বনফুল রচনাবলী

বিংশ খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ।। কলকাতা-৭৩

সূচীপত্র

উপন্যাস

তীর্থের কাক

উৎসর্গ

অনুজপ্রতিম সাহিত্যিক বন্ধু
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কল্যাণীয়েষু

॥ এক ॥

গাড়িতে প্রচুর ভিড় ছিল সেদিন। তৃতীয় শ্রেণীর কামরা, প্রচণ্ড দ্বিপ্রহরকে প্রচণ্ডতর করিয়া 'লু' বহিতেছিল। ধুলো ও বালির ঝড়ে চতুর্দিক অন্ধকার। ট্রেনের গর্জন ও ঝড়ের গর্জন যে প্রলয়-রোল তুলিয়াছিল তাহাতে আতঙ্কিত হইবার কথা, কিন্তু যাত্রীদের মুখে আতঙ্কের কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছিল না। যাঁহারা বসিবার স্থান পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঢুলিতেছিলেন, কেহ খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, গুনগুন করিয়া সুরও ভাঁজিতেছিলেন একজন। ভদ্রঘরের মহিলাও ছিলেন কয়েকটি। একজনের মাথায় ঘোমটা ছিল, তিনি দুইটি আঙুল দিয়া ঘোমটা ফাঁক করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া নানা যাত্রীর মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছিলেন। আর একধারে কয়েকজন নোংরা-কাপড়-পরা লোক নিজেদের মধ্যে জটলা করিতেছিল। দুইজন বিড়ি ফুঁকিতেছিল, একজন ছুরি দিয়া একটা বড় ফুটি ছাড়াইতেছিল, খৈনি মলিতেছিল একজন, আর দুইজন পাটের দড়ি পাকাইতেছিল একধারে বসিয়া। কেহই নীরব ছিল না, সকলেরই রসনা দ্রুতবেগে চলিতেছিল। মনে হইতেছিল একদল ছাতারে পাখি যেন কচকচ করিতেছে। গাড়ির সব জানালা বন্ধ ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ একটা জানালার সার্সি হড়াম্ করিয়া খুলিয়া গেল, উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া অব্যাহত বেগে প্রবেশ করিল ধূলি-ধূসরিত উন্মত্ত 'লু'। চঞ্চল হইয়া উঠিল যাত্রীরা।

"জানলাটা বন্ধ করে দিন মশাই—"

"খিড়কি বন্দ্ কর দিজিয়ে।"

"প্লিজ ক্লোজ দি শাটার্স।"

যুগপৎ তিনটি ভাষায় কলবল করিয়া উঠিল সকলে। জানলার ঠিক ধারেই বসিয়াছিল নবকিশোর। তাহারই অসুবিধা হইতেছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। সে সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া সার্সিটা বন্ধ করিতে গেল, কিন্তু পারিল না। সার্সিটা এমন বেকায়দায় আটকাইয়া গিয়াছিল যে কিছুতেই তোলা গেল না। নবকিশোর অনেক টানাটানি করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যাত্রীদের মধ্যে অনেকে আসিয়া চেষ্টা করিলেন কিন্তু অনড় সার্সিকে আর নাড়ানো গেল না। হু হু করিয়া কামরার মধ্যে যখন উত্তপ্ত 'লু' প্রবেশ করিতেছে এমন সময় হঠাৎ 'ক্যাঁচ' করিয়া একটা শব্দ হইল। কে যেন 'চেন' টানিয়াছে।

নবকিশোর চাহিয়া দেখিল একটি বলিষ্ঠ যুবক কামরার অপর প্রান্ত হইতে আগাইয়া আসিয়া 'চেন' ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুখে মৃদু হাসি। মৃদু কিন্তু স্পর্ধা-ব্যঞ্জক। স্পর্ধা-ব্যঞ্জক হইলেও উদ্ধত নয়। তাহা চিত্তে আঘাত করে না, চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে। সে হাসি নীরব ভাষায় যেন সকলকে বলিয়া দিল—ইহা ছাড়া এখন করিবার আর কি আছে, তোমরা কেহ সাহস করিলে না, কিন্তু আমি করিয়াছি। সব ঝুঁকি আমিই লইলাম। যুবকের দিকে চাহিয়া নবকিশোর মুগ্ধ হইয়া গেল। উৎসাহকে সেই প্রথম দেখিল সে। তখন ইংরেজের আমল। এখনকার মতো তখন

যখন-তখন যেখানে-সেখানে চেন টানিয়া ট্রেন থামাইতে কেহ সাহস করিত না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন থামিয়া গেল এবং গার্ড সাহেব আসিয়া হাজির হইলেন। গার্ড সাহেব, সাহেব নন, প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্রলোক।

"চেন টেনেছে কে ?"

"আমি—"

উৎসাহ আগাইয়া গেল।

"চেন টানলেন কেন হঠাৎ ? কি হয়েছে—"

"গাড়ির জানলা বন্ধ হচ্ছে না। আমরা গরমে মারা যাচ্ছি। জানলাটা বন্ধ করবার ব্যবস্থা করুন—"

"কি হয়েছে, দেখি—"

গার্ড সাহেবও জানলাটা ধরিয়া খানিকক্ষণ টানাটানি করিলেন, কিন্তু সুবিধা করিতে পারিলেন না।

"মিস্ত্রী না হলে হবে না। এই মাঠের মাঝখানে মিস্ত্রী কোথায় পাব ! এই জন্যে চেন টানলেন ? আশ্চর্য !"

"এমন বাজে গাড়ি আপনারা দিয়েছেন কেন ! আপনারা কি থার্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জারদের মানুষ বলে মনে করেন না ?"

গার্ড সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আমরা যদি মানুষ হতাম তাহলে কি ইংরেজ এদেশে রাজত্ব করতে পারত ! তারা ক্ষমা-ঘেন্না করে যা আমাদের দিয়েছে তাই আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে—"

"নেব না। গাড়ির জানলা যতক্ষণ না বন্ধ হয় আমরা গাড়ি যেতে দেব না, বারবার চেন টানব।"

একদল বিহারী উৎসাহের দলে যোগ দিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"জরুর, জরুর—"

হে হৈ করিয়া উঠিল সকলে।

গার্ড সাহেব উৎসাহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জানেন এর পরিণাম কি ? আপনাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা তো দিতেই হবে, জেলও হ'তে পারে।"

উৎসাহ কয়েক মুহূর্ত গার্ড সাহেবের মুখের দিকে হাসিমুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পর যাহা বলিল তাহা অপ্রত্যাশিত।

"এ মাসে আমার গোচর ফল খুব ভালো। চতুর্থ স্থানে মীনরাশিতে বৃহস্পতি আছেন। আপনি কিচ্ছু করতে পারবেন না আমার !"

একটা কাবুলী এতক্ষণ কামরার এককোণে নিদারুণ ভিড় এবং গরম সত্ত্বেও অগাধে ঘুমাইতেছিল। গোলমালে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। উঠিয়া সবিস্ময়ে বলিল—"হাল্লা কাহে বাবু সাব ?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সব শুনিল সে। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইল। একটি বাক্যব্যয় না করিয়া ভিড় ঠেলিয়া একেবারে সোজা আসিয়া হাজির হইল জানলাটার কাছে। একবার নাড়াইয়া দেখিল, তাহার পর সামনের বেঞ্চে দাঁড়াইয়া প্রচণ্ড একটি লাথি মারিল সার্সিটার যতটুকু বাহির হইয়া ছিল তাহার উপর। খট্ করিয়া শব্দ হইল একটা। বাস্, তাহার পর সব ঠিক। লাথি খাইয়া সার্সিটা সুড়সুড় করিয়া

উপরে উঠিয়া গেল। কাবুলী কোন দিকে ফিরিয়া চাহিল না, স্বস্থানে ফিরিয়া গেল এবং আবার অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

গার্ড সাহেব তাহার দিকে এক নজর চাহিয়া বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন—"তাগদ আছে বটে লোকটার।" তাহার পর উৎসাহের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনার কুষ্ঠিতে বিশ্বাস আছে না কি?"

"অগাধ।"

"হাতটাত দেখতে জানেন?"

"সামান্য—"

"আসুন আমার সঙ্গে।"

"কোথায়—"

"আমার গাড়িতে। বে-আইনী কাজ করেছেন জরিমানা দিতে হবে।"

"একটি পয়সা দেব না। পয়সা নেইও। যদি জেলে পুরে দিতে পারেন কৃতজ্ঞ থাকব। হার্ড স্ট্রাগলের দিনে গভর্নমেণ্টের স্কন্ধে বসে দিনকতক খাওয়া যাবে বিনা পয়সায়—"

হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন গার্ড সাহেব।—"আরে না, না মশায়। আপনাকে দিয়ে হাতটা দেখাব। আসুন। কতদূর যাবেন আপনি?"

"কলকাতা।"

"আসুন আমার গাড়িতে। সঙ্গে জিনিসপত্র আছে?"

"না। একেবারে ঝাড়া হাত পা—"

গার্ড সাহেবের সহিত উৎসাহ চলিয়া গেল।

নবকিশোর মনে মনে একটু হতাশ হইল, ছেলেটির সহিত আলাপ করিবার বাসনা জাগিয়াছিল তাহার। যদিও সে মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বিজ্ঞানের নিকষে যাচাই না করিয়া কোন কিছু সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে তাহার বুদ্ধি অস্বীকার করে, তবু ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাহার কিছু দুর্বলতা আছে। একজন জ্যোতিষী তাহার মায়ের মৃত্যুর তারিখটা নির্ভুলভাবে বলিয়া দিয়াছিল মায়ের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে। আর একজন জ্যোতিষী তাহার দরিদ্র প্রতিবেশী জগমোহনবাবুর হাত দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল যে এক বৎসরের মধ্যে জগমোহনবাবু একটি পাকা বাড়ির মালিক হইবেন। দরিদ্র জগমোহন অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী কিন্তু নিষ্ফল হয় নাই। এমনই অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ ঘটিয়াছিল যে জগমোহনবাবু সত্যই এক বৎসরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটি পাকা বাড়ি কিনিতে পারিয়াছিলেন। নবকিশোর এমনি আরও দুই একটা আশ্চর্যজনক গল্প শুনিয়াছিল। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ফলিত জ্যোতিষের ব্যাখ্যা করা যায় না—কিন্তু শেক্সপীয়ারের সেই বিখ্যাত উক্তিটা মনে পড়ে—there are more things in heaven and earth...। নবকিশোরের ইচ্ছা আছে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে জ্যোতিষের আলোচনা করিবে। কিন্তু পথ দেখাইবে কে তাহাকে? এই ছেলেটির জ্যোতিষ-শাস্ত্রে দখল আছে মনে হয়, কিন্তু ও তো চলিয়া গেল। সহসা নবকিশোরের মনে হইল মুখটা যেন চেনা-চেনা। কোথায় যেন দেখিয়াছে। কোথায়? কলিকাতায় যাইবে বলিল। সেও তো কলিকাতায় চলিয়াছে।

কলিকাতাতেই কি দেখা হইয়াছিল কখনও ? আবার কি হইবে ? ট্রেন আবার চলিতে শুরু করিল। নবকিশোরের মনে উৎসাহের মুখটাই ভাসিয়া উঠিতে লাগিল বারবার।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন যখন পেঁাছিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নবকিশোরের সঙ্গে ছোট একটি ট্রাংক ছিল। সেটি নিজেই সে নামাইয়া প্ল্যাটফর্মের উপর রাখিল এবং সন্ধান করিতে লাগিল কোনও কুলি পাওয়া যায় কি না। লম্বা প্ল্যাটফর্ম, ট্রাংক লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। প্ল্যাটফর্মের বাহিরে গিয়া একটা ট্যাক্সি কিংবা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিতে হইবে। সেকালে 'বাস'-এর তেমন প্রচলন হয় নাই, ট্রামও স্টেশনের ধার পর্যন্ত আসে নাই। তখন পুরাতন হাওড়ার পুল ছিল, দিনে দুইবার খোলা হইত। কুলি বেশী ছিল না এবং তাহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যাহাদের বেশী মাল আছে তাহাদের লইয়া। একজন কুলি বলিল, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি এ মালগুলো গাড়িতে চড়িয়ে এখনই ফিরে আসছি। তারপর আপনার ট্রাংকটা নিয়ে আপনাকে গাড়িতে চড়িয়ে দেব। আট আনা পয়সা নেব কিন্তু—"। সেকালের হিসাবে মজুরিটা একটু বেশী। এক আনা, বড় জোর দুই আনাই পর্যাপ্ত মজুরি ছিল সেকালে। নবকিশোরের মনে হইল লোকটা গরজ বুঝিয়াছে। পাশের প্ল্যাটফর্মে আর একটা গাড়ি আসিয়াছিল, সেজন্য অনেক কুলি সেই দিকে ছুটিয়াছিল। নবকিশোর ভাবিতেছিল কি করিবে, এমন সময় দেখিতে পাইল উৎসাহ আসিতেছে। অন্যমনস্ক হইয়া আসিতেছে, চারিদিকে এত ভিড়, এত কলরব, কোন দিকে তাহার যেন খেয়াল নাই। নবকিশোর আগাইয়া গেল।

"নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আপনি তো নেবেই গেলেন—"

"কে আপনি ! ও, আগে নমস্কারটা করা উচিত। নমস্কার, নমস্কার। আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না, অথচ মনে হচ্ছে—"

"যে জানলা নিয়ে দুপুরে আমাদের কামরায় এত কাণ্ড হ'ল, আমি সেই জানলার পাশেই বসেছিলাম। আপনি চেন টেনে গাড়ি থামালেন—"

"বুঝেছি। মনে পড়েছে। আলোর মতো স্বচ্ছ হ'য়ে গেছে সবটা। আলাপ করবেন আমার সঙ্গে ? কেন !"

"আপনার বলিষ্ঠ দৃপ্ত আচরণ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম। আর কোনও কারণ নেই—"

"আমাকে ফ্ল্যাটার করে আপনার লাভ ? আমি বড়লোক নই, কেউ-কেটা নই, আমি অতি সামান্য নগণ্য লোক—"

"আমিও তাই। লাভ লোকসান ভেবে কারও সঙ্গে আলাপ করি নি আজ পর্যন্ত—"

"তাহলে আসুন প্রথমেই আলিঙ্গনবদ্ধ হই।"

উৎসাহের বলিষ্ঠ বাহু দুইটি নবকিশোরকে জড়াইয়া ধরিল।

"এইবার আপনার নামটা বলুন।"

"নবকিশোর মুখোপাধ্যায়।"

"বাঃ, তাহলে গোত্র মিলে গেছে। আমি উৎসাহ মুখোপাধ্যায়। চলুন, যাওয়া যাক, দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?"

"ট্রাংকটা নিয়ে যেতে হবে। কুলির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। আট আনা পয়সা চাইছে—"

"কুলি বি ড্যাম্‌ন্‌ড্‌ (be damned), চলুন আমি নিয়ে যাচ্ছি। বিবেকে যদি খচখচ করে পয়সাটা আমাকেই দিয়ে দেবেন। চলুন।"

অবলীলাক্রমে উৎসাহ ট্রাংকটা হাতে ঝুলাইয়া লইল।

কিছুদূর গিয়া নবকিশোর জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?"

"মল্লিকের হাত দেখছিলাম।"

"মল্লিক কে —"

"ওই যে গার্ড সাহেব।"

"সমস্ত দিন ওইখানে ছিলেন ?"

"সমস্ত দিন।"

"সমস্ত দিন হাত দেখছিলেন ?"

"শুধু হাত নয়, সর্বাঙ্গ দেখছিলাম।"

"সর্বাঙ্গ ?"

"সর্বাঙ্গ না দেখলে সব কথা ঠিক ঠিক বলা যায় না। মল্লিককে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দেখেছি।"

"কি রকম ?"

"ব্যাপারটা আলোর মতো স্বচ্ছ করে দেব ? কল্পনা করুন তাহলে। দুপুরের প্রখর রোদে পুড়ে যাচ্ছে চারিদিক। হুহু করে 'লু' বইছে ধুলো বালি উড়িয়ে। কুমড়ো-মুখো মল্লিক উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে, তাঁর হাইড্রোসিল, তাঁর নেয়াপাতি ভুঁড়ি, তাঁর কাঁচা-পাকা লোমে ভরতি বুক, তাঁর তলপেটের জড়ুর, তাঁর গোপন অঙ্গের তিল প্রখর দিবালোকে প্রকট হ'য়ে উঠেছে। ঈষৎ অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন পঞ্চকন্যা এবং তিনপুত্রের জন্মদাতা মল্লিক আমার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আলোর মতো স্বচ্ছ হয়েছে এবার ?"

"হয়েছে। কি দেখলেন ?"

"তা আলোর মতো স্বচ্ছ করতে পারব না। 'এটিকেট'-বিরুদ্ধ। তবে আবছাভাবে বলতে পারি আমাদের সবলেরই মতো উনিও সংসার-তরঙ্গ-তাড়িত খড়কুটো। কিন্তু উনি যে খড়কুটো মাত্র সে জ্ঞানটুকু নেই, অহংকারে অন্ধ হ'য়ে আছেন। মনে করছেন চেষ্টা করলে উনি বুঝি ভাগ্যকেও উলটে দিতে পারেন। তাবিজ পরেছেন, মাদুলি পরেছেন, দামী দামী পাথর ধারণ করেছেন, স্বস্ত্যয়ন করিয়েছেন—"

"ওসবে কিছু হয় না বুঝি ?"

"তা জানি না। রত্ন-বিশারদ বিরাট পণ্ডিত বলেন হয়। আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, আমি 'হাঁ' 'না' কিছুই বলতে পারব না—"

ট্রেন হইতে একটা বরযাত্রীর দল নামিয়াছিল। লাল-চেলী-পরা নববধূটিকে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে বসাইয়া কর্তা-ব্যক্তিরা গাড়ির খোঁজে বাহিরে গিয়াছিলেন সম্ভবত। বধূটির পাশে সিল্কের মোজা ও চকচকে পাম-শু-পরা ছোকরাটি সম্ভবত

বর। উৎসাহ হঠাৎ তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পড়িল এবং বরের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর যেন আপন মনেই অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"হায়, ভগবান··!"

"কি হ'ল—"

"কিছু না। চলুন—"

হনহন করিয়া আগাইয়া গেল। কিছুদূর গিয়া নবকিশোরের দিকে চাহিয়া নিজেই বলিল, "ছোকরা বেশী দিন বাঁচবে না। অকালবৈধব্য হবে মেয়েটার—"

"আপনি বুঝতে পারলেন ?"

"পারলুম বৈকি। মনে হল মুণ্ডহীন কেতুর কবন্ধটা দু'হাত বাড়িয়ে ওর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে!"

"বলেন কি!"

উৎসাহ কোন উত্তর না দিয়া হেঁটমুণ্ডে হাঁটিতে লাগিল, মনে হইল শান-বাঁধানো স্টেশন প্ল্যাটফর্মের উপরই সে যেন উত্তরটা খুঁজিতেছে। তাহার পর হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল—"আমার জীবনের এইটেই ট্রাজেডি। আমি বিপদের ছায়া আগে থাকতে দেখতে পাই, অথচ জানি সে বিপদ নিবারণ করা যাবে না। ভালোটা দেখতে পাই না, খারাপটা পাই। কিছুদিন থেকে আমার এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টা ভূতের মতো আমার ঘাড়ে চেপে রয়েছে আর ক্রমাগত বলছে—ওই দেখ, ওই দেখ, ওই দেখ—ওই লোকটা মরবে, ওই লোকটা খুনী, ওই মেয়ে পতিঘাতিনী। কি করি বলুন তো ?"

করুণকণ্ঠে উৎসাহ যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

"কতদিন থেকে আপনি এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের পাল্লায় পড়েছেন ? মাপ করবেন পাল্লা কথাটা ব্যবহার করলাম, আর কোন জুতসই কথা মাথায় আসছে না—"

" 'কবল' বললে আরও জুতসই হ'ত। এক শ্মশান ভৈরবীর নির্দেশে আমি দিনকতক তান্ত্রিক সাধনা করেছিলাম। যোগিনী-সাধনা। বর পেয়েছি, কিন্তু বর অভিশাপ বলে মনে হচ্ছে। তারপর থেকেই এই ব্যাপার।"

উৎসাহ পুনরায় হেঁটমুণ্ডে হাঁটিতে লাগিল। আর কোন কথা বলিল না। নবকিশোরের মনে হইল সে কাহারও দিকে চাহিতে চায় না বলিয়াই বোধ হয় হেঁটমুণ্ডে হাঁটিতেছে।

নীরবেই তাহারা বাকি প্ল্যাটফর্মটুকু পার হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

নবকিশোর প্রশ্ন করিল—"আপনি কোথা যাবেন ?"

"আমি যাব সিংহিবাগান। মদন চাটুজ্যে লেন। আপনি ?"

"আমি মির্জাপুর স্ট্রীট। এক কাজ করা যাক, আসুন একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করি। আমি আপনাকে সিংহিবাগানে নাবিয়ে দিয়ে আমার মেসে চলে যাব—"

"আমি গরীব মানুষ, ঘোড়ার গাড়ি চড়া আমার অভ্যাস নেই। আমি হেঁটে যাব—"

"না, না, চলুন, আমার সঙ্গে।"

"এ অহেতুক আগ্রহ কেন ?"

"অহেতুক নয়, হেতু আছে বই কি একটা—"

"সেটা ব্যক্ত করুন।"

"আপনাকে দেখে এত ভাল লেগেছে যে কলকাতার এই ভিড়ে আপনাকে হারিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে না। আপনার বন্ধুত্ব কামনা করছি। এতে কি আপনি আপত্তি করবেন ? আপনার মুখটাও চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। আপনি কি করেন ?"

"আমি এবার মেডিকেল কলেজে ঢুকেছি—"

"ও, তাই। আমিও মেডিকেল কলেজের ছাত্র। আপনার ফার্স্ট ইয়ার ? আমি ফোর্থ ইয়ারে উঠলাম এবার। আপনি আই. এসসি পাস করেছেন কোথা থেকে ?"

"আই. এসসি পাস করেছি কটক থেকে—"

"আপনি তাহলে উড়িষ্যা থেকে সিলেক্টেড হয়েছেন ?"

"না। চেষ্টা করেছিলাম, হই নি। তারপর বি. এসসি পড়ি বহরমপুর থেকে। তবুও ঢুকতে পারি নি। এবার এম. এসসি পাস করেছি সায়েন্স কলেজ থেকে, এবারও ঢুকতে পারতাম না। কিন্তু এখন যিনি আমার অভিভাবক তিনি প্রিন্সিপাল বার্নাডো সাহেবের কি যেন একটা উপকার করেছিলেন এককালে। সাহেবরা উপকারের কথা ভোলে না। বার্নাডোও ভোলেন নি। তাঁরই সুপারিশে ভরতি হ'তে পেরেছি। ডিয়ার সাহেবের আমলে কলকে পাই নি, কারণ জানা-শোনা ছিল না, ঘুষ দেবার মতো পর্যাপ্ত টাকাও ছিল না হাতে। সুতরাং কালক্ষয় করতে হয়েছে। সবই অদৃষ্ট, আমাদের কোনও হাত নেই। চললুম। এই আপনার ট্রাঙ্ক রইল। আপনি একটা গাড়ি ডেকে চলে যান—"

"চলুন না একসঙ্গেই যাই—"

"না, মাপ করবেন। পরের পয়সায় গাড়ি চড়ব না। আমার কাছেও পয়সা নেই যে গাড়ির অর্ধেক ভাড়া দিয়ে দেব। সুতরাং চরণবাবুর জুড়িতেই চললুম—"

"কিন্তু আপনার সঙ্গে যে ভাব করতে চাই।"

"সে পরে হবে এখন। আচ্ছা, আমার ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি আপনাকে। আপনার ঠিকানাটাও দিন। তাছাড়া কলেজেও দেখা হয়ে যেতে পারে।"

উৎসাহ পকেট হইতে ছোট একটা পকেট বুক বাহির করিল এবং তাহারই একটা পাতায় ঠিকানা লিখিয়া কাগজটা ছিঁড়িয়া নবকিশোরকে দিল।

"এই নিন। এইবার আপনার ঠিকানাটা বলুন, টুকে নিই। ঘুরতে ঘুরতে একদিন গিয়ে পড়ব। সন্ধ্যের পর নিশ্চয়ই বাড়ি থাকেন ?"

"হ্যাঁ। সাধারণতঃ থাকি। আমার ঠিকানা ৩নং মীর্জাপুর স্ট্রীট।"

"আচ্ছা, চলি তা'হলে—"

"আচ্ছা, নিতান্তই যখন যাবেন না একসঙ্গে, তখন ছেড়ে দিতেই হবে। নমস্কার। সময় পেলে কালই যাব আপনার ঠিকানায়। খুব ভোরে কিংবা বিকেলে ছ'টা নাগাদ। কি বলেন ?"

"বেশ। কলেজেও দেখা হতে পারে—"

"তা হতে পারে। আমার সকাল থেকেই ক্লাস, তারপর হাসপাতাল, তারপর আবার ক্লাস। আপনারও ক্লাস তো সকাল থেকেই শুরু। কলেজে আলাপ করার সময় হবে কি। দেখা যাক—"

নবকিশোরের একবার মনে হইল উনি যখন আমার পয়সায় গাড়ি চড়িতে অনিচ্ছুক তখন আমিই বা বিনা পয়সায় উঁহাকে দিয়া ট্রাঙ্কটা বহাইয়া লইলাম কেন। আমিই

বা ঋণী থাকিব কিসের জন্য ! একটু ইতস্তত করিয়া অবশেষে সে বলিয়াই ফেলিল—"আপনি পরের পয়সায় গাড়ি চড়তে নারাজ, আমারও তো তাহলে আপনাকে দিয়ে বিনা পয়সায় ট্রাঙ্কটা বইয়ে নেওয়া উচিত হ'ল না—আপনি হয়তো মনে মনে আমাকে সুবিধাবাদী ভাবছেন—"

"বেশ তো মজুরি দিতে চান দিন না। আপনি যা দেবেন তাই নেব। আমি তীর্থের কাক, যেখান থেকে যতটুকু পাই ছাড়ি না—"

নবকিশোরকে তখন মনি-ব্যাগ বাহির করিতে হইল। দেখিল খুচরা মাত্র চার আনা আছে, বাকি সব টাকা। একটি টাকাই সে বাহির করিয়া বলিল—"এই নিন তাহলে—"

উৎসাহ সঙ্গে সঙ্গে টাকাটি পকেটস্থ করিয়া হাসিমুখে নবকিশোরের দিকে চাহিয়া রহিল ক্ষণকাল, তাহার পর বলিল—"শুধু টাকাটাই পেলাম না, আরও অনেক কিছু পেলাম, কিন্তু আপনি সেটা জানতে পারলেন না। কাকেরা ধূর্ত, তারা অনেক জিনিস লুকিয়ে নিয়ে পালায়।"

"আর কি পেলেন।"

বিস্মিত নবকিশোর প্রশ্ন করিল।

"আপনার চরিত্রের খানিকটা পেলাম। বুঝলাম আর পাঁচজনের মতো আপনিও নকলনবীশ। যা করলেন তা আমার নকল করে করলেন, বিবেকের আদেশে নয়। 'তুমি এই করলে, বেশ আমিও করছি, আমিও তোমার চেয়ে কম কিছু নই'—এই আপনার মনোভাব। এ মনোভাবের নাম দম্ভ !"

"কিন্তু আপনার মনোভাবও কি দম্ভ নয় ?"

উৎসাহ কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আপনাকে এখনই বলবার ইচ্ছে ছিল না। হ্যাঁ, আপাতদৃষ্টিতে ওটাও দম্ভ। কিন্তু আমি একটা ব্রত পালন করছি, সে ব্রতের মেরুদণ্ড স্বাবলম্বন। এর বেশী এখন আর বলব না কিছু। সত্যিই যদি আমাদের বন্ধুত্ব হয় তখন সব জানতে পারবেন। চললুম। নমস্কার—"

উৎসাহ হনহন করিয়া আগাইয়া গেল। কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিল না। একটা ছুটন্ত ট্যাক্সি আসিয়া তাহাকে চাপা দিল। তাহার নিজেরই পিছনে সম্ভবত কোনও পাপগ্রহ ছায়াপাত করিয়াছিল কিন্তু সে ছায়া উৎসাহ দেখিতে পায় নাই। পিছনে তো চোখ থাকে না ! ট্যাক্সিওয়ালাকে ঘিরিয়া একদল লোক হৈ হৈ করিয়া উঠিল। নবকিশোরও ছুটিয়া গেল সেখানে। দেখিল উৎসাহ অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। নবকিশোর আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই ট্যাক্সিতেই তাহাকে লইয়া মেডিকেল কলেজের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইল। সঙ্গে রহিল কেবল একটা পুলিস।

॥ দুই ॥

নববিশোর উৎসাহকে লইয়া যখন মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সি রুমে পৌঁছিল তখন সেখানে ও. ডি. (অফিসার অন্ ডিউটি) ছিলেন ডাক্তার পুলিন মিত্র। তিনি রসিক লোক। নবকিশোরকে ভালও বাসিতেন।

বলিলেন, "রৌরব তো জমজমাট। দু'টি সুইসাইড, একটি বার্ন কেস (burn case), গোটা দুই ফ্র্যাকচার। তুমি বাবা আর একটি পাপীকে এনে জোটালে! ওদিকে বড় সায়েব মাল চড়িয়ে লাট হ'য়ে বসে আছেন। কুটোটি নেড়ে সাহায্য করবেন না। একটু আগে একটা স্ট্র্যাংগুলেটেড্ হার্নিয়া (strangulated hernia) এসেছিল, খবর পাঠালুম, এলেন না। নিজে গেলুম, দেখি ফুল ফোর্সে ফ্যান খুলে দিয়ে শুধু গায়ে ইজি চেয়ারে শুয়ে আছেন। পাশের টেবিলে হুইস্কি সোডা। আমাকে দেখে বললেন—I am not very steady now, you do it yourself Pulin : এই মাত্র সেটির গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করে নেবে এসেছি। তুমি আবার কাকে আনলে।"

"আমাদের কলেজেরই ছাত্র। একটু আগেই আমার সামনে ট্যাক্সি চাপা পড়ল হাওড়ায়। আগে ওকে একটু দেখুন সার।"

"সবায়ের মুখেই তো ওই এক বুলি—আগে ওকে একটু দেখুন সার। চল দেখি। মেডিকাল কলেজের ছেলে এত আনাড়ি, ট্যাক্সি চাপা পড়ল!"

"অন্যমনস্ক হ'য়ে রাস্তা cross করছিল—"

অজ্ঞান উৎসাহকে ইমার্জেন্সি রুমের টেবিলে চড়াইয়া দেখা গেল বাম হাতের একটা সামান্য ক্ষত হইতেই তাহার জামা কাপড় রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে। কোনও হাড় ভাঙে নাই। ডাক্তার মিত্র উৎসাহের নাড়ী, চোখ, বুক, পেট প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"এখন observation-এ রেখে দেওয়া যাক। চট করে কিছু বলা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কংকাশান অব দি ব্রেইন (concussion of the brain) হয়েছে। দেখ তো এজরাতে (Ezra) বেড খালি আছে কি না—"

নবকিশোর দেখিল, আছে।

"সেইখানেই নিয়ে যাও তাহলে। ওর আত্মীয়স্বজনকে খবর দিয়েছ ?"

"না। আমি তাদের চিনি না—"

"যদি মরে যায় তাহলে কি ডোমে ফেলবে ?"

নবকিশোর চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মনে পড়িল উৎসাহ তাহাকে সিংহিবাগানের একটা ঠিকানা দিয়াছিল।

"ওর একটা ঠিকানা জানি। সেইখানে গিয়েই খোঁজখবর করছি—"

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অজ্ঞান লোককে লইয়া পুলিস প্রবেশ করিল এবং ডাক্তার মিত্রকে সেলাম করিয়া বলিল—"মাতোয়ালা হ্যয় হুজুর। রাস্তা পর গিরা হুয়া থা—"

"ওই বেঞ্চ পর শুতা দো। ভিতর মে আর জায়গা নেহি হ্যয়—ওহে এটার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালো—"

ডাক্তার মিত্র নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার বন্ধুকে নিয়ে এজরায় শুইয়ে দিয়ে এসো। সেখানে যে নার্সটি আছে তাকে চেনো ? নার্স কিং—"

"আলাপ নেই—"

"দুটো মিষ্টি কথা বলে আলাপ করে ফেল। আখেরে ভালো হবে। ওদের হাতেই তো সব—"

ইমার্জেন্সি ডিউটিতে নবকিশোরের এক বন্ধু সুশীল ছিল। সে খানিকটা বরফ-জল আনিয়া মাতালটার মুখে ঝাপটা দিতে লাগিল। দিতে দিতে নিম্নকণ্ঠে

নবকিশোরকে বলিল—"তুই এর মুখে জলের ঝাপটা দে। আমি তোর বন্ধুকে এজরায় নিয়ে যাচ্ছি। মিস্‌ কিংয়ের সঙ্গে আমার আলাপ আছে—"

ডাক্তার মিত্র একটা ফ্র্যাক্‌চার লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবকিশোর সুশীলের হাত হইতে বরফ-জলের বড় মগটা লইয়া মাতালটার চোখে মুখে ঝাপটা দিতে লাগিল, সুশীল একটা স্ট্রেচার যোগাড় করিয়া উৎসাহকে লইয়া গেল এজরার দিকে।

ডাক্তার মিত্র হঠাৎ বাহির হইয়া আসিলেন।

"একি, তুমি এজরায় যাও নি—?"

"সুশীল গেল। আমি তার কাজটা করে দিচ্ছি। ও বললে ওর সঙ্গে আলাপ-সালাপ আছে—"

"আচ্ছা ঘড়েল ছোকরা তো! এক মাগী আপিং গিলে এসেছে, আর একবার তার 'স্টমাক ওয়াশ' (stomach wash) করতে হবে। ওকে সব ঠিক করতে বলেছিলাম—পাগল করে দেবে দেখছি আমাকে তোমরা—"

ডাক্তার মিত্র আবার হন্তদন্ত হইয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন, কারণ ফ্র্যাকচার রোগীটার ক্লোরোফর্মের নেশা বোধ হয় ছুটিয়া গিয়াছিল, চীৎকার করিতেছিল সে। ডাক্তার মিত্র পুনরায় বাহির হইয়া আসিলেন।

"তুমি ওই ফ্র্যাক্‌চার কেসটাকে একটা মর্ফিন দিয়ে এস। আমি এটাকে দেখি—অমন যাদুর গায়ে হাত বোলালে হবে না—"

ডাক্তার মিত্র হড়হড় করিয়া মগের সব জলটা তাহার মাথায় ঢালিলেন এবং একটা কুলিকে আদেশ করিলেন—"আরও জল আন—"

মাথায় মুখে প্রচুর বরফ-জল দেওয়াতে মাতালের জ্ঞান হইল। সে চোখ খুলিয়া তাকাইল।

চোগোপ্পা বলিষ্ঠ কনস্টেবলটা সবিস্ময়ে এতক্ষণ নীরবে চাহিয়া ছিল। এইবার সে মন্তব্য করিল—"অব শালেকা হোস্‌ আয়া—"

ডাক্তার মিত্র প্রশ্ন করিলেন, "নাম কি?"

"জগন্নাথ।"

জগন্নাথ ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর নিজের ভিজা কাপড়চোপড়ের দিকে চাহিয়া জড়িতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"এটা কি হল, সার।"

"জগন্নাথের স্নানযাত্রা—"

ডাক্তার মিত্র কাগজপত্রে সই করিবার জন্য আবার ভিতরে চলিয়া গেলেন। ইমার্জেন্সি রুমের নাটকে দৃশ্যের পর দৃশ্য বদল হইতে লাগিল।

ইমার্জেন্সি রুম হইতে বাহির হইয়া নবকিশোর 'এজরায়' গেল। 'এজরা' হাসপাতালের সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় ছিল না। তখনও তাহার সেখানে 'ডিউটি' পড়ে নাই। গিয়া প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহার পর ওআর্ডের ভিতর ঢুকিয়া সে হঠাৎ নির্মলকে দেখিতে পাইল। নির্মল তাহার সহপাঠী। এজরাতেই তাহার ডিউটি ছিল। তাহার নিকটই সে খবর পাইল সুশীল উৎসাহকে লইয়া স্টুডেন্টস কেবিনের দিকে গিয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। চারিদিকে

আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ওআর্ড নিস্তব্ধ। নবকিশোর বারান্দা দিয়া কেবিনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল চোখে-ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা রোগীর দল নিজের নিজের বিছানায় শুইয়া আছে। এজন্য তখন চোখের হাসপাতাল ছিল। হঠাৎ খটখট শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া সে দেখিতে পাইল নার্স আসিতেছে, তাহার পিছু পিছু সুশীল। নার্স নির্বিকার, সুশীল গদগদ।

"এই যে নবকিশোর। ইনিই নার্স কিং। এঁকে বলে দিয়েছি সব। তোমার বন্ধু ওই কেবিনটায় আছে—"

নবকিশোরের সহিতও নার্স কিং-এর পরিচয় করাইয়া দিল সুশীল।

"Glad to meet you."

মুচকি হাসিয়া নার্স কিং খটখট করিয়া আগাইয়া গেল। নবকিশোরকে দেখিয়া তাহার গতিবেগ কিছুমাত্র কমিল না। নবকিশোরের কেন জানি না মনে হইল একটা খঞ্জন খুর খুর করিয়া চলিয়া গেল।

উৎসাহের কেবিনে গিয়া দেখিল উৎসাহ তখনও অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। মাথায় আইস ক্যাপ। নাড়ীটা টিপিয়া দেখিল একবার। যদিও তাহার নাড়ীজ্ঞান বিশেষ কিছু হয় নাই তখনও, তবু তাহার মনে হইল নাড়ী ভালই চলিতেছে। নিশ্বাস প্রশ্বাসও বেশ স্বাভাবিক। মুখভাব যদিও প্রশান্ত তবু নবকিশোরের মনে হইল উৎসাহ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আছে যেন। শুধু তাই নয় তাহার মুখে কি যেন একটা পরিবর্তনও আসিয়াছে। কিন্তু সেটা কি তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। যে লোক গাড়ির চেন টানিয়া ট্রেন থামাইয়াছিল, যে লোক সদ্যবিবাহিত বরের পিছনে কেতুর ছায়া দেখিতে পাইয়াছিল, এ যেন সে লোক নয়। একটা আত্মসমর্পণের ভাব যেন সারা মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটু আগে সে বলিয়াছিল 'আমি তীর্থের কাক'। কোন্ তীর্থের ? তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নবকিশোর খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সহসা মনে পড়িল সিংহিবাগানে একটা খবর দিতে হইবে। পকেট হইতে কাগজটা বাহির করিয়া আর একবার সে ঠিকানাটা পড়িয়া লইল—কেয়ার অফ পণ্ডিত বিরাটেশ্বর শর্মা, মদন চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা। চিৎপুরের কাছে।

নবকিশোরের ট্রাঙ্কটা ইমার্জেন্সি রুমেই ছিল। সেটি লইয়া প্রথমে সে মেসে গেল। মেসে গিয়া স্নান করিয়া লইল। রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছিল। ঠাকুর বলিল—রান্না হইয়া গিয়াছে।

"আমার খাবারটা ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে দিও। একটু বেরুচ্ছি এখন। ফিরতে হয়তো দেরি হবে—"।

ট্রামেই বাহির হইয়া পড়িল নবকিশোর।

পথে একজন সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, মদন চ্যাটার্জি লেনটা কোথায় বলতে পারেন ? আমি মফস্বলের ছেলে, কলকাতার পথ-ঘাট এখনও সব চিনি না—"

ভদ্রলোক বলিলেন,—"আপনি যে মফস্বলের লোক একথাটা পথে-ঘাটে বলে বেড়াবেন না। কলকাতা শহরে ঠগের অভাব নেই ; এখুনি কেউ আপনার পিছু নেবে। আমি কলকাতা শহরে গত কুড়ি বছর থেকে আছি, আমিও সব রাস্তাঘাট চিনি না। মদন চাটুজ্যে লেনের নাম শুনি নি—"

স্থূলকায় ভদ্রলোকটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইলেন এবং ধূম উদ্‌গিরণ করিতে করিতে আর একটি উপদেশ দিলেন।

"কলকাতায় যদি ঘুরতে চান একটা স্ট্রীট গাইড কিনে ফেলুন। তাতে সব রাস্তার খবর পাবেন।"

তাঁহার পাশে একটি রোগা-গোছের হাই-পাওয়ার-চশমাপরা ভদ্রলোক বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি ঠনঠনে কালীবাড়ির সামনে নেবে পড়ুন। তারপর চিৎপুরের দিকে এগিয়ে যান। কাউকে জিগ্যেস করবেন মল্লিকদের মার্বেল প্যালেস কোথায়। সেখানে গিয়ে দেখবেন ডান হাতি একটা গলি বেরিয়েছে। সেই গলি গিয়ে পড়েছে মদন চাটুজ্যে লেনে। কাউকে বললেই দেখিয়ে দেবে। মদন চাটুজ্যে ও অঞ্চলে বিখ্যাত লোক, ঠাকুরবাড়ির আত্মীয় ছিলেন। কতদিন কলকতায় এসেছেন?"

"তিন বছর হ'য়ে গেল—"

"এখনও রাস্তাঘাট চেনেন না! কি করেন এখানে?"

"মেডিকেল কলেজে পড়ি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার সময় পাই না তো তেমন। কলেজের কাছেই থাকি, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলেজেই থাকতে হয়—"

সেকালে মেডিকেল কলেজের ছেলেদের সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে একটা সমীহ-ভাব ছিল। দুইজন ভদ্রলোকেরই চোখে মুখে সে ভাবটা ফুটিয়া উঠিল। স্থূলকায় ভদ্রলোকটি কিন্তু হটিবার পাত্র নন। তাঁহারও যে মেডিকেল কলেজের সহিত কিছু সম্পর্ক আছে একথা তিনি জাহির করিতে ছাড়িলেন না।

"আমার আপন মাসতুতো দাদার আপন ভগ্নীপতি মেডিকেল কলেজের রেজিস্ট্রার ছিলেন—"

ট্রামের আরোহীদের মধ্যে অনেকে হঠাৎ হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। চশমা-পরা ভদ্রলোক বলিলেন—"মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট এসে গেছে। এইবার আপনি নেবে পড়ুন!" তিনি নিজেই উঠিয়া ট্রামের ঘণ্টার দড়িটা টানিয়া দিলেন।

"আপনি কোথায় থাকেন?"

"মেডিকেল কলেজের সামনেই। তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটে—"

"ও আচ্ছা, নমস্কার।"

ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সামনে নবকিশোর নামিয়া পড়িল। দেখিল অত রাত্রেও অনেক লোক হাত জোড় করিয়া মন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। সেও দাঁড়াইয়া পড়িল এবং মা কালীকে প্রণাম করিল। এতদিন কলিকাতায় আছে, কিন্তু ঠনঠনিয়ার কালীবাড়িতে সে কখনও আসে নাই। কালীঘাটেও যায় নাই। কোথায়ই বা গিয়াছে সে। ইডেন গার্ডেন, বটানিক্যাল গার্ডেন, মিউজিয়াম, কোথাও তাহার যাওয়া হয় নাই। যাইবার প্রেরণাই পায় নাই সে। এমন কি দক্ষিণেশ্বর বেলুড়েও যাওয়া হয় নাই, যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের পরমভক্ত সে। যেখানে পরিবেশ অনুকূল নয়, যেখানে মূঢ় জনতার হৈ-হৈ, যেখানে হুজুক, যেখানে আত্ম-বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, সেখানে যাইবার প্রবৃত্তি নবকিশোরের কখনও হয় না। সে বিহারের ছেলে, বিহারের এক গ্রামে তাহার জন্ম। গ্রামের পাশ দিয়া গঙ্গা বহিয়া গিয়াছে। সেই গঙ্গার তীরে আছে এক শিমুল গাছ—বিশাল শাল্মলী তরু—আর তাহার পাশেই বটবৃক্ষ একটি।

সেটিও বিশাল। সেখানেও দেখিবার জিনিস অনেক আছে। অনেক পাখি, অনেক প্রজাপতি, অনেক ফড়িং, আরও অনেক অদ্ভুত জিনিস। কিন্তু সে-সব দেখিতে কেহ সেখানে যায় না, সেখানে ভিড় নাই। গ্রামের সেই নদীতীরের অনুরূপ স্থান কলিকাতার নিকটেও আছে হয়ত, কিন্তু নবকিশোর এখনও তাহার সন্ধান পায় নাই। যে সব মার্কা-মারা বহুবিজ্ঞাপিত বেড়াইবার জায়গাগুলি কলিকাতার কাছে-পিঠে জনতাকে আকর্ষণ করে সে-সব জায়গা নবকিশোরের চিত্ত বিনোদন করিতে পারে না। সে নির্জনতা ভালবাসে। গ্রামের সেই গঙ্গাতীর তাহার প্রিয় স্থান ছিল। ডাক্তারি পড়িবার জন্য বাধ্য হইয়া সে কলিকাতা শহরে আসিয়াছে। এখানে ভিড় অনিবার্য। কিন্তু এই অনিবার্য ভিড়ের মধ্যেও সে একটি নির্জনলোক সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। বিরাট জঙ্গলের মধ্যে একটি সরু পথ। এই পথেই সে যাতায়াত করে। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিবার সাহস বা প্রবৃত্তি কোনটাই তাহার নাই। এতদিন কলেজে আছে, কিন্তু কাহারও সহিত তেমন অন্তরঙ্গতা হয় নাই। দুই চারিজনের সঙ্গে তথাকথিত 'ফ্রেন্ডশিপ' অবশ্য হইয়াছে, তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে যাহারা আছে তাহাদের সহিতও তাহার সামাজিক হৃদ্যতা যে নাই তাহা নহে, কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু মেলে নাই একজনও। যাহাকে দেখিবামাত্র প্রাণের তন্ত্রী আপনি বাজিয়া উঠিবে, যাহাকে ঘিরিয়া স্বপ্ন জাগিবে, আকুলতা ঘনাইবে সে বন্ধুর সন্ধান সে পায় নাই এতদিন। আজ হঠাৎ ট্রেনে উৎসাহকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার দৃপ্ত আচরণ, তাহার শক্তি-ব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, তাহার বে-পরোয়া ভাব, তাহার অকপট ব্যবহার, তাহার ভবিষ্যদ্বাণী করিবার প্রবণতা, আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার জীবন সংশয়—এই সমস্তটা মিলিয়া এমন একটা আবির্ভাব যাহা নবকিশোরকে বিচলিত করিয়াছে, কৌতূহলী করিয়াছে, তাহার অজ্ঞাতসারেই তাহার মন তাহাকে বলিতেছে —এই তো বন্ধু মিলিয়াছে। তাহাকে পাইয়াই কি হারাইবে? না না, সে তো অসম্ভব। ভক্তিভরেই সে ঠনঠনিয়ার মা কালীকে প্রণাম করিল, এই অজ্ঞাতকুলশীলের জন্য। এই হঠাৎ-পাওয়া বন্ধুর জন্য সত্যই প্রার্থনা করিল সে।

কিছুদূর আগাইয়া সে পানের দোকান দেখিতে পাইল একটা।

"আচ্ছা, মদন চাটুজ্যের গলিটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?"

"পাশেই ডানহাতি গলি। কোথা যাবেন, বিরাট পণ্ডিতের বাড়ি না কি—"

"হ্যাঁ। কি করে বুঝলেন আপনি—"

"আপনার চেহারা দেখেই বুঝেছি। অচেনা লোক মদন চাটুজ্যে লেনের ঠিকানা খুঁজলেই বুঝতে পারি বিরাট পণ্ডিতের খোঁজে এসেছে। বিশেষত এত রাত্রে। আমি এ পাড়ার চেনা লোকেদের নাড়ীনক্ষত্র সব জানি। একটু আগেই আর এক অচেনা ভদ্রলোককে বিরাট পণ্ডিতের কাছে পাঠিয়ে দিলুম। আসুন—"

পান-ওলা পান সাজিতেছিল, এক খিলি পান সে সসম্ভ্রমে তুলিয়া ধরিল।

"না, পান দরকার নেই—"

"খেয়ে দেখুন না এক খিলি। ভাল মঘই পান। খেলে আমাকে ভুলতে পারবেন না। আসুন। ভাব করে নিচ্ছি আপনার সঙ্গে সার। বিরাট পণ্ডিতের পাল্লায় যখন পড়েছেন তখন বারবার আপনাকে আসতে হবে এখানে। বিরাট পণ্ডিতের দৌলতে অনেক লোকের সঙ্গে ভাব হয়েছে আমার। আপনাকেই বা ছাড়ব কেন। আসুন—"

নবকিশোরকে পানের খিলিটি লইতে হইল। খাইয়া দেখিল সত্যই ভালো পান। শিল্পীর হাতের তৈরি।

"কি করেন, কোথায় থাকা হয়—"

"আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি। মেসে থাকি—"

"উচ্ছে বাবুর বন্ধু নাকি ?"

নবকিশোর প্রথমে বুঝিতেই পারে নাই যে 'উৎসাহ' নামটাই 'উচ্ছে' হইয়াছে।

"উচ্ছে কে চিনি না। আমি উৎসাহের বাড়িতে খবর দিতে এসেছি—"

"ওই উৎসাহকেই উচ্ছে করেছেন বিরাট পণ্ডিত। এ পাড়ার সবাই ওকে উচ্ছে বলেই জানে। কি খবর দিতে এসেছেন ?"

"উনি মোটর চাপা পড়েছেন। মেডিকেল কলেজেই আছেন এখন—"

"আরে, কি সর্বনাশ ! যান যান তাহলে দেরি করবেন না। পান ভাল লাগল ?"

"চমৎকার—"

"তাহলে আসুন, আর এক খিলি—"

"কত খাব ! না, আর থাক—"

"ওই দেখুন, আপনার চাকনি তো খোলা যাচ্ছে না সহজে। ভাল লেগেছে যখন নিন আর এক খিলি—"

"আপনি দোকান করেছেন পান বিতরণ করবার জন্যে না কি—"

"ধরে নিন তাই। নিন। আর দাঁড়াবেন না। পরে আলাপ হবে—"

আর এক খিলি পান চিবাইতে চিবাইতে নবকিশোর বিরাট পণ্ডিতের বাসার দিকে পা বাড়াইল।

"চিৎপুরের কাছ বরাবর গিয়ে বাড়িটা পাবেন। সাইনবোর্ড আছে—"

॥ তিন ॥

বিরাট পণ্ডিতের বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশী সময় লাগিল না। চিৎপুরের কাছেই দ্বিতল বাড়িটা। বাড়ির সামনে একটি ল্যাম্পপোস্ট এবং সেই ল্যাম্পপোস্টের আলোকে ঝুলিয়া-পড়া সাইনবোর্ডটাও তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। কালো রঙের সাইনবোর্ডের উপর বড় বড় সাদা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে শ্রীবিরাটেশ্বর শর্মা। অক্ষরের রঙও উঠিয়া গিয়াছে অনেক জায়গায়। একতলায় বসিবার ঘরটা খোলা ছিল। সেই উন্মুক্ত দ্বারপথে নবকিশোর শুনিতে পাইল কে যেন কাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছে। সে সহসা ঢুকিতে সাহস করিল না। রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

"বৃথা ঘ্যানর ঘ্যানর করছেন কেন। আপনি অতি দরিদ্র, অতি অসহায়, জিনিসপত্রের দাম অগ্নিমূল্য, চাকর-বাকর নেই, ফ্যান গালতে গিয়ে আপনার স্ত্রীর পা পুড়ে গেছে, সোমত্ত মেয়ের জন্যে পাত্র জোটাতে পারছেন না, চাকরিতে এক্‌সটেনশন পান নি, বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে—এসব তো অনেকবার শুনেছি। ওই আপনার ললাটের লিখন। আমি কি করব বলুন। আপনার দুঃখের কাঁদুনি শুনে আমার লাভই বা কি। আমি যা জানি তা আপনাকে বলেছি। পুরুষকার

চাই। গ্রহ কুপিত হয়েছে, তাকে ঠাণ্ডা করতে হবে। চেষ্টা করলে কুপিত গ্রহকে ঠাণ্ডা করা যায়। অন্তত সে চেষ্টাটা করতে হবে আপনাকে। ওই চেষ্টার নামই পুরুষকার। একটি পান্না আপনাকে ধারণ করতে হবে। পাঁচ রতি পান্নার দাম আড়াইশ' টাকা পড়বে। তাছাড়া সোনা আছে, আপনার আঙুলগুলোও গোবদা গোবদা। কম সোনাতে হবে না। সাড়ে তিনশ' চারশ' টাকা লেগে যাবে বানি নিয়ে—"

"আমি অতি দরিদ্র লোক। অত টাকা কোথায় পাব পণ্ডিত মশায়—"

"তাহলে এখানে এসেছেন কেন। ডাক্তারের কাছে এসেছেন, ডাক্তার যে ওষুধ লিখে দিয়েছে, তা যদি কেনবার সামর্থ্য না থাকে তাহলে অসুখ সারবে না। কেঁউ কেঁউ করলে বুধ গ্রহ শান্ত হবে না।"

"আমি দরিদ্র—"

"না, আপনি দরিদ্র নন। যে রক্তমুখী নীলাটা আপনি ধারণ করে আছেন তা কোনও দরিদ্র লোক ধারণ করতে পারে না!"

"কি করব, একজন জ্যোতিষীর পরামর্শে ওটা ধারণ করেছি। এর জন্যে স্ত্রীর গয়না বিক্রী করতে হয়েছে—"

"সে জ্যোতিষী গবেট। ফল পেয়েছেন কোনও?"

"কিছু না। খারাপই হয়েছে বরং।"

"সে জ্যোতিষী গবেট। ওই নীলাই আপনাকে ডোবাচ্ছে—"

"কি করব তাহলে বলুন।"

"বলেছি তো, আমার উপর বিশ্বাস যদি থাকে নীলা খুলে পান্না ধারণ করুন।"

"কিন্তু এখন আমার যা অবস্থা তাতে—"

"তাহলে বাড়ি যান। আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।"

"আমাকে দয়া করতেই হবে পণ্ডিত মশায়—"

"আমার উপর সত্যি বিশ্বাস আছে আপনার কি?"

"আছে বই কি। তা না হলে এত কষ্ট করে সেই কঁইকালা থেকে আপনার কাছে এসেছি—"

"তাহলে তার প্রমাণ দিন। আপনার ওই নীলাটা খুলে আমার কাছে রেখে যান। তার বদলে আপনাকে আমি পান্নার আংটি করিয়ে দেব একটা। সাতদিন পরে আসবেন।"

"নীলাটা খুলে দিয়ে যাব বলছেন?"

"এতে দুর্বোধ্য তো কিছু নেই—"

"আমার গিন্নীকে না জিগ্যেস করে এটা আপনাকে দিয়ে যেতে ভরসা পাচ্ছি না। তার গয়না বেচেই এটা কিনেছি কিনা—হাতে আংটি না দেখলে তুলকালাম কাণ্ড করবে—বোঝেনই তো মেয়েমানুষ—"

"তাহলে মেয়েমানুষের কাছেই যান! উঠুন, আমি ভিতরে যাব একটু, কপাট বন্ধ করব। ওরে গাঁট্টা, শোন, আমাকে তুলে দে একটু। উচ্ছে কি এখনও আসে নি?"

"আমাকে কি সত্যিই হতাশ করবেন পণ্ডিত মশায়। বড় আশা করে এসেছিলাম।"

"ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার না করে দিলে কি আপনি যাবেন না?"

"আচ্ছা বেশ নীলাটাই খুলে দিয়ে যাচ্ছি তাহলে। আচ্ছা ধরুন আর এক কাজ করলে হয় না। আমার চেনাশোনা একজন জুয়েলার আছে তার কাছ থেকে যদি পান্নাটা কিনি, সে হয়তো ধারে দেবে—"

"আমার পরামর্শ অনুসারে যদি রত্ন ধারণ করতে চান সে রত্ন আমিই দেব। গোড়া থেকে কানে কামড়ে এই একটি কথাই তো বারবার বলছি আপনাকে। অপরের দেওয়া রত্নের উপর আমার বিশ্বাস নেই। ইমিটেশন স্টোনে বাজার ছেয়ে গেছে—"

"বেশ, তাহলে রাখুন এটা—"

"সাতদিন পরে আসবেন। ওরে গাঁট্টা কোথা গেলি তুই আবার—"

নবকিশোর দেখিল একটি প্রৌঢ় লোক বাহির হইয়া আসিলেন। মুখময় কয়েকদিনের না-কামানো কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি। গায়ে আধময়লা কামিজ, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, বগলে একটি তালি-দেওয়া ছাতি। মনে হইল ভদ্রলোক একটু কুব্জও। কোন দিকে না চাহিয়া তিনি রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন এবং চিৎপুরের দিকে আগাইয়া গেলেন।

নবকিশোর এইবার ঢুকিয়া পড়িল। গিয়া দেখিল একটি ক্ষীণকায় অস্থি-পঞ্জর-সার ব্যক্তি একটি বলিষ্ঠ লোকের উপর ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। নবকিশোরকে দেখিয়া বলিলেন—"দাঁড়া, দাঁড়া, আবার কে এল। আমাকে আজ সেক নিতে দেবে না দেখছি। কি চান আপনি—"

নবকিশোরের মুখের দিকে দৃষ্টিনিবন্ধ করিলেন বিরাট পণ্ডিত, তাহার পর বলিয়া উঠিলেন—"ও বাবা, এ যে মহাপুরুষ দেখছি। বসুন, বসুন। মহাপুরুষের কি দরকার আমার কাছে—"

"আমি উৎসাহের খবর এনেছি। তিনি হাওড়ায় মোটরচাপা পড়েছিলেন। এখন মেডিকেল কলেজে আছেন।"

"মোটর-চাপা পড়েছিল? উচ্ছে?"

বিরাট পণ্ডিতের সমস্ত মুখটা বিবর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তাঁহার নাকটাই প্রথমে চোখে পড়িল। প্রকাণ্ড একটা খাঁড়া যেন শীর্ণ মুখের উপর ঝুলিয়া আছে। নাকের ছিদ্র দুইটি হইতে লোমও বাহির হইয়া আছে প্রচুর। গোঁফ দাড়ি কামানো। চক্ষু দুইটি আরক্ত এবং আকর্ণবিস্তৃত, মনে হয় যেন প্রতিমার চোখ। বুদ্ধিদীপ্ত মর্মভেদী দৃষ্টি। দেখিলে ভয় করে।

"এ রকম যে কিছু একটা হবে তা আমি আগেই জানতাম। মাসখানেক থেকে পই পই করে বলছি প্রবালটা ধারণ কর। কিছুতে করলে না। স্বল্পবিদ্যা ভয়ংকরী কি না। বেঁচে আছে তো?"

"বেঁচে আছে। কিন্তু এখনও জ্ঞান হয় নি।"

"আপনি কে।"

"আমিও মেডিকেল কলেজের ছাত্র। আমরা একসঙ্গে ট্রেনে আসছিলাম। হাওড়া স্টেশনে নেবে আমি একটি ঘোড়ার গাড়ি করতে চাইলাম, বললাম চলুন দুজনে একসঙ্গে যাই। কিন্তু উনি বললেন আমি ঘোড়ার গাড়িতে চড়ব না, হেঁটেই যাব। ভিড়ের মধ্যে হনহন করে এগিয়ে গেলেন, এমন সময় একটা ট্যাক্সি চাপা দিয়ে দিলে এসে—"

"ভয়ানক একগুঁয়ে চিরকাল। আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে।"

তাহার পর কয়েক মুহূর্ত নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"কি করি বলুন তো। আমি এখন বাতে পঙ্গু হ'য়ে রয়েছি। আমার পক্ষে যাওয়া শক্ত। অথচ —। আপনি দয়া করে একটা কাজ করবেন?"

"কি বলুন, নিশ্চয়ই করব।"

"আমি ওর জন্যে একটা ভালো প্রবালের আংটি করিয়ে রেখেছি। সেটা ওকে পরিয়ে দিন গিয়ে। এক্ষুনি দিন —। গাঁট্টা, বসিয়ে দে আমাকে ভাল করে। কোমরটায় বড্ড ব্যথা হয়েছে, বুঝলেন। একটু সেক দিলেই কমে যেত, কিন্তু সে অবসরটুকু আর পাচ্ছি না। লোকের পর লোক, লোকের পর লোক, জ্বালাতন করে মেরেছে —। আপনি বসুন একটু। চা খাবেন, না কফি—?"

"না কিছু দরকার নেই।"

"আপনার দরকার নেই, আপনি মহাপুরুষ, কিন্তু আমার দরকার আছে। মহাপুরুষের সেবা করতে পারা মহাভাগ্যের কথা। সুযোগ যখন পেয়ে গেছি ছাড়ব কেন। মাংস খাবেন? হরিণের মাংস?"

নবকিশোর কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

"মাংস খাই, কিন্তু হরিণের মাংস কখনও খাই নি। কিন্তু অত হাঙ্গামা করছেন কেন—"

"হাঙ্গামা কিছু নেই। মাংস তৈরি রয়েছে, প্লেটে করে এনে দেবে, আপনি চটপট খেয়ে নেবেন। তারপর এক কাপ কফি, কফিই মাংসের সঙ্গে জমবে ভাল। গাঁট্টা, চটপট করে ব্যবস্থা করে ফেল দিকি—"

গাঁট্টা ভিতরে চলিয়া গেল।

"বসুন ভাল করে —"

ঘরে কয়েকটা চেয়ার ছিল, নবকিশোর তাহারই একটাতে উপবেশন করিল। বিরাট পণ্ডিত বসিয়াছিলেন বড় একটা চৌকিতে। তাঁহার পিছনে কয়েকটি তাকিয়া ছিল। ডান পাশে ছিল বড় একটা কাঠের বাক্স। তিনি সেটির ডালা খুলিলেন, নবকিশোর দেখিতে পাইল সেটি টুকিটাকি নানা জিনিসে পরিপূর্ণ। বাক্স হইতে তিনি একটা কৌটা বাহির করিলেন। কৌটা খুলিয়া বাহির করিলেন প্রবালের একটি আংটি। সেটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন, তাহার পর আবার কৌটার মধ্যে ঢুকাইয়া বলিলেন —"আপনি কৌটোসুদ্ধই নিয়ে যান। কৌটোটি কিন্তু ফেরত চাই আমার। অষ্টধাতুর তৈরি কৌটো, কাশীতে এক স্যাকরাকে ফরমাশ দিয়ে করিয়েছিলাম। কোটের ইনার পকেট আছে? তার ভিতরই রেখে দিন কৌটোটা। আজই আংটিটি ধারণ করিয়ে দেওয়া চাই—"

নবকিশোর বলিল —"ওঁর হাতে হবে তো আংটিটা!"

"ওর আঙুলের মাপ নিয়েই তৈরি করেছিলাম। কিন্তু ও কিছুতেই পরলে না। দুচার পাতা জ্যোতিষ পড়ে নিজেই পণ্ডিত হয়েছে। বলে ভাগ্যকে বদলানো যায় না। বলে, পুরুষকার নিষ্ফল। মানুষ হ'য়ে, শক্তসমর্থ বুদ্ধিমান পুরুষ হ'য়ে বলে পুরুষকার নিষ্ফল। পাজি নচ্ছার কোথাকার। এখনি গিয়ে আপনি আংটিটা ধারণ করিয়ে দিন!"

"আচ্ছা।"

নবকিশোর কোটোটি কোটের ইনার পকেটে রাখিয়া দিল। সে উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিল। কে এই বিরাট পণ্ডিত? উৎসাহের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কি? হঠাৎ সে লক্ষ্য করিল ইনি যদিও সকলকে রত্ন ধারণ করাইবার জন্য ব্যগ্র কিন্তু নিজে কোনও রত্ন ধারণ করেন নাই। আংটি, মাদুলি, তাবিজ কিছুই সে দেখিতে পাইল না। অথচ বাতে এত কষ্ট পাইতেছেন!

গাঁট্টা এক প্লেট মাংস এবং খানকয়েক লুচি আনিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল কোথায় রাখিবে।

"খবরের কাগজ পেতে এই চৌকির উপরই দে। ছোট তেপায়াটা কোথা—"

গাঁট্টা এতক্ষণ কোনও কথা বলে নাই। এই কথায় তাহার চোখের দৃষ্টি অগ্নিবর্ষী হইয়া উঠিল। বলিল, "তেপায়ার উপর পা রেখে ইজিচেয়ারে শুয়ে জরি নবেল পড়ছে। বললাম, তেপায়াটা দে—পায়ের পাতা নেড়ে বললে, দেব না যা।"

"উচ্ছে ওর মাথাটি চিবিয়ে খেয়ে দিয়েছে দেখছি। চৌকির উপর খবরের কাগজ পেতেই দে খাবারটা। আপনি একটু এগিয়ে আসুন—। যা কফিটা নিয়ে আয় চট করে—"

নবকিশোর আহারে প্রবৃত্ত হইল। হরিণের মাংস তাহার সত্যই খুব ভাল লাগিতেছিল। খুব নরম এবং চমৎকার সোঁদা-সোঁদা গন্ধ একটা।

"ভালো লাগছে হরিণের মাংস?"

"চমৎকার। কোথায় পেলেন?"

"গুহবর্মা নামে আমার এক শিকারী ভক্ত আছে। সে-ই দিয়ে যায় মাঝে মাঝে। এই বাঘের চামড়া, ওই হরিণের চামড়া সবই তার দেওয়া। অব্যর্থ লক্ষ্য ছোকরার—"

নবকিশোর এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, এবার দেখিতে পাইল বিরাট পণ্ডিত একটি বাঘের চামড়ার উপরই বসিয়া আছেন। হরিণের চামড়াটি দেওয়ালে ঝোলানো আছে।

"আর একটু মাংস দেবে?"

"না, আর চাই না।"

গাঁট্টা এক গ্লাস জল, একটি তোয়ালে লইয়া প্রবেশ করিল। নবকিশোর উঠিয়া হাত ধুইয়া ফেলিল।

"কফি কই—"

"জরি আনছে। হঠাৎ নবেল ফেলে দিয়ে উঠে বললে—তুই যা আমি কফি নিয়ে যাচ্ছি!"

রাগত ভাবে গাঁট্টা প্রস্থান করিল।

নেপথ্য হইতে শোনা গেল—"জেঠু, সেক নেবে এখন? তোমার জন্যে তেল গরম করব?"

নবকিশোরের মনে হইল একটা বাঁশি বাজিল যেন।

"আগে তুই কফি দিয়ে যা—"

তাহার পর নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"সব অদ্ভুত মনে হচ্ছে, না? জীবনটাই অদ্ভুত। দু'চার দিন যাতায়াত করলেই আর অদ্ভুত মনে হবে না, তখন

মনে হবে এইটেই স্বাভাবিক। এও এক অদ্ভুত নিয়ম। অন্ধকারে প্রথমটা দেখা যায় না কিছু, কিন্তু একটু পরেই সব দেখা যায় আবার।"

নবকিশোর এইবার সাহস করিয়া প্রশ্ন করিল—"উৎসাহ আপনার কে হয় ?"

"কেউ হয় না। এরা কেউ আমার কেউ হয় না। আমি তীর্থ, এরা তীর্থের কাক !"

হাস্যোদ্দীপ্ত কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"নিজেকে তীর্থ বললুম বলে নিশ্চয়ই আপনি মনে করছেন লোকটা খুব অহঙ্কারী। কিন্তু ওটা অহঙ্কারবশত বলি নি। বিনয়বশতই বলেছি। তীর্থ অতি খারাপ জায়গা। বৃন্দাবন গেছেন ? মথুরা গেছেন ? কাশী ? তারকেশ্বর ?"

নবকিশোর হাসিয়া মাথা নাড়িল।

"যান নি ? গেলে বুঝতে পারতেন তীর্থ অতি খারাপ জায়গা। আমিও অতি খারাপ লোক। পরিচয় হোক বুঝতে পারবেন। কিন্তু না-ও পারতে পারেন, মহাপুরুষরা সবাইকেই ভাল দেখে।"

নবকিশোর সঙ্কুচিত হাসি হাসিয়া বলিল, "আমাকে বারবার মহাপুরুষ বলছেন কেন—"

"মহাপুরুষ না হলে কি আপনি কষ্ট করে এত রাত্রে উচ্ছের জন্য ছুটে আসতেন ? পরের জন্যে কে কি করে মশাই ? কার বয়ে গেছে। তাছাড়া আপনার কপাল দেখেই বুঝেছি—ইউ আর এ গ্রেট ম্যান। আপনার চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে নয়, স্বচ্ছ। আপনার হাতটা একবার দেখাবেন ?"

নবকিশোর একটু ইতস্তত করিতে লাগিল।

"দেখাতে আপত্তি আছে না কি। তবে থাক—"

"আচ্ছা দেখুন—"

বিরাট পণ্ডিতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নবকিশোরের প্রসারিত করতলের উপর নিবদ্ধ হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া হাতটা তিনি দেখিলেন। তাহার পর বলিলেন, "চমৎকার হাত। জীবনে অনেক উন্নতি করবেন। শনিটা একটু খারাপ মনে হচ্ছে কেবল। নীলা পরুন। নীলার আংটি আছে আমার কাছে একটা। দেখি আপনার আঙুলে হয় কি না—"

বিরাট পণ্ডিত সেই নীলার আংটিটি নবকিশোরের আঙুলে পরাইয়া পরাইয়া দেখিতে লাগিলেন কোনও আঙুলে লাগে কি না। ডান হাতের মধ্যমা আঙুলে ঠিক হইল।

"এটা শনির আঙুল, ভালই হ'ল। ওটা নিয়ে যান আপনি—"

নবকিশোর আংটিটি খুলিয়া চৌকির উপর রাখিয়া সবিনয়ে বলিল—"আংটি কেনবার পয়সা নেই আমার –"

"পয়সা দিতে হবে না আপনাকে।"

এমন সময় দরজার কাছে শব্দ হইল। নবকিশোর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল একটি মেয়ে একটি ছোট তেপায়া লইয়া প্রবেশ করিয়াছে।

"কফি হ'য়ে গেছে। আনব ?"

"আনবে বই কি। খবর শুনেছ? উচ্ছে মোটর-চাপা পড়ে হাসপাতালে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে। ইনি খবর এনেছেন—"

জরি ভিতরে চলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি রঙিন ট্রের উপর কফির সরঞ্জাম সাজাইয়া লইয়া আসিল। তাহার পর নিঃসঙ্কোচে নবকিশোরের দিকে চাহিয়া বলিল —"আপনি কফিটা খান। আমি কাপড়টা বদলে আসি। আমিও আপনার সঙ্গে যাব।"

আবার ভিতরে চলিয়া গেল সে।

"দেখলেন কাণ্ডটা! এত রাত্রে ওর যাবার দরকারটা কি। কিন্তু শুনবে কি ও কোনও মানা? এইজন্যেই আমি কলেজে পড়ার ঘোর বিরোধী। বড় বার-ফটকা হ'যে যায় মেয়েগুলো। ওরে গাঁট্টা, জরি বেরুচ্ছে, তুইই আমার কোমরে তেলটা মালিশ করে দে—তুইই অগতির গতি—"

একটু পরেই জরি বাহির হইয়া আসিল। কালো রঙের সিল্কের একটা শাড়ি পরিয়াছে, রুপোলী জরির পাড়-বসানো। মেয়েটির রঙও কালো। এতক্ষণে নবকিশোর তাহার দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল। গোল মুখ, নাকটা থ্যাবড়া, চোখ দুটি গোল। কিন্তু কুৎসিত নয়। চোখের দৃষ্টি সমুৎসুক এবং তীক্ষ্ন, মনে হইল একটু যেন হিংস্রও। পুষ্ট অধর, চিবুক দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কেমন যেন একটা বাঘ-বাঘ ভাব।

"চলুন—"

"ওকি, আংটিটা ফেলে যাচ্ছেন যে। নিয়ে যান, ধারণ করুন ওটা"—বিরাট পণ্ডিত মনে করাইয়া দিলেন।

"মাপ করবেন, ওটা আমি—"

অপ্রত্যাশিতভাবে জরি বলিয়া উঠিল—"দিচ্ছেন যখন, নিন্ না—"

নবকিশোর আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না। আংটিটা আঙুলে পরিয়া ফেলিল। বিরাট পণ্ডিত উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। নবকিশোরের মনে হইল ব্যঙ্গের হাসি।

রাস্তায় দুইজনেই নীরবে পাশাপাশি হাঁটিতে লাগিল। নবকিশোর স্বভাবতই একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। জরি প্রথমে কথা কহিল।

"আপনার পাথর-টাথরে বিশ্বাস নেই না কি—"

"ও বিষয়ে কোন মতই নেই আমার। কখনও তো ধারণ করি নি। আমার চেনা-শোনা কাউকে ধারণ করতে দেখিও নি।"

"বাড়ি কোথা আপনার—"

"বিহারে। ভাগলপুরে—"

"নীলাটা তাহলে আপনি পরবেন না?"

"কি করব ভাবছি। ও'র কাছ থেকে বিনা পয়সায় অমন একটা দামী পাথর-বসানো সোনার আংটি নেওয়াটা উচিত কি না সেইটেই প্রথম কথা। উনি আমাকে দিলেন কেন তাও বুঝতে পারছি না। আমার সঙ্গে আগে ও'র কোন পরিচয়ই তো ছিল না—"

"কেন দিয়েছেন তা পরে বুঝতে পারবেন। তবে একটা কথা বলতে পারি, একবার যখন ও'র কাছে এসে পড়েছেন তখন বারবার আপনাকে আসতে হবে। সুতরাং ও'কে

চটানো ঠিক নয়। আংটিটা রাখুন আপনি। তবে নীলায় যদি আপনার বিশ্বাস না থাকে ওটা আমাকে দিয়ে দিতে পারেন—আমি আপনাকে একটা ইমিটেশন স্টোনের আংটি দিয়ে দেব—"

"আপনি কি করবেন!"

"বিক্রি করে দেব। বেশ দাম পাওয়া যাবে ওটার। চলুন না ওতলোকে দেখাই গে। ওতলো এ বিষয়ে গুণী—"

"ওতলো কে—"

"ভাল নাম অতুল। আমরা আড়ালে ওতলো বলি। ওই যে মোড়ে পানের দোকানটা রয়েছে তারই মালিক।"

"হ্যাঁ, আসবার সময় আলাপ হ'ল যে ও'র সঙ্গে। পান খাওয়ালেন আমাকে—"

"হয়েছে আলাপ? অদ্ভুত লোক। বড়লোকের ছেলে, লেখাপড়াও জানে, অথচ পানের দোকান করেছে। আর কিছু করবে না। বলে পানের দোকানই আমার শখ পেশা স্বপ্ন—সব। চলুন ওকেই দেখাই। আংটিটা খুলে দিন আমাকে—"

নবকিশোর আংটিটি খুলিয়া দিল। একটু পরেই পানের দোকানের সমীপবর্তী হইল তাহারা।

"আসুন, জরিদি। এই যে আপনিও। ভাব হ'য়ে গেছে বুঝি। হবেই জানতাম। আসুন—"

দুইজনকে দুই খিলি পান দিয়া অতুল জরির মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ভাবটা—এত রাত্রে এ অনুগ্রহের অর্থ কি।

"অতুল, এই নীলার আংটিটা দেখ তো। দাম কত হ'তে পারে।"

অতুল আংটিটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। তাহার পর আলোর দিকে পাথরটাকে ফিরাইয়া বাম চক্ষুটি বুজিয়া কেবল দক্ষিণ চক্ষু দিয়া নিরীক্ষণ করিল খানিকক্ষণ, তাহার পর দক্ষিণ চক্ষু বুজিয়া বাম চক্ষু দিয়া আরও খানিকক্ষণ।

"বেশ দামী পাথর। দাম অন্তত শ' তিনেক হবে। সোনার দাম ছাড়া—"

"তাহলে ওটা রেখে আপাতত আমাকে একশ' টাকা দিতে পারবে?"

অতুলের চোখে একটা চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"টাকা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু নীলাটি রাখবো না। বিরাট পণ্ডিতই আমাকে বলেছিলেন নীলার ত্রিসীমানায় তুমি যেও না। নীলা তোমার সইবে না—"

অতুল ক্যাশবাক্স খুলিয়া একশ' টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া জরির হাতে দিল।

"আংটিটা যদি বেচতে চান হীরালাল জহুরির কাছে দেবেন। সে ঠকাবে না। হীরালালকে চেনেন তো?"

কিন্তু জরির মুখের দিকে চাহিয়া অতুল থামিয়া গেল। জরি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল।

"আংটি যদি তুমি না রাখতে পার টাকাটাও রেখে দাও। আমি হীরালালের কাছে থেকেই টাকা নেব। আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে আসি নি।"

নোটখানা প্রায় ছুঁড়িয়া দিয়া সে আংটিটা তুলিয়া লইল। তাহার পর নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া বলিল—"চলুন। এখানে আর সময় নষ্ট করে কি হবে।"

হা-হা করিয়া উঠিল অতুল।

"ছি, ছি জরিদি, কি কাণ্ড! টাকা নিয়ে যান আপনি। দিন, দিন আংটিটা আমাকে। আমিই হীরালালের কাছে নিয়ে যাচ্ছি ওটা। এত রাগী লোক আপনি! আসুন আর এক খিলি পান খান। একটু তাম্বুল বিহার দিয়ে দেব?"

জরির মুখে মৃদু হাসি ফুটিল। নবকিশোর দেখিল তাহার চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিও স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে। জরি পানের খিলিটি মুখে পুরিয়া নোটটি তুলিয়া লইল। অতুল নবকিশোরের দিকেও আর এক খিলি পান বাড়াইয়া বলিল, 'আসুন'।

"না। আমি আর খাব না। পান তো খাই না সাধারণতঃ—"

"চলুন—"

অতুলের দোকান ছাড়াইয়া কিছু দূরে গিয়া জরি প্রশ্ন করিল—"আপনার খুব আশ্চর্য লাগছে, না?"

নবকিশোর কিছু না বলিয়া মুচকি হাসিল একটু।

"এই ট্যাক্সি—"

একটা ছুটন্ত ট্যাক্সিকে থামাইয়া জরি বলিল, "চলুন আপনাকে আর একটু আশ্চর্য করে দি। চলুন চৌরঙ্গী থেকে ঘুরে আসি একটু—"

"চৌরঙ্গী থেকে? কেন!"

" 'কারণ' কিনব। ওইখানেই ভালো পাওয়া যায়।"

"কারণ? মানে, মদ?"

"মদ কথাটা ভালগার। 'কারণ' হচ্ছে বিশুদ্ধ পবিত্র নাম। আপনি একেবারেই অজ্ঞ লোক দেখছি—"

নবকিশোরের কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল। সে কোনও উত্তর দিল না। কলুটোলার মোড়ে সে বলিল—"রোকো—"

তাহার পর জরির দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি 'এজরা' হাসপাতালে নেবে যাচ্ছি। আপনি যদি আসেন ওখানে খোঁজ করলেই পাবেন আমাকে। উৎসাহ এজরাতেই আছে—"

"আপনার নামটা তো জানি না।"

"নবকিশোর মুখোপাধ্যায়।"

ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

নবকিশোর সন্তর্পণে হাসপাতালে ঢুকিয়া দেখিল নার্স কিং একটি সবুজ শেড দেওয়া সুদৃশ্য টেবিল-ল্যাম্পের আলোকে বসিয়া কাজ করিতেছে। পায়ের শব্দ শুনিয়া সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ তুলিল। তাহার পর নবকিশোরকে চিনিতে পারিয়া হাসিমুখে বলিল, "Good evening, student. Your friend is still unconscious. Would you like to see him again? You know where he is. Please go softly......"

[নমস্কার। আপনার বন্ধু এখনও অজ্ঞান হ'য়ে আছেন। ওঁকে দেখবেন আর একবার? কোথায় আছেন তাতো জানেন, আস্তে আস্তে চলে যান।]

নবকিশোর গিয়া দেখিল উৎসাহ তখনও অজ্ঞান। প্রবালের আংটিটা তাহার আঙুলে পরাইয়া দিতেই সে সামান্য একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিল যেন। তাহার চোখের

পাতাটাও ক্ষণিকের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। আবার সব চুপচাপ। নবকিশোর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। আবার তাহার মনে হইল উৎসাহের মুখে কি যেন একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। তাহার দৃপ্ত মুখভাব যেন প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে। সে মেসে ফিরিয়া যাইবে ভাবিতেছিল এমন সময়ে পদশব্দ শুনিয়া সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল নার্স কিং আসিতেছে। তাহার সঙ্গে স্বয়ং প্রিন্সিপাল বার্নাডো! বার্নাডো একবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নবকিশোরের দিকে চাহিতেই নার্স কিং তাহার পরিচয় দিয়া দিল। বার্নাডো সাহেব তখন হাসিয়া ইংরেজীতে যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম এই: "তুমি আমাদের কলেজের ছেলে? এর বন্ধু? তাহলে তো ভালই হ'ল। তুমিই এর খবরদারি কর। বিরাট পণ্ডিত এখনই আমাকে ফোন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ আছে? প্রচণ্ড বিদ্বান এবং বহুদর্শী লোক।"

বার্নাডো ঝুঁকিয়া উৎসাহের নাড়ীটা পরীক্ষা করিলেন। "না, কোনও ভয় নেই—। আচ্ছা, আমি তাহলে পণ্ডিতকে ফোন ক'রে দিচ্ছি—তুমি ওর দেখাশোনা কর।"

বার্নাডো সাহেব চলিয়া গেলে নবকিশোর নার্সকে বলিল—"আমি আমার মেসে ফিরে যাচ্ছি। এখন তো ভালো আছে—"

"কতদূরে তোমার মেস—"

"কাছেই। তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীট। কলুটোলার সামনেই—"

"আচ্ছা, ঠিকানাটা লিখে রেখে যাও। দরকার হলে আমি তোমাকে খবর দেব।"

মোটরের হর্নে নবকিশোরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বিছানায় উঠিয়া বসিল। তাহার মেসের সামনে দাঁড়াইয়া একটা মোটর ক্রমাগত হর্ন দিয়া যাইতেছে। গাড়িবারান্দা হইতে ঝুঁকিয়া দেখিল ট্যাক্সি একটা। ট্যাক্সির সামনে দাঁড়াইয়া আছে জরি। গোলদীঘি হইতে গ্যাসের আলো তাহার সর্বাঙ্গে পড়িয়াছে। সেই আলোকে তাহার মেসের দিকে উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে সে। তাহার কালো শাড়ির জরির পাড়ে যেন আগুন লাগিয়াছে।

"নবকিশোরবাবু—নবকিশোরবাবু—"

"যাই—"

নবকিশোর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। তাহার মনে হইল কে যেন তাহার গলায় গামছা দিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। জরির সামনে গিয়া যখন দাঁড়াইল তখন জরি কোন কথা কহিল না। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল; "বিরাট পণ্ডিতের ভাষায় আপনি ঘোর তামসিক লোক দেখছি। এত গাঢ় আপনার ঘুম! আধ ঘণ্টা ধরে ডাকছি, আপনার ঘুমই ভাঙে না।"

"কটা বেজেছে—"

"বারোটা বেজে গেছে—"

"উৎসাহের কাছে যাবেন এখন?"

"ঘুরে এসেছি সেখান থেকে। নার্স কিংয়ের সঙ্গেও আলাপ হ'ল। সে-ই আপনার ঠিকানা দিলে।"

"তাহলে—এখন কি করবেন।"

"চলুন লম্বা একটা ড্রাইভ দিয়ে আসা যাক। সুযোগ তো সব সময় পাওয়া যায় না। যান, একটা জামা গায়ে দিয়ে জুতো পরে আসুন। চট করে যান—"

"ড্রাইভ! এত রাত্রে ড্রাইভ দিয়ে কি হবে!"

"আপনার সঙ্গে পরিচয় হবে। সেটাই বা কি কম। আপনার দিক থেকেও হয়তো লাভ হবে কিছু, সেটা অবশ্য নির্ভর করে আপনি কি জাতের লোক তার উপর। আসুন না দু'জন দুটো অজ্ঞাত অরণ্যে ঢুকে পড়ি খানিকক্ষণের জন্য।"

"অবণ্য মানে?"

"আপনি একটা অরণ্য আমি একটা অরণ্য। আপনি আমার ভিতর ঢুকবেন, আমি আপনার ভিতর।'

তাহার চোখের দৃষ্টি চকচক করিয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল সে দৃষ্টিতে।

"ঢোকা যাবে না। বড় জটিল ব্যাপার। তবু চেষ্টা করতে হবে। সারা জীবনই চেষ্টা করতে হবে। চলুন।"

নবকিশোর ইতস্তত করিতে লাগিল।

সহসা জরি তাহার কাঁধ ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিল।

"এখনও ঘুমুচ্ছেন না কি! উঠুন, চলুন—যাই—"

"কোথায় যাচ্ছি আমরা।"

"বেলগেছিয়ার দিকে। সেখানে একটা খালি বাগানবাড়ি আছে। সে বাড়ির মালি আমার চেনা। ডাকলেই গেট খুলে দেবে।"

"সেখানে কেন—"

"চমৎকার ছাত আছে। চলুন না, গেলেই বুঝতে পারবেন।"

ট্যাক্সি দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল।

জরি বলিল, "আপনি ভাববেন না যে আমি মদ খেয়ে মাতলামি করছি। মদ এক বোতল কিনেছি বটে, কিন্তু খাই নি এখনও। এইবার খাব। ওই বাড়ির ছাতে বসে!"

নবকিশোর কোন উত্তর দেয় নাই। উত্তর দিবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না তাহার। লজ্জায় ধিক্কারে তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ ভরিয়া উঠিয়াছিল। বারবার মনে হইতেছিল এত রাত্রে কেন সে এমন ভাবে এই অজ্ঞাতকুলশীলার সহিত ভাসিয়া পড়িল? খরস্রোতা নদীর জলে যে সব খড়কুটা ভাসিয়া যায় তাহাদের বোধশক্তি থাকিলে তাহারাও হয়তো এইরূপই ভাবিত। নবকিশোরের মনের মধ্যে যে আবর্ত ঘূর্ণিত-বিঘূর্ণিত হইতেছিল তাহার প্রাবল্য নীরবেই সে ভোগ করিতে লাগিল। নিজেকেই সে ধিক্কার দিতেছিল বেশী। কিন্তু এই ধিক্কারের মধ্যে একটু মাধুর্য, একটু বিস্ময়ও ছিল। আর ছিল একটু কৌতূহল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে, কয়েক ঘণ্টাও নয়, কয়েক মিনিট বলিলেই ঠিক হয়—এই স্বল্প পরিচয়ে মেয়েটি প্রায় উপযাচিকার মতো তাহার কাছে আসিয়া হাজির হইল কেন।

"চুপ করে আছেন কেন। কি ভাবছেন—"

"ভাবছি আপনি আপনার এই নৈশ অভিযানে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন কেন।"

"প্রথমেই একটা কথা স্পষ্ট করে বলে দি—'লাভ্ অ্যাট্ ফার্স্ট সাইট্' নয়। প্রথম দর্শনেই পা হড়কে অথৈ জলে পড়ে যাই নি। অথৈ জলে পড়েছি অনেক আগেই। হাবুডুবু খাচ্ছি। আপনি খড়, সামনে এসে পড়েছিলেন, তাই আপনাকে আঁকড়ে ধরেছি। জানি লাভ কিছু হবে না, তবু ধরেছি। ও হ্যাঁ, ভুলে যাওয়ার আগে এইটে নিয়ে নিন—"

"কি—"

"ইমিটেশন নীলার আংটিটা, প্রায় ওইটার মতোই দেখতে। পরে থাকুন। আঙুলে আংটি না দেখলে জেঠু জেরা করবেন। নিন।"

নবকিশোর আংটিটা লইল, কিন্তু পরিল না।

"পণ্ডিতমশাই কি আপনার জ্যাঠামশাই হ'ন?"

"না। শুনেছি আমার বাবা ওঁকে দাদা বলতেন। ওঁর শিষ্যও হয়েছিলেন। আমার মা বহুদিন আগে মারা গেছেন। আমার বাবা মরবার সময় আমাদের ওই বাড়িটা উইল করে দান করে গেছেন তাঁর গুরুদেবকে, মানে বিরাট পণ্ডিতকে। আমার সমস্ত ভারও তিনি দিয়ে গেছেন গুরুদেবের উপর। উনিই এখন আমার অভিভাবক। এসব অবশ্য আমার শোনা কথা।"

"আর উৎসাহ?"

"উচ্ছেরও উনি অভিভাবক। উচ্ছের বিধবা মা ওঁর শিষ্যা ছিলেন। থাকতেন তাঁর দাদার বাড়িতে। রাঁধুনীবৃত্তি করতেন। তিনি যখন মারা যান তখন উচ্ছের বয়স সাত বছর। সেই থেকে উচ্ছে বিরাট পণ্ডিতের কাছে আছে। এও শোনা কথা। উচ্ছেকে আমি জন্মে থেকে দেখছি।"

"উৎসাহেরও কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল না কি?"

"জানি না। তবে একটা রংচটা হলদে রঙের তালা-লাগানো তোরঙ্গ আছে, সেটা শুনেছি ওর মায়ের। জেঠু সেটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে 'সীল' করে রেখে দিয়েছেন। কাউকে হাত দিতে দেন না। ওর মধ্যে যে কি রহস্য আছে জানি না। হয়তো ভয়ংকর কিছু আছে।"

"আপনাদের পারিবারিক খবর জানবার এ অশোভন কৌতূহল আশা করি মার্জনা করবেন—"

"দেখুন নবকিশোরবাবু, না নবকিশোরবাবু বলব না, বার বার বেড়া টপকে যাতায়াত করা পোষাবে না। দেখ নবু, 'অশোভন কৌতূহল, মার্জনা করবেন' এ সব কেতাবী বুলি কেতাবেই মানায়। অশোভন তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বরং তোমার মনের কথা যদি স্পষ্ট করে বলবার সাহস থাকত তাহলে বলতে—ওলো হারামজাদি, এই যে এমন করে রাত দুপুরে আমার টিকি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিস, তুই কে, তোর পরিচয়টা অন্তত দে—আর সত্যিই এমনি ভাবে যদি বলতে পারতে তাহলে কি খুশি যে হতাম। মুখোশ, মুখোশ, মুখোশ, চারদিকে কেবল মুখোশ। খানিকক্ষণের জন্যে মুখোশটা খুলে ফেল দিকি। কি জানতে চাও অসংকোচে জিগ্যেস কর, আমি অকপটে সব বলব। উলঙ্গ হবার জন্যেই আজ বেরিয়েছি—"

নবকিশোর এ সব কথা শুনিয়া আরও ভীত হইয়া পড়িল। আড়চোখে ড্রাইভারটার

দিকে চাহিয়া দেখিল একবার। প্রকাণ্ড পাগড়িমাথায় প্রচুর গোঁফদাড়িওয়ালা পাঞ্জাবী ড্রাইভার নির্বিকার ভাবে স্টিয়ারিং ধরিয়া বসিয়া আছে। সে যে তাহাদের কথা শুনিতেছে তাহার মুখ দেখিয়া তাহা মনে হইল না।

"চুপ করে আছ যে। তোমার অশোভন কৌতূহল শেষ হয়ে গেল?"

"না শেষ হয় নি। কৌতূহল অফুরন্ত। কোথা থেকে শুরু করব ভাবছি। আপনার জরি নামটা কে রেখেছে—"

"আপনার নয়, তোমার। বেড়া ভেঙে ফেল, মুখোশ খোল। জরি নাম আমি নিজেই রেখেছি। আমার ভালো একটা সংস্কৃত নাম ছিল—'অজরা', মা রেখেছিলেন। সেটা ছোট করে জেঠু ডাকতেন 'অজু' বলে। আমি একদিন জেঠুকে বললাম, নাম যদি ছোট করতেই হয় তাহলে 'অজু' নয়, জরি বলে ডাকুন আমাকে। জেঠুর পছন্দ হয়ে গেল। ওই জরি নামকে আরও নানাভাবে রূপান্তরিত করেছেন জেঠু। জরদা, জর্জরিতা, জিরে, জরৎকারু ইত্যাদি ইত্যাদি। জেঠু অদ্ভুত লোক। অমন কবি, অমন পণ্ডিত, অমন দেবতা, অমন পিশাচ—একাধারে দুর্লভ। এতদিন একসঙ্গে আছি অথচ এখনও ওঁর কুল-কিনারা পাই নি—"

"পিশাচ?"

"হ্যাঁ পিশাচ। অর্থপিশাচ। আমার বিশ্বাস ওঁর এই রত্ন-ধারণ করানোটা বুজরুকি। টাকা রোজগার করবার ফন্দী একটা। আমার মনে হয় ওঁর বাতটাও একটা 'পোজ'। ওঁর বাত-টাত কিছু হয় নি।"

"এ রকম 'পোজ' করবার মানে?"

"ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এক ডাক্তারকে লোকের কাছে খেলো করবার উদ্দেশ্যে। তিনি ভালো অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার। কিন্তু তিনিও জ্যোতিষচর্চা করেন, কুষ্ঠি দেখে রত্ন দেন। তাঁকে উনি একদিন 'কল' দিলেন, বললেন কোমরে আর হাঁটুতে খুব ব্যথা হয়েছে, চিকিৎসা করুন। ওষুধ খেতে পারি, কিন্তু ইনজেকশন নেব না। ডাক্তারবাবু নানারকম ওষুধ দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন মাংস ডিম খাওয়া চলবে না। জেঠু একটি ওষুধও খান নি, মাংস ডিম পুরোদমে খেয়ে চলেছেন। দুবেলা লোকদেখানো 'সেক' নেন অল্পক্ষণের জন্যে। লোকের সামনে ভান করেন বাতে পঙ্গু হয়ে গেছেন আর গালাগাল দেন ড্যাশগুপ্তকে। ডাক্তার দাশগুপ্তকে উনি ড্যাশগুপ্ত বলেন। রোজ রাত্রি বেলা দেখি বেশ গটগট করে সিঁড়ি দিয়ে ছাতে যাচ্ছেন আর সেখানে পদ্মাসনে বসে কোমর সোজা করে প্রাণায়াম করছেন। সত্যি বাত হলে পারতেন না!"

"বল কি! টাকা রোজগার করবার জন্যে এত সব করছেন? বৃহৎ পরিবার না কি!"

"ওঁর কেউ নেই। আমাদের জন্যই টাকা রোজগার করেন। ওঁর নিজের খরচও অবশ্য রাজকীয়। আতর চাই, 'কারণ' চাই, মাংস চাই। যখন তন্ত্র সাধনা করেন তখন সাধনসঙ্গিনীও চাই। আমি যখন প্রথম যৌবনে পদার্পণ করি তখন আমাকেও উনি সাধনসঙ্গিনী করেছিলেন দিনকতক—যদিও আমি ওঁর মেয়ের মতো। দিনকতক পরে বললেন আমি ওঁর সাধন-সঙ্গিনী হবার যোগ্য নই। আমাকে ছেড়ে দিয়ে একটা চামারের মেয়ের সঙ্গে জুটলেন। তাকেও ছেড়ে দিলেন মাস ছয়েক পরে—"

"সাধন-সঙ্গিনী? ব্যাপারটা কি—"

"সংক্ষেপে, অর্চনা। আমার সর্বাঙ্গ উনি রীতিমত পুজো করতেন!"

"পুজো করতেন! সর্বাঙ্গ? কি রকম?"

"আমার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গকে উনি মন্ত্র উচ্চারণ করে ভক্তিভরে পুজো করতেন যেন আমি শক্তির প্রতীক। আমাকে বলেছিলেন তুই ঠিক পাষাণ প্রতিমার মতো নির্বিকার থাকবি। কিন্তু আমি পাষাণ নই, নির্বিকার থাকতে পারি নি। দিনকতক পরে বললেন, তুই পশু, তোকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না—দূরে হ।"

"তন্ত্রের এসব ব্যাপার তুমি বিশ্বাস কর।"

"ও অরণ্যে তো ঢুকতে পারি নি। তাই কোনও জ্ঞান নেই। তবে একটা জিনিস বলতে পারি, জেঠু সত্যিই বিরাটেশ্বর। তীক্ষ্ণ তলোয়ার নিয়ে খেলা করেন, গায়ে আঁচড়টি লাগে না। দুরন্ত বিষধরকে গলায় জড়িয়ে বেড়ান, সে ফণা তুলতে সাহস করে না। উচ্ছেও ওই সব নিয়ে মেতেছিল দিনকতক এক শ্মশান-ভৈরবীর সঙ্গে। তিনি আসতেন মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে। জেঠু একদিন রাগারাগি করে সব থামিয়ে দিলেন। বললেন—আগে পড়াশোনা করে জমি তৈরি কর, তারপর বাগানের স্বপ্ন দেখো। অথচ আশ্চর্য, জেঠু মেয়েদের পড়াতে চান না। বলেন মা কালী মা দুর্গার কলেজে পড়বার দরকার নেই। ওরা এমনিই শক্তি। আমি হাংগার স্ট্রাইক শুরু না করলে আমাকে মা কালী মা দুর্গা হ'য়েই থাকতে হ'ত···কিন্তু আমি মানুষ, রক্তমাংসের···"

নবকিশোরের মনে হইল যেন একটা আগ্নেয়-পর্বত লাভা উদ্গিরণ করিতেছে। এক মুহূর্ত থামিতেছে না, গলগল করিয়া নিজের ফুটন্ত মনটা বাহিরে নিষ্ঠুরভাবে ছড়াইয়া ছিটাইয়া দিতেছে।

জরি বলিতে লাগিল—"শুধু রক্তমাংসের নয়, মনের আত্মার চিন্তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার এক বিচিত্র সমন্বয় আমি, জেঠুর স্তোকবাক্যে তাই আমি ভুলি নি। লেখাপড়া শিখেছি, ছোট্ট চৌবাচ্চা থেকে ঝাঁপ দিয়েছি বিশাল সমুদ্রে। ছোট্ট উঠোনের দেওয়াল টপকে লাফ দিয়েছি যে জগতে তা এত বৃহৎ যে দুহাত দিয়ে আঁকড়েও তাকে পাওয়া যায় না। তা—"

হঠাৎ জরি থামিয়া গেল। তাহার পর আবার বলিল, "এখন মনে হয় ভুল করেছি। কিছু লাভ হয় নি। 'আমি শক্তি' জেঠুর এই তত্ত্বটাকে যদি নিভৃতে ঘরের কোণে বসে তা দিতুম তাহলে হয়তো শক্তির প্রচ্ছন্ন ভ্রূণটা পাখি হ'য়ে একদিন আকাশে ডানা মেলতে পারত। কিন্তু অন্যায় হয়ে যাচ্ছে একটা, নিজের কথাই বলে যাচ্ছি কেবল। তোমার কথা একটু শুনি—"

"শোনাবার মতো চমকপ্রদ ঘটনা আমার জীবনে তো কিছুই ঘটে নি! আমি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের সাধারণ ছেলে। ছেলেবেলাতেই বাবা-মা যে লাইন ধরিয়ে দিয়েছিলেন সেই লাইন ধরেই চলছি। তোমার এই অদ্ভুত বিচিত্র জীবনের কথা শুনে অবাক হ'য়ে যাচ্ছি আমি। আর একটা কথা ভেবেও অবাক হচ্ছি, আমাকে তুমি কতটুকুই বা চেন, অথচ তোমার জীবনের সব কথা এমন ভাবে বলে যাচ্ছ—"

"পৃথিবীতে সবাই অচেনা। পাশাপাশি বহুকাল একসঙ্গে বাস করলেও অচেনা অচেনাই থাকে। উচ্ছের সঙ্গে এতকাল বাস করেছি, সে-ও যেমন অচেনা তুমিও

তেমনি অচেনা। বললাম তো, তোমাকে সামনে পেয়েছি তাই আঁকড়ে ধরেছি। বিরাট পণ্ডিত বললেন তোমার চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ, হয়তো আমাকে তুমি ঠিক ভাবে দেখতে পাবে। আজ পর্যন্ত কেউ পায় নি। জেঠু বলেন, তুই দুর্বল, উচ্ছে বলে তুই পাপীয়সী, গাঁট্টা বলে তুই পাজি হারামজাদি, ওতলো বলে তুমি রহস্যময়ী—কিন্তু কেউ আমাকে ঠিক-ঠিক দেখতে পায় নি। ওরা যা বলে তা ঠিক, কিন্তু ওসব ছাড়াও আমি আরও কিছু। আশা আছে সেই আরও কিছুটা তুমি দেখতে পাবে, জেঠু বললেন, তুমি মহাপুরুষ, তোমার চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ। পাবে কি দেখতে?"

যেন মিনতির মতো শুনাইল। নবকিশোর উত্তর দিবার অবসর পাইল না। পাঞ্জাবী ট্যাক্সিওলা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"বেলগাছিয়া আ গিয়া। কাঁহা উৎরেংগে।"

"চল এখানেই নেবে পড়ি। এখান থেকে বেশী দূরে নয়।"

নবকিশোর এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, এবার দেখিতে পাইল জরি একটি বড় ব্যাগ কিনিয়াছে। ব্যাগটি লইয়া সে নামিয়া পড়িল। ট্যাক্সি ভাড়া উঠিয়াছিল প্রায় বারো টাকা। সে টাকাটাও দিয়া দিল।

ব্যাগ খুলিয়া টর্চ বাহির করিল একটা।

"চল এইবার—"

"এ সব কোথা পেলে। যখন আমার সংগে এলে তখন তো ছিল না।"

'কিনলাম। মানুষের মন ছাড়া আর সব জিনিসই কেনা যায়। এখান থেকে বেশী দূরে নয়। চল—"

ও অঞ্চলটা তখনও একটু পাড়া-গাঁ পাড়া-গাঁ ছিল। তখন রাস্তায় বিদ্যুত-বাতি জ্বলিত না। অনেক দূরে দূরে কেরোসিনের আলো ছিল মাঝে মাঝে। টর্চের আলো ফেলিতে ফেলিতে তাহারা আগাইয়া চলিল। রাস্তায় পীচ ছিল না। অনেক জায়গায় খোয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। নবকিশোর এক জায়গায় হোঁচট খাইল।

"টর্চটা তুমিই নাও। আমার এ-সব পথ চেনা!"

"পথ চেনা হ'তে পারে। কিন্তু গর্তগুলো?"

"ওগুলোও চেনা।"

নবকিশোর টর্চটা লইয়া জরিকেই পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

"আমাকে পথ দেখাতে হবে না। স্বর্গের পথ যদি দেখাতে পার তাহলেই বুঝব তুমি মহাপুরুষ। মর্ত্যের পথ আমার চেনা।"

নবকিশোরের মানসিক আড়ষ্টতা ক্রমশ কাটিয়া যাইতেছিল। এবার সে সহজভাবে, একটু ব্যঙ্গের সুরেই উত্তর দিল—"স্বর্গের পথ ভুগোলের পথ নয়। সে যে গোলে আছে তা শুনেছি, গোলক-ধাঁধা। সমাধান করবার ক্ষমতা আমার নেই।"

"তোমার কি ক্ষমতা আছে কি ক্ষমতা নেই তা তুমি কি জান? হাতী কি জানে সে কতটা শক্তিধর! জানে না। তাই মানুষের খেদায় ধরা পড়ে একটা কুনকি হাতীর মোহে। তুমি মোহের বেড়া ভাঙতে পারবে, এটা হয়তো দুরাশা। কিন্তু ওই সব দুরাশাকে আঁকড়েই তো এতদিন কাটল। এই তো জীবন।"

"ধর মোহের বেড়া যদি ভাঙতেই পারি তাহলেই কি তোমাকে স্বর্গের পথ দেখাতে পারব?"

"মোহের বেড়া ভাঙলেই স্বর্গ, জেঠু বলেছেন। তুমি নিজেই তখন স্বর্গ হয়ে যাবে, তোমার থেকেই তখন নির্মল আনন্দের নির্ঝর উৎসারিত হবে, স্নান করে পান করে অবগাহন করে আমি বাঁচব।"

"তুমি খুব ভালো বাংলা জানো দেখছি—"

"জানি। এম. এ.তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম। শুধু বাংলা নয়, আরও অনেক কিছু জানি। নানা রকম জ্ঞানের শরশয্যায় শুয়ে ছটফট করছি। কিন্তু শান্তি নেই।"

নীরবেই তাহারা পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নবকিশোর জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা যাঁর বাগানবাড়িতে যাচ্ছি তাঁর নাম কি?"

"তাঁর নামটা করব না, তিনি মানী লোক। যখন বি. এ. পড়তুম তখন তিনি আমার প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে এই বাড়িটা আমাকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমি নিই নি, কারণ আমি যা চাই তার তুলনায় এ বাড়িটা ধূলিকণার চেয়েও তুচ্ছ। তিনি তাঁর মালি সুখদেওকে ঢালা হুকুম দিয়ে দিয়েছেন যে, আমি দিনে রাত্রে যখন খুশি এসে যতক্ষণ থাকতে চাইব তার ব্যবস্থা সে যেন করে দেয়। কিন্তু আমি ওই হুকুমের সুযোগ নিয়ে যাই না, যাই সুখনের টানে। সুখন গরীব চাকর মাত্র, কিন্তু আমি জানি সে তার ধনী মালিকের চেয়ে বড়লোক। সত্যি ভালবাসে আমাকে। আর যাই ছাতটার লোভে। তিনতলার উপর প্রকাণ্ড ন্যাড়া ছাত। রেলিং নেই, আলসে নেই। অসাবধানে সীমা অতিক্রম করলেই মৃত্যু। ভারি লোভনীয়..."

"অসাবধান হবার ইচ্ছে হয় না কি মাঝে মাঝে—?"

"না। মরবার ইচ্ছে নেই এখন। মোটেই নেই। কিন্তু মৃত্যু পাশেই আছে এই ধারণাটা বেশ রোমাঞ্চকর। বালিশের নীচে সাপ থাকার মতো। থ্রিলিং।"

"বাড়ির মালিক এখন কোথায় আছেন?"

"কলকাতাতেই আছেন। পক্ষাঘাতে পঙ্গু হ'য়ে শয্যাশায়ী এখন। উন্মত্ত প্রেমিকদের শেষ পর্যন্ত যে দশা হয় তাই হয়েছে তাঁর। এই যে আমরা এসে গেছি—"

প্রকাণ্ড একটা গেটের সামনে জরি দাঁড়াইয়া পড়িল। গেট না বলিয়া সিংহদরজা বলাই উচিত। দুই পাশের স্তম্ভে দুইটি প্রকাণ্ড সিংহের মূর্তি, থাবা তুলিয়া স্পর্ধা ভরে দাঁড়াইয়া আছে।

"সুখন, সুখন, সুখদেও—"

কোনও সাড়াশব্দ নাই। তখন জরি নীচের ঠোঁটটা দুই আঙুলে টিপিয়া খুব জোরে একটা 'সিটি' দিল। এইবার কাজ হইল। গেটের নিকটেই যে ঘরটা ছিল সেটার কপাট খুলিয়া গেল।

"কে, সুখন—?"

মৃদু কোমল কণ্ঠে উত্তর আসিল—'হাঁ, বেটি'। একটি লণ্ঠন হাতে করিয়া সুখন বাহির হইয়া আসিল। দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ লোক। কাছে আসিতেই নবকিশোর দেখিল তাহার মুখভাব গম্ভীর। কপালের উপর লাল চন্দনের তিলক। নগ্নদেহে উপবীত-গুচ্ছ বিলম্বিত। প্রকৃত ব্রাহ্মণের চেহারা। জরির দিকে চাহিয়া ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরেই সে যেন বলিল—"এত রাত্রে কেন বেটি। ফের বদখেয়াল, না অন্য কাজ আছে—"

"বদখেয়াল নয়, শুধু খেয়াল। আমার নতুন বন্ধুকে নিয়ে এলাম এখানে। মৌজ

করব। তোমার জন্যেও ভাল 'বিলাইতি' এনেছি আজ। তোমার সেই গ্লাশটা আছে তো—"

গম্ভীরবদন ব্রাহ্মণের মুখে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। একটা নেবানো ইলেক্‌ট্রিক বালব্‌ সহসা বিদ্যুতায়িত হইয়া উঠিল যেন।

"আছে বই কি—"

"এখানে সোডা পাওয়া যাবে কি।"

"সব যাবে। গণেশকে উঠিয়ে এখুনি সব নিয়ে আসছি। খাবার আনব? এত রাত্রে ঠাণ্ডা সিঙাড়া কচুরি পাওয়া যেতে পারে রামধন হালুইয়ের দোকানে—করিমও দিতে পারে হয়তো কিছু।"

"যা পাও আন। ক্ষিধে পেয়েছে—"

"চাবিটা রাখ তুমি তাহলে। আমি যাই, নিয়ে আসি জিনিসগুলো। তোমরা সামনের ঘরটা খুলে বস।"

সুখদেও চলিয়া গেলে নবকিশোর প্রশ্ন করিল, "ও কি বাঙালী?"

"খোঁজ করিনি। নাম শুনে মনে হয় বিহারী। যাই হোক গ্রেট ম্যান। এই রাত্রে কি অসাধ্যসাধন করে দেখ না আমাদের জন্যে। চল সামনের ঘরটায় গিয়ে বসা যাক ততক্ষণ। ইলেক্‌ট্রিক লাইট নেই। আমি মোমবাতি কিনে এনেছি কিছু। দেশলাইও আছে। দাঁড়াও বার করি ব্যাগটা থেকে। সিগারেটও এনেছি এক টিন। তুমি সিগারেট খাও না বোধ হয়।"

"না—"

"আমি খাই মাঝে মাঝে।"

বাহিরের বৈঠকখানাটা প্রকাণ্ড। মহার্ঘ সোফা সেটি দিয়া সাজানো। মাঝখানে খুব বড় একটা মার্বেল পাথরের টেবিল। দেওয়ালে বড় বড় অয়েল পেণ্টিং ছবি। রবি বর্মার বিখ্যাত কয়েকখানা ছবিও রহিয়াছে। জরি মোমবাতি জ্বালাইয়া টেবিলের উপর রাখিল। তাহার পর ব্যাগ হইতে হুইস্কির বোতলটাও বাহির করিল। নবকিশোরের দিকে চাহিয়া হাসিল একটু।

"ভাল ছেলের এ সব চলে না নিশ্চয়—"

"না—"

"You are a darling: তোমাকে দিতে হ'লে আমার ভাগে খানিকটা কমে যেত। সুখনকেও খানিকটা দিতে হবে।"

"সুখন তোমার একগ্লাসের ইয়ার এতে ভারি আশ্চর্য লাগছে!"

"সুখনকে মদ খেতে শিখিয়েছে ওর মালিক। এখন ওর মালিক কাত হয়েছেন, মুশকিলে পড়েছে বেচারা। শুনেছি রোজ তাড়ি খায়। আমি যখন আসি ওকে ভালো জিনিস খাওয়াই।"

"অথচ তোমাকে তো বেটি বলে সম্বোধন করলে!"

'তাতে কি হয়েছে। বাপ বেটিতে তো অনেক জায়গায় একসঙ্গে মদ খায়। ও আমাকে বেটি বলে তার একটা ইতিহাস আছে। একদিন আমার প্রেমিকবর মদ খেয়ে বেহুঁশ হ'য়ে পড়েছিলেন, আমি তখনও বেহুঁশ হই নি। সুখন মালিকের মাথায় জল দিয়ে হাওয়া করছিল। আমি সেই সময় এক কাণ্ড করে বসলাম। হঠাৎ ওর কোলে

বসে গলা জড়িয়ে ধরলাম। পুরুষ হিসেবে he is a wonderful specimen, ও কি করলে জান ? ও আমার গালে একটা চুমু খেয়ে বললে—তুই আমার বেটি। কোলে বসেছিস বেশ করেছিস। এখন শুবি চল -। সেই থেকে আমি ওর বেটি।—কি, ফ্রয়েড্ মনে পড়ছে না কি—হা-হা-হা-হা—।".

নবকিশোর চমকাইয়া উঠিল। জরি যে এত জোরে হাসিতে পারে তাহা সে কল্পনা করে নাই।

জরি মদের বোতলটা খুলিয়া ফেলিল।

সুখন সত্যই অসাধ্যসাধন করিয়াছিল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গরম গরম কচুরি ও আলু-পেঁয়াজের ছেঁচকি আনিয়া হাজির করিল সে। ছয় বোতল সোডাও।

বলিল, "করিম মুর্গি জবাই করেছে। এখুনি 'কারি' তৈরি করে আনছে। তোমরা ততক্ষণ এইগুলো খাও। দেখি—"

মদের বোতলটা তুলিয়া সস্নেহে সেটার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ।

"দাঁড়াও, আমি আমার গ্লাশটা নিয়ে আসি !"

সিঁড়ি দিয়া যখন তাহারা ছাতে উঠিতেছিল তখন কোন আলো ছিল না। জরি ইচ্ছা করিয়াই কোন আলো আনে নাই।

"তুমি আমার হাতটা ধর। দুচার ধাপ উঠলেই বুঝতে পারবে সিঁড়ির ধরনটা কেমন। ভাল সিঁড়ি।"

"টর্চটা আনলে না কেন।"

"তুমি বেরসিক দেখছি। অন্ধকার উপভোগ করতেই তো এসেছি। এখানে আলো জেলে কি হবে—"

"হাতটা ভাল করে ধর তাহলে। এইবার চল—"

কিছুদূর উঠিয়া জরি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গানটা জান ? তোমার আছে তো হাতখানি।"

নবকিশোর চুপ করিয়া রহিল।

জরি আবার বলিল—"সেই যে, বিজন ঘরে—"

নবকিশোর মদ খায় নাই, তবু সে উত্তেজনা অনুভব করিতেছিল একটা। তাহার মনে হইতেছিল আরব্য-রজনীর একটা অদ্ভুত রজনীই বুঝি সুদূর অতীত হইতে ছিটকাইয়া আসিয়া বিংশ শতাব্দীর কলিকাতা নগরে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মূর্ত হইয়াছে। কথা বলিয়া এই উত্তেজনার মোহটাকে ছিন্নভিন্ন করিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। উত্তেজনাটা সে উপভোগ করিতেছিল তাই চুপ করিয়া ছিল। জরি কিন্তু না-ছোড়।

"চুপ করে আছ কেন—"

"অন্ধকারে তুমিই তো আলো ফেলতে চাইছ না। ভুলে যাচ্ছ যে কথাও আলো। তাই চুপ করে আছি—"

"আমি কথার আলো নিয়ে খেলা করব বলেই তো অন্য আলো আনি নি। কথার আলো জেলে জেলেই নিবিড় অন্ধকারে আমি যে জগতে তোমাকে নিয়ে যেতে চাই সে জগৎ দিনের আলোয় অদৃশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং চুপ করে থাকা চলবে না। আমি তো কথা বলবই, তোমাকেও বলতে হবে। বুঝলে—?"

জরি নবকিশোরের হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়া আবার হাসিয়া উঠিল।

নীরবে তাহারা সিঁড়ি উঠিতে লাগিল।

জরি একবার বলিল, "তুমি এক পেগ খেয়ে নিলে পারতে।"

নবকিশোর কোনও উত্তর দিল না।

একটু পরেই অনুভব করিল সে যেন একটা ঝড়ের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। হু হু করিয়া প্রবল বেগে হাওয়া বহিতেছে।

"আমরা ছাতে এসে গেছি। দাঁড়াও, তোমাকে বসিয়ে দিচ্ছি এক জায়গায়। চুপ করে বসে থাক। ছাতে আলসে নেই,—এইখানে বস।"

নবকিশোরকে বসাইয়া দিয়া জরি সরিয়া গেল। হু হু করিয়া হাওয়া বহিতেছে। নির্মেঘ আকাশে অগণ্য নক্ষত্র কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কোথায় গেল জরি? এই অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে কোন্ নাটকের অভিনয় হইবে?

"এইগুলো তুমি নাও তো। ভালো করে ধরে থাকো। উড়ে না যায়। আজ বড্ড হাওয়া—"

নবকিশোর হাত দিয়া অনুভব করিল একটা কাপড়ের পুঁটুলি।

"কি এটা।"

"আমার শাড়ি সেমিজ সায়া আর ব্লাউস। আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েছি। উলঙ্গ হবার জন্যেই আসি এখানে। ধরে থাক ভাল করে। উড়ে না যায়। আমি এখানেই বসছি—"

নবকিশোরের সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ বহিয়া গেল। একটু পরেই মদ ঢালার শব্দ এবং গ্লাসের ঠুনঠুনও শুনিতে পাইল সে।

"একটা কথা প্রথমেই পরিষ্কার করে বুঝে নাও নবু। তোমাকে নষ্ট করব বলে এখানে নিয়ে আসি নি। আমি অনেক বাঘ সিংহ হাতি গণ্ডার শিকার করেছি, তোমার মতো নিরীহ শশককে বধ করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। তাছাড়া sex-এর চরম করেছি বলেই জানি ওই নিয়ে উন্মত্ত হ'য়ে যারা সারাজীবন কাটিয়ে দেয়, তারা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব। আমিও সেই শ্রেণীর ছিলাম, হঠাৎ—ভালো ফুটবল খেলোয়াড়কে কিক্ করতে দেখেছো কখনও—হঠাৎ সেই রকম একটা কিক্ খেয়ে মাটি থেকে আকাশে উঠে গেছি। ফুটবল হ'লে মাটিতে আবার নেবে পড়তুম, কিন্তু আমি ফুটবল নই, তাই এখনও আকাশে আকাশেই ভেসে বেড়াচ্ছি আর সেই আকাশ-লোকেই দেখা পেয়েছি তোমার। তুমি হয়তো জানতে চাইবে কে আমাকে 'কিক্' করেছিল, নামটা কিন্তু বলব না। তুমি আন্দাজ করতে পার কিন্তু জেনে রাখ সে আন্দাজটাও ভুল হবে—"

হঠাৎ জরি থামিয়া গেল। যে কথাটা নবকিশোরের গোড়াতেই মনে হইয়াছিল সেই কথাটাই আবার মনে হইল। মেয়েটা পাগল নয় তো? তাহার উপর মদ গিলিতেছে! নিজের উপরই রাগ হইল আবার। কেন সে এমন ভাবে এত রাত্রে—

জরি কথা কহিল।

"তোমার রাগ হচ্ছে জানি। রাগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তুমি নিজেকে হয়তো ইঁদুর ভাবছ, আর আমাকে ভাবছ বেড়াল। ভাবছ তোমাকে গ্রাস করবার আগে থাবা দিয়ে দিয়ে খেলাচ্ছি। বিশ্বাস কর, তা নয়। আমার অন্তরটা যদি তোমাকে দেখাতে

পারতাম তাহ'লে তুমি হয়তো রাগ করতে না। কয়লার খাদ দেখেছো কখনও? যে খাদ থেকে আর কয়লা ওঠে না, বিস্ফোরণে যে খাদ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, যেখানে একটা কালো গহ্বর ছাড়া আর কিছু নেই—দেখেছ এরকম খাদ? আমার অন্তরটা অনেকটা সেই রকম। কিন্তু সেই অন্ধকার অন্তরের অন্তরতম গুহায়, পাতাল-পর্যন্ত-প্রসারিত সেই গাঢ় তমিস্রায় একটা ছোট্ট সবুজ স্বপ্ন এখনও বেঁচে আছে। সেই স্বপ্নটা আমার চুলের ঝুঁটি ধরে আমাকে সেই খাদ থেকে টেনে তোলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না বেচারা। প্রথমত ছোট্ট, দ্বিতীয়ত স্বপ্ন। তুমি তাকে একটু সাহায্য করবে? কেউ করেনি। কেউ করতে চায় না। গাট্টা, ওতলো, উৎসাহ, আরও অনেককে বলেছিলাম। কেউ হেসে উড়িয়ে দেয়, কেউ না-বোঝবার ভান করে। জেঠু বুঝতে পেরেছেন কিন্তু তিনি মুচকি মুচকি হাসেন আর বলেন— তখনই বলেছিলাম কলেজ ফলেজ যাস নি। অথৈ জলে পড়ে এখন হাবুডুবু খা খানিকক্ষণ, তারপর নৌকা নিয়ে আসবে কেউ একজন। জেঠু হেঁয়ালিতে কথা বলেন। আমি হাবুডুবু খাচ্ছি না, জলের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও, ওটা জেঠুর হেঁয়ালি। আমি অবলম্বন-হীন হ'য়ে শূন্যে ঝুলছি। আগে যখন মোহে পড়ে ভালবাসার ভান করতাম তখন তাই একটা অবলম্বন ছিল, তারপর যখন মোহমুক্ত হলাম তখন ঘৃণা করতাম সকলকে, ঘৃণাটাই অবলম্বন ছিল। সকলকে প্রাণ ভরে গাল দিয়ে সময় কাটত। এখন ঘৃণাও করতে পারি না। এখন—"

আবার হঠাৎ চুপ করিয়া গেল জরি। নবকিশোর এসব কথার উত্তরে কি যে বলিবে তাহা ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে সে মরিয়া হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল—

"আমি কিছু করলে যদি তোমার উপকার হয় আমি তা করতে প্রস্তুত আছি যদি তা আমার সাধ্যাতীত না হয়। আমি—"

জরি তাহাকে কথা শেষ করিতে দিল না।

"মহত্ত্বের উঁচু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে যদি উপকারের মুষ্টিভিক্ষা দাও তাহ'লে কাজ হবে না। সে ভিক্ষা আমি পাবও না, কারণ ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করে আমি দাঁড়িয়ে নেই। তা ধুলোয় পড়ে নষ্ট হবে। উপকার নয়, তুমি আমাকে বুঝতে চেষ্টা কর। আমাকে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো মনে কর, তাহলেই আমাকে বুঝতে পারবে। এসব জিনিস বুদ্ধি দিয়ে হয় না, অনুভূতি চাই, মেকি নয় খাঁটি অনুভূতি—"

"কিন্তু এরকম অনুভূতি তুমি আমার কাছে কেন প্রত্যাশা করছ, আমি তোমার সম্পূর্ণ অচেনা, তোমার সম্বন্ধে এক বিস্ময় ছাড়া আর তো কোনও অনুভূতি আমার মনে জাগছে না। তুমি উলঙ্গ হ'য়ে অন্ধকারে বসে যা বলছ তা যদি আবোল-তাবোল হ'ত তাহ'লে তোমাকে পাগলই মনে করতাম। কিন্তু তা আবোল-তাবোল নয়, তা অত্যন্ত অদ্ভুত, অত্যন্ত শাণিত, অত্যন্ত উজ্জ্বল। তা তাচ্ছিল্য করে অগ্রাহ্য করব এমন শক্তিও আমার নেই। অথচ আমি কি যে করব, কি যে করতে পারি তাও ভেবে পাচ্ছি না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি—"

"তোমাকে গোড়াতেই বলেছি তুমি অচেনা এইটেই আমার পক্ষে মস্ত সুবিধে। চেনা-লোকেরা বড় উদাসীন, আমার সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল ফুরিয়ে গেছে। তারা যদিও আমার কিছুই জানে না কিন্তু মনে করে যেন সব জেনে ফেলেছে। শেকসপীয়ার, মিলটন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের চেনা হ'য়ে গেছে, তাই আমরা আর

তাদের পাড়ি না। তাদের সমস্ত বিস্ময় সমস্ত ঐশ্বর্যকে আমরা ঔদাসীন্যের ধামা-চাপা দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছি। তুমি আমাকে চেনো না, আমি তোমাকে চিনি না এইটেই মস্ত সুবিধে। তাই তোমাকে টেনে এনেছি এখানে—"

"কি করতে হবে বল—"

"কিছু করতে হবে না। কারো কিছু করবার ক্ষমতা নেই। আমাকে শুধু তুমি বোঝ, সহ্য কর। আমার কেউ নেই। এই ভয়াবহ নির্জনতায় তুমি শুধু কাছে থাক। আর পার যদি আমার ওই সবুজ স্বপ্নটাকে একটু সাহায্য কর। আমি যা করছি তা অসম্ভব, তা হাস্যকর। কিন্তু তবু আমি তা করবই…"

"কি সেটা—"

"রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই জীবন ঘটালে মোর জনম জনমান্তর।' সেটা হয়তো তাঁর কল্পলোকে ঘটেছিল। আমি এই জীবনে তা সত্যিসত্যি ঘটাতে চাই। জেঠু বলেন, যা তুমি প্রাণমন দিয়ে চাইবে তাই হবে। জেঠুর কথা বিশ্বাস করি আমি। আমি সেই সাধনাই করছি। তুমি তার সাক্ষী থাক—"

"কি সাধনা, বুঝতে পারছি না ঠিক—"

"যা ঘটেছে এ জীবনে আমি তা মুছে ফেলতে চাই। ক্লীন স্লেট নিয়ে শুরু করতে চাই আবার। আবার সেই শিশু হ'তে চাই যে শিশু নিষ্কলঙ্ক, নির্ভয়, নির্মোহ, যা আমি একদিন ছিলাম—"

"বেশ তো হও না, কিন্তু আমি এর মধ্যে কি করে আসছি—"

"তুমি সাক্ষী থাকবে। আমি সত্যিই যদি স্বপ্নটাকে সফল করতে পারি তাহলে তোমার দরকার হবে না, যদি না পারি তুমি তোমার বন্ধুকে বোলো যে আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি—"

"কোন্ বন্ধুকে ?—"

"উচ্ছেকে, যার ভালো নাম উৎসাহ, যে শ্মশান ভৈরবীর সঙ্গে জুটে একদিন ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল—যে আমাকে বলেছিল তোর পেছনে একটা নীচস্থ শুক্র ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, তুই পাপীয়সী, আমাকে ছুঁসনি—।"

"উচ্ছেকে ভালবাস না কি—"

"মোটেই না। ওকে আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে আমি ওর নীচস্থ শুক্রকে ভয় করি না। সাধনার জোরে নীচস্থ শুক্রকে তুঙ্গী বৃহস্পতি করে দিতে পারি। যদি না পারি, তুমি বোলো আমি চেষ্টা করেছিলাম—"

"তুমি নিজেই তো বলতে পার।"

"পরাজয়ের কথাটা নিজের মুখে বলতে পারব না। সেটা তুমি বোলো—"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর আবদারের সুরে বলিয়া উঠিল—"নবু, কাল আমাকে কিছু লজেনস্ চকোলেট কিনে দেবে ? আর দু'চারটে খেলার পুতুল ? আমি ওই সব নিয়েই আবার থাকতে চাই। দেবে ?"

"তা না হয় দেব। কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না এখনও। তুমি—"

"বোঝবার দরকার নেই। আমাকে তুমি শিশু মনে কর। আমার সঙ্গে শিশুর মতো ব্যবহার কর। ভুলে যাও যে আমি যুবতী নারী। মনে কর আমি তোমার খুব ছোট্ট একটি বোন, যে এখনও ভাল করে হাঁটতে শেখে নি, কথা বলতে শেখে নি।

একাগ্র হয়ে যদি একথা ভাবতে পার আমি ঠিক আমার শৈশব ফিরে পাব। শ্রীরামকৃষ্ণের একাগ্রতায় মৃন্ময়ী কালী জীবন্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। তুমি এই ঝুনো পাকা বুড়ীটাকে কচি শিশু করে দাও—তুমি পারবে যদি চেষ্টা কর। জেঠু বলেছেন, তুমি মহাপুরুষ। তোমার চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ! তুমি ক্ষেত্রবাবুর 'অভয়ের কথা' পড়েছ? তাতে এক জায়গায় আছে, একজন মানুষের মুক্তি হ'লেই সব মানুষের মুক্তি হ'য়ে যায়। একজনও যদি সত্যি সত্যি উপলব্ধি করে যে জগৎটা মিথ্যা মায়া মাত্র, সব উপে যাবে। অর্থাৎ একজন মানুষ সত্যি সত্যি ইচ্ছে করলে আর একজন মানুষকে রূপান্তরিত করতে পারে—এই সারটুকু আমি সংগ্রহ করেছি। তীর্থের কাক তো—যা পাই সংগ্রহ করে রাখি। অনেক বাজে জিনিসও সংগ্রহ করেছি জীবনে। এটার জলুস কিন্তু বাড়ছে দিন দিন, তাই এটাকে আঁকড়ে আছি—"

"বিরাট পণ্ডিত তোমাদের তীর্থের কাক বলে, না?"

"হ্যাঁ, সবাইকে ওই নাম দিয়েছেন জেঠু। এমন কি নিজেকেও। বলেন, আমি যে তীর্থের কাক সে তীর্থের মন্দিরে কিন্তু ছাত নেই, চূড়া নেই, দেওয়াল নেই, অর্থাৎ সে তীর্থে মন্দিরই নেই। সেখানে মাথার উপরে আকাশ, পায়ের নিচে মাটি আর আশেপাশে দশ দিক। এই তীর্থের কাক উনি। নিজেকে মাঝে মাঝে তীর্থও বলেন। জেঠুর সবই আজগুবি, সবই অদ্ভুত!"

"তোমার জেঠুকে বার্নার্ডো সাহেব খুব খাতির করেন মনে হ'ল—"

"করেনই তো। চরক, সুশ্রুত, জ্যোতিষ, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক জ্ঞানদান করেছেন উনি বার্নার্ডো সাহেবকে। একটা ভালো প্রবালের আংটিও দিয়েছেন। সে আংটি পরে নাকি সাহেবের অনেক উন্নতি হয়েছে। জেঠুর সুপারিশেই তো উচ্ছে মেডিকেল কলেজে ঢুকতে পেরেছে।"

"উৎসাহও তো খুব ভালো জ্যোতিষী। নয়?"

"কি করে জানলে?"

"আজ ট্রেনে যখন আসছিলাম ও চেন টেনে গাড়ি থামিয়েছিল। গার্ডসায়েব যখন এলেন তখন বলল—আমার গোচর ফল এখন ভালো, আমার কিচ্ছু করতে পারবেন না আপনি—"

কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল জরি।

"বেচারা উচ্ছে। জেঠু ওর আসল কুষ্ঠিটা লুকিয়ে রেখেছেন, ওকে যে কুষ্ঠিটা দিয়েছেন, তা একটা বানানো কুষ্ঠি—ওর নয়—"

"সে কি! তুমি কি করে জানলে—"

"আমিই তো টুকে দিয়েছিলাম কুষ্ঠিটা। উচ্ছে যখন শ্মশান ভৈরবীকে নিয়ে মাতল তখন একদিন জেঠুর কাছে এসে কুষ্ঠি চাইলে। জেঠু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, সেটা আমার পুরোনো খাতায় টোকা আছে, পরে বার করে দেব। উচ্ছে চলে যাবার পর জেঠু আমাকে ডেকে বললেন, তুই এই কুষ্ঠির ছকটা ওকে টুকে দে। এটা ওর কুষ্ঠি নয়। কিন্তু ওকে বলিস নি সে কথা। জিগ্যেস করলাম—ওর নয় তো, কার কুষ্ঠি এটা। জেঠু বললেন, কারো নয়। সেই কুষ্ঠি নিয়ে উচ্ছে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। ওর না কি রাজযোগ আছে—"

আবার জরি হাসিয়া উঠিল।

জরির হাসিতে পরিবেশটা যেন হালকা হইল একটু। বিস্ফোরণ-বিধ্বস্ত কয়লার খনিটা এমন হাসি হাসিতে পারে? নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল নবকিশোর। জরিও নির্বাক। ছাতের উদ্দাম বাতাসটাও থামিয়া গেল হঠাৎ। নবকিশোর সহসা অনুভব করিল তাহার সমস্ত দেহটা ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। সমস্ত দিন ট্রেনে কাটিয়াছে, তাহার পর উৎসাহকে লইয়া মেডিকেল কলেজে ছুটাছুটি, মেসে আসিয়া সামান্য একটু ঘুমাইয়াছিল, তাহার পরই জরি।

"আমার বড় ঘুম পাচ্ছে জরি—"

"আমি তোমাকে এতক্ষণ ধরে যা বললাম তাতে তো ঘুম অন্তর্ধান করা উচিত। সব শুনেও তোমার ঘুম পাচ্ছে— ?"

"পাচ্ছে তো—"

"তাহলে ওইখানে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়। বিছানা বালিশ কিছুই নেই। কষ্ট হবে। আমার কোলে মাথা রেখে শুতে পারতে। কিন্তু অতটা নির্বিকার হয়েছ কি? হওনি। এক কাজ কর, আমার কাপড় জামার পুঁটুলিটা মাথায় দিয়েই শোও। একটু ঘুমিয়েই নাও। কিন্তু ভয় হচ্ছে আমার। ঘুমের পর মানুষের মন বদলে যায়। তুমি বদলে যাবে না তো! যে খড়টাকে আঁকড়ে ধরেছি সেটা সর্পে রূপান্তরিত হবে না তো?"

নবকিশোরের মনে হইল নিবিড় অন্ধকারে নক্ষত্রখচিত কালো আকাশের নিচে বসিয়া জরি সাগ্রহে যেন তাহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু কি উত্তর সে দিবে? কাহাকেও আশ্বাস দিবার সামর্থ্য কি তাহার আছে? কোন উত্তর সে দিতে পারিল না।

একটু পরে জরিই আবার কথা বলিল—"ঘুমের পর মানুষ বদলে যায়, কিন্তু তবু ঘুমকে তো আটকানো যায় না। ঘুমোও তুমি—"

লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল নবকিশোর। কিন্তু স্বস্তি পাইল না। শাড়ির জরি-পাড় তাহার কাঁধের নিচে বিঁধিতে লাগিল, ব্লাউসের বোতামগুলো মনে হইল যেন সজীব পোকা কয়েকটা। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল সে। কিন্তু ঘুম আসিল না। আচ্ছন্নের মতো তবু অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল সে। মনে হইতে লাগিল যেন যুগ-যুগান্ত পার হইয়া যাইতেছে। জরির কোনও সাড়াশব্দ নাই। কিন্তু হঠাৎ সে যেন চাবুক খাইয়া উঠিয়া বসিল। বিবেকের চাবুক! এ কি করিতেছে সে। অজানা একটা বাড়ির ছাতে অচেনা একটা মাতাল মেয়ের প্রলাপ শুনিয়া সে বিহ্বল হইয়া বসিয়া আছে! এ কি দুর্মতি হইল তাহার। বাতাসের বেগটা হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিল। বহুদূর হইতে ঝিল্লীর ঝনৎকার ভাসিয়া আসিয়া অন্ধকারকে স্পন্দিত করিয়া তুলিল।

"জরি তুমি কোথায়—"

দূর হইতে উত্তর আসিল, মনে হইল অনেক দূর হইতে।

"আমি হামাগুড়ি দিচ্ছি। তোমার ঘুম হ'য়ে গেল?"

"আমি চললুম—"

"এখনই?"

"হ্যাঁ—"

"অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারবে ?"

"পারব—"

নবকিশোর উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ কাচ ভাঙার একটা শব্দ হইল। তাহার পর গড়গড় করিয়া গড়াইয়া আসিল কি যেন একটা।

"যাঃ, হাওয়ার দাপটে গ্লাশটা ভেঙে গেল। বোতলটা গড়িয়ে যাচ্ছে তোমার দিকে, খালি বোতলটা—"

নবকিশোর কোন উত্তর না দিয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সিঁড়ির দরজাটা খুঁজিতেছিল। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হইতেছিল আলিসাবিহীন ছাতের সীমা অতিক্রম করিয়া একেবারে নীচে পড়িয়া যাইবে না তো! সৌভাগ্যক্রমে তখনই সিঁড়ির দরজাটা হাতে ঠেকিল।

"শোন শোন, এত রাত্রে একা যাবে কি করে? ট্যাক্সি পাবে কি। টাকা আছে সঙ্গে? নিচের ঘরে টেবিলে আমার ব্যাগে টাকা আছে, তার থেকে নিয়ে যাও কিছু—"

নবকিশোর কোনও উত্তর দিল না। অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

॥ চার ॥

পরদিন নবকিশোর কলেজে গিয়াই প্রথমে উৎসাহের খোঁজ করিল। গিয়া শুনিল তাহার জ্ঞান হইয়াছে। ডাক্তাররা নাকি তাহার বিশেষ যত্ন লইতেছেন। বার্নাডো সাহেব আর একবার আসিয়া তাহাকে দেখিয়া গিয়াছেন। নবকিশোরকে দেখিয়া নার্স কিং আগাইয়া আসিয়া ইংরেজীতে ফিসফিস করিয়া যাহা বলিল তাহার সারমর্ম এই: "তোমারই অপেক্ষা করছিলাম। আমার ডিউটি শেষ হয়েছে এখন। নার্স ব্রাউন থাকবেন। তাঁকে সব বলে দিয়েছি। ভয় নেই, জ্ঞান হয়েছে। তুমি কাছাকাছি থাকো, কিন্তু ওর সঙ্গে বেশী কথা বোলো না এখন। কর্নেল বার্নাডো মানা করে গেছেন। আমি চললুম। গুড বাই। সন্ধ্যের সময় দেখা হবে।"

নার্স কিং চলিয়া গেল। গত রাত্রে নবকিশোর যে অদ্ভুত আবর্তের মধ্যে পড়িয়াছিল তাহার ঘোর তখনও সে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। একটা দুঃস্বপ্ন বলিয়া সেটাকে উড়াইয়া দিতে পারিলে সে হয়তো স্বস্তি পাইত। কিন্তু প্রত্যক্ষ ঘটনা-পরম্পরাকে দুঃস্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না সে। সমস্তক্ষণ তাহার মনের মধ্যে জরি অটল হইয়া বসিয়া রহিল। উৎসাহের শয্যাপার্শ্বে যখন গিয়া সে দাঁড়াইল, তখনও তাহার মনে হইতে লাগিল জরি তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া আছে।

উৎসাহ চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। নবকিশোর নিকটে দাঁড়াইতেই সে চোখ খুলিয়া চাহিল। তাহার আগমনবার্তা যেন উৎসাহের মনের মধ্যে নীরবেই সঞ্চারিত হইল। সে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল নবকিশোরের দিকে। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "নমস্কার। কি কাণ্ড যে হ'য়ে গেল!"

"সব বলব। এখন নয়, পরে।"

"ঘটনা কি ঘটেছিল তা আমি জানি। আপনার বন্ধু আমাকে আশ্বাসও দিয়ে

গেছেন আমার হাড়টাড় কিছু ভাঙেনি। প্রিন্সিপালও এসে বলে গেলেন কোন ভয় নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি আমার সব ভেঙে গেছে—"

"কি ভেঙে গেছে ?"

"এতদিন ধরে যে হর্ম্যটা গড়েছিলাম সামান্য একটা ধাক্কায় তা ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। আমার কুষ্ঠি অনুসারে আমার যা গোচর ফল তাতে আমার কোনও বিপদ হওয়ার কথা নয়, কিন্তু হ'য়ে গেল তো। তার মানে—"

আর কিছু সে বলিতে পারিল না। ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল শুধু।

"ওসব নিয়ে এখন মাথা ঘামাবেন না। এখন আপনার বিশ্রাম দরকার—"

"ভাবছি মরে গেলেই বা ক্ষতি কি। এ প্রবালের আংটিটা আমার হাতে আপনি পরিয়ে দিয়ে গেছেন কি ?"

"হ্যাঁ, আমি বিরাটেশ্বর শর্মার কাছে গিয়েছিলাম আপনার খবরটা দিতে। তিনিই আমাকে আংটিটা দিয়ে বললেন—এখুনি ওটা গিয়ে ওকে ধারণ করিয়ে দিন। কাল রাত্রেই এসে ওটা আপনাকে পরিয়ে দিয়ে গেছি। তখন আপনার জ্ঞান ছিল না। আংটি পরে তো উপকার হয়েছে দেখছি—"

উৎসাহ কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিল।

তাহার পর বলিল—"আংটিটা আপনি নিয়ে যান। বিরাট পণ্ডিতকে ফেরত দিয়ে দেবেন। ওসবে আমার বিশ্বাস নেই—"

উৎসাহ আংটিটা খুলিয়া তুলিয়া ধরিল।

"এখন থাক না। এখুনি তো আমি যাচ্ছি না তাঁর কাছে। কবে যাব, যাব কি না, কিছুই ঠিক নেই, আপনি সেরে উঠুন, তারপর ফেরত দেবেন।"

"তাহলে ওটা আপনার কাছেই রাখুন এখন। আমি ওটা পরব না, আমার কাছেও রাখব না।"

অগত্যা নবকিশোরকে আংটিটা লইতে হইল।

"বিরাট পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?"

"হয়েছে। অদ্ভুত লোক বলে মনে হ'ল—"

"জরির সঙ্গে ?"

"হয়েছে। জরি আরও অদ্ভুত।"

উৎসাহ আবার চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"এবার বুঝতে পেরেছি কেন যেতে চাইছেন না।"

"আমি এখন চললুম। আমি থাকলেই আপনি কথা কইবেন।"

"একটা কথা শুনে যান। মনে হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে একটা লাভ হয়েছে—"

"কি লাভ—"

"আমার সেই ক্ষমতাটা লোপ পেয়েছে। সকাল থেকে চেয়ে চেয়ে দেখছি কারো পিছনে আর পাপগ্রহের ছায়া দেখতে পাচ্ছি না। ভৈরবী আমাকে বলেছিল অহমিকার ধাক্কায় ও ক্ষমতা চলে যাবে। ভাবছি অহমিকাটা কার, আমার না ট্যাক্সির—"

"Please do not talk much."

[বেশী কথা কইবেন না]

নার্স ব্রাউন হাসিমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"আচ্ছা চললুম—"

নবকিশোর বাহির হইয়া গেল।

ক্লাস ওআর্ড প্রভৃতি সারিয়া সে যখন মেসে ফিরিল তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে মেসের চাকর বলিল—"একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এসেছিল। অনেকক্ষণ বসেছিল সে। এই চিঠিটা রেখে গেছে। বলেছে সময় পেলে আজ সন্ধ্যের পর আবার আসবে। আপনার খাবার নিয়ে আসি?"

"এস—"

খামের চিঠিখানি হাতে করিয়া নবকিশোর উপরে উঠিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা খুলিল না। ভাবিল খাইবার পর ধীরে সুস্থে খুলিবে। খাওয়ার পরও অনেকক্ষণ সে চিঠিটা খুলিল না। অপেক্ষা করিতে লাগিল তাহার রুম-মেট যোগেন ঘুমাইয়া পড়িলে খুলিবে। যোগেন অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতির লোক। খামের চিঠি খুলিতে দেখিলেই প্রশ্ন করিবে কার চিঠি। নবকিশোরের চিঠি বড় একটা আসে না। খামের চিঠি তো আসেই না। সৌভাগ্যক্রমে যোগেন সেদিন খাইয়া উঠিয়াই জামা-জুতা পরিতে লাগিল।

"এখন কোথায় বেরুবে এই দুপুরে?"

যোগেন বলিল—"চেতলা যাচ্ছি। সেখানে আমার এক পিসির কলেরা হয়েছে খবর পেলাম। খবর যখন পেয়েছি যেতেই হবে। তোমার পিসি-টিসি আছে?"

"না—"

"ভাগ্যবান লোক তুমি।"

যোগেন বাহির হইয়া গেল। নবকিশোর উঠিয়া ঘরের কপাটটা বন্ধ করিয়া দিল, শুধু বন্ধ নয়, খিল দিয়া দিল। কেন এরূপ করিল তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়তো লজ্জিত হইয়া পড়িত। বিছানার উপর বসিয়া খামের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া রহিল খানিকক্ষণ। হাতের লেখাটাও অদ্ভুত। পরিষ্কার গোটাগোটা মুক্তোর মতো হস্তাক্ষর নয়। কেমন যেন জড়ানো জড়ানো জটিল লেখা, কিন্তু ওই জটিলতার মধ্যেও কেমন যেন একটা তীক্ষ্ণ পরিচ্ছন্নতা আছে।

চিঠি খুলিতেই একটা আংটি বাহির হইয়া পড়িল। সেই ইমিটেশন স্টোনের নীলার আংটিটা। আংটিটা নবকিশোর টেবিলের উপরই রাখিয়া আসিয়াছিল।

জরি লিখিয়াছে—

"নবু,

হয়তো তোমার দেখা পাব না এই ভেবেই আগে থাকতে চিঠিটা লিখে নিয়ে যাচ্ছি। যদি দেখা না পাই, চিঠিটা রেখে আসব। তুমি কাল রাত্রে যে আচরণ করেছ তা সাধারণের চোখে কাপুরুষোচিত মনে হবে। কিন্তু আমার চোখে তা মনে হয় নি। মহাপুরুষরা অনেক সময় কাপুরুষোচিত আচরণ করতে পারেন বলেই মহাপুরুষ বলে গণ্য হন। তাছাড়া পশ্চাদপসরণ করা অনেক সময় সেরা রণকৌশল। টলস্টয়ের 'ওআর এণ্ড পীস' নিশ্চয় পড়েছ। রুশ সেনাপতি কুটুজভ্ যদি মস্কো ছেড়ে পালিয়ে না যেতেন তাহলে তিনি নেপোলিয়নকে হয়তো হারাতে পারতেন না।

কাল রাত্রে তুমি হয়তো ভয়েই পালিয়েছ, কিন্তু তোমার ওই ভয়টাই তোমার ভদ্র মনের পরিচয় দিয়েছে। আমি কাল রাত্রে অকপটে তোমাকে যা বলেছি, আমার আচরণে যা তোমার কাছে প্রকট করেছি, তাতে আমাকে ভয়ংকরী মনে করাই তো স্বাভাবিক। অনেকের কাছে এই ভয়ংকরীও আবার লোভনীয়া। তুমি তথাকথিত সাহসী হ'লে যা করতে চাইতে বা করতে পারতে তাতে আমি বাধা দিতাম না। কিন্তু তারপর তোমাকে সেই আস্তাকুঁড়ে আবর্জনার মতো ফেলে দিতাম যেখানে অসংখ্য লালসাক্লিন্ন মনুষ্যাকৃতি পশুর দল নানা ওজুহাতে কিলবিল করছে অনাদিকাল থেকে। আর্ট, সাহিত্য, ধর্ম, বিজ্ঞান—কোন-না-কোন একটা অজুহাতের ছুতোয় তুমিও অনায়াসে পশুত্বের সেই আদিমস্তরে নেমে যেতে পারত। কিন্তু তা তুমি যাও নি। ভয়েই যদি কাল পালিয়ে থাক বেশ করেছ—আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু ভয় না হ'য়ে যদি ওটা ঘৃণা হয় তাহলে অবশ্যই কিছু বলবার আছে। কারণ ঘৃণা অহমিকারই রূপান্তর। নিজেকে একটা কাল্পনিক উচ্চবেদীতে না তুললে অপরকে ঘৃণা বা কৃপা করা যায় না। কৃপাও ঘৃণার আর একটা রূপ। আমরা ভগবানের বা ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা করি কারণ তাঁকে আমরা নিজের মতো ভেবে নি। তিনি যেন দারোগা, হাকিম বা ওই জাতীয় কিছু একটা। এ ধরনের অহমিকায় তোমার মন ওতপ্রোত তা আমি অবশ্য কল্পনা করতে পারি, কিন্তু কল্পনা করতে ইচ্ছে করে না। তোমার যতটুকু দেখেছি তাতে তোমাকে সেই অতি-বিরল-শ্রেণীভুক্ত করতে ইচ্ছে করে যার চলতি নাম 'ভদ্রলোক'। জেঠু তোমাকে এক নজরেই চিনেছিলেন তাই তোমাকে বলেছিলেন 'মহাপুরুষ'। ভদ্রলোকেরাই মহাপুরুষ। যাক এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর বেশী আলোচনা করব না। তুমি হয়তো বিব্রত বোধ করছ। ভদ্রলোকেরা প্রশংসা শুনে স্ফীত হয় না, বিব্রত হয়। আমার নিজের কথাই বলি এবার। কাল সব কথা তোমাকে বলা হয় নি। সবচেয়ে দরকারী কথাটাই বলি নি। যে অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে কাল তুমি ভয়ংকরী উন্মাদিনীকে অভিনয় করতে দেখেছিলে তার যবনিকা কালই ফেলে দেব আগে থাকতে ঠিক করে রেখেছিলাম। যখনই তোমার কাছ থেকে নীলার আংটিটা পেয়ে গেলাম আর ওতলো সেই আংটির বদলে টাকা দিলে তখনই ঠিক করেছিলাম সেটা। তোমাকে দর্শকরূপে পেয়ে উৎসাহটা বেড়ে গেল আরও। ঠিক করলাম আমার দৈন্যের ঐশ্বর্য তোমার কাছেই উজাড় করে দেব সব। তারপর যবনিকাটা ফেলে দিয়ে আরম্ভ করব নূতন জীবন। তোমার কাছেই নিজেকে নিরাভরণ নগ্ন করে দেখাবার প্রবৃত্তি কেন আমার জেগেছিল তা কাল তুমি জানতে চেয়েছিলে, আমি তার উত্তরও দিয়েছিলাম—জীবনে নিরুত্তর হই নি কখনও—কিন্তু আজ তোমাকে বলছি, উত্তরটা আমিও জানি না। লেট দেয়ার বি লাইট অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ লাইট (Let there be light and there was light) বাইবেলে উক্ত এই ঘটনার মতো ওটাও একটা বিস্ময়কর, কিন্তু সত্য ঘটনা। বিরাট আবর্জনার বোঝা গঙ্গাই বইতে পারে, তোমাকে হয়তো আমার গঙ্গা বলেই মনে হয়েছিল, হয়তো আমার অবচেতন লোকে তোমাকে আমি আরও মর্যাদা দিয়েছিলাম, হয়তো তোমাকে আমি সেই ত্রিপথগামিনী স্রোতস্বিনী বলে কল্পনা করেছিলাম যিনি স্বর্গে অলকানন্দা, মর্ত্যে গঙ্গা এবং পাতালে ভোগবতী। ওই দেখ, আবার তোমার কথায় এসে পড়েছি। যাই হোক, যা হবার হ'য়ে গেছে, যা করবার করে ফেলেছি। এইবার আসল কথাটা বলি যেটা কাল

তোমাকে বলা হয় নি। আমি কাল এখান থেকে চলে যাচ্ছি। অনেক দিন আগে একটা চাকরির জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতে হবে আর তাদেরই সঙ্গে থাকতে হবে বোর্ডিংয়ে। ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গলাভের জন্য মন অনেকদিন থেকেই উৎসুক হ'য়ে আছে। মনে হচ্ছে ওরাই আমাকে সেই দেশে নিয়ে যাবে যাকে যীশুখৃস্ট কিংডম্ অব হেভেন বলেছেন। চাকরিটা পাব সে আশা করি নি। কিন্তু পেয়ে গেছি। কাল চলে যাব। তুমি আমার জন্য প্রার্থনা কোরো, আমাকে ছোট শিশু বলে ভেবো, আমার বিশ্বাস তাতে অনেক কাজ হবে। নীলার আংটিটা তুমি ফেলে গিয়েছিলে, ফেরত দিলাম এই সঙ্গে। যদি পরতে না চাও রেখে দিও। আমার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেই থাক ওটা তোমার কাছে। জেঠুকে সব বলেছি। তাঁর নীলার আংটিটাও ফেরত দিয়ে দিয়েছি তাঁকে। ওতলোকেও টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছি। জেঠু আমাকে মার-ধোর করলেন একটু (আমার মতো বুড়ো মেয়েকেও উনি চুলের ঝুঁটি ধরে কিল চড় লাথি মারতে ইতস্তত করেন না!)—কিন্তু টাকাটা দিয়ে দিলেন এবং ওতলোকেও যাচ্ছেতাই করলেন টাকাটা দিয়েছিল বলে। ওতলোর সঙ্গে আলাপ কোরো। ও মহাশয় লোক। পণ্ডিতও—ডবল এম. এ.। আমাকে ও ভালবাসে, কিন্তু কদর্থে নয়। আমাকে শ্রদ্ধা করে, সহ্য করে, আর আমাকে নিয়ে ও মনে মনে না জানি কি একটা রহস্যময় কৌতুক-কাব্যলোক সৃষ্টি করেছে যার আভাস ওর চোখের দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে। লোক কিন্তু চমৎকার। ওর সঙ্গে আলাপটা বজায় রেখো, সুখ পাবে। ও আমার অনেক আবদার সহ্য করেছে, আমাকে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। জেঠুর চেয়ে ওতলো আমার বড় সহায়, জেঠুকে ভয় করে, ওতলোকে করে না। আমি কাল চলে যাব সে কথা আর কাউকে বলি নি এখনও। বললে একটা হুলুস্থুলু হবে আশঙ্কা করছি। যাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাব। রাত্রি দশটার আগে আসব না। কারণ তার আগে হয়তো তোমার কাজ শেষ হবে না, আর তার আগে কলকাতার হৈ-হৈ-হট্টগোলের মাঝখানে সত্যিকার 'দেখা' কি হওয়া সম্ভব? তুমি মেসেই থেকো, আমি তোমাকে তুলে নিয়ে যাব—"

জরি চিঠিতে নাম সই করে নাই। নবকিশোর আংটিটা আঙুলে পরিয়া দেখিল। ঠিক ফিট করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া আবার রাখিয়া দিল সেটা টেবিলের উপর। তাহার পর আবার উঠিল। বাক্স খুলিয়া কাপড়-জামার নিচে রাখিয়া দিল আংটিটা। তাহার পর মনে পড়িল উৎসাহের আংটিটাও তাহার পকেটে আছে। বিরাট পণ্ডিতের সেই অষ্টধাতুর কৌটোটাও। কৌটোর মধ্যে আংটিটা পুরিয়া সেটা হাতে করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল সে। একবার ইচ্ছা হইল এখনি গিয়া বিরাট পণ্ডিতকে আংটিটা ফেরত দিয়া আসে। এখন তো ক্লাস নাই। জরির কথা ভাবিয়াই কিন্তু নিরস্ত হইল সে। যদি তাহার সহিত দেখা হইয়া যায়, যদি সে ভাবে চিঠিটা পাইয়াই হ্যাংলার মতো ছুটিয়া আসিয়াছে—না, নিজেকে অত খেলো করিবে না সে। কৌটোটা রাখিয়া, জামাটা খুলিয়া লুঙ্গি পরিয়া শুইয়া পড়িল। এই সময় সাধারণতঃ সে ঘুমায়। কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয় নাই। শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল—একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে রাস্তায় যেন দেখা হইয়াছে—নিতান্ত ছোট, তিন চার বছরের বেশী হইবে না, মাথায় লাল ফিতা দিয়া বাঁধা বেড়াবিনুনি, এক হাতে ন্যাকড়ার পুতুল, আর এক হাতে আধ-খাওয়া বিস্কুট। নবকিশোরের দিকে একদৃষ্টে

চাহিয়া রহিল। তাহার পর মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। নবকিশোর দুই হাত বাড়াইয়া তাহার দিকে আগাইয়া যাইতেই কিন্তু ছুটিয়া চলিয়া গেল সে। রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল হঠাৎ। সেখানে অজস্র ফুল ফুটাইয়া প্রকাণ্ড কদম গাছ দাঁড়াইয়া আছে একটা। বৃদ্ধ গাছটাও যেন রোমাঞ্চিত।···দুম্ দুম্ দুম্ দুম্ শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল নবকিশোরের। কপাটে কে ধাক্কা মারিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপাটটা খুলিয়া দিল। যোগেন আসিয়াছে। ঘর্মাক্ত কলেবর।

"পিসি পটল তুলেছে। মাঝ থেকে আমার ভোগান্তি আর খরচ। ডিস্‌গাস্‌টিং! খুব ঘুমিয়েছ? চোখ তো বেশ লাল দেখছি। খিল দিয়ে শুয়েছিলে ভাল করেছিলে। নতুন ছোঁড়া চাকরটা চোর মনে হচ্ছে। বিশুদার লাল গামছাটা পাওয়া যাচ্ছে না।"

"জামা খুলবে না?"

"এখনি তো ক্লাস। তুমি যাবে না?"

"যাব নিশ্চয়ই। চল—"

উইলসন সাহেবের সার্জারির ক্লাস ছিল। উইলসন সাহেবের পাকা গোঁফ কাইজারী কায়দায় তা দেওয়া। ঊর্ধ্বমুখী গুম্ফপ্রান্ত যেন সদম্ভে ঘোষণা করিতেছে—হট্ যাও। ছাত্রদের উপর কিন্তু তিনি ভারী প্রসন্ন। প্রথম দিনই ক্লাসে আসিয়া বলিয়াছিলেন—বই পড়িয়া বা বক্তৃতা শুনিয়া সার্জারি শেখা যায় না। তোমাদের মধ্যে কেহ সত্যই যদি সার্জন হইতে চাও হাতে-কলমে কাজ শিখিতে হইবে। অনেকবার ঠকিয়া, অনেক ধাক্কা খাইয়া, অনেক লাঞ্ছনা এবং বকুনি সহ্য করিয়া তবে সার্জন হইতে হয়। পরীক্ষায় পাস করিবার জন্য এই লেকচার। আমার প্রফেসারের দেওয়া যে নোট পড়িয়া আমি পাস করিয়াছিলাম, সেই নোট আমার খাতায় টোকা আছে। সেই খাতা হইতে আমি তোমাদের রোজ পনরো মিনিট করিয়া সেই নোট ডিক্‌টেট করিব। তোমরা তাহা যদি আয়ত্ত করিতে পার অনায়াসে পরীক্ষায় পাস করিয়া যাইবে। উইলসন সাহেব পনরো মিনিটের বেশী ক্লাস লইতেন না। নবকিশোর ক্লাস হইতে বাহির হইয়া উৎসাহের কাছে গেল। গিয়া দেখিল সেখানে অগ্নিগর্ভ পর্বতের মতো বিরাট পণ্ডিত বসিয়া আছেন। কপালে রক্তচন্দনের টিকা, পরিধানে সাদা থান, পায়ে সাদা চামড়ার চটি। খালি গা, বুক-ভরা কাঁচা-পাকা লোম, তাহার উপর শুভ্র উপবীতগুচ্ছ। নবকিশোরকে দেখিয়া তিনি হাসিবার চেষ্টা করিলেন। নবকিশোরের মনে হইল দুই চোখে যেন দুইটি শিখা জ্বলিতেছে। বিরাট পণ্ডিত শীর্ণকায় অস্থিপঞ্জরসার ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার কপালের রক্তচন্দন, তাঁহার চোখের শিখায়িত দৃষ্টি, তাঁহার মুখের মেকী হাসি দেখিয়া নবকিশোর শঙ্কিত হইল। ওই ছোটখাটো লোকটাকে একটা দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত বলিয়াই মনে হইল তাহার।

"এই যে আপনিও এসে গেছেন। আপনিই বলুন, কাক আর মানুষে তফাত আছে কি না।"

"আছে বই কি—"

"কিন্তু কোনও কাক যদি হঠাৎ মনে করে যে সে মানুষের মতো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে উঠেছে—"

উৎসাহ বলিয়া উঠিল, "আমি কাক নই, আমি মানুষ—"

হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন বিরাট পণ্ডিত।

"ক'টা মানুষ আছে দুনিয়ায়! কেউ কেঁচো, কেউ ব্যাঙ, কেউ শ্বাপদ, কেউ সাপ। তীর্থের কাকও বেশী নেই, তীর্থই বা ক'টা আছে। মানুষ অসাধ্যসাধন করে, বিধির বিধানকে উলটে দিতে চায়। তুমি কি করেছ শুনি? তুমি তো সামান্য একটা রাস্তা পার হ'তে পার না, মোটর চাপা পড়ে যাও! ভাগ্যে কাল প্রবালটা ধারণ করিয়ে দিয়েছিলাম তাই বেঁচে গেছ। ওটা পরে থাক—"

নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আংটিটা আপনার কাছেই আছে তো, দিন পরিয়ে দিন—"

নবকিশোর আংটি আর অষ্টধাতুর কৌটোটা বিরাট পণ্ডিতের হাতে দিল। তিনি প্রবালের আংটিটা বাহির করিয়া সেটা আবার উৎসাহের হাতে পরাইয়া দিলেন।

"আর খুলো না। আমি বলছি না ওতে অমোঘ অব্যর্থ ফল ফলবেই। কিন্তু ও ছাড়া আমাদের কিছু করবার নেই। সাগর পর্বত লঙ্ঘন করবার জন্যে মানুষ নৌকো জাহাজ প্লেন করেছে, লঙ্ঘনও করছে, আবার ব্যর্থও হচ্ছে। ব্যর্থ হচ্ছে বলে থামছে না। পুরুষকারেই মনুষ্যত্ব। আংটি খুলবে না—"

উৎসাহ আর কোন প্রতিবাদ করিল না, আংটিটা পরিয়াই রহিল। নবকিশোর আর একবার অনুভব করিল, যে বিদ্রোহী পুরুষকে সে ট্রেনের কামরায় দেখিয়াছিল সে বোধ হয় ট্যাক্সি চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। উৎসাহের এখন আত্মসমর্পণের ভাব। নবকিশোরের ভাল লাগিল না। সকালে সে যখন আংটিটা খুলিয়া দিয়াছিল তখন ভাল লাগিয়াছিল। উৎসাহ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমিও কুষ্ঠি দেখতে জানি। আমার কুষ্ঠির গোচর ফল অনুসারে আমার এখন এই অ্যাক্সিডেণ্ট হওয়া উচিত ছিল না—"

"হবে তা আমি অনেক আগেই জানতাম তাই প্রবালের আংটি করিয়ে রেখেছিলাম। তুমি যদি পরে থাকতে কিছুই হ'ত না। অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী হ'লে যা হয় তোমার তাই হয়েছে। তাই বিরাট পণ্ডিতের কথার উপর কথা কইতে চাও—"

"আমার স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বিচারবুদ্ধির তাহলে কি কোনও মূল্য নেই আপনার কাছে?"

"মানুষেরই স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন বিচারবুদ্ধি থাকে, তুমি এখনও মানুষ হওনি। তুমি তীর্থের কাক মাত্র। মন্দির থেকে খুঁটে খুঁটে যা পাও তাই তোমার পাওনা। তার বেশি এখন পাবে না, পেতে চাইলে দুঃখ পাবে।"

বিরাট পণ্ডিতের ওষ্ঠপ্রান্তে একটা ব্যঙ্গের হাসি চিকমিক করিয়া উঠিল। উৎসাহ নতচক্ষে শুনিল সব। কোন উত্তর দিল না।

"আপনার বাত কেমন আছে"—নবকিশোর প্রশ্ন করিল।

"ভাল আছে। ডাক্তারী ওষুধে কিছু হ'ল না। ড্যাশগুপ্ত কিছু করতে পারলে না। একটা তান্ত্রিক মন্ত্র কাল থেকে জপ করছি, ফল পেয়েছি। আপনি নীলাটা ধারণ করেন নি?"

"না। আমি জরিকে দিয়ে দিয়েছি ওটা। ওসব পরতে আমার ভালো লাগে না।"

বিরাট পণ্ডিত চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি যে জরির নিকট হইতে আংটিটা ফেরত পাইয়াছেন তাহা ভাঙিলেন না। জরির সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না

তিনি। নবকিশোরও কিছু বলিল না। কিছুক্ষণ নীরবতার পর উঠিয়া পড়িলেন বিরাট পণ্ডিত।

"আমি এবার চললাম। বার্নাডো বলেছে ওকে আরও দু'দিন এখানে রাখবে। তারপর ছেড়ে দেবে। আমি আজই নিয়ে যেতে চাইছিলাম, কিন্তু ও একগুঁয়ে লোক রাজী হল না। দুনিয়াতে সবাই একগুঁয়ে, মানে সবাই মনে করে সে যা ভাবছে তাই নির্ভুল। সারা জীবনটা পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে আর হোঁচট খেতে খেতে চলতে হচ্ছে। আপনি আসছেন আবার তো আমাদের বাড়িতে? আসবেন নিশ্চয়। উচ্ছে যখন আপনার বন্ধু আসতেই হবে আপনাকে—।"

যাইবার পূর্বে উৎসাহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আংটিটি খুলো না দয়া করে—"

সহজভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বেশ সহজভাবেই হাঁটিতে লাগিলেন। কালই তিনি যে বাতে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিলেন স্বচক্ষে না দেখিলে নবকিশোর তাহা বিশ্বাস করিত না। জরি যাহা বলিয়াছিল তাহা মনে পড়িল। বিরাট পণ্ডিতকে দ্বার পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া নবকিশোর আবার উৎসাহের কাছে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল উৎসাহ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রবালের আংটিটাই দেখিতেছে।

"বেশ ভালো আছেন তো?"

"হ্যাঁ। কোন কষ্ট নেই। ঘাড়ের সে ভূতটাও নেবে গেছে! বেশ ভালো আছি। প্রবালটা পরব না ভাবছি—"

"পরুন না, ক্ষতি কি। আপনার অভিভাবকের যখন অত ইচ্ছে এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রে উনি যখন অত বড় পণ্ডিত, আপনার নিজেরও জ্যোতিষে বিশ্বাস আছে যখন —তখন পরেই দেখুন না দিনকতক—"

"উনি আপনাকে নীলা দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। অত দামী নীলা আমি ও'র কাছ থেকে বিনা পয়সায় নেব কেন, তাছাড়া ওসব ব্যাপারে কোনও জ্ঞানই নেই আমার, কখনও পরি নি ওসব, তাই জরিকে ফেরত দিয়ে দিলাম।"

"জরির সঙ্গে আলাপ হয়েছে?"

"হয়েছে। খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে—"

নবকিশোর আশা করিয়াছিল উৎসাহ হয়তো জরির সম্বন্ধে কিছু বলিবে। কিন্তু সে কিছুই বলিল না। হঠাৎ সে লক্ষ্য করিল সে যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে। আড়চোখে আর একবার তাহার দিকে চাহিল। মনে হইল এখন এখানে না থাকাই উচিত।

"আমি এখন চলি। পরে আসব।"

নবকিশোর চলিয়া যাইতেছিল, উৎসাহ ডাকিল।

"শুনুন। আমার একটা উপকার করবেন? আমাকে গোটা দুই প্রাইভেট ট্যুশনি যোগাড় করে দিতে পারবেন?"

"কেন!"

"আমি তাহলে বিরাট পণ্ডিতের কাছে আর থাকব না। স্বাধীনভাবে থাকব এবার। মাসে গোটা পঞ্চাশেক টাকা রোজগার করতে পারলেই হয়ে যাবে। আমি

এম. এসসি ভালভাবেই পাস করেছি। বি. এসসি ক্লাসের ছেলেদের পড়াতে পারব—”

“আমার সঙ্গে তো তেমন কারও আলাপ নেই। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয় তাহলে। কিন্তু বিরাট পণ্ডিত সত্যিই আপনার হিতৈষী লোক। সত্যিই আপনাকে স্নেহ করেন। তাঁর কাছ থেকে চলে আসাটা কি— ”

“তাঁর স্নেহ অক্টোপাসের মতো। আষ্টেপৃষ্ঠে সর্বদা জড়িয়ে থাকতে চায়। ছেলেবেলা থেকে সহ্য করেছি, আর পাচ্ছি না। এইবার মুক্তি চাই, আপনি একটু সাহায্য করুন আমাকে।”

“চেষ্টা করব-

নবকিশোর আর দাঁড়াইল না। যাইতে যাইতে তাহার মনে হইল এই অপরিচিত পরিবারের সঙ্গে এমনভাবে জড়াইয়া পড়াটা কি ভাল হইতেছে ?

॥ পাঁচ ॥

জরির প্রতীক্ষায় নবকিশোর মেসে বসিয়া ছিল। এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। তাহার রুম-মেট যোগেনের নাইট ডিউটি। সে অনেকক্ষণ আগে হাসপাতালে চলিয়া গিয়াছে। নবকিশোরেরও খাওয়া হইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। অন্যদিন হইলে সে এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িত। সেদিনও সে শুইয়াছিল কিন্তু ঘুম আসিতেছিল না। শুইয়া শুইয়া যে ডাক্তারী বইটা সে পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল তাহারও একবর্ণ তাহার মাথায় ঢুকিতেছিল না। সে কান পাতিয়া রাখিয়াছিল রাস্তার উপর—যদি কোনও মোটর দাঁড়াইয়া হর্ন দেয়। অনেক মোটর আসা-যাওয়া করিতেছিল, হর্নও অনেকবার বাজিয়াছে, নবকিশোর অনেকবার গাড়িবারান্দাতে উঠিয়াও গিয়াছে, কিন্তু জরির মোটর আসে নাই। যখন পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল তখন নবকিশোর আবার গাড়িবারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইলে মির্জাপুর স্ট্রীটের অনেকটা এবং গোলদীঘির প্রায় সবটাই দেখা যায়। নবকিশোর ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া রাস্তার যতটা দেখা যায় দেখিল। পথ প্রায় নির্জন হইয়া আসিয়াছে। ফুটপাথে ভিখারীরা ঘুমাইতেছে। একটা রিকশা ঠুন্ ঠুন্ করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া মন্থরগতিতে চলিয়া গেল। পথ প্রায় জনশূন্য।

“নবু—”

সেই বাঁশির স্বর ভাসিয়া আসিল হঠাৎ।

নবকিশোর দেখিল রাস্তার ঠিক ওপারে গোলদীঘির রেলিং ধরিয়া জরি দাঁড়াইয়া আছে। গোলদীঘির আলোছায়ার পরিবেশে চিত্রার্পিতবৎ জরিকে অবাস্তব বলিয়া মনে হইল। সত্যই কি জরি দাঁড়াইয়া আছে ? না, তাহার দৃষ্টির ভ্রম !

“নবু—”

আবার সেই বাঁশির ডাক।

নবকিশোর জামা গায়ে দিয়া জুতো পরিয়া নিচে নামিয়া গেল। চাকরকে উঠাইয়া বলিয়া দিল—তাহার ফিরিতে দেরি হইবে। সে যেন কপাটটা বন্ধ করিয়া দেয়।

রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিল জরি নাই। রাস্তা পার হইয়া গোলদীঘিতে ঢুকিয়া পড়িল। প্রথমটা কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

"এই যে আমি এখানে—"

একটা ঝোপের ছায়ায় ঘাসের উপর জরি বসিয়াছিল। নবকিশোর কয়েক মুহূর্ত কোন কথাই বলিতে পারিল না।

"তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

"অনেকক্ষণ। তুমি আমার জন্যে সত্যি সত্যি অপেক্ষা করছ কি না সেইটেই লক্ষ্য করছিলাম এতক্ষণ ধরে। কাল তোমাকে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম, আজ আর সে ইচ্ছে নেই। আজ তুমি নিজে আসবে এইটেই আমার কামনা ছিল। আমার সে কামনা তুমি পূর্ণ করেছ। অজানা পথে চলে যাওয়ার আগে এটা আমার মস্ত বড় পাথেয় হ'য়ে রইল। চল—"

"কোথা যাবে—"

"গঙ্গার ধারে। বাবুঘাটের কাছে বসব কোথাও।"

গোলদীঘি হইতে বাহির হইয়া সিনেট হলের সম্মুখে দাঁড়াইল তাহারা। জরি সিনেট হলের সম্মুখে দাঁড়াইয়াই রহিল খানিকক্ষণ। মনে হইল তন্ময় হইয়া গিয়াছে। তাহার পর যাহা করিল তাহা নবকিশোর প্রত্যাশা করে নাই। দুই হাত জোড় করিয়া সে নমস্কার করিতে লাগিল। তাহার পর নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"এর কাছে অনেক পেয়েছি—অনেক!"

দেখা গেল একটু দূরে একটা ভিক্টোরিয়া গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। সেই দিকেই তাহারা অগ্রসর হইল।

বাবুঘাটে ঠিক গঙ্গার উপরেই তাহারা বসিয়া ছিল। জরি জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা নবু, কাউকে কখনও ভালবেসেছ?"

"রোম্যাণ্টিক ভালবাসা বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায় তা আমার জীবনে কখনও ঘটে নি। তবে—"

ঘাটের একটু দূরেই যে নৌকাখানা স্তূপীকৃত অন্ধকারের মতো ছিল সেই দিকে চাহিয়া নবকিশোর ইতস্তত করিতে লাগিল।

"তবে কি—"

"একটি মেয়ের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে আমার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে, তাকেই আমি ভালবাসি যদিও তাকে এখনও দেখি নি।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জরি বলিল—"প্রমীলা ভাগ্যবতী। তার কাছে—"

"প্রমীলাকে তুমি চেন নাকি—"

"একসঙ্গে পড়েছি। তার কাছ থেকেই তোমার অনেক কথা শুনেছিলাম আগে, তারপর হঠাৎ কাল দেখা হ'য়ে গেল। নবকিশোর মুখোপাধ্যায় আর মেডিকেল কলেজ শুনেই বুঝলাম--"

জরি কথাটা শেষ করিল না। চুপ করিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর হঠাৎ আবার শুরু করিল—"যাবার আগে সত্যি কথাটাই বলে যাই। প্রমীলা বড়লোকের মেয়ে, রূপসী, দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। তাই তাকে হিংসে করতুম খুব। তার মুখেই শুনেছিলুম মেডিকেল কলেজের ভালো ছেলে নবকিশোর মুখুজ্যের সঙ্গে

তার বিয়ের ঠিক হ'য়ে আছে। সেই নবকিশোরকে কাল যখন নাগালের মধ্যে পেলাম, ভাবলাম একটু বাজিয়ে দেখি। দেখি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রে কলঙ্করেখা এঁকে দিতে পারি কি না। কিন্তু পারলুম না, হেরে গেলুম। আমার জীবনে এই প্রথম পরাজয় আর সে পরাজয়ের গৌরব আমাকে যেখানে নিয়ে গেছে সেখানে শুক্র নীচস্থ নয়, বৃহস্পতি তুঙ্গী। দুঃখ পেলে একথা শুনে?"

"দুঃখ পাব কেন। কিন্তু আশ্চর্য যাচ্ছি। তোমাকে একটা আশ্চর্য উপন্যাস বলে মনে হচ্ছে। প্রতি পরিচ্ছেদেই নূতন বিস্ময়—"

"উপন্যাস কাল্পনিক সৃষ্টি, কিন্তু মানুষ জীবন্ত সত্য। যারা মহাপুরুষ তারাই কল্পনা আর সত্যকে অভিন্ন বলে মনে করে। সাধারণ মানুষে তা পারে না। তুমি যে মহাপুরুষ তার আর একটা প্রমাণ পেলাম। আচ্ছা, সত্যি কথা বল তো নবু, আমাকে তোমার কেমন লেগেছে?"

"এ কথা জানতে চাইছ কেন। আমি এত রাত্রে তোমার সঙ্গে এই গঙ্গার ধারে এসে বসে আছি, এর থেকে কি সেটা বুঝতে পারছ না—"

"বুঝতে পারছি উপন্যাস পড়ার মনোভাব নিয়ে তুমি এসেছ। দেখতে-চাইছ এর পর কি হয়। কিন্তু সত্যি বলছি নবু, এর পর আর কিছু হবে না। আর কিছু নেই। এর পর যদি কিছু হয় তা অন্যত্র নূতনভাবে হবে। কাল যে সবুজ ছোট্ট স্বপ্নটার কথা বলেছিলাম তা যে কি হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে না শুকিয়ে যাবে, কিছুই জানি না এখনও। আমি শুধু জানতে চাইছি আমি তোমার মনে যে ছাপটা রেখে গেলাম, তা কি শুধু কালিরই ছাপ? কালিমাই কি তার একমাত্র তাৎপর্য?"

"আমি ওসব কিছু ভাবি নি। তোমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছি শুধু। তোমার মতো মেয়ে এর আগে আমি দেখি নি, দেখব কল্পনাও করি নি। এর চেয়ে বেশি আর কি বলব—"

"আমার জন্যে তোমার চোখে এক ফোঁটাও জল কি জমে নি?"

"জল? না। জল জমবে কেন শুধু শুধু!"

"না, আমার দিক থেকে সে রকম দাবি কিছু নেই। আমার জীবনের ট্র্যাজেডিটা যদি—থাক, ওসব কথা আর বলব না। একটা কথা শুধু জেনে রাখো, এই একটি কথাই শুধু মনে রেখো যে আমি এই ভাগ্যহত যুগের প্রতীক—ভোগের মাঝখানে থেকেও যার ক্ষুধা মেটে নি—যে পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গিয়েও আবার অগ্নি-কামনা করেছে বারবার। ছাইও পুড়েছে, পুড়ে নতুন ধরনের ছাই হয়েছে। এই ক্রমাগত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে এ যুগে। ভস্ম হবার আকাঙ্ক্ষাই এ যুগের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। আমি এই যুগেরই প্রতীক। জেঠু যে মহেশ্বর ভোলানাথ মহাকালের কথা বলেন তিনি ভস্মভূষণ। বহু যুগের ভস্মকে তিনিই অঙ্গে ধারণ করেন, এ যুগের ভস্মকেও হয়তো করবেন। কিন্তু আমার তাতে সান্ত্বনা নেই। আমি ভস্ম হ'য়েই থাকতে চাই না, আমি আবার উন্মুখ উৎসুক হ'য়ে ফুটতে চাই নবাঙ্কুরের কাঁচ কাঁচ পাতায় যা ভস্মকে উজ্জীবিত করবে, যা অমর—"

জরি থামিয়া গেল। নবকিশোরের মনে হইল অশ্রুর বন্যা বুঝি তাহার ভাষাকে ভাসাইয়া লইয়া সেই দেশে চলিয়া গেল যেখানে নীরবতাই ভাষা। সেই নীরবতাই বার বার নবকিশোরকে বলিতে লাগিল—মনে রেখো আমি এই ভাগ্যহত যুগের প্রতীক। আমি আবার উন্মুখ উৎসুক হ'য়ে ফুটতে চাই—।

জরি আবার কথা কহিল।

"বিরাট-মন্দিরে তীর্থের কাক ছিলুম। অনেক জিনিস সংগ্রহ করেছি। কিছুই কাজে লাগে নি। একটি জিনিস ছাড়া। সেটি হচ্ছে সেই চিরন্তন বিশ্বাস—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। তাই বুকে আঁকড়ে নিয়ে চললাম।…"

"কোথায় যাচ্ছ তুমি? কোথায় চাকরি পেয়েছ?"

"তা বলব না। পুরোনো জগতের সঙ্গে সম্বন্ধটা নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিয়ে যাচ্ছি। ক্লীন স্লেট নিয়ে নূতন জীবন আরম্ভ করব। তুমি আমার জন্যে প্রার্থনা কোরো নবু। করবে?"

"প্রার্থনা? আমার প্রার্থনায় কি ফল হ'বে কোনও? আমি তো সন্ধ্যাহ্নিক পর্যন্ত করি না! কাকে প্রার্থনা করব? ভগবানকে? ভগবান সম্বন্ধে কোনও ধারণাই আমার নেই। আমি অতি সাধারণ লোক, আমাকে এ-সব অনুরোধ করছ কেন—"

"তুমি সাধারণ নয়, তুমি অসাধারণ। তুমি কাল পালাতে পেরেছিলে। সাধারণ লোক হলে কাল নরকে ঝাঁপিয়ে পড়তে, তারপর সাফাই গাইবার জন্য ফ্রয়েড আওড়াতে। তা তুমি করনি। জেঠু একনজরেই তোমায় চিনেছিলেন। কাউকে উদ্দেশ্য করে তোমায় প্রার্থনা করতে হবে না। তুমি মনে মনে কামনা কোরো আমার ওই সবুজ স্বপ্নটা যেন বেঁচে থাকে। করবে?"

নবকিশোর হাসিয়া বলিল, "বেশ, বলছ যখন করব—"

"বিলেতে গিয়েও যেন ভুলে যেও না—"

"আমি বিলেত যাব কে তোমাকে বললে—"

"প্রমীলা। বিয়ে হ'য়ে গেলেই বড় ডিগ্রি আনবার জন্যে বিলেত পাঠাবেন তোমাকে প্রমীলার বাবা। খুব বড়লোক তো। তোমার দাদা-বৌদি নিশ্চয় আপত্তি করবেন না। শুনলাম তোমার দাদা প্রফেসর, উত্তর প্রদেশে কোথায় যেন আছেন—"

"এত খবর তুমি যোগাড় করলে কি করে?"

"সব প্রমীলা বলেছে। এ-সব তো তোমার বাইরের খবর। যে কেউ যোগাড় করতে পারত। প্রমীলা যোগাড় করেছে নিজের স্বার্থের জন্যে। আর সেটা গলগল করে আমার কাছে বলেছে নিজের সৌভাগ্য জাহির করবার জন্যে। এটা অবশ্য ওর বিশেষত্ব নয়, আস্ফালনটা সব যুগেরই বিশেষত্ব। আমি কিন্তু তোমার যে খবরটি পেয়েছি তা প্রমীলা জানে না, সেটি বহুমূল্য রত্নের মতো সঞ্চয় করে রাখব আমি—"

নবকিশোর উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিল। জরির সঙ্গে প্রমীলার ভাব আছে! তাহার এত খবর সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে সে! জরি তাহার সম্বন্ধে কোন্ খবরটি বহুমূল্য রত্নের মতো সঞ্চয় করিয়া রাখিতে চায়? জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল হইল কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

জরিই কথা কহিল আবার।

"মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় তোমার বুকটা হয়তো পাষাণে গড়া। কিন্তু এ-ও জানি সন্দেহটা অলীক। পাষাণের তলায় ঝরনার সাড়াও পেয়েছি।"

"আমার বুকটা পাষাণে-গড়া এ সন্দেহ হঠাৎ হ'ল কেন?"

"এখন হঠাৎ মনে হ'ল। কারণ তোমার কোনও কৌতূহল নেই। অন্য কেউ হ'লে এখুনি জানতে চাইত তোমার সম্বন্ধে যে বহুমূল্য খবরটি আমি রত্নের মতো সঞ্চয়

করে রেখেছি সে খবরটি কি। কিন্তু তুমি চুপ করে রইলে। হয়তো মহাপুরুষের এ-ও একটা লক্ষণ।"

"বলতে যদি বাধা না থাকে বল খবরটি কি—"

"খবরটি হচ্ছে তুমি অতি ভীতু লোক। এ যুগের অতিসাহসী আরশোলার দলে তুমি একটি অতি-ভীতু 'মথ'—"

কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল জরি। নবকিশোরের আবার মনে হইল জরি এমন হাসিতে পারে!

"উৎসাহের সঙ্গে আর দেখা হয়েছে?"

"তুমি হাসপাতাল থেকে চলে আসবার ঠিক পরেই আমি গিয়েছিলাম। নার্স ঢুকতে দিলে না। বললে এখন ভিজিটিং আওয়ার নয়। তার কাছে উৎসাহের নামে একটা চিঠি রেখে এলাম। আর তো তার সঙ্গে দেখা হবে না।"

"কেন, কখন যাবে তুমি—"

"এখনই যাব। সুখনের জন্যে অপেক্ষা করছি। সে আমার জিনিসপত্র টাকাকড়ি নিয়ে এখানেই আসবে। সে এলেই চলে যাব—"

"কোন্ ট্রেনে?"

"ট্রেনে নয়, নৌকোয় যাব। ওই যে আমার নৌকো বাঁধা আছে—"

স্তূপীকৃত অন্ধকারের মতো যে নৌকোটা একটু দূরে বাঁধা ছিল জরি সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

"নৌকো ক'রে যাচ্ছ? কেন!"

"জলে কোনও দাগ থাকে না। আমার অন্তর্ধানের পর জেঠু চারদিক তোলপাড় করবেন। তাই আমি এই পথ ধরেছি। এ পথে আমার নাগাল পাওয়া সহজ হবে না। তুমি কথাটা গোপন রেখো। তুমি ছাড়া এ কথা আর কেউ জানে না।" একটু থামিয়া বলিল—"জানবেও না।"

"তুমি একা যাবে?"

"না। সুখন যাবে আমার সঙ্গে। কিছুদূর পর্যন্ত যাবে, তারপর ফিরে আসবে। বাকি পথটা একাই চলতে হ'বে আমাকে।"

"সুখন যাবে? সুখদেও?"

"হ্যাঁ। ও বলিষ্ঠ, বিশ্বাসী এবং পিতৃতুল্য। ও আমার সত্যিকার হিতৈষী। ওর উপর নির্ভর করা যায়—"

"তুমি কাল বলেছিলে ও আর একজনের চাকর। ও কি ক'রে তোমার সঙ্গে যাচ্ছে? ওর মনিব অনুমতি দিয়েছে বুঝি—"

"শুধু দিয়েছে নয়, দিয়ে কৃতার্থ হয়েছে। ওর মনিবের মনিব যে আমি। আচ্ছা নবু বিরাট বড়লোকদের মনস্তত্ত্ব বোঝ কিছু? ও লোকটা জানে যে আমি ওকে ভালবাসি না, ঘৃণা করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও সুখনকে ঢালাও হুকুম দিয়ে রেখেছে আমার কোনও বাসনা যেন অপূর্ণ না থাকে। আমি সুখনকে কাল বলেছিলুম আমি নৌকো করে বেড়াতে বেরুব। ও যেন বাবুঘাটে একটা নৌকো ঠিক করে রাখে আর আমার জিনিসপত্র আর কিছু টাকাকড়ি নিয়ে রাত বারোটা নাগাদ বাবুঘাটে এসে যেন পৌঁছয়। সুখন আজ বিকেলে এসে বলে গেছে, নৌকো সন্ধ্যা থেকেই বাবুঘাটে

বাঁধা থাকেবে। তার মালিক তাকে হুকুম দিয়েছেন সে যেন কিছু টাকা নিয়ে আমার সঙ্গে যায়। ও ভদ্রলোক জানে যে আমি ওকে ঘৃণা করি, তবুও আমার পিছনে টাকা খরচ করবার জন্যে এত উৎসুক কেন! আর আমিই, যা এত নীচ, কেন যে সব জেনে-শুনেও ওর টাকা দুহাত পেতে নিই! এ-সব রহস্যের সমাধান করতে পার? না, তুমি পারবে না। এ সব জটিল গোলক-ধাঁধায় কোনও দিন তো ঢোক নি।"

জরি কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করিল। তাহার পরই উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল —"দেহ দিয়ে লোককে যে সুখ দেওয়া যায় তার কি কোন বাঁধা-ধরা বাজারদর আছে? নেই, নেই, নেই। সুতরাং—"

আবার থামিয়া গেল সে। হয়তো আরও কিছু বলিত, কিন্তু বাধা পড়িল। একটা ট্যাক্সি আসিয়া থামিল রাস্তার উপর।

"সুখন এল বোধ হয়।"

সত্যিই দেখা গেল সুখন আসিতেছে। তাহার এক হাতে একটা স্যুটকেস আর এক হাতে টিফিন কেরিয়ার।

"সুখন এসেছ? ওই নৌকোটাই কি আমার নৌকো।"

"হাঁ ওহিঠো। আজ দিন-ভোরের মজুরি দিয়ে ওকে এখানে থাকতে বলেছি—হো ভিখুয়া, ভিখুরাম—"

নৌকার ভিতর হইতে সাড়া আসিল—"জি হাঁ—"

"নিকলো নাওসে। চিজবস্ সামহালো—"

নৌকার ভিতর হইতে জ্বলন্ত টর্চ হাতে করিয়া ভিখু বাহির হইয়া আসিল এবং সুখনের হাত হইতে স্যুটকেস ও টিফিন-কেরিয়ার লইয়া গেল। সুখন একটি লম্বা কোট গায়ে দিয়া আসিয়াছিল। সে কোটের ইনার পকেট হইতে একটি খাম বাহির করিয়া জরির হাতে দিয়া বলিল—"ইঠো ঠিকসে রাখ্খো বেটি—"

"কি এটা?"

সুখন এতক্ষণ হিন্দীতে কথা বলিতেছিল, এইবার বাংলায় বলিল—"টাকা। পাঁচশো টাকা আছে। আর একটা ব্যাংক্ চেক!"

জরি তাচ্ছিল্যভরে খামটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

"যার টাকা তাকে দিয়ে দিও। আমি ভিকিরি নই। আমি কাল যে টাকা টেবিলের উপর রেখে এসেছিলাম সে টাকা কোথায়—"

সুখন খামটা তুলিয়া লইয়া বলিল—"তোমার স্যুটকেসে রেখে দিয়েছি। বিয়াল্লিশ টাকা সাড়ে ছ আনা ছিল—"

"স্যুটকেস কোথা থেকে পেলে—"

"কিনে আনলাম। কাপড় জামাও কিনেছি কিছু—"

"আন্দাজি জামা কিনেছ?"

"আন্দাজি কিনব কেন। তোমার একটা 'বিলাউস্' বাগানে উড়ছিল। কাল রাত্রে ফেলে এসেছিলে। সেইটের মাপেই কিনেছি—সব ঠিক আছে। এবার চল—"

জরি অপ্রত্যাশিতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল।

"দূর হ'য়ে যাও, দূর হ'য়ে যাও তুমি। সব ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমি একা একবস্ত্রে হেঁটে হেঁটে যাব, নৌকো চাই না—"

তারপর নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া বলিল—"নবু, আমি চললুম। আর দেখা হবে না। তুমি আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। ফিরে যাও—"

জরি রাস্তা ধরিয়া হাঁটিতে লাগিল।

সুখনের মুখে প্রশান্ত মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল একটা।

"পাগলী ফের ক্ষেপল !"

ট্যাক্সি-ওলা আসিয়া ভাড়া চাহিল। দেখা গেল ট্যাক্সি-ওলা সুখনের চেনা লোক। তাহার হাতে একটি দশ টাকার নোট দিয়া সুখন বলিল—"সরদারজি, এবাবুকে ফিরতি পথে নাবিয়ে দিয়ে যেও। তুমি তো এখন গারাজে ফিরবে ?"

"হাঁ। আপ কাঁহা যাইয়েগা—"

"মেডিকেল কলেজকো সামনে হামকো উতার দিজিয়ে গা।"

"ঠিক হ্যয়। আইয়ে—"

নবকিশোর ঘাড় ফিরাইয়া একবার দেখিল। আলো-আঁধারির ভিতর দিয়া জরি হাঁটিয়া চলিয়াছে। সুখন স্মিতমুখে বলিল—"আপনি ভাববেন না। বুঝিয়ে-সুজিয়ে আমি পাগলীকে ফিরিয়ে আনব ঠিক—"

নবকিশোর তবু কয়েক মুহূর্ত সেই অপস্রিয়মান আবছা মূর্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

"চলিয়ে—"

ড্রাইভার তাগাদা দিল আবার।

"চল।"

নবকিশোর যখন মেসে ফিরিল তখন চতুর্দিক নিস্তব্ধ। কড়া নাড়িতেই চাকরটা কপাট খুলিয়া দিল। পাশের বাড়ির ঘড়িতে তিনটা বাজিল।

চাকরটা বলিল—"আপনি চলে যাবার পর এক বাবু আপনার খোঁজে এসেছিলেন। এই চিঠিটা রেখে গেছেন।"

নবকিশোর উপরে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া চিঠিটা পড়িল। বিরাট পণ্ডিতের চিঠি।

মহাপুরুষেষু,

জরি হঠাৎ কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। আপনি কোনও খবর জানেন কি ? দয়া করিয়া কাল যদি আমার বাড়িতে পদধূলি দেন কৃতার্থ হইব। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীবিরাটেশ্বর শর্মা

॥ ছয় ॥

সকালে উঠিয়াই নবকিশোর এজরা হাসপাতালে গেল। জরির অন্তর্ধানে উৎসাহের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে তাহা প্রথমে জানিয়া তাহার পর বিরাট পণ্ডিতের সহিত দেখা করা উচিত এই কথাটাই যুক্তিযুক্ত মনে হইল তাহার। আর একটা কথাও মনে হইতেছিল। ইহাদের কাছে জরির প্রসঙ্গ তোলা কি আদৌ উচিত

হইবে? জরির অনুরোধ মনে পড়িল—তুমি কথাটা গোপন রেখো। তুমি ছাড়া একথা আর কেউ জানে না। ইহাদের সহিত তাহার পরিচয় আকস্মিক। উৎসাহ, বিরাটেশ্বর, জরি, অতুল, গাট্টা—ইহাদের কাহাকেও তো সে চিনিত না। আশ্চর্য, হঠাৎ ইহারাই এই মুহূর্তে তাহার জীবনে প্রধান আকর্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রবলতম আকর্ষণ জরি। অথচ জরির সে কতটুকু জানে? তাহার অনুরোধ রক্ষা করিবার কি বাধাবাধকতা আছে তাহার? এই সব প্রশ্ন নিজের অজ্ঞাতসারেই সে নিজেকে করিতেছিল কিন্তু জ্ঞাতসারে যে উত্তরটা তাহার মনে সজাগ ছিল তাহা এই—জরির অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না। তাহার জীবনে এতদিন কোনও রোম্যান্টিক ঘটনা ঘটে নাই, প্রমীলাকে ঘিরিয়া তাহার যে স্বপ্ন তাহা নিতান্তই বাঁধাধরা নীতি-সম্মত স্বপ্ন, তাহাতে কোনও শিহরণ, উন্মাদনা বা অনিশ্চয়তা নাই! ইহা লইয়াই সে এতদিন সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু প্রত্যেক নর-নারীর মনের নিভৃততম প্রদেশে রোমান্স-লোলুপ যে বাসনাটি থাকে, নানা মনে তাহার নানা রূপ। নবকিশোরের মনে তাহা যেন একটি শূন্য ঘরের রূপ-পরিগ্রহ করিয়া দৃষ্টির অগোচরে ছিল এতদিন—গভীর অরণ্যের মধ্যে লতা-গুল্ম-পরিবৃত নির্জন ঘর একটি। সেই ঘরে হঠাৎ একটা বনাহরিণী সহসা ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, সহসা আবার পলাইয়া গেল। শিকারীর দল তাড়া করিয়া আসিতেছে। হরিণী কোন্ দিকে গেল তাহা সে বলিয়া দিবে কি? বলিয়া দেওয়া কি উচিত? খুব স্পষ্টরূপে না হইলেও এই ধরনের একটা ছবি তাহার অবচেতনলোকে ফুটি-ফুটি করিতেছিল। উৎসাহ যদি জরির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাহা হইলে কি করিবে সে। ইহাই ভাবিতে ভাবিতে একটু বিপন্নভাবেই সে এজরা হাসপাতালে প্রবেশ করিল। গিয়া যাহা শুনিল তাহাতে সে আরামও পাইল, বিস্মিতও হইল। উৎসাহ না কি রিস্‌ক্ বণ্ডে (Risk bond) সহি করিয়া হাসপাতাল ত্যাগ করিয়াছে। একটু আগেই চলিয়া গিয়াছে সে।

নার্স কিং বলিল—"Your friend was very adamant about it. He didn't care even to listen to Dr. Ghosh's advice." তাহার পর হাসিয়া বলিল—"But I liked him for it. He didn't feel quite at home here."

[তোমার বন্ধুটি ভারি একগুঁয়ে। ডাক্তার ঘোষের কথাও সে শুনল না। ...কিন্তু এইজন্যেই ওকে আমার ভাল লেগেছে। বেচারা এখানে স্বস্তি পাচ্ছিল না]

"কোথায় গেছে তা জান?"

"না। He just walked out".

খানিকক্ষণ পরে ইমার্জেন্সি-রুমের ও. ডি. (O. D.) ডাক্তার পুলিন মিত্রের সহিত দেখা হইয়া গেল নীলমণির চায়ের দোকানে।

"কি হে তোমার বন্ধুটির খবর কি। সে শুনছি একটি খলিফা ছেলে। নগেনবাবুর মতো কড়া লোককেও বশীভূত করে ফেলেছে।"

"কি রকম—"

"তাঁর মুখ দেখে আর হাত দেখে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তা নাকি ওয়াণ্ডারফুল। নগেনবাবু কাল বলছিলেন। সে নাকি বলেছিল সাতদিনের মধ্যেই আপনার চাকরির উন্নতি হবে। হয়েছে। বলেছিল—এই মাসের মধ্যেই আপনার

মেয়ের জন্য সুপাত্র পেয়ে যাবেন। পেয়েছেন। আমাকে একবার তার কাছে যেতে হবে। কি রকম আছে ছোকরা, খবর নিয়েছিলে?"

"সে চলে গেছে আজকে 'রিস্‌ক্‌ বণ্ডে' সই করে।"

"তাই নাকি! 'রিস ক্‌ বণ্ডে' সই করে?"

"হ্যাঁ, তাই শুনলাম এখনি গিয়ে। খামখেয়ালী ছোকরা, আমার সঙ্গে আলাপও হয় নি তেমন। সেদিন স্টেশনেই প্রথম আলাপ। এদিকে বেশ বিদ্বান, এম. এসসি. পাস। আমাকে বলছিল—টিউশনি জুটিয়ে দিন। বি. এসসি ক্লাসের ছেলেকেও পড়াতে পারব।"

"গরীব না কি—"

"আমি ওর ঠিকানাটা জানি, আর বিশেষ কিছু জানি না। ভাবছি আজ বিকেলের দিকে আর একবার যাব ওর খোঁজে। হঠাৎ চলে গেল কেন এমনভাবে—"

"আমার এক আত্মীয় তাঁর ছেলের জন্য ভালো গার্জেন টিউটার খুঁজছেন। ছেলেটি আই. এস-সি পড়ে—"

নবকিশোর একটু অবাক হইল।

"যে ছেলে আই এস-সি পড়ে তার জন্যে গার্জেন টিউটার কেন?"

"প্রথম কারণ ছেলেটির পিতামাতা উভয়েই প্রগতিবাদী। সব সময় সমাজের এবং সংস্কৃতির উন্নতি করবার জন্য বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান। ছেলের দিকে নজর দেবার সময় পান না। দ্বিতীয় কারণ—বড়লোক। তোমার বন্ধু যদি রাজী থাকে বলে দেখতে পারি। থাকবার জন্যে আলাদা ঘর পাবে, খাওয়া পাবে, তাছাড়া মাইনে একশ টাকা।"

"বলব। কিন্তু গার্জেন টিউটারি করে মেডিকেল কলেজে পড়া চলবে কি—"

"চলা উচিত নয়। বলে দেখতে পারি তাদের, কিন্তু অন্‌ ওয়ান কণ্ডিশন। আমার হাত আর কুষ্ঠি ভাল করে দেখে দিতে হবে।"

"বলব ওকে। আপনিও কুষ্ঠিতে বিশ্বাস করেন না কি—"

"দেখ ভাই, যত বয়স বাড়ছে ততই বুঝতে পারছি নিজের কিছু করবার সামর্থ্য নেই আমাদের। আমি জানি সার্জারির আমি কিছু জানি না, কিন্তু কাল যখন সাহেব আমার পিঠ চাপড়ে বললে—ও পুলিন, ইউ ডীড্‌ এ নীট্‌ বিট্‌ অব্‌ সার্জারি—তখন বড় মিষ্টি লাগল। যদিও কালকের সেই স্ট্র্যাংগুলেটেড্‌ হার্নিয়া কেসটা আজ পটল তুলেছে আমার নীট্‌ বীট্‌ অব্‌ সার্জারিকে কলা দেখিয়ে—তবু মিষ্টি লাগল সাহেবের কথাগুলো। নিজের কানাপুতকে কেউ যদি পদ্মলোচন বলে, ভারি ভালো লাগে। কুষ্ঠি দেখাতে যাই ওই আশায়। যদি কেউ দুটো মিষ্টি কথা শোনায়। হরু জ্যোতিষীটা পাষণ্ড। কুষ্ঠি দেখে পট্‌ করে বলে দিলে আপনার মেয়ে বিধবা হবে। তার নিজের তিন তিনটে মেয়ে বিধবা কি না, তাই আর কারো মেয়ে সধবা আছে এটা সে সহ্য করতে পারে না। অনেক জ্যোতিষী পরশ্রীকাতর জান? ভাল জিনিস দেখতে পায় না, কিংবা দেখতে পেলেও বলতে চায় না। তোমার বন্ধুটির কেমন ধরন-ধারণ? মিষ্টিকথা শোনাবে দু'চারটে?"

"কি জানি। আমি কিছুই বিশেষ জানি না ওর সম্বন্ধে। আচ্ছা সার চলি। আটটা বেজে গেছে। ওআর্ডে যেতে হবে।"

"কার ওআর্ডে ?"

"বার্নাডো সাহেবের।"

"নটা দশটার আগে তিনি আসবেন না। তুমি আরও ঘণ্টাখানেক স্বচ্ছন্দে আড্ডা দিতে পার। সাহেব চুটিয়ে প্র্যাকটিস করছে আজকাল। নীলমণি, ডবল ডিমের ওমলেট দাও আমাকে। তুমি খাবে ?"

"না থাক"—সলজ্জ হাসি হাসিয়া নবকিশোর প্রতিবাদ করিল।

"থাক কেন! যা যেখানে পাবে হামড়ে খেয়ে নেবে তবে না যুঝতে পারবে। বাঁচা মানে লড়াই, ডারবিন সাহেব বলে গেছেন। ডাক্তার হ'তে যাচ্ছ, ডাক্তারি মানেও ওই. যা যেখানে পাবে হামড়ে নিয়ে নেবে। লজ্জা, বিনয়, ভদ্রতা ওসব পোস্টাফিসে জমা করে রেখে দাও। যখন অসমর্থ হ'য়ে পড়বে তখন কাজে লাগবে। নীলমণি, আর একটা ডবল ডিমের ওমলেট। ওহে, একটা সুখবর আছে, উইলসন সাহেবের ওআর্ডে বদলি হয়েছি"—বাম চক্ষুটা ঈষৎ কুঁচকাইয়া বলিলেন—"অনেক 'কল' খাইয়েছিলাম সাহেবকে। ফল ফলেছে—"

ওয়ার্ডে গিয়া নবকিশোর দেখিল ডাক্তার মিত্রের কথাই সত্য। বার্নাডো সাহেব তখনও ওয়ার্ডে আসেন নাই। নবকিশোরের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। অন্যমনস্ক হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একটা কথাই সে মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল বিরাট পণ্ডিতের বাড়ি সে এখনই যাইবে, না সন্ধ্যার পর।

॥ সাত ॥

সন্ধ্যার পর খাওয়াদাওয়া শেষ করিয়া সে বিরাট পণ্ডিতের বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল। মেস হইতে বাহির হইয়াই খালি ট্রাম পাইয়া গেল একটা। ছুটিয়া গিয়া সেকেণ্ড ক্লাসেই চড়িয়া বসিল। পিছনের দিকের বেঞ্চটা খালি ছিল। বেঞ্চের এককোণে বসিয়া তাহার মনে হইল ক্যাপ্টেন কুক, ডাক্তার লিভিংস্টোন, কলম্বাস প্রভৃতি মহারথীর মতো সেও যেন একটা দুর্জয় অভিযানে চলিয়াছে। রুষ্ট বিরাট পণ্ডিতের সম্মুখীন হইবার পর কি যে ঘটিবে তাহা অনিশ্চিত। ঠিক করিল প্রথমে অতুলের সহিত দেখা করিতে হইবে। ও বাড়ির আবহাওয়ার খবরটা সে-ই ভালো দিতে পারিবে। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সামনেই নামিয়া পড়িল। দেখিল বহুলোক সেখানে জোড়-হস্তে দাঁড়াইয়া আছে, অনেকে প্রণাম করিতেছে। ধূপধুনার গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। পুরোহিত মহাশয় সম্ভবত আরতি করিতেছেন। নবকিশোরও দাঁড়াইয়া পড়িল। হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিতে করিতে যে প্রার্থনা সে করিল তাহা যেন নির্বাক হইয়া তাহার মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল, এইবার বাঙ্ময় হইল। অস্ফুটকণ্ঠে নবকিশোর বারবার বলিতে লাগিল—মা, জরির মনের বাসনা যেন সফল হয়। তার সবুজ স্বপ্নটা যেন বেঁচে ওঠে। বড় দুঃখী সে। প্রার্থনা শেষ করিয়াই তাহার মনে হইল কেন এসব করিতেছে সে। তাহার প্রার্থনার কি মূল্য আছে ? জরিই বা তাহার কে। একটু অপ্রস্তুত হইয়াই সে পথ চলিতে লাগিল। এতদিন সে যে বাঁধা-ধরা পথে চলিয়া আসিয়াছে সে পথে

কোনও মনস্তাত্ত্বিক খানা-খন্দ ছিল না, নেপথ্যবাসিনী প্রমীলা ছাড়া আর কোনও নারীরও ছায়া পড়ে নাই সে পথে। এখন এ কি হইল? জরির শারীরিক ছায়াটা অবশ্য সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু স্মৃতির ছায়া যে গাঢ়তর হইল। একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিল নবকিশোর।

অতুলের দোকানের সামনে আসিয়া দেখিল অতুল নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া একটা মোটা বই পড়িতেছে। নবকিশোরকে দেখিয়া সে বইটি মুড়িয়া রাখিল এবং হাসিমুখে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

"আমি জানতাম আপনি আসবেন। আসুন—"

সামনেই কয়েক খিলি পান সাজা ছিল, তাহার একটি সে সসম্ভ্রমে তুলিয়া ধরিল। নবকিশোর আপত্তি করিল না। সে বুঝিয়াছিল আপত্তি টিঁকিবে না। অতুল তাহার পর একটি সুদৃশ্য কৌটা হইতে তুলা এবং একটি সরু কাঠি বাহির করিয়া ছোট একটি তুলি প্রস্তুত করিল এবং পাশের তাক হইতে একটি চমৎকার আতরের শিশির ছিপি খুলিয়া তুলিতে একটু আতর মাখাইয়া হাসিমুখে তুলিটি নবকিশোরের দিকে বাড়াইয়া দিয়া আবার বলিল—"আসুন—"

"কি ওটা।"

"গোলাপী আতর! খুব ভালো নয়, কিন্তু এর চেয়ে ভালো আতর কলকাতা শহরে এখন পাওয়া যাচ্ছে না। নাকের কাছে একটু লাগিয়ে নিন। তারপর তুলোটা গুঁজে রেখে দিন কানে। চিত্ত প্রফুল্ল থাকবে। চিত্তটা প্রফুল্ল থাকা দরকার—"

নবকিশোর তুলিটা লইয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আপনার কাণ্ডকারখানাই আলাদা দেখছি।"

অতুল সবিনয়ে হাসিমুখে বলিল, "এটা আমার দ্বিতীয় পরিচয়ের সওগাত। যদি পরিচয় গাঢ়তর হবার সৌভাগ্য হয় তাহলে আরও নতুন রকম কিছু ভেট দেবার ইচ্ছা রইল!"

"সেটা আবার কি রকম হবে—"

"আমার যে-সব বই ভালো লেগেছে তাই একে একে আপনাকে দেব, যদি আপনার পড়ার ঝোঁক থাকে।"

"আপনি খুব পড়েন বুঝি—"

"এই দোকানে বসে যতটা পারি—"

"দোকানে? এখানে অনেকক্ষণ থাকেন বুঝি।"

"সব সময়ে বসে আছি। ভোর পাঁচটায় খুলি, রাত্রি বারোটা পর্যন্ত খুলে রাখি—"

"খেতে যান না?"

"পাশের হোটেল আমার স্নানাহারের ভার নিয়েছে। আমার আপন লোক নেই কেউ। রাত্রে বাড়িতে শুতে যাই। সেখানে তেতলার উপর ঘর আছে একখানা, বাইরে থেকে সিঁড়ি আছে। চুপি চুপি উঠে যাই। ভাড়াটেদের জাগাতে হয় না।"

"পানের দোকান নিয়েই থাকেন সমস্ত দিন? আশ্চর্য তো। জরি বলছিল আপনি পণ্ডিত লোক—"

অতুলের চোখের কোণে কৌতুকছটা চকচক করিয়া উঠিল।

"জরিদি আমাকে স্নেহ করেন তাই ওসব বলেছেন। জরিদি'কে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, শুনেছেন ?"

"সেই শুনেই তো আসছি। উৎসাহও চলে এসেছে হাসপাতাল থেকে। বাড়ি এসেছে তো ?"

"আমি যতদূর জানি, আসে নি। গাট্টা একটু আগে এসেছিল, তার মুখ থেকেই শুনলাম। বিরাট পণ্ডিত ভিতরের ঘরে চোখ বড় বড় করে বসে আছেন নাকি গুম হ'য়ে। সন্ধ্যে থেকে কারো সঙ্গে দেখা করেন নি। অনেক লোক এসেছিল, সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার সঙ্গেও হয়তো দেখা করবেন না !"

"আমাকে উনি ডেকেছেন।"

"তাহলে যান। আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। বড়ই রহস্যময় পরিবেশ ঘনিয়ে উঠল। রোজ এমনটা ঘটে না। যাবার সময় আমাকে খবরটা দিয়ে যাবেন কি হ'ল ! আমি ততক্ষণ বইটা পড়ি বসে বসে—"

"কি বই ওটা—"

"ডন্ কুইক্সোট্ (Don Quixote)—ঠিক উচ্চারণটা জানি না। পড়েছেন এ বই ?"

"স্কুলে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পড়েছিলাম—এ বই পড়ছেন যে হঠাৎ এখন।"

"জরিদি'র কথা মনে করে। ওরা কেউ জানে না কিন্তু আমি জানি জরিদিও ডন্ কুইক্সোট্। ডন্ কুইক্সোট্ নিজের কল্পিত আদর্শের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে ছুটে বেড়িয়েছিল নানারকম অ্যাডভেনচারের (adventure) পিছু-পিছু। আমাদের কাছে তা অনেক সময় হাস্যকর, অনেক সময় অদ্ভুত, অনেক সময় করুণ—কিন্তু ডন্ কুইক্সোটের চোখে তা একটিমাত্র আদর্শের রূপ নিয়ে মূর্ত হয়েছে সর্বদা—বীরত্বের আদর্শ। এর জন্যে সে অনেক দুঃখ সয়েছে কিন্তু আদর্শচ্যুত হয়নি। জরিদির ব্যাপারও অনেকটা সেইরকম। উনিও অনেক রকম বিপদ বরণ করেছেন, অনেক রকম ঝামেলায় জড়িয়েছেন নিজেকে, আমাদের মাপকাঠি দিয়ে মাপতে গিয়ে আমরা সে সবের মানে বুঝতে পারি নি। আমার বিশ্বাস উনিও একটা বড় আদর্শের জন্যেই এ সব করছেন যদিও সেটা কি তা মাথায় ঢোকে নি এখনও। জরিদির কথা মনে হচ্ছিল বলেই বইটা আবার পড়ছিলাম—"

নবকিশোর বলল—"জরিদি'র চেয়েও আপনি আমাকে বেশী অবাক করেছেন। আপনার মতো বিদ্বান্ লোক পানের দোকানে বসে—"

"কোর্টে এজলাসে গাউনটাউন পরে গিয়ে বসলে বেশী ভালো হ'ত বলছেন ? হয় তো হ'ত। কিন্তু ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি। আমার এই বেশ ভাল লাগে। এই দোকানে বসে বসে, কত রকম লোকই যে দেখি, কত রকম কথাই যে শুনি। আকাশে সূর্য চন্দ্র তারার মিছিল আর এই দোকানের সামনে মানুষের। সূর্য চন্দ্র তারা একঘেয়ে, মানুষ কখনও একঘেয়ে হয় না। খাশা আছি। এ দোকান না থাকলে কি আপনার নাগাল পেতুম ? একবার একজন কবি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটা ছোট্ট কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। দেখবেন ?"

অতুল একটি সুদৃশ্য বাঁধানো খাতা বাহির করিল।

"এই দেখুন। এটা অটোগ্রাফের খাতা। আমি বিখ্যাত লোকের অটোগ্রাফ সংগ্রহ

করি না। এতে যাদের হাতের লেখা আছে তাদের কেউ চেনে না। এই প্রথম পাতাটা দেখুন।"

নবকিশোর দেখিল আঁকাবাঁকা বড় বড় হরফে লেখা আছে—"আমার নাম ভুঁদি। ভালো নাম সবিতা।"

"এ রকম অনেক আছে। আপনাকে কবিতাটা দেখাই।"

খাতাটার পাতা উলটাইয়া উলটাইয়া অতুল অবশেষে একটা পাতায় আসিয়া থামিল।

"এই দেখুন—"

নবকিশোর দেখিল সবুজ কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

পথের পাশে ছোট্ট দোকান
দু'চার কথা এ-কান ও-কান
হঠাৎ পাওয়া হাসির গমক
ছুটকো গানের গিটকিরি
ঢেউ লাগছে সুখের দুখের
চলছে মিছিল চলতি মুখের
পানের দোকান প্রাণের দোকান
নানান্ ছিটের ছিট্‌কিরি।

—পথিক

"বাঃ, চমৎকার কবিতা। কবির নাম পথিক নাকি?"

"জানি না। প্রথমে নাম লেখে নি। বলাতে শেষে 'পথিক' লিখে দিলে। এখনও ওর আসল নাম কি জানি না। আমার দোকানে মাঝে মাঝে আসতো। কিমাম দিয়ে পান খেতে ভালবাসত খুব। ওর জন্যে ভাল কিমাম সংগ্রহ করে রেখেছি। অনেকদিন আসে নি। কি জানি পথিক কোথায় চলে গেছে।"

একটু থামিয়া অতুল বলিল—"যাক্। যাওয়াটাই তো নিয়ম। তার একটা পদচিহ্ন ধরে রাখতে পেরেছি এই আনন্দেই মশগুল হ'য়ে আছি। জরিদিও কোথায় চলে গেল কে জানে। আপনি যান, বিরাট পণ্ডিতের হালচালটা কি জেনে আসুন। জরিদি'কে টাকা দিয়েছিলাম বলে আমাকে তো পণ্ডিত মারতে বাকি রেখেছেন খালি। অদ্ভুত লোক, ভয়ঙ্কর লোক, অথচ কী বিদ্বান্, হেন বিষয় নেই যে জানেন না—"

"জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস আছে আপনার?"

"জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা জানি না। কিন্তু এটা জানি যে বিরাট পণ্ডিত বা বলে দেন তা ফলে যায়। কোন্ শাস্ত্র পড়ে বলেন তা জানি না, সবাইকে উনি বলেনও না, কিন্তু যা বলেন তা নির্ঘাৎ। আমার কুষ্ঠি এক নজর দেখে বলেছিলেন তোর মাতুল বংশ ধ্বংস হ'য়ে যাবে। সত্যি ধ্বংস হ'য়ে গেল। দিন কুড়ি আগে মাতুল বংশের শেষ প্রদীপটি নিবে গেছে। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বসে আছি—"

"আপনি অপ্রস্তুত কেন। আপনার দোষ কি—"

"আমি তাদের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী যে। আসুন।"

অতুল আর এক খিলি পান তুলিয়া ধরিল।

"পান খাওয়া আমার তেমন অভ্যাস নেই!"

"অভ্যাস করুন। দু'একটা নেশা থাকা ভালো। জীবনটাকে যদি সেতার-বাজনার সঙ্গে তুলনা করেন তাহ'লে এই ছোটখাটো নেশাগুলো চিকারির ঝঙ্কারের মতো ভারি মিষ্টি লাগে। কাশীর ভাল জর্দাও আছে আমার কাছে। নেবেন একটু ?"

"না থাক। আমি চলি এবার—"

"আচ্ছা ওদের যদি কোন খবর পান আমাকে বলে যাবেন। কেমন ?"

"আচ্ছা।"

বিরাট পাণ্ডতের বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড একটা পুলিস ভ্যান দাঁড়াইয়াছিল। বৈঠকখানার কপাটটা খোলা ছিল। নবকিশোর শুনিতে পাইল বিরাট পণ্ডিত কাহার সঙ্গে যেন কথা কহিতেছেন। শুনিতে পাইল বিরাট পণ্ডিত বলিতেছেন—"আপনি সন্ধান পেয়েছেন সে মাগীর ?"

একটু ইতস্তত করিয়া নবকিশোর অবশেষে ঢুকিয়া পড়িল।

"আসুন, আসুন মহাপুরুষ, আপনারই অপেক্ষা করছি। ইনি একজন বড়ো পুলিস অফিসার। আমাকে সর্বদাই অনুগ্রহ করেন। জরি তো পালিয়েছেই, উচ্ছেও পালিয়েছে হাসপাতাল থেকে। আপনি কিছু জানেন কি।"

"না। আমি আশ্চর্য হ'য়ে গেছি। জরি অবশ্য কাল রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। বলেছিল কোথায় না কি একটা চাকরি পেয়ে সে বাইরে চলে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি জিগ্যেস করলাম, কোথায় চাকরি পেয়েছ। বলল, তা বলব না। তারপর চলে গেল। আর তো কিছু জানি না।"

পুলিস অফিসারটি প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় আপনাদের দেখা হয়েছিল—"

"আমার মেসের সামনেই কলেজ স্কোয়ার। সেখান থেকেই জরি ডাকছিল আমায়। আমি কলেজ স্কোয়ারেই তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম।"

"তখন ক'টা হবে ?"

"সন্ধ্যার খানিকক্ষণ পরে। ঠিক সময়টা বলতে পারছি না, দশটা আন্দাজ হবে—"

কথাটা বলিয়াই নবকিশোর একটু অস্বস্তি বোধ করিল। কারণ সে জানিত বারোটার পর তাহার সহিত জরির দেখা হইয়াছে। মিথ্যা কথা বলিতে সে অভ্যস্ত নহে। তাহার খারাপ লাগিতে লাগিল। কিন্তু আরও মিথ্যাভাষণ তাহাকে করিতে হইল।

পুলিস অফিসার আবার প্রশ্ন করিলেন—"কতক্ষণ আপনারা দু'জনে ছিলেন একসঙ্গে—"

"বেশীক্ষণ নয়। মিনিট দশেক—"

"তারপর কি হ'ল—"

"তারপর জরি একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে গেল—"

কোন্‌দিকে গেল।"

"তা ঠিক বলতে পারব না। ট্যাক্সিটা হ্যারিসন রোডের দিকে চলে গেল।"

পুলিস অফিসার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিলেন—"এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আমি যতটা পারি চারদিকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। তার ফোটো আছে ?"

"না।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুলিস অফিসার সহাস্যে বিরাট পণ্ডিতকে প্রশ্ন করিলেন—"ওর কুষ্ঠি দেখেছিলেন আপনি ?"

"দেখেছিলাম। কুষ্ঠি থেকে মনে হয় ও আর ফিরবে না। কিন্তু তা বলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকলে তো চলবে না। ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে হবে।"

"নিশ্চয়। চেষ্টা করব। আমার মেয়ের কুষ্ঠিটা দেখবার সময় পেয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ। ওর এখন বিয়ে দেবেন না। আর ভালো চুনী পরিয়ে দিন একটা। আমিই দেব এখন। ভালো চুনী আছে আমার কাছে। খুঁজে বার করতে হবে। পেলে আপনাকে খবর দেব।"

"আচ্ছা। উৎসাহবাবুর সম্বন্ধে কি করব।"

"তাকে ওই মাগীর কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে। ও সাংঘাতিক মেয়েমানুষ, শ্মশানে-মশানে বেড়ায়, ওর পাল্লায় পড়ে ছোকরা উচ্ছন্ন গিয়েছিল দিনকতক। বি. এস-সিতে ও ফার্স্ট হ'ত কিন্তু ওর প্যাঁচে পড়ে সাধনা আরম্ভ করে দিলে পড়াশোনা ছেড়ে—"

"উৎসাহবাবু কিন্তু স্পষ্টই বললেন তিনি এখানে ফিরে আসতে চান না।"

"আসতেই হবে। ওর মায়ের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি যে ওকে মানুষ করব। ওর মা বেঁচে থাকলে সে-ই ওকে সামলাত, কিন্তু সে আমার হাতে ওকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজেছে, আমি ওকে একটা ডাকিনীর কবলে দেখে চুপ করে বসে থাকব কি করে! আপনি এর একটা ব্যবস্থা করুন যেমন করে হোক—"

পুলিস অফিসার বলিলেন—"চেষ্টা করব। কিন্তু কথা কি জানেন, উৎসাহবাবু নাবালক নন, উনি আইনত কোন দোষও করেন নি, তাই ঠিক আমাদের এলাকার মধ্যে পড়ছেন না। তবু দেখি চেষ্টা করে। একটা কথা কিন্তু বলব, যদিও ওঁর উপর আপনার রাগ খুব, ওই শ্মশানভৈরবীকে দেখলে কিন্তু ভক্তি হয়। একেবারে মাতৃ-মূর্তি। উনিও উৎসাহবাবুকে বার বার অনুরোধ করলেন ফিরে আসতে, কিন্তু উৎসাহবাবু ফিরতে রাজি নন! জোরজবরদস্তি করবার স্কোপ নেই, ওঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে।"

"মাগী ওকে জাদু করেছে। আপনাকেও করেছে মনে হচ্ছে। বিপদ যখন ভয়ঙ্কর রূপ ধরে আসে তখন তা তত বিপজ্জনক নয়, কারণ তার ভয়ঙ্কর রূপই মানুষকে সাবধান করে দেয়। কিন্তু সে যখন মনোহর মূর্তি নিয়ে আসে তখনই সর্বনাশ। তখন মানুষ মুগ্ধ হয়, স্বেচ্ছায় গলা বাড়িয়ে দেয় অদৃশ্য হাড়কাঠে। উঃ কি কুক্ষণেই আমি ওকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলাম। দিয়েছিলাম কারণ আমিও মুগ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু দু'দিন পরেই দেখলাম, ও বাবা! এ একেবারে জাতসাপ। ঠাকুমার গল্পের সেই 'রূপ-তরাসী'। সঙ্গে সঙ্গে বিদেয় করে দিলাম, কিন্তু তখন উৎসাহের মুণ্ডুটি ঘুরে গেছে—"

হঠাৎ বিরাট পণ্ডিত থামিয়া গেলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সামনের দেওয়ালটার দিকে চাহিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর পুলিস অফিসারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওকে উদ্ধার করতেই হবে। আপনি বন্ধুলোক, তাই আপনাকে এই কষ্টটুকু দিচ্ছি—"

"আমি যথাসাধ্য করব, যথাসাধ্য করব, সারটেনলি। এখন কিন্তু উঠি। আপনার ফোন পেয়ে কাজ ফেলেই চলে এসেছি—। আমি আবার যাব উৎসাহবাবুর কাছে—"

"আচ্ছা।"

পুলিস অফিসার বিরাট পণ্ডিতকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বিরাট পণ্ডিত তখন নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মহাপুরুষ, আপনাকেও চেষ্টা করতে হবে। উচ্ছের যখন আপনাকে ভাল লেগেছে—"

"আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন—"

"মহাপুরুষকে তো 'আপনি'ই বলা উচিত। পুলিস অফিসারের কাছে আপনি যে ছোট্ট মিছে কথাটা বললেন তাতে মনে হ'ল আপনি সত্যিই মহাপুরুষ। জরির কাছে যে প্রতিশ্রুতিটা দিয়ে এসেছিলেন সেটা রক্ষা করলেন। প্রতিশ্রুতি-রক্ষা করাই তো মনুষ্যত্বের লক্ষণ। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার জন্যে দশরথের মতো পুণ্যবান রাজাও রামের মতো ছেলেকে বনবাসে দিয়েছিলেন।"

বিরাট পণ্ডিত স্থির কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নবকিশোরের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল সে। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল সে যে মিথ্যা কথা বলিয়াছে তাহা বিরাট পণ্ডিত জানিলেন কিরূপে? তবে কি সুখদেও ফিরিয়া আসিয়া সব কথা তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছে? তবে কি জরি একাই হাঁটিতে হাঁটিতে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে? হঠাৎ নবকিশোর মনস্থির করিয়া ফেলিল।

"আমি মিথ্যে কথা বলেছি তা কি করে জানলেন?"

"আমি জরিকে তার জন্ম থেকে জানি যে। ও আপনাকে কলেজ স্কোয়ার থেকে ডেকে দশমিনিটের মধ্যে ছেড়ে দেবে এটা অবিশ্বাস্য। তাছাড়া আপনি কথাটা যখন বলছিলেন তখন আপনার চোখের পাতার কাঁপন আর আপনার অপ্রস্তুত মুখভাব দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম আপনি সত্যটা ঢাকছেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন। খুব ভালো কাজ করেছেন। ওতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। পুরাণ উলটে দেখবেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার জন্যে কি কাণ্ডটাই না করেছেন।"

তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন—"প্রতিশ্রুতির সিন্দুকে আমিও অনেক সত্যকে চাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখেছি। ওটা দোষের কিছু নয়। ভদ্রলোকরাই করে। আমার দুঃখ জরির মতো অসাধারণ মেয়েকে এত কষ্ট করে বড় করলুম, কিন্তু সে কাছে রইল না। অমাবস্যার গর্ভ থেকে চাঁদকে এনে লালন করলুম, কিন্তু পূর্ণিমা হওয়ার আগেই সে অস্ত গেল। উচ্ছেও মনে হচ্ছে থাকবে না। ওরা থাকে না। তীর্থের কাক কিনা, পূজারী তো নয়। ডানা আছে উড়ে উড়ে বেড়াতে চায়। তীর্থে তীর্থে ঘুরে, চেখে চেখে দেখতে চায় আরও ভালো কিছু পাওয়া যায় কি না। অনেক লোক ক্রমাগত গুরু বদলায়, অনেক ছাত্র প্রাইভেট টিউটার বদলায়, কলেজ বদলায়, অনেক স্ত্রী স্বামী বদলায়, অনেক স্বামী স্ত্রী বদলায়, ভাড়াটেরা বাড়ি বদলায়, বাবুরা জামা জুতো বদলায়, ফ্যান বদলায়, কিন্তু এত করেও শেষ পর্যন্ত লাভ কিছুই হয় না। দেখা যায় কাক কাকই আছে, ময়ূরও হয় নি, বুলবুলিও হয় নি। অনেক ঘাটের জল খেয়ে তবে আমি এ সত্যটা বুঝেছি। ওরাও বুঝবে। কিন্তু ওদের আমি এমনি ছেড়ে দেব না। জরিকে খুঁজতে হবে, উচ্ছেকে আবার ধরে আনতে হবে। আনতে হবে ওদের

জন্য নয়, আমার নিজের জন্য। আমার পুরুষকারকে সার্থক করবার জন্য। আমি কুষ্ঠি নিয়ে ব্যবসা করি বটে কিন্তু নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করি না। আমি মানুষ, আমি যোদ্ধা. আত্মসমর্পণ যদি করতেই হয় যুদ্ধে হেরে গিয়ে তবে করব—তার আগে নয়। আপনার সাহায্য পেতে পারি কি।"

"কি সাহায্য বলুন। জরি কোথায় গেছে আমি জানি না, এর বেশী আমি আর কিছু বলতে পারব না।"

"আমি জানতেও চাই না। পুলিশ তাঁর খোঁজ করুক। আপনি উচ্ছের কাছে যান, তাকে বুঝিয়ে বলুন যে অত তম্বির করে তাকে মেডিকেল কলেজে ঢোকালুম, ওই হারামজাদির পাল্লায় পড়ে সে কি সব জলাঞ্জলি দেবে? কুম্ভক, শবসাধনা এসব করার কোনও মানে হয় পড়াশোনা ছেড়ে? জ্যোতিষ শিখতে চাও আমার কাছেই শেখ না, শিখেওছো তো কিছু-কিছু, কিন্তু পড়াশোনা ছেড়ে এ কি কাণ্ড। আপনি বুঝিয়ে বললে শুনবে। আপনাকে ওর খুব ভালো লেগেছে। ওই ভালো লাগার টানেই পৃথিবী চলে। আমাকে ওর ভালো লাগে না, কারণ আমি ওর অভিভাবক, ওর হিতৈষী। আমি তো মন রেখে মিষ্টি কথা বলি না, হিত-কথা বলি, তা অনেক সময় তেতো। আমার জীবনের এইটেই ট্র্যাজেডি। যদিও অবশ্য আমি ট্র্যাজেডিকে গ্রাহ্য করি না, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এই মুহূর্তে বেরিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তা যাব না, হার মানব না। আমি জানি ওদের জীবনের পরিণাম কি, কিন্তু কর্তব্যচ্যুত হব না তাবলে। যা কর্তব্য তা করতেই হবে। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন।"

"করব। উৎসাহ কোথায় আছে বলে দিন, আমি গিয়ে দেখা করব তার সঙ্গে। বুঝিয়ে বলব। কিন্তু একটা কথা বলছি আপনাকে, রাগ করবেন না তো—"

"না, রাগ করব কেন। আমার বাইরের শীর্ণ চেহারাটা, বিশেষ করে আমার নাকটা দেখে অনেকে মনে করে আমি বুঝি খুব তিরিক্ষে লোক। বাইরেটা আমার ঝুনো নারকেলের মতো হ'লেও ভিতরে কিছু শাঁস-জল আছে। কি বলতে চান নির্ভয়ে বলুন।"

"উৎসাহ বড় হয়েছে, ওর নিজেরও মতামত হয়েছে একটা। ওর মতের বিরুদ্ধে জোর করে কিছু করতে যাওয়াটা কি ঠিক? ও প্রবালের আংটি পরতে চায় না, ওর ওসবে বিশ্বাস নেই, অথচ আপনি জোর করে সেটা পরাতে চান ওকে। ওতেই ও খুব চটে গেছে। আমাকে বলছিল টিউশানি যোগাড় করে দিন, আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না—"

"বলছিল না কি। এখন তাতো বলবেই। এখন ডানা হয়েছে। উড়তে চাইবেই। যখন পাখা হয় নি, তখন বাসায় বসে খালি হাঁ করত আর আমি খাবার এনে দিতাম। শুধু দেহের খাবার নয়, মনের খাবারও। তখন গণৎকার হিসেবে আমার নাম হয় নি, কেরানীগিরি করতাম আর সেণ্ট জেভিয়ার্সের এক ঋষিতুল্য প্রফেসারের কাছে রাত্রে গিয়ে অ্যাস্ট্রনমি (astronomy) চর্চা করতাম। আয় যৎসামান্য ছিল, সেই সময় থেকে ওর ভার নিয়েছি, ওর ভালো করবার চেষ্টা করেছি, ওকে মানুষ করবার চেষ্টা করেছি—এখন উনি আমার উপর নিজের মতামত ফলাতে এসেছেন, নিমকহারাম নচ্ছার কোথাকার। প্রবাল কেন পরাতে চাইছি জানেন? ওকে মঙ্গলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। মঙ্গলই ওর মারক। জ্যোতিষশাস্ত্র যদি মানতে হয় তাহলে প্রবাল,

নীলা, গোমেদ, হীরে, চুনী—সব মানতে হবে। বিজ্ঞান বসন্তরোগের যে তত্ত্ব বার করেছে তা স্বীকার করলে টিকে-নেওয়াটাকেও স্বীকার করতে হবে। একটাকে মানব, আর একটাকে মানব না তা হয় না। হতে পারে না। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র—তা ঠিক। কিন্তু আমরা পাথর নই, মানুষ। বিরূপ ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার বুদ্ধি বিধাতাই আমাদের দিয়েছেন—"

"কিন্তু উৎসাহ বলছিল ওর কুষ্ঠি না কি ভালো। ওর গোচর ফল না কি—"

"উৎসাহ কুষ্ঠি দেখার কিচ্ছু জানে না। কিন্তু হামবড়া ভাব আছে খুব। ওতেই সর্বনাশ করেছে। হ্যাঁ ভালো কথা, আপনাকে যে নীলাটা আমি দিয়েছিলাম সেটা আপনি জরিকে দিয়েছিলেন বুঝি। জরি কোন জিনিস চাইলে 'না' বলা শক্ত তা আমি জানি। কিন্তু নীলাটা নিয়ে ও কি করেছিল জানেন? ওই পানওলা ওত্লোর কাছে সেটা রেখে তার কাছ থেকে একশ টাকা নিয়েছিল। টাকা নিয়ে বেলেল্লাগিরি করেছে সমস্ত রাত। আর সাহস দেখুন, তারপর দিন সকালে এসে আমারই কাছে খুলে বলছে সব। দুর্জয় সাহস তো মেয়েটার। না পারে হেন কাজ নেই। জোয়ান অব্ আর্ক হবার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু এ যুগের আবহাওয়ায় পচে গেল, নর্দমায় পড়ে ভেসে ভেসে চলে গেল অমন সুন্দর ফুলটা—"

বিরাট পণ্ডিত আবার হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সামনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিয়া উঠিলেন—"কুছ পরোয়া নেই। লড়ে যাব ভাগ্যের সঙ্গে। দেখি কি হয়—উই মাস্ট্ ফাইট্।"

দ্বারে পদশব্দ হইল।

"আসতে পারি?"

"আসুন।"

নবকিশোর প্রথম দিন যে ভর্ৎসিত ভদ্রলোককে কুণ্ঠিতমুখে লগুড়াহত কুকুরের মতো বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছিল তিনি দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিলেন। এবার হাসিমুখ। জুতা খুলিয়া আগাইয়া আসিলেন এবং বিরাট পণ্ডিতকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"পাথরে খুব কাজ হয়েছে। বড় ছেলের চাকরি হয়েছে একটা। এই সুখবরটা দিতে এলাম।"

"সব ঠিক হয়ে যাবে। ওইটেই এখন ধারণ করে থাকুন। আর কিছু করতে হবে না।"

"যে আজ্ঞে।"

তিনি জুতা পরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিলেন আবার।

"আমার স্ত্রী বলছিলেন ওই নীলাটা যদি দিয়ে দেন তাহলে আমি ওটা বিক্রি করে আপনাকে—"

"আপনি পান্নার দামটা দিয়ে তবে নীলাটা নিয়ে যাবেন। সাতদিনের মধ্যে যদি দাম না পাই ওটা বিক্রী করে দেব। কারণ যে জহুরি আমাকে পাথর দেন তাঁকে দামটা দিতে হবে। এ নিয়ে কোন রকম কচলাকচলি করবার আমার সময় নেই। বুঝলেন?"

"যে আজ্ঞে।"

আবার চলিয়া গেলেন তিনি।

দ্বারের দিকে একটা অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হানিয়া বিরাট পণ্ডিত বলিলেন—"মিথ্যাবাদী চামার। লোকটার দারিদ্র্যযোগ আছে। চরিত্রও তাই বলিষ্ঠ নয়। বুধ নীচস্থ কি না, তারুণ্যের কোন লক্ষণ নেই।"

নবকিশোর চুপ করিয়া রহিল। কোনও প্রকার মন্তব্য করা সমীচীন মনে করিল না।

বিরাট পণ্ডিত বলিলেন, "আপনি উচ্ছের সঙ্গে দেখা করুন। সে বউবাজারে আছে ওই ভৈরবী মাগীর বাসায়। ঠিকানা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি—"

"ভৈরবী কলকাতায় থাকে না কি—"

"হ্যাঁ, ওটা ওর স্বামীর বাড়ী। শোনা যায় ওর স্বামীর শবের উপর বসে ও নাকি শবসাধনা করেছিল। স্বামী রাত্রে হার্টফেল করে মারা যায়,—বাড়িতে আর কেউ ছিল না—ও কাউকে খবর দেয় নি। খিড়কির কপাটটা নাকি খোলা ছিল, ঠিকে দাই এসে দেখে স্বামীর বুকের উপর চোখ বুজে বসে আছে মাগী। একেবারে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। হতে পারে ঢং, হতে পারে সত্যিই সমাধিস্থ হয়েছিল। সমস্তটাই গুজব হ'তে পারে, বাংলা দেশে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টরি গুজবের। যা শুনেছি তাই বললাম। তবে যেটা জানি সেটাও বলে দিচ্ছি—মেয়েটি মোহিনী ও মায়াবিনী। বয়স কত তা আন্দাজ করা শক্ত, দেখে মনে হয় ষোড়শী। খুব সাবধান, আপনিও যেন মুগ্ধ হ'য়ে যাবেন না। জরি ওকে চিনেছিল ঠিক, জরির সঙ্গে ওর একটা সূক্ষ্ম রাইভালরিও (rivalry) হয়েছিল যেন। জরিই আমার টিকি টেনে ধরেছিল, তা না হলে আমিও ডুবছিলাম। আপনি পারতপক্ষে ওর সামনে থাকবেন না বেশীক্ষণ। উচ্ছেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কোনও পার্কে বসে কথা বলবেন।"

"আচ্ছা—"

দ্বারে কড়া নড়িল।

"আসুন—"

যিনি প্রবেশ করিলেন তাঁহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল নবকিশোর। ডাক্তার পুলিন মিত্র! কোট-প্যাণ্ট নাই, ধুতি পাঞ্জাবি পরা বাঙালী ভদ্রলোক।

"এ কি সার, আপনি!"

"নবকিশোর না কি। তুমি এখানে?"

"আমি উৎসাহের খোঁজে এখানে এসেছি। এইখানেই সে থাকে। ইনি তার গার্জেন—"

নমস্কার করিয়া ডাক্তার পুলিন মিত্র বলিলেন, "আমি এসেছি পণ্ডিত বিরাটেশ্বর শর্মার খোঁজে। তিনিও কি এখানে থাকেন? আমার নাম পুলিন মিত্র।"

"এই যে তিনি।"

পুলিন মিত্র নমস্কার করিলেন আবার।

"আপনার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি। তাই আপনার কাছে এলাম একটা সন্দেহ মেটাতে—"

"কি রকম সন্দেহ—"

"এক জ্যোতিষী আমার কুষ্ঠি দেখে বললেন আমার সদ্য-বিবাহিতা মেয়ে নাকি বিধবা হবে এক বছরের মধ্যে। শুনে থেকে মনটা বড় খারাপ হ'য়ে আছে। তাই আপনার শরণাপন্ন হলাম। আপনি একটু দেখুন তো—"

"কোন্ জ্যোতিষী একথা বলেছে।"

"হরু জ্যোতিষী—"

"গ্যাঁড়াতলার হরু জ্যোতিষী ?"

"হ্যাঁ—"

"সে একটি আকাট। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

"আমি কুষ্ঠিটা সঙ্গে এনেছি। যদি একটু দেখে দেন—"

"রেখে যান। দেখে রাখব। কুষ্ঠি দেখতে আমি সাধারণতঃ একশ টাকা করে নিই—"

"জানি সেটা—"

ডাক্তার পুলিন মিত্র পকেট হইতে কুষ্ঠি এবং মনি-ব্যাগ হইতে একশত টাকার একটি নোট বাহির করিয়া বিরাট পণ্ডিতের সম্মুখে রাখিলেন।

"আপনি উৎসাহকে চেনেন ? এই মহাপুরুষের সঙ্গে তো আলাপ আছে দেখছি।"

"আমি মেডিকেল কলেজের ওয়ার্ডে হাউস সার্জন। এরা কলেজের ছাত্র, সুতরাং আলাপ হবেই—"

"ও, আপনি মেডিকেল কলেজের ডাক্তার! মানে, এদের মাস্টার ? আপনার কাছে কোনও দক্ষিণা নেব না।"

"না, ওটা নিতে হবে। আমাদের কেউ যদি ফি না দেয় বড় রাগ হয় মনে। যদিও অনেক সময় সে রাগটা প্রকাশ করা যায় না—"

"ও, আপনি তাহলে একটি পাষণ্ড দেখছি, আমারই মতন। স্বজন লাভ করে আনন্দিত হলাম। তবে, একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না। আমরা সত্যি সত্যি কারও কিছু করি না। বিনিময়ে তার কাছ থেকে অনেক দিন ধরে অনেক কিছু আদায় করি এবং আদায় করবার প্রত্যাশা রাখি। অধিকাংশ মানুষই সে প্রত্যাশা পূর্ণও করে। অবশ্য এমন দু'একটা শৃগালও দেখা যায় যাদের বিষ্ঠাটুকুর প্রয়োজন হ'লে তাঁরা পর্বতে গিয়ে মল-ত্যাগ করে আসেন। আপনি উৎসাহ আর এই মহাপুরুষের একটু দেখা-শোনা করবেন এই প্রতিশ্রুতিটুকু শুধু প্রত্যাশা করব আপনার কাছে। টাকা চাই না। টাকাটা উঠিয়ে নিন। আপনার মেয়ে জামাইয়েরও কুষ্ঠি দরকার। মেয়ের শ্বশুরের পেলে আরও ভালো হয় "

পুলিন মিত্র কয়েক মুহূর্ত গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "নবকিশোর আর উৎসাহ আমাদের কলেজের ছাত্র হলেও তাদের দেখাশোনা করবার 'স্কোপ' আমার খুব বেশী নেই। তবু যথাসাধ্য নিশ্চয়ই করব। কিন্তু তার জন্যে আপনি আপনার প্রণামী নেবেন না এতটা আবদার করবার মতো ঘনিষ্ঠতা হয় নি এখনও আপনার সঙ্গে। আগে সেটা হোক, তারপর দেখা যাবে। আজ প্রণামীটা আপনার পায়ের কাছেই থাক। আমার মেয়ে আর জামাইয়ের জন্মকুণ্ডলীর ছক আমার ডায়েরিতে টোকা আছে। এক টুকরো কাগজ পেলে এখনই লিখে দিয়ে যেতে পারি। আমার মেয়ের শ্বশুরের কুষ্ঠিটা যোগাড় করা একটু শক্ত হবে। কুষ্ঠি আছে কি না সন্দেহ, তিনি একটু সাহেবী ধাঁচের মানুষ। তবু খোঁজ করব—"

"দরকার হ'লে হাত দেখে আমি কুষ্ঠি তৈরি করে দিতে পারব কুষ্ঠি যদি না থাকে। কি করেন তিনি—"

"তিনি একজন আই. এম. এস. ডাক্তার। দিল্লী মেডিকেল কলেজে বায়োলজির প্রফেসার। মনে হয় জ্যোতিষে তেমন আস্থা নেই। বিয়ের সময় কুষ্ঠি চান নি।"

"তিনি এখানে আসবেন কি কখনও ?"

"এসে পড়তে পারেন। আই. এম. এস. অফিসারদের ভারতবর্ষের কোথাও যেতে বাধা নেই। শুনেছি এখানে আসবার চেষ্টাও করছেন—"

"আপনার মেয়ের আর জামাইয়ের জন্মসময় আর জন্মকুণ্ডলী টুকে দিয়ে যান তাহলে এই খাতাটায়। আপনি যখন না-ছোড় তখন এবার টাকাটা নিচ্ছি, কিন্তু বারান্তরে আর দেবার চেষ্টা করবেন না। আপনার অহঙ্কারটাকে এবার একটু তৈলাক্ত করে দিলুম, কিন্তু বার-বার পারব না। আপনি দিনদশেক পরে আসবেন—"

একটি মোটা খাতায় ডাক্তার পুলিন মিত্র তাঁহার মেয়ে-জামাইয়ের জন্মকুণ্ডলী লিখিতে লাগিলেন। বিরাট পণ্ডিতও একটি কাগজে উৎসাহের ঠিকানাটা লিখিয়া নবকিশোরকে দিয়া বলিলেন—"এই ঠিকানা। এইখানে গেলেই আশা করি তার দেখা পাবেন। এখন যেতে পারবেন কি।"

"এখন ? এত রাত্রে ?"

"বেশী রাত তো হয় নি। মোটে এগারোটা। এই সময়টাই তো ভালো। নির্জন চারদিক—"

"দেখি—"

পুলিন মিত্র লেখা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"লিখে দিলাম। অনুমতি করেন তো যাই এবার।"

"আসুন। আমি ভালো করে দেখে রাখব। যদি ভয়ের কিছু থাকে তারও ব্যবস্থা করব। ঘাবড়াবার কিছু নেই।"

প্রণাম করিয়া পুলিন মিত্র নবকিশোরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এখন বসবে নাকি।"

"হ্যাঁ। ওঁর কাজ শেষ হয় নি এখনও।"

"আমি চলি তাহলে।"

পুলিন মিত্র চলিয়া গেলেন।

বিরাট পণ্ডিত নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মুখ দেখে যতটা বুঝলাম আপনার ওই পুলিন মিত্র সুবিধার লোক নন। ধূর্ত এবং সুবিধাবাদী। ওঁর সঙ্গে বেশী মেশামিশি করবেন না। আর উৎসাহের কথাও ওঁকে বলবেন না। তাই ওঁর সঙ্গে যেতে দিলুম না আপনাকে! আপনি এখুনি গিয়ে উৎসাহকে ধরবার চেষ্টা করুন। বাড়িতে ঢুকবেন না। ঢুকলে ভৈরবীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যেতে পারে, সে 'রিস্ক্' নেবেন না। গলির মধ্যে বাড়ি। আপনি বাড়ির কড়া নেড়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবেন। একটা বুড়ী চাকরাণী আছে, সে-ই এসে কপাট খুলে দেবে। ভৈরবী মাগী সাধারণতঃ দোতলা থেকে নাবে না। সে দিনরাত ধ্যানাসনে বসে থাকে না কি। কপাট খুললে আপনি বলবেন উৎসাহের সঙ্গে দেখা করব, তাকে নীচে পাঠিয়ে দাও। সে নীচে এলে তাকে বড় রাস্তায় আনবেন। আর পারেন যদি, মানে তাকে রাজী করতে পারেন যদি, একটা ট্যাক্সি ডেকে দুজনে চড়ে বসবেন তাতে। আর বোঁ বোঁ করে এখানে চলে আসবেন। এই পুলিন মিত্রের একশ' টাকা

আপনিই নিয়ে যান, যা খরচ-খরচা হয় করবেন। পরে হিসেব নেব আপনার কাছ থেকে—"

"টাকার জন্যে আটকাবে না। টাকা আছে আমার কাছে—"

"থাকলেই বা। গরজটা আমার, আপনি খরচ করতে যাবেন কেন!"

"টাকার জন্যে ব্যস্ত হবেন না—"

"মহাপুরুষরা বড়ই বেহিসাবী হন জানি সেটা। সেইজন্যেই তাঁদের সংগে কারবার করা কঠিন। আচ্ছা, বেশ,—থাক্ টাকা। আপনাকে চটাতে চাই না। আপনি দয়া করে কাজটি উদ্ধার করে দিন। ওকে যদি নিয়ে আসতে পারেন—"

"যদি না আসতে চায়, জোর তো করতে পারি না। ছোট ছেলে তো নয়—"

"ও ছোট ছেলেই। ওর দেহটাই বড় হয়ে গেছে, মনটা শিশু। ভুলিয়ে ভালিয়ে আনতে হবে। একটা টোপ ফেলতে পারেন। বলতে পারেন প্রবাল-ট্রবাল পরতে হবে না, তোমার মতেই তুমি চলো—"

তাহার পর চোখ মটকাইয়া বলিলেন—"প্রবাল পরতেই হবে বাছাধনকে। ও আসুক, ওকে কন্‌ভিন্‌স্ করে তারপর পরাব। মুশকিল কি জানেন, স্বল্পবিদ্যা আর অহঙ্কার এই দুটোর যোগাযোগ ভয়ঙ্কর। দিশি কুকুরের ল্যাজের মতন, যুক্তি দিয়ে যতই টানুন, ছেড়ে দিলেই আবার গুটিয়ে যাবে। আসুক তো, তারপর দেখা যাবে—। আপনি এনে ফেলুন ওকে এখানে। তারপর দেখা যাবে—"

"উঠি আমি তাহলে—"

"আচ্ছা। রাত্রে কিন্তু আমি উৎকর্ণ হ'য়ে থাকব।"

নবকিশোর প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অতুলের দোকান খোলা ছিল। অতুল তন্ময় হইয়া ডন্ কুইক্সোটই পড়িতেছিল। নবকিশোরকে দেখিয়া মুখ তুলিল।

"কি হ'ল? বিরাট পণ্ডিত খুব ক্ষেপচুরিয়াস না কি।"

"না ভদ্রলোক বড্ড দমে গেছেন মনে হ'ল।"

"উনি অদম্য। আপনার কাছে হয়তো দমে গেছেন এই অভিনয়টা করলেন। ভাবলেন তাতে হয়তো কাজ হবে। কি করতে বললেন আপনাকে।"

"উৎসাহকে ফিরিয়ে আনতে বললেন যেমন করে হোক। উৎসাহ নাকি সেই ভৈরবীর কাছে চলে গেছে—"

"সঙীন পরিস্থিতি। ভৈরবী স্বেচ্ছায় যদি উচ্ছেকে ছেড়ে না দেয়, আনা শক্ত হবে। উচ্ছে ভৈরবীর কেনা গোলাম। দেখুন যদি আনতে পারেন। ঠিকানা পেয়েছেন?"

"পেয়েছি। আচ্ছা, এ ভৈরবীর ইতিহাস জানেন কিছু? উনি এদের জীবনে এলেন কোথা থেকে—"

"আকাশ থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেও এমনি এক ভৈরবী এসেছিলেন। নৌকো থেকে নেবে এলেন অজানা থেকে, এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে সাধনাপথে এগিয়ে দিয়ে গেলেন মায়ের মতো। এ-ও অনেকটা সেই রকম হয়েছিল। ইনি নৌকো থেকে নাবেন নি, রিক্‌শা থেকে নেবেছিলেন। আমার এই দোকানের সামনেই নেবেছিলেন। নেবে জিগোস করেছিলেন বিরাটেশ্বর শর্মার বাড়ি কোথায়। আমিই বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছিলাম তাঁর—"

"ও। ভদ্রমহিলা কি ধরনের বলুন তো—"

"দেখলে ভক্তি হয়। অমন অতলকালো চোখের তারা আমি আর দেখি নি। চোখের দিকে চাইলে মনে হয় হারিয়ে গেলুম। রিক্‌শা-ওলা ভাড়া নিতে চাইছিল না, জানেন ? সে-ও অভিভূত হয়ে পড়েছিল। বলে দেবীজির কাছে ভাড়া নেব না। আমি বিশেষ কিছুই জানি না তাঁর সম্বন্ধে। ওই একদিনই দেখেছিলুম। বিরাট পণ্ডিতের বাড়িতে ছিলেন কিছুদিন। জরিদির মুখে শুনেছিলাম প্রত্যাদিষ্ট হয়ে উনি নাকি এসেছেন উচ্ছেকে দীক্ষা দেবার জন্যে। বিরাট পণ্ডিতও নাকি ওঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন খুব। তারপর হঠাৎ একদিন শুনলাম উনি চলে গেছেন। জরিদির সঙ্গে নাকি ঝগড়া হয়েছিল। এর বেশী আর কিছু জানি না আমি। আমি তো বাইরের লোক। তবে উচ্ছে মাঝে মাঝে এসে খুব উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠত ওঁর সম্বন্ধে। বলত আমি মাতৃহীন ছিলুম, এতদিনে মা পেয়েছি। কিছু বিভূতিও পেয়েছিল উচ্ছে ওঁর কাছ থেকে। খুব ভক্তি করে ওঁকে। আপনি চলে যান, গেলেই বুঝতে পারবেন। আসুন—"

অতুল আর এক খিলি পান তুলিয়া ধরিল।

"আপনি পানের নেশাটা ধরিয়ে ছাড়বেন দেখছি। চমৎকার পান আপনার !"

অতুল হাসিমুখে হাতজোড় করিয়া রহিল। কোন উত্তর দিল না।

"আচ্ছা, এবার চলি তবে আমি।"

॥ আট ॥

নবকিশোর সোজা বউবাজারে গেল না। নিজের মেসে গেল প্রথমে। প্রথম উদ্দেশ্য টর্চটা লওয়া, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মেসের চাকরটাকে বলিয়া যাওয়া যে তাহার ফিরিতে রাত হইবে, সে একটা দরকারী কাজে বাহিরে যাইতেছে। মেসের চাকর মিঠ্ঠু এই মেসে বহুকাল আছে। অনেক ছাত্র তাহার হেফাজতে থাকিয়া বড় বড় ডাক্তার হইয়াছে। তাহার ভাব-ভঙ্গী অভিভাবক-গোছের। নবকিশোর আজও রাত্রে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া সে স্থিরদৃষ্টিতে নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল—"রোজ রোজ রাত্রে বেরিয়ে যাওয়া ভাল নয়, বাবু। কলকাতা বড় খারাপ জায়গা। একটু আগে আপনার বড়াভাই এসেছিলেন। আমি বললাম, বাবুর নাইট ডিউটি আছে। ঝুট বাত বলে দিলাম। কিন্তু রোজ রোজ এরকম বেরিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। কাল সকালেই উনি আবার আসবেন। সাতটার সময়। তার আগে ফিরবেন তো ?"

"হাঁ, হাঁ—আমি একটু পরেই ফিরব। দাদা কি একাই এসেছিলেন ?"

"হাঁ। আমি তাঁকে বসিয়ে সিঙাড়া চা খাওয়ালাম। খেতে চাইছিলেন না। আমি জবরদস্তি করলাম, বললাম, আপনি নব্বু বাবুর বড়াভাই, এমনি এমনি চলে যাবেন তা হবে না। কিছু খেতেই হবে। কাল মাইজিকে নিয়ে আসবেন বললেন।"

"বউদি এসেছেন না কি।"

"বললেন তাই। আপনি কোথায় যাচ্ছেন চট্ ক'রে ঘুরে আসুন—দেরি করবেন না।"

"যোগেন কোথা।"

"থিয়েটার দেখতে গেছেন। খেয়ে যায় নি। আমি খাবার ঢাকা দিয়ে আগলাচ্ছি বসে। এলে গরম করে দিতে হবে। বড় 'দিক্' করেন আপনারা বাবু। সুনীলবাবু আজ আপনার খোঁজ করছিলেন একটু আগে।"

"তাই না কি।"

নবকিশোর শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সুনীলদা সিক্স্থ্ ইয়ারের ছেলে। এ মেসের গার্জেন এবং আদর্শ ছাত্র। স্বাস্থ্যে, পড়াশোনায়, নীতি-নিয়মে নিখুঁত। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে। তিনি মাঝে মাঝে জুনিয়ার ছাত্রদের খোঁজখবর নেন। কোনও উপদেশ দেন না, বকুনিও দেন না। কিন্তু তিনি খোঁজখবর লইয়াছেন জানিতে পারিলেই সকলে একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে।

"কিছু বললেন না কি।"

"না। এমনি জিগ্যেস করলেন নবকিশোর কোথা।"

"আচ্ছা, আমি এখুনি ঘুরে আসছি—"

নবকিশোর টর্চের বোতামটা একবার টিপিয়া দেখিল ঠিক জ্বলিতেছে কি না।

"কতক্ষণ পরে ফিরবেন।"

"এই ধর ঘণ্টাখানেক।"

"বারোটা বেজে গেছে, সেটা যেন মনে থাকে।"

নবকিশোর কেন যে হঠাৎ এই অপরিচিত পরিবারের সহিত নিজেকে জড়াইয়া সময় নষ্ট করিতেছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিলে হয়তো সে সদুত্তর দিতে পারিত না। বহু-পূর্বে মহর্ষি বাল্মীকি অন্য একটি গল্পের মধ্যে ইহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন। বনবাসী ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নগরে প্রস্তুত সন্দেশের লোভ দেখাইয়া কয়েকজন পতিতা শহরে ভুলাইয়া লইয়া আসিয়াছিল। বন্য ফলমূলে পরিতৃপ্ত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি অভিনব সন্দেশ খাইয়া প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। নবকিশোরেরও অনেকটা সেই দশা। তাহার দেহাতী সরল মন সেই রোমান্সের মোহে মুগ্ধ যে রোমান্সের স্বাদ ইতিপূর্বে সে পায় নাই। উৎসাহ, জরি, অতুল, বিরাট পণ্ডিত, সুখদেও সকলেই যেন আরব্য-উপন্যাসের বর্ণময় কল্পলোক হইতে নামিয়া আসিয়া ভিন্ন নামে সহসা এই কলিকাতা শহরের তুচ্ছতার মধ্যেই রহস্য-রসে অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। শ্মশান ভৈরবী আবার কি রূপ ধরিয়া দেখা দিবে কে জানে। গলিটার সামনে নবকিশোর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। অন্ধকার গলি। টর্চ ফেলিয়া দেখিল, সোজা নয়, ডান দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। একটা বাড়ির বারান্দায় একটা লোমওঠা কুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে। তাহার সামনেই জঞ্জালে পরিপূর্ণ একটা ডাস্টবিন। এইখানে এই এঁদো গলির মধ্যে শ্মশান ভৈরবী আছে! বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু বিরাট পণ্ডিত ভুল খবর দিবার লোক নন। একটু ইতস্তত করিয়া নবকিশোর অবশেষে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার আশঙ্কা হইয়াছিল কুকুরটা হয়তো ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিবে। কিন্তু সে টুঁ শব্দটি করিল না। টর্চের আলো ফেলিয়া ফেলিয়া সে খুঁজিতে লাগিল বত্রিশ বাই ওয়ান বাই এ, কোন্ নম্বরটা। অনেক বাড়িতে নম্বরই দেখিতে পাইল না সে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর হঠাৎ নজরে পড়িল একটা বাড়ির কালো কপাটে খড়ি দিয়া নম্বরটা লেখা রহিয়াছে। আর, কি আশ্চর্য কড়া নাড়িবামাত্র কপাটটা খুলিয়া গেল। চাকরানীই কপাট খুলিয়া দিল এবং বলিল—"ওপরে চলুন—"

"ওপরে যাব ?"

"হ্যাঁ। আপনিই তো উৎসাহবাবুর বন্ধু ?"

"হ্যাঁ—"

"মা বললেন আপনাকে উপরে নিয়ে আসতে।"

"উৎসাহ কি উপরেই আছে ?"

"তিনি একটু বেরিয়েছেন। এখুনি ফিরবেন। আপনি আসুন।"

নবকিশোর একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। উৎসাহ নাই এ সময় কি বাড়িতে ঢোকা উচিত ? বিরাট পণ্ডিত মানা করিয়া দিয়াছেন—

"এস বাবা, উপরে উঠে এস। উৎসাহ এখনি আসবে !"

না, বাঁশির মতো গলা নয়। একটু যেন ভাঙা-ভাঙা ধরা-ধরা। দ্বিতলের স্বল্পালোকিত অন্ধকার হইতে কথাগুলি ভাসিয়া আসিল। নবকিশোর মুখ তুলিয়া দেখিল অস্পষ্ট একটি মূর্তি আবছাভাবে দেখা যাইতেছে। রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

"এই যে এই দিকে সিঁড়ি…"

চাকরানী সিঁড়িটা দেখাইয়া দিল। এ অবস্থায় ফিরিয়া আসা অশোভন। নবকিশোর টর্চের আলো ফেলিতে ফেলিতে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল।

"এস বাবা ঘরের ভিতরে বস।"

অস্পষ্ট মূর্তি ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। উপরের ঘরের খোলা দ্বারপথটা আলোকিত হইয়া উঠিল। নবকিশোর কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে আশা করিয়াছিল অপরূপ সুন্দরী যোড়শী মূর্তি দেখিবে। কিন্তু দেখিল একটি পলিতকেশা প্রৌঢ়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখে আসন্ন জরার চিহ্ন। ইনিই কি শ্বশান ভৈরবী ? একটু ইতস্তত করিয়া নবকিশোর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিল —"আপনিই কি ভৈরবী মা ?"

"হ্যাঁ, ওই নামে ডাকে আমাকে অনেকে।"

"উৎসাহ কি হাসপাতাল থেকে এখানেই চলে এসেছিল ? ও আপনার ঠিকানা জানত না কি।"

"না জানত না। আমিও এখানে ছিলাম না। তারাপীঠে ছিলাম। যেদিন এখানে আসি সেদিন পথে জরির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে-ই জিগ্যেস করেছিল আমি এখানে কোথায় উঠব। তাকে ঠিকানা বলেছিলাম। আমার এ ঠিকানা পুরোনো ঠিকানা। অনেকেই জানে, বিরাট পণ্ডিত মশাই এসেছেন এ বাসায়। বস।"

ভৈরবী মা খাটের তলা হইতে একটি কার্পেটের আসন বাহির করিয়া মেঝেতে বিছাইয়া দিলেন। ঘরে টেবিল চেয়ার ছিল না। এক কোণে একটা দড়ির খাটিয়া ছিল শুধু।

"বস। উৎসাহের ঘরে চেয়ার আছে একটা। ঘরে চাবি দিয়ে বেরিয়ে গেছে সে।"

"আপনি বসুন—"

"বসি—"

ভৈরবী মা পাশের ঘরে ঢুকিয়া একটা বড় কাঠের পিঁড়ি লইয়া আসিলেন। নানা-রকম কাঠ জোড়া দেওয়া একটা অদ্ভুত পিঁড়ি। পিঁড়ির উপর তিনি পদ্মাসনে বসিলেন। নবকিশোরও বসিয়া পড়িল।

"তুমি যে আসছ তা অনেকক্ষণ থেকে আমি বুঝতে পারছি। উৎসাহকে বললুম, তোমার বন্ধু আসছে, তার জন্যে কিছু খাবার এনে রাখ। ক্ষিদে পেয়ে গেছে বেচারীর। কাছোঁপিঠে খাবার পাওয়া গেল না, তাই উৎসাহ চিৎপুরের দিকে গেল। সেখানে একটা দোকানে নাকি সমস্ত রাত খাবার পাওয়া যায়!"

"আপনি আগে থাকতে বুঝতে পেরেছিলেন আমি আসছি? আশ্চর্য তো।"

"কিছুই আশ্চর্য নয়। মন সব টের পায় বাবা। আয়না যদি পরিষ্কার থাকে ঠিক ছবি পড়ে। তোমার কথা উৎসাহের কাছে শুনলুম সব। ভাল ছেলে তুমি, ভাগ্যবান ছেলে। উৎসাহকে ছেড় না, উৎসাহও খুব ভালো ছেলে, ও নিজে জানে না ওর মধ্যে কি অসাধারণ শক্তি আছে, কিন্তু ওর ভাগ্যটা খারাপ; মৃত্যু ওর আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেডিকেল কলেজ জায়গাটাই ওর পক্ষে ভাল নয়। ওকে আমি মেডিকেল কলেজে যেতে মানা করেছিলুম, কিন্তু ওর বাবাই ওকে যখন জোর করে ঢুকিয়ে দিলে আমি কি আর বলব। একটা মন্ত্র জপ করতে বলেছি, কিন্তু এ-ও জানি নিয়তিকে লঙ্ঘন করা যায় না!"

"উৎসাহের বাবা আছেন না কি? কোথায় থাকেন তিনি।"

"বিরাট পণ্ডিতই উৎসাহের বাবা। জরিও বিরাট পণ্ডিতেরই মেয়ে। ওরা দু'জন বৈমাত্রেয় ভাই বোন।"

"তাই না কি। জানতুম না তো।"

'কেউ জানে না। ওরাও না। আমি জানি। আমি কিছুদিন ওদের কাছে ছিলাম—"

নবকিশোরের মনে হইল ভৈরবী হঠাৎ রসনা সংযত করিলেন। তাহার পর অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন—"তুমি তো মেসে থাক?"

"হ্যাঁ।"

"উৎসাহকেও তোমার সঙ্গে রাখ না। ওর বাড়ির আবহাওয়া ওর পক্ষে ভাল নয়। বিরাট পণ্ডিত গুণীলোক, মস্তলোক, কিন্তু উৎসাহের উপর ওঁর প্রভাব শুভ নয়, কারণ উৎসাহ ওঁকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। শ্রদ্ধার সোপান দিয়েই মানুষ ওপরে ওঠে। ও বাড়িতে সে সোপান নেই। তোমার সঙ্গে থাকলে ওর মঙ্গল হবে।"

"আমাদের মেসে তো 'সীট' খালি নেই। তাছাড়া—আচ্ছা, একটা কথা জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে। আপনার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি—"

"রক্তের সম্পর্ক নেই। আলো বাতাস জলের সঙ্গে সকলের যে সম্পর্ক আমার সঙ্গে ওর সেই সম্পর্ক। রক্তের চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ। মরে' যাওয়ার পর তো রক্ত থাকে না, ওরা থাকে।"

"আপনি কি করে ওর কাছে এলেন।"

"আলো বাতাস জল যে ভাবে আসে। তোমার কাছেও এসেছি। সকলের কাছেই আসি। কেউ চিনতে পারে, কেউ পারে না। আলো বাতাস জলের অভাব টেরই পায় না অনেকে। টের পেলেই পরিচয় ঘটে, দেরি হয় না। উৎসাহের অন্তরাত্মা আলো বাতাস জলের অভাবে ছটফট করছিল, তাই এসে পড়লুম একদিন।"

এই ধরনের উচ্চাঙ্গের কথার প্রত্যুত্তর দিবার সামর্থ্য নবকিশোরের ছিল না। সে মাথা হেঁট করিয়া নত-নয়নে কার্পেটের আসনটাই দেখিতেছিল। হঠাৎ চোখ তুলিয়া

কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতে একেবারে নির্বাক্ হইয়া গেল সে। পিঁড়ির উপর বসিয়া আছে প্রৌঢ়া নয় একজন ষোড়শী যুবতী, চোখের তারা অতল কালো, মুখে প্রসন্ন মৃদু হাসি, সর্বাঙ্গে অপূর্ব লাবণ্য-লীলা। নবকিশোরের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—"কে, কে আপনি!"

সঙ্গে সঙ্গে ষোড়শী অন্তর্ধান করিল, পলিতকেশা ভৈরবী হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমি সামান্য মানুষ বাবা। আমার মানুষ-আমিকে আড়াল করে মাঝে মাঝে আমার সাধনার সিদ্ধি আত্মপ্রকাশ করে আমার অজ্ঞাতসারে। অনেক সময় আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ি। কিছু দেখলে না কি।"

"দেখলাম আর একজন বসে আছেন আপনার জায়গায়। অপরূপ সুন্দরী—"

"হ্যাঁ ওই। ওই মাঝে মাঝে এসে আমাকে আড়াল করে ফেলে। আমাকে অপ্রস্তুত করে দেয়। আমি যা নই লোকে আমাকে তাই মনে করে।"

"আমি এখনি যাকে দেখলাম আপনি তা নন?"

"না। আমি যা হ'তে চাই তাই!"

নবকিশোর লক্ষ্য করিল প্রৌঢ়া ভৈরবীর ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, চোখের দৃষ্টিতে যে আকুলতা ঘনাইয়া উঠিয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। নবকিশোরের মনে হইল সে দৃষ্টি যেন ঘরের কোথাও নিবদ্ধ নহে, ঘরের দেওয়াল ভেদ করিয়া তাহা কোন্ মহাশূন্যে যেন কি অন্বেষণ করিতেছে। নবকিশোর অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া কোনও কথা সরিল না। একটু যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল। ভৈরবীই কথা কহিলেন আবার।

তোমাকে একটা অনুরোধ করছি বাবা।। যা দেখলে তা কাউকে বোলো না। উৎসাহ শুনলে খুব রাগারাগি করবে। ও সব দেখালে থাকে না জানি। আমি সব সময় দেখাতেও চাই না, আপনি এসে পড়ে। বিরাট পণ্ডিতের বাড়িতে যখন ছিলাম তখন এই বুড়ীটাকে আড়াল করে ওইটেই সর্বক্ষণ ছিল, তাই গোলমালেরও সৃষ্টি হয়েছিল অনেক। ও বাড়িতে এক উৎসাহ ছাড়া কেউ চেনে নি আমাকে। আমাকে আড়াল করে আমার সিদ্ধি বড় হ'য়ে উঠুক তা ও চায় না। ও বলে আমি মানুষটাকে চাই। তার ডিগ্রীটা তাকে আড়াল করে ফেলবে, তার বাইরের পোশাকটা তাকে ঢেকে ফেলবে—এ আমি মোটেই চাই না। তুমি বড় ডিগ্রী পেয়েছ, সেটা সিন্দুকে বন্ধ করে রাখ। কিন্তু বাবা এ তো কাগজের উপর লেখা ডিগ্রী নয় যে সিন্দুকে বন্ধ করে রাখলেই আড়ালে থাকবে। সিন্দুকেই বন্ধ করে রেখেছি, তবু মাঝে মাঝে ও বেরিয়ে এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর এটাও ঠিক মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছেও হয় ও বেরিয়ে আসুক, হাজার হোক মেয়েমানুষ তো, নিজের ঐশ্বর্য দেখাতে ইচ্ছে করে বই কি। এ দুর্বলতাটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারি নি বাবা। উৎসাহকে তুমি কিছু বোলো না। বড্ড বকাবকি করবে। তুমি উৎসাহকে নিতে এসেছ, কিন্তু ও কি যাবে, ও প্রাইভেট টিউশনি করবে বলে ক্ষেপেছে, কিন্তু দাসত্ব করতে করতে কি কোনও বড় কাজ করা যায়, তুমিই বল—"

"বিরাট পণ্ডিতের কাছে ফিরে যাওয়াই ওর পক্ষে ভালো। এখানে থাকলে আপনার জপ-টপের বিঘ্ন হবে—"

"তা হবে না। এ পথে ও আমার সহায়, বিঘ্ন নয়। বিশুদ্ধচরিত্র কি না, অসীম

মনের বল, আসাধারণ ধৈর্য। সাধনার পথে থাকলে ও খুব বড় তপস্বী হ'তে পারত, কিন্তু ও এ পথে থাকবে না, নিয়তি ওকে অন্য দিকে নিয়ে যাবে। ও মহীরুহ, কিন্তু ঝড় আশংকা করছি। দেখ, তুমি বুঝিয়ে যদি ওকে ওর বাবার কাছে নিয়ে যেতে পার, ও যদি যায় আমি আপত্তি করব না। কিন্তু আমি জানি ও জায়গাও ওর পক্ষে শুভ নয়—"

নবকিশোর একটু হাসিয়া বলিল, "বিরাট পণ্ডিত মশাই নিজেকে তো তীর্থ বলেন, আর এদের বলেন তীর্থের কাক—"

"উনি নিজেই একটি কাক। ভুশুণ্ডী কাক। অদ্ভুত প্রতিভা, যেন দশ-ফলা ছুরি, প্রত্যেক ফলাটাই চকচক করছে। কিন্তু সমস্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে লালসা আর অহংকারের জন্য। ওঁর মেয়ে জরিও প্রতিভাময়ী কন্যা। ও ইচ্ছে করলে অসাধ্যসাধন করতে পারে। কিন্তু থাকতে পারল না বাপের কাছে। ছিটকে চলে গেল। তন্ত্রের খুব ভালো একটা বই দিয়েছিলাম ওকে, তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেলেছিল বইটা। ইজিপ্ট দেশেও একরকম তন্ত্র আছে, পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে তার ফরাসী অনুবাদ যোগাড় করে এনেছিল, আমাকে মাঝে মাঝে শোনাতো। সোজা মেয়ে! তিন চারটে ভাষা জানে—"

"ও কোথা গেছে, আপনি জানতে পেরেছেন নিশ্চয়—"

"ও এখনও কোথাও গিয়ে পৌঁছয় নি। নদী প্রান্তর পাহাড় পেরিয়ে যাচ্ছে এখনও। কোথাও থামে নি, কেবল চলছে—ও আর ফিরবে না।"

সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল।

"উৎসাহ আসছে—"

উৎসাহ একটা খাবারের ঝুড়ি হস্তে প্রবেশ করিল।

"এই যে। আলোর মতো স্বচ্ছ হ'য়ে গেছে সব? কেন এখানে এলাম, কি করে এলাম, আপনি যে আসছেন তা আগে থাকতে কি করে জানতে পারলাম এসব বিষয়ে আবছা আর কিছু নেই তো!"

নবকিশোর স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল। কোনও জবাব দিল না।

ভৈরবী প্রশ্ন করিলেন—"কি খাবার পেলে?"

"হিংয়ের কচুরি, মোগলাই পরোটা আর আলুর দম। চমচমও এনেছি কিছু।"

"নিজের জন্যেও এনেছ তো? তুমি তো আমার সঙ্গে একবেলা হবিষ্যান্ন খাচ্ছ খালি—"

"তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে। তোফা আছি।"

নবকিশোর সঙ্কোচবোধ করিতেছিল।

বলিল, "এত রাত্রে আমার জন্যে খাবার আনতে আপনি চিৎপুরে ছুটেছিলেন এতে ভারি খারাপ লাগছে।"

"ব্যাপারটা আলোর মতো স্বচ্ছ করে দেব? ভৈরবী মা সন্ন্যাসিনী হলেও ভদ্রতাবোধ-বিবর্জিতা নন। তাছাড়া তিনি মা। সুতরাং আমাকে ছুটতে হ'ল। আপনি সঙ্কোচ করবেন না। ওটা সহ্য করব না। ভুলে যাবেন না সঙ্কোচ বিনয় নয়, ওটা প্রচ্ছন্ন দম্ভ!"

ভৈরবী হাসিয়া বলিলেন—"শুনলে তো! ওর সঙ্গে কথায় পেরে উঠবে না। যাও তোমরা ওঘরে গিয়ে খাও, ওখানে টেবিল চেয়ার কুঁজো কাচের গ্লাশ সব আছে।"

"তাই চলুন। ওঘরে আপ-টু-ডেট সব ব্যাপার আছে, মায় অ্যাশ্ ট্রে পর্যন্ত। মা ভেবেছিলেন যখন মেডিকেল কলেজে ঢুকেছি তখন সিগারেট খেতে শিখেছি নিশ্চয় —এসে দেখি সব আনিয়ে রেখেছেন।"

"না, না বাবা। সব এনেছে রাজু, আমার ঝি, ওই যাকে দেখলে একটু আগে। তাকে বলেছিলাম একজন ডাক্তারবাবু আসবেন, তাঁর জন্যে দক্ষিণদিকের ঘরটা ঠিক করে রাখ। সে-ই সব কেনা-কাটা করেছে। কি এনেছে না এনেছে আমি দেখিও নি। যাও তোমরা খেয়ে নাও, আর রাত কোরো না।"

খাইতে খাইতে উৎসাহ প্রশ্ন করিল—"ভৈরবী আগে থাকতেই সব জানতে পারেন। আমি যে এখানে আসব তা আগে থাকতে জানতে পেরেছিলেন, আপনি যে আমাকে ফিরিয়ে নিতে আসছেন তাও জানতে পেরেছিলেন। উনি সর্বজ্ঞ। এইবার বিরাট পণ্ডিতের ব্যাপারটা আমার কাছে আলোর মতো স্বচ্ছ করে দিন তো।"

"আপনি জুঁরি দুজনেই চলে আসাতে তিনি বড্ড অসহায় হ'য়ে পড়েছেন। বললেন—"

"জুঁরি হাসপাতালে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল। দেখবেন?"

টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া সে চিঠিখানি বাহির করিয়া দিল।

জুঁরি লিখিয়াছে—

উচ্ছে,

নিরুদ্দেশ যাত্রার আগে সেই লোকটির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম যার সঙ্গে আমার বাল্য কৈশোর যৌবন কেটেছে, যাকে ঘিরে প্রেম ঘৃণা স্বপ্ন বাস্তব মেঘের মতো এসেছে আর ভেসে গেছে। আমিও ভেসে যাচ্ছি। যে ভৈরবী মার সন্ধানে তুমি তারাপিঠে গিয়েছিলে এবং যেখান থেকে ফিরবার সময় তোমার মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল, সেই ভৈরবী মা ফিরেছেন। রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। তুমি যে মৃত্যুর কবলে পড়বে তা তিনি জানতেন, তুমি যে এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাবে তাও তিনি জানেন। বউবাজারের সেই গলিতে সেই পুরোনো ঠিকানায় তিনি তোমার জন্য প্রতীক্ষা করবেন বললেন। আমি জানি এ প্রতীক্ষার মর্যাদা তুমি দেবে। তোমার শৈশবের সাথী আমি একটি অনুরোধ শুধু করে যাচ্ছি, ডুবে যেও না, মাথা উঁচু করে ভেসে থেকো। মেডিকেল কলেজের পড়াটা শেষ কোরো। শ্মশান ভৈরবী চোখ-ধাঁধানো আলো, সে আলোয় চোখ অন্ধ হ'য়ে যেতে পারে। তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেছি বটে, কিন্তু তাঁর মহিমাকে অস্বীকার করছি না। স্বীকার করছি যে আলোয় তিনি জ্যোতির্ময়ী তা দুরূহ তপস্যার আশ্চর্য প্রকাশ। তোমার বন্ধু নবকিশোরবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক, কিন্তু চমৎকার। ওঁর সঙ্গ ছেড়ো না। জেঠুকে ছেড়ে চলে আসতে বড় কষ্ট হ'ল। ছেড়ে এলাম কারণ এখানে থাকলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। উদ্দেশ্যটা কি তা ব্যক্ত করলে তোমরা অবিশ্বাসের হাসি হাসবে। তাই সেটা আপাতত উহ্য থাক। জেঠুর সঙ্গে তোমার বনছে না জানি, কিন্তু জেঠুকে ত্যাগ কোরো না। তাঁর ছোট বড় নানা দোষ আছে, কিন্তু খানা-খন্দ কঙ্কর-কণ্টক দেখে পর্বতের বিচার করা হাস্যকর। বিরাটেশ্বর শর্মা পর্বত। তুমি চলে গেলেও তিনি পর্বতই থাকবেন। অন্য কেউ হয়তো সেখানে এসে ঘর বাঁধবে, তীর্থের কাকের অভাব হবে না কখনও। তুমিই তোমার আশ্রয়টুকু হারাবে। তাঁর

চূড়ায় যদি উঠতে পার অনেক বড় দিগন্ত দেখতে পাবে। মেডিকেল কলেজে ছেলেদের কমন-রুমে বসে এই চিঠি লিখলাম। তোমার সঙ্গে দেখা তো হ'ল না। এই চিঠিটা তোমার নার্সকে দিয়ে যাব। দেখা হ'লে এর চেয়ে বেশী আর কিই বা বলতাম। তবু মনে হচ্ছে দেখা হ'লে হয়তো আরও একটু কিছু হ'ত যা হ'ল না। কিন্তু কি আর করা যাবে। এইখানেই থামি। ইচ্ছে করেই ভালবাসা জানালাম না। ইতি

জরি

চিঠি পড়িয়া নবকিশোর কয়েকমুহূর্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল—"কি করবেন ঠিক করেছেন।"

"ঠিক করি নি এখনও কিছু। এ-ও মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ঠিক করতে পারবও না বোধ হয়। নিজের কাছে ব্যাপারটা আলোর মতো স্বচ্ছ হ'য়ে উঠছে না। বিরাট পণ্ডিতের বিরাট ব্যক্তিত্বের চাপে দম বন্ধ হ'য়ে আসে, ভৈরবী মার ব্যক্তিত্বে দম বন্ধ হয় না, কিন্তু দিশাহারা করে দেয়। মনে হয় ভুল পথে চলছি, জীবনের আসল লক্ষ্য যদি মোক্ষ হয় তাহলে ডাক্তারি পড়া অর্থহীন। ভৈরবী মা বলছেন ওই মেডিকেল কলেজের আবহাওয়াই না কি আমার পক্ষে অশুভ। অথচ কি যে করা উচিত তাও খুলে বলছেন না। একটা মন্ত্র দিয়েছেন। বলছেন ওইটেই কেবল জপ কর রোজ সকাল সন্ধ্যা। দশ বছর পরে অন্য রাস্তা দেখাবেন। কিন্তু এ দশ বছর আমি করি কি। ভৈরবী মা বলছেন, 'তোমার ভাগ্যই সেটা ঠিক করে দেবে। তুমি যদি বিরাট পণ্ডিতের কাছে না ফিরে যেতে চাও, এখানেই থাকতে পার। এখানে তোমার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আমি এখানে থাকব না। কামরূপে আমার গুরুদেব আছেন, তিনি ডেকেছেন আমাকে। সেখানেই আমি যাব।' এ বাড়ির মালিক ভৈরবী মার একজন গুরুভাই। তিনি ভৈরবী মাকেই এ বাড়িটা দিয়েছেন থাকবার জন্যে। কিন্তু ভৈরবী মার অবর্তমানে আমাকে থাকতে দেবেন কি না তার তো ঠিক নেই। সুতরাং ব্যাপারটা আলোর মতো স্বচ্ছ হ'য়ে উঠছে না। আপনার মেসে 'সীট' পাওয়া যাবে একটা ?"

"আমার মেসে সীট খালি নেই। খুঁজলে অন্য মেসে সীট হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু আপনি বিরাট পণ্ডিত মশায়ের আশ্রয় ছাড়বেন কেন।"

"অক্টোপাসকে জড়িয়ে থাকা যাবে না। ছেলেবেলায় ওঁর অনেক মার সহ্য করেছি, এ বয়সে আর পারব না। নিজের স্বাধীনতাকে—"

"পণ্ডিতমশায় কিন্তু একটা কথা বলে পাঠিয়েছেন। আপনার স্বাধীনতায় তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না। এমন কি আপনি যদি প্রবালের আংটি না-ও পারেন, আপত্তি করবেন না তিনি। আপনি মেডিকেল কলেজের পড়াটা শেষ করুন, এইটেই তাঁর ইচ্ছে। জরি চলে গেছে, আপনিও যদি তাঁকে ছেড়ে আসেন তাহলে তাঁর পক্ষে সেটা বড়ই মর্মান্তিক হবে। আপনাদের তিনি ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন, যতদূর জানি আপনারা ছাড়া তাঁর আপন লোক কেউ নেই, তাঁর সঙ্গে মতে মিলছে না বলে তাঁকে ছেড়ে চলে আসাটা কি উচিত হবে। তিনি আমাকে আজ ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে বড় কষ্ট হ'ল!"

"কিন্তু ভৈরবী মা বলছেন ওঁর প্রভাব না কি আমার পক্ষে শুভ নয়।"

"হ'তে পারে। কিন্তু ধরুন যদি উনি আপনার বাবা হ'তেন আর ওঁর যদি কুষ্ঠ

থাকত তাহলে কি আপনি ওঁকে ছেড়ে চলে আসতেন? আসাটা কি উচিত হ'ত! আপনি কি ওঁকে একটুও ভালবাসেন না?"

"সমুদ্রকে কেউ গিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করে তোমার কি একটুও জল নেই? তাহলে তা যেমন হাস্যকর হয় আপনার এই প্রশ্নটাও তেমনি হাস্যকর মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা আলোর মতো স্বচ্ছ হয়েছে এইবার? ওঁকে ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকে ভালবাসি না। But he is so terrible, so deep, so fathomless (কিন্তু উনি এমন ভয়ঙ্কর, এমন গভীর, এমন অতল) যে ভয়ও করে। উনিই তো আমার গুরু। আমাকে বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, কেমিস্ট্রি, ফিজিকস্, অঙ্ক, বায়োলজি সব পড়িয়েছেন। গুরুমশায়ের মতো বেত হাতে নিয়ে পড়িয়েছেন। এই সেদিনও আকাশে মঘা নক্ষত্র দেখাতে পারি নি বলে কান মলে দিয়েছেন আমার। আমাকে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, ফারমাকোলজি পড়াবেন বলে বই কিনে পড়াশোনা আরম্ভ করেছেন নিজে। একটু বেচাল হ'লে এ বয়সেও মার-ধোর করেন। তাঁকে না বলে তারাপীঠে চলে গিয়েছিলাম ভৈরবী মার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, তারপরই মোটর অ্যাকসিডেন্ট হ'ল। এর পর তাঁর কাছে ফিরে গেলে যে কি দুর্গতি কপালে নাচছে কে জানে—"

"কিছু হবে না। আপনি চলুন আমার সঙ্গে, তিনি আপনার জন্যে জেগে বসে আছেন।"

উৎসাহ টেবিলে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারিয়া বলিল, "আপনি গ্যারাণ্টি দিচ্ছেন কিছু হবে না?"

"দিচ্ছি।"

"বেশ চলুন তাহলে। ভৈরবী মাকে বলে দি। জিনিসপত্র কিছু নেই। একবস্ত্রে এসেছিলাম। ভৈরবী মা কাপড় গামছা কিনে দিয়েছিলেন অবশ্য। সেগুলো এখানে থাক। আসুন—"

তাহারা পাশের ঘরে গিয়া দেখিল ভৈরবী মা নাই। সেই চাকরানীটা বসিয়া আছে।

"মা কোথা গেলেন—"

"তিনি তো নেবে চলে গেলেন।"

"কোথায়।"

"তা তো জানি না। ত্রিশূলটা নিয়ে নেবে গেলেন।"

"তাই নাকি!"

নবকিশোর আশা করিয়াছিল একটা ট্যাক্সি পাইয়া যাইবে। কিন্তু পাওয়া গেল না। কিছুদূর হাঁটিয়া একটা রিক্সা পাওয়া গেল। তাহাতেই চড়িয়া বসিল তাহারা। উৎসাহ নজর রাখিতে লাগিল রাস্তায় কোথাও যদি ভৈরবী মার দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখা গেল না।

নবকিশোর বলিল, "আশ্চর্য তো, কোথায় চলে গেলেন উনি—"

"আমার পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন বোধহয়। আর হয়তো দেখাই হবে না।"

হঠাৎ একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল বউবাজারের মোড়ে। ট্যাক্সিতে বসিয়া উৎসাহ বলিল, "আমার কিন্তু ভয় করছে নবকিশোরবাবু। কি যে হবে কে জানে।"

"কি আবার হবে।"

"আপনি বিরাট পণ্ডিতকে চেনেন না ভাল করে।"

ট্যাক্সি যখন মুক্তারামবাবুর স্ট্রীটে ঢুকিল তখন দুইজনেই ঠনঠনিয়ার কালীকে প্রণাম করিল। অতুলের দোকানের সামনে গিয়া নবকিশোর অবাক্ হইয়া গেল। অতুল তখন নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িতেছে, দোকান খোলা। একটি সুদৃশ্য ধূপদানে ধূপ জ্বলিতেছে। নবকিশোর ট্যাক্সি থামাইয়া মুখ বাড়াইল।

"অতুলবাবু, আপনি এখনও এখানে ?"

"আপনার অপেক্ষাতেই রয়েছি। উচ্ছে এল ?"

"এই যে—"

উৎসাহ হাসিমুখে মুণ্ড বাড়াইল।

"ওদিকের খবর কি।"

"জানি না। গাঁট্টা সাধারণতঃ দশটার পর পান খেতে আসে। আজ আসে নি, এলে খবর পেতুম।"

"চল—"

ট্যাক্সি বিরাট পণ্ডিতের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। বাড়ির সামনের দরজাটা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ট্যাক্সিটা দাঁড়াইতেই খট্ করিয়া ভিতরের ছিটকিনিটা খুলিয়া গেল। কপাটটাও খুলিয়া গেল তাহার পর। কিন্তু কপাটের সামনে কেহ আসিয়া দাঁড়াইল না। ভাড়া লইয়া ট্যাক্সি চলিয়া গেল। খোলা কপাটের সামনে উৎসাহ আর নবকিশোর দাঁড়াইয়া রহিল কয়েকমুহূর্ত। দেখা গেল ঘরের ভিতরে আলো জ্বলিতেছে।

"আসুন—"

নবকিশোরই প্রথমে আগাইয়া গেল।

"হ্যাঁ, চলুন।"

উৎসাহই ঘরের ভিতরে প্রথমে ঢুকিল। তাহার পিছু পিছু নবকিশোর। বিরাট পণ্ডিত স্থির হইয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহার বড় বড় চোখ দুইটা জ্বলিতেছিল। মনে হইতেছিল কোন হিংস্র শ্বাপদ যেন ওত্ পাতিয়া বসিয়া আছে। উৎসাহ ঘরে ঢুকিতেই তিনি লাফাইয়া আগাইয়া আসিলেন এবং তাহার গালে ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া বলিলেন, "রাসকেল, আমাকে বুড়ো বয়স পর্যন্ত তুমি জ্বালাবে। ভেবেছ কি তুমি—।"

ঠাস্ ঠাস্ করিয়া তাহাকে চড়াইতে লাগিলেন।

"চাবকে আজ তোমার পিঠের ছাল ছাড়িয়ে ফেলব আমি।"

হয়তো ইহার পর তিনি চাবুকই বাহির করিতেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই যাহা ঘটিল তাহা অপ্রত্যাশিত এবং ভয়ংকর। প্রকাণ্ড একটা গোক্ষুর সর্প হঠাৎ কোথা হইতে যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত হইল এবং বিশাল ফণা তুলিয়া বিরাট পণ্ডিত ও উৎসাহের মাঝে দাঁড়াইয়া দুলিতে লাগিল। বিরাট পণ্ডিতকে দুই একবার ছোবল মারিবারও চেষ্টা করিল সে। ভাবটা যেন—খবরদার ফের যদি মার, তোমাকে শেষ করিয়া দিব। বিরাট পণ্ডিতের অদ্ভুত পরিবর্তন হইল। তিনি সভয়ে পিছাইয়া গেলেন এবং হাতজোড় করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। নবকিশোর ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল লাঠি সংগ্রহ করিবার জন্য। এইটাই তাহার সর্বপ্রথম মাথায় আসিল। বাহির হইয়া

কিন্তু কোন-কিছু তাহার চোখে পড়িল না। তখন সে অতুলের দোকানের উদ্দেশ্যে ছুটিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়াই কিন্তু থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল তাহাকে। তাহার পাশ দিয়াই বিরাট সাপটা সন্ সন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। এত বড় সাপ সে কখনও দেখে নাই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর মনে হইল উহাদের কাহাকেও কামড়ায় নাই তো। আবার সে দ্রুতপদে ফিরিতে লাগিল। গিয়া দেখিল বিরাট পণ্ডিত বসিয়া আছেন এবং উৎসাহ তাঁহার দুই পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—"আমায় ক্ষমা করুন। আমি আর কক্ষনো আপনার অমতে কিছু করব না। আমাকে আপনি দয়া করুন, দয়া করুন।"

বিরাট পণ্ডিত নির্বাক। তাঁহার চোখ দিয়াও দরদরধারে অশ্রু ঝরিতেছে। হঠাৎ তিনি দুই হাত দিয়া নিজেকেই চড়াইতে লাগিলেন।

"আমার কামের, ক্রোধের, লোভের শাস্তি আমি নিজেই নিজেকে দিচ্ছি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই আমাকে করতে হবে। মহাপুরুষ, আসুন, এগিয়ে আসুন, আপনার পায়ের ধুলো দিন আমাকে। তীর্থের কাকের মুক্তি হোক—"

নবকিশোর তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া বিরাট পণ্ডিতের হাত দুইটি ধরিয়া ফেলিল।

"ছি, ছি, কি করছেন আপনি। থামুন। উৎসাহবাবু উঠে বসুন আপনি। এসব কি কাণ্ড।"

উৎসাহ চেয়ারটায় উঠিয়া বসিল এবং নতমুখে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল। বিরাট পণ্ডিত কিন্তু দুই চোখ মুছিয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল।

"মহাপুরুষ, আজ বড় শুভদিন। আপনি আমাদের আপন লোক হ'য়ে গেলেন। আমরা যেখানে দুর্বল, যেখানে অপরিচ্ছন্ন, যেখানে আতুর, অসহায় সেই ঘনিষ্ঠলোকে আজ পেলাম আপনাকে। আপনি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন না। বসুন। ওই চেয়ারটায় বসুন—"

যে কথাটা নবকিশোরের মনে সর্বাপেক্ষা বেশী বিস্ময় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই সে এইবার বলিল।

"অত বড় সাপটা এখানে এল কি করে? আপনাদের কাউকে কামড়ায়-টামড়ায় নি তো? দেখলাম গলি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। কি আশ্চর্য ব্যাপার!"

"ও আপনিও দেখেছেন বুঝি"—বিরাট পণ্ডিতের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল—"হ্যাঁ, ভয় পাবারই কথা বটে। কিন্তু ওটা আসল সাপ নয়। ওটা—"

বিরাট পণ্ডিত কথা শেষ করিলেন না, হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন।

"কি ওটা—"

"ওটা মানে, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান দিয়ে ওটার ঠিক ব্যাখ্যা করা যাবে না। হয়তো আমার ক্রোধই ওই মূর্তি ধরে আমাকে শাসন করে গেল, কিংবা হয়তো—থাক—ওসব ঠিক বোঝাতে পারব না আপনাকে। তবে ওটাকে দেখে আমি আত্মস্থ হয়েছি। আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। আপনার বন্ধুকে বুঝিয়ে দিন ওর কোনও কাজে আমি আর বাধা দেব না। বাধা দিয়েছি ওর ভালোর জন্যই, কিন্তু এখন ভেবে

দেখছি ও বড় হয়েছে, নিজের ভালোমন্দ কিসে হয় তা ও নিজেই ঠিক করুক। আমার কাছে যদি না থাকতে চায় তাতেও আমার আপত্তি নেই। জরি তো চলেই গেল। ও যদি যেতে চায় যাক। চরের উপর উপুড়-হ'য়ে পড়ে-থাকা ভাঙা নৌকো দেখেছেন? আমার অবস্থা অনেকটা সেইরকম। অনেক যাত্রী পার হয়েছে আমার উপর চড়ে, এখন যদি তারা আমার দিকে ফিরে না চায়, বলবার কিছু নেই। এই নিয়ম!"

উৎসাহ এতক্ষণ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল। সে হঠাৎ অশ্রুসিক্ত মুখটা তুলিয়া প্রদীপ্ত চক্ষে অকম্পিত কণ্ঠে কহিল—"প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। আমি আজ প্রতিজ্ঞা করছি যে আপনি যা বলবেন তা আমি এবার থেকে নির্বিচারে পালন করব। আমি নিজের মতে চলতে চেষ্টা করে অন্যায় করেছিলাম সেটা এখন বুঝতে পেরেছি—"

বিরাট পণ্ডিতের চোখে মুখে আনন্দের একটা জ্যোতি ঝলমল করিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে তিনি বলিলেন—"একটা লোহার শক্ত শিক কেঁচোর মতো নাত্‌পেতে হ'য়ে যাক তা আমি চাই না, যদিও পাগলা ঘোড়ার মতো বনে-জঙ্গলে অপথে-বিপথে ছুটোছুটি করে বেড়ানোটাও ভালো নয়—"

উৎসাহ বলিল—"কি ভালো কি মন্দ তা আপনিই ঠিক করে দেবেন এবার থেকে। আপনার আদেশ আমি নির্বিচারে পালন করব।"

নবকিশোর তখনও দাঁড়াইয়া ছিল।

"মহাপুরুষ, আপনি দাঁড়িয়েই রইলেন যে। বসুন।"

"আমি এবার মেসে ফিরব। রাত অনেক হয়েছে। আর বসব না এখন।"

"ও, হ্যাঁ, তা বটে। উচ্ছের কথাটা শুনে রাখুন। বলছে ও এবার থেকে আমার কথা শুনে চলবে। আপনি সাক্ষী রইলেন।"

"ওর কথা অবিশ্বাস করছেন কেন। যখন বলেছে-"

"ওকে চিনি যে। ও একটি মানুষ-হাউই। এমনি বেশ আছে, কিন্তু বারুদে আগুন ধরে গেলে, 'হুস্' করে কোথায় যে উড়ে যাবে তার ঠিক নেই। নির্জীব হাউই হ'লে আর ফিরত না, অস্কার ওয়াইলডের গল্পের হাউইয়ের মতো কোনও পচা ডোবায় পড়ে থাকত। সজীব বলে ফিরে এসেছে। দেখা যাক।"

নবকিশোর উৎসাহের দিকে চাহিয়া দেখিল, সে প্রস্তর-মূর্তিবৎ বসিয়া আছে।

"আমি তাহলে চলি এখন।"

"এত রাত্রে কি করে যাবে?"

"পেয়ে যাব কিছু একটা। না হয় হেঁটেই চলে যাব। বেশী দূরে তো নয়।"

নবকিশোর যাইবার পূর্বে বিরাট পণ্ডিতকে প্রণাম করিতে গেল। কিন্তু তিনি 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিলেন।

"করেন কি, করেন কি! আপনার যা পরিচয় পাচ্ছি তাতে আমারই উচিত আপনার পায়ের ধুলো নেওয়া। আমি প্রথম দর্শনেই চিনেছিলাম আপনাকে! না—না।"

উৎসাহের দিকে ফিরিয়া নবকিশোর বলিল—"চললুম এখন। কাল কলেজে দেখা হবে।"

অতুল তখনও জাগিয়া দোকানে বসিয়া ছিল।

"কি হ'ল ?"

"যা হ'ল তা আশ্চর্য কাণ্ড। বিরাট পণ্ডিত উৎসাহের গালে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারলেন—"

"হ্যাঁ, ওঁর হাত খুব চলে। আমিও ওঁর হাতে মার খেয়েছি। জরিও খেয়েছে। তারপর ভাব হ'য়ে গেল তো ?"

"হ্যাঁ। উনি কাঁদতে লাগলেন, উৎসাহও কাঁদতে লাগল। শেষে উনি নিজের গালে নিজেই চড় মারতে লাগলেন ! হ্যাঁ, আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার, হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল ওদের মাঝখানে। আমি তো আপনার কাছে ছুটে আসছিলাম লাঠির খোঁজে, এমন সময় সাপটা বেরিয়ে গেল।"

অতুল বিস্মিত হইল না। তাহার চক্ষু দুইটি কৌতুক-হাস্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল কেবল। সে শুধু বলিল—"বিরাট পণ্ডিতের বিরাট কাণ্ডকারখানা। ওর রহস্য ভেদ করা আমাদের কর্ম নয়। একটু আগে আর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। দেখবেন ?"

"কি—"

"দেখুন—"

অতুল তাহার ছোট কাঠের বাক্সটি খুলিয়া একটি মীনাকরা রূপার কৌটা বাহির করিল।

"খুলে দেখুন—"

নবকিশোর খুলিয়া দেখিল তাহার ভিতর একগোছা চুল রহিয়াছে।

"কি এ ? কার চুল ?"

"জরিদির বোধহয়। একটু আগে সুখদেও এসে দিয়ে গেল। এই কৌটোটা গত বছর আমি জরিদিকে দিয়েছিলাম তার জন্মদিনে। সেইটের ভিতরই খানিকটা চুল পুরে ফেরত পাঠিয়েছেন। মনে পড়েছে আমি একদিন ওঁর চুলের প্রশংসা করেছিলাম।"

"সুখদেও ফিরে এসেছে ? কি বললে সে ? জরি কোথায় এখন ?"

"তা সে জানে না। তার হাত ফসকে পাখী উড়ে গেছে। বললে, আমি ঘুমিয়েছিলাম, বেটি চুপসে উঠে কোথা চলে গেল। অনেক খুঁজলাম, পাত্তা করতে পারলাম না। ডিব্‌বাটা আমায় দিনের বেলাতেই দিয়েছিল, বলেছিল অতুলবাবুকে দিয়ে দিও যখন ফিরে যাবে। তখন আন্দাজ করতে পারি নি ও ভাগবার মতলবে আছে। তারপর তার মাতৃভাষায় বলল—হদ্ কিয়া। সুখদেও একটা অদ্ভুত ক্যারেকটার।"

"কোথায় ওদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে ?"

"শ্রীরামপুর পর্যন্ত ওরা নৌকোয় গিয়েছিল। সেখানে নৌকো ছেড়ে দিয়ে স্টেশনে ওয়েটিং রুমে ছিল। সেই ওয়েটিং রুম থেকেই জরিদি অন্তর্ধান করেছে।"

নবকিশোর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যেন আশা ছিল সুখদের সহিত জরি আবার ফিরিয়া আসিবে।

"আমি চলি তাহ'লে। অনেক রাত হ'ল। আচ্ছা, এ অঞ্চলে কাছেপিঠে কোনও ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড আছে।"

"এখন ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত। আচ্ছা, দাঁড়ান একটু—"

"কেন—"

"দাঁড়ান না। আসুন। এইটেই আজকের লাস্ট পানের খিলি। চলুন, আমিই আপনাকে পেঁৗছে দিয়ে আসি—"

"আপনি ? আপনি আবার কেন কষ্ট করবেন।"

"কষ্ট হবে না। গাড়ি আছে—"

অতুল দোকান বন্ধ করিয়া ফেলিল।

"আসুন, এই পাশের গলিতেই গারাজ—"

পাশের গলিতে ঢুকিয়া অতুল গারাজ হইতে নূতন একটি মোটর গাড়ি বাহির করিয়া ফেলিল।

"চলুন, পেঁৗছে দিয়ে আসি। আপনার আস্তানাটাও দেখে আসব।"

"কার গাড়ি ?"

অতুল মুচকি হাসিয়া উত্তর দিল—"আপনারই। কোন্ দিকে যাব—"

"কলেজ স্কোয়ার। মির্জাপুর স্ট্রীটে আমার মেস।"

ফাঁকা রাস্তা। নবকিশোর দেখিল অতুল সুদক্ষ ড্রাইভারও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি তাহার মেসের সামনে আসিয়া থামিল। নবকিশোর নামিয়া পড়িল।

"নমস্কার।"

"নমস্কার। অদ্ভুত সেকেলে লোক তো আপনি।"

"কেন।"

"ধন্যবাদ তো দিলেন না !"

মুচকি হাসিয়া নবকিশোর মেসের দিকে অগ্রসর হইল। অতুলের মোটর সার্কুলার রোডের দিকে চলিয়া গেল। মেসে কপাটের কড়া নাড়িতেই মিঠ্ঠু সঙ্গে সঙ্গে কপাটটা খুলিয়া দিয়া একটা দেশলাইকাঠি জ্বালিল। মেসে ঢুকিবার পথটা অন্ধকার।

"এই কি আপনার একটু পরে ফেরা ? ক'টা বেজেছে জানেন ? তিনটে। আমি জেগে কেবল ঘড়ির ঘণ্টা গুনে যাচ্ছি !"

নবকিশোর কোনও উত্তর দিল না। কেবল এক নজর মিঠ্ঠুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। থলথলে ভারী মুখটায় প্রচ্ছন্ন হাস্য উঁকি দিতেছে। নিশ্চিন্ত হইল সে। মিঠ্ঠু চটিলেই মুশকিল। মেসের সে-ই কর্ণধার। সে কিন্তু চটে না। নিতাইবাবু মাঝে মাঝে মদ খাইয়া আসিয়া মাতলামি করেন, যোগেন প্রায়ই মুখ খারাপ করিয়া গালাগালি দেয়, রজনীবাবু ধারে খাবার আনাইয়া পয়সা শোধ করেন না, বিলাসবাবু কোথায় কখন কি ফেলেন মনে থাকে না এবং চাকর ঠাকুরকে চোর বলিয়া সন্দেহ করেন। মিঠ্ঠু কিন্তু চটে না। হাসিমুখে সে এই দুরন্ত দামাল উদীয়মান ডাক্তারদের সব দৌরাত্ম্য সহ্য করে।

"চা খাবেন ? টিনে দুধ আছে একটু—"

"না—"

নবকিশোরের মনে হইল মিঠ্ঠুর সহিত সুখনের যেন সাদৃশ্য আছে। যোগেন উলঙ্গ হইয়া নাক ডাকাইতেছিল। ঘুমের সময় তাহার কোমরে কাপড় থাকে না। ঘুম কিন্তু সজাগ। নবকিশোরের পদশব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। রক্তচক্ষু মেলিয়া সহাস্যবদনে সে বলিল—"ও নবু ! রাধিকার খবর কি।"

"রাধিকার খবর, মানে ?"

"অভিসারে বেরিয়েছিলে তো !"

"আরে না, না। দরকারি কাজে বেরিয়েছিলুম—"

"ও !"

যোগেন আর কিছু না বলিয়া কাপড়টা কোমরে একটু জড়াইয়া লইল এবং পাশ ফিরিয়া পুনরায় নাসিকাগর্জন শুরু করিল।

॥ নয় ॥

পরদিন ঠিক সাতটার সময় অধ্যাপক হরিকিশোর মুখোপাধ্যায় পত্নী শ্রবণার সহিত নবকিশোরের মেসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে একটি বড় রুই মাছ, এক হাঁড়ি সন্দেশ এবং এক কড়াই দই। নবকিশোর দাদার জন্য প্রস্তুত হইয়াই বসিয়াছিল। প্রণাম করিয়া বলিল, "কাল দেখা হয় নি, আমি একটু দরকারে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। মাছ-টাছ এনেছেন কেন !"

"তোমরা সবাই খাবে।"

হরিকিশোরবাবু ঈষৎ হাসিয়া একটু অপ্রতিভভাবেই কথাগুলি বলিলেন যোগেনের দিকে আড়চোখে চাহিয়া। যোগেন নিজের টেবিলের উপর একটা ছোট ফাটা আয়নার সামনে বসিয়া মুখভঙ্গী সহকারে দাড়ি কামাইতেছিল। কোন নোটিশ না দিয়া নবুর বন্ধুদের সম্মুখে এই সব ভোজ্যবস্তু এভাবে নিক্ষেপ করা হয়তো ঐশ্বর্য আস্ফালনের মতো দেখাইতেছে এই কথাটা মনে হওয়াতে হরিকিশোরবাবু মনে মনে সঙ্কোচবোধ করিতেছিলেন।

নবকিশোর যোগেনের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল।

"আমার দাদা, বৌদি—"

যোগেন তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আধ-কামানো অবস্থাতেই হেঁট হইয়া প্রণাম করিল তাঁহাদের।

"থাক থাক থাক—"

হরিকিশোরবাবু শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

শ্রবণা দেবী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "করুক না। ছোট ভাই তো সব। হঠাৎ এতগুলি দেওর পেয়ে খুব ভালো লাগছে, যদিও সকলের সঙ্গে আলাপ হয় নি এখনও। একটি শুভ সংবাদ এনেছি, তাই মাছ দই মিষ্টিও আনলাম। আগামী রবিবার ঠাকুরপোর বিয়ে। হরিশ মুখার্জি রোডে আমরা বাড়ি ভাড়া করেছি। সেখানেই হবে। বিয়ে অনেক আগে থাকতেই ঠিক হয়ে ছিল, উনি ছুটি পাচ্ছিলেন না, বাড়িও সুবিধামতন পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই দেরি হ'য়ে গেল—"

নবকিশোর সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"আমাকে তো কিচ্ছু জানান নি।"

"তুমি তো জানই। নতুন করে আবার কি জানাব। ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র নিয়ে এসেছি, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের দিও।"

শ্রবণা দেবী তাঁহার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলিয়া একগোছা রঙীন খাম বাহির করিলেন। একটি যোগেনকে দিলেন, বাকিগুলি নবকিশোরকে।

যোগেন চিঠিটি পড়িল এবং মাছ, মিষ্টি, দই দেখিয়া বলিল, "আচ্ছা, বউদি, আপনি টের পেলেন কি করে বলুন তো।"

"কি টের পেলাম ?"

"এই মেসে যে বারোটি রাক্ষস বাস করে এ খবর আপনাকে দিলে কে! এত এনেছেন!"

শ্রবণা দেবীর মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

বলিলেন, "আহা, কতই বা এনেছি। যাই হোক, তোমরা সব যেও।"

"নিশ্চয় যাব। কাকের মুখে খবর পেলেও যেতাম। আর একটা কথা, দেওর হিসাবে যদি কোন ফরমাশ করতে চান বিনা দ্বিধায় করতে পারেন। আপনার আদেশ পালন করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকব।"

"কি ফরমাশ—"

"এই ধরুন, কেনা-কাটা, ডেকোরেটারকে ডাকা, বাসনপত্র যোগাড় করা—ইন শর্ট —ফপরদালালি করা—"

"না না, সে সব করতে হবে না তোমাদের। সে সবের জন্যে আলাদা লোকই এনেছি আমরা। ওঁর কয়েকজন ছাত্রও সে-সবের ভার নিয়েছে। তোমরা বরং দেখো বরযাত্রীদের যেন কোনও কষ্ট না হয়।"

"দেখব, নিশ্চয় দেখব।"

অধ্যাপক হরিকিশোর উদ্ভাসিত মুখে বসিয়াছিলেন। তাঁহার মনের সংকোচ কাটিয়া গিয়াছিল। তাঁহার ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ-গুচ্ছকে প্লাবিত করিয়া যে প্রশান্ত হাস্য বিকীর্ণ হইতেছিল তাহা সত্যই অধ্যাপক-সুলভ। তিনি একটি কথা না বলিয়া একবার যোগেনের মুখের দিকে এবং আর একবার শ্রবণার মুখের দিকে চাহিতেছিলেন। যদিও তিনি 'বটানি'র প্রফেসর তবু কত ধানে কত চাল হয় তাহা তিনি জানেন না। যিনি জানেন, যিনি তাঁহার সংসার-তরণীর কর্ণধার, তাঁহার আশ্চর্য নিপুণতাই তিনি যেন মুগ্ধ হইয়া লক্ষ্য করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।

"রাবড়িটা আনা হয় নি তো—"

"রাবড়ির ফরমাশ দিয়েছিলে না কি।"

"দিয়েছিলাম। ভাগলপুরের কৈলাস শ্যামবাজারে একটা দোকান করেছে। ভাল রাবড়ি দিতে পারবে বললে। তাকে সের দুই করে রাখতে বলেছিলাম।"

"আমাকে কিছু বল নি তো।"

"ভুলে গিয়েছিলাম। কাল প্রফেসর বোস এসে পড়লেন তো, কথায় কথায়—"

"তাহলে ঠাকুরপো চলুক আমাদের সঙ্গে। নিয়ে আসবে ওটা—"

নবকিশোর বলিল—"আমার তো হাসপাতাল এখন। ওয়ার্ডে যেতে হবে—"

যোগেন বাধা দিল—"তুমি ভাল ছেলে, তুমি ওয়ার্ডে যাও। আমি যাচ্ছি বউদির সঙ্গে। আমার কাছে ওয়ার্ডে গিয়ে ভ্যারেণ্ডা ভাজার চেয়ে রাবড়ি, বিশেষত দাদা বউদির দেওয়া রাবড়ি ঢের বেশী মূল্যবান। বউদি, আমি যাব আপনার সঙ্গে"—

প্রফেসর হরিকিশোর কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

"না, ক্লাস কামাই করা ঠিক নয়। আমরাই ফেরবার সময় দিয়ে যাব। আমরা এখন ব্যারাকপুর যাচ্ছি। এগারোটা নাগাদ ফিরব। ক'টার সময় খাও তোমরা ?"

"বারোটার আগে নয়—"

"তার আগে আমরা পেঁছে যাব। এখন উঠি তাহলে—। নবু, তুমি একবার হরিশ মুখুজ্যে রোডে যেও সন্ধ্যাবেলা। দিদি, জেঠিমা, আর ভাগলপুরের অনেকে এসেছেন।"

"যাব। বুলু কোথা—তাকে সঙ্গে আনো নি?"

"তাকে বাড়িতে রেখে এসেছি। সে কাকিমার জন্যে ব্লাউস তৈরি করছে।"

বুলু হরিকিশোরবাবুর একমাত্র কন্যা সন্তান। এলাহাবাদ কলেজে আই. এ. পড়ে।

"এবার উঠি তাহলে—"

হরিকিশোরবাবু নিজের কাজেই আসিয়াছিলেন। নবকিশোর ও যোগেন তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া গিয়া তাঁহাদের গাড়িতে উঠাইয়া দিল। গাড়ি চলিয়া গেলে যোগেন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "তোমাদের গাড়ি?"

"হ্যা, দাদা বিলেত থেকে আসবার সময় কিনে এনেছিলেন।"

যোগেন নবকিশোরের পুরা পরিচয় জানিত না। গাড়ি দেখিয়া বুঝিল এই নিরীহ প্রকৃতির হাবা-গোবা গোছের ছেলেটি কেউ-কেটা নয়—শাঁসালো ব্যক্তি। যোগেন সেই প্রকৃতির লোক যাহারা ঐশ্বর্যের গন্ধ পাইলে সশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। নবকিশোরের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা হইল।

"তোমাদের বাড়ি তো ভাগলপুরে?"

"হ্যা। সেখানে অবশ্য এখন কেউ নেই। দাদা এলাহাবাদে প্রফেসরি করেন। আমাদের ভাগলপুরের বাড়িতে আছেন রঘুনাথ ভেইয়া।"

"তিনি আবার কে—"

"তিনিই ওখানকার সর্বেসর্বা। দাদার সঙ্গে পড়েছিলেন কিছুদিন। তারপর পড়াশুনা ছেড়ে দেন। বিয়ে-টিয়ে করেন নি। মস্ত বড় পালোয়ান, মস্ত বড় শিকারী। তিনিই আমাদের ভাগলপুরের বিষয়-আশয় দেখাশোনা করেন।"

"বাঃ বাঃ শুনে সুখী হলাম। হে উড্ বি (would be) ইন্দ্রজিৎ, আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর। চল এবার সন্দেশগুলো ধ্বংস করা যাক।"

দুইজনে উপরে উঠিয়া গেল।

॥ দশ ॥

নবকিশোর কলেজে আসিয়া দেখিল ওয়ার্ডে হৈ হৈ কাণ্ড। অমৃতবাজার পত্রিকায় কে যেন বেনামীতে একটি চিঠি লিখিয়াছে যে বার্নার্ডো সাহেব না কি ঠিক সময়ে ওয়ার্ডে আসিয়া ছাত্রদের ক্লিনিকস্ দেন না, তিনি সমস্ত সকালটা প্র্যাকটিস করিয়াই কাটাইয়া দিতেছেন। ইহার প্রতিকার হওয়া উচিত। বার্নার্ডো সাহেব নিজেই আসিয়া স্বমুখে খবরটি ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, আমাদের জীবন-মরণ লইয়া কারবার। আমরা সেজন্য সব সময়ে রুটিন বজায় রাখিতে পারি না, কারণ মরণ পূর্বাহ্ণে সময় ঠিক করিয়া আসে না এবং মরণ দ্বারে হানা দিলেই আমাদের ডাক পড়ে। মরণকে

ঠেকাইতে পারি বা না পারি আমাদের ছুটিয়া যাইতে হয়। এজন্যই রুটিন ঠিক রাখিতে পারি না। ছাত্র-হিতৈষী ভদ্রলোকটি খবরের কাগজে চিঠি লিখিয়া আমার বিবেককে সচেতন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এজন্য তিনি আমার ধন্যবাদভাজন। কাল হইতে আমি ঠিক আটটার সময় ওয়ার্ডে আসিব। ঠিক আটটার সময় 'রোল কল' হইবে। যদি কোনও ছেলের আসিতে দেরি হয় সে আর সেদিনের 'পারসেনটেজ' পাইবে না। ইহার পর বার্নাডো সাহেব লিভারের নানারূপ অসুখ সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। ওয়ার্ডে কয়েকটি লিভারের রোগী ছিল। বার্নাডো সাহেব চলিয়া যাইবার পর হৈ-চৈ শুরু হইল। বার্নাডো সাহেবকে খোসামোদ করিতেন এরূপ ডাক্তারের অভাব ছিল না। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছাত্রদের খুব ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "যে কাগজে চিঠি লিখেছ তার উচিত বার্নাডো সাহেবের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া। পিছন থেকে কামড়ানো ভীরু কুকুরের কাজ। তার যদি মনুষ্যত্ব থাকে সে বার্নাডো সাহেবের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাক। কে কাগজে ও চিঠি লিখেছে তা আমরা জানতে পারবই। লুকোনো কিছু থাকবে না। তখন কিন্তু তার সর্বনাশ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।"

যোগেন হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আমি লিখেছি সার। আপনি আমাকে বার্নাডো সাহেবের কাছে নিয়ে চলুন, দেখা যাক কি হয়।"

ডাক্তারটি থতমত খাইয়া গেলেন।

"তুমি লিখেছ ? বিশ্বাস করলাম না। তুমি ভালো ছেলে।"

"আপনি তো একজনকে 'স্কেপ গোট' খাড়া করতে চান। আমাকেই করুন।"

ডাক্তারবাবুর চেহারা বদলাইয়া গেল। তিনি যোগেনের পিঠ চাপড়াইয়া হাসিমুখে বলিলেন—"কি যে পাগলামি কর। যাও যাও সব। বার্নাডো সাহেবকে চটিও না, বুঝলে— হি ইজ্ এ জিনিয়াস (he is a genius)।

ইহার পর সকলে নীলমণির দোকানে গিয়া আড্ডা জমাইল।

সেখানে নবকিশোর দেখিল উৎসাহ এক কোণে বসিয়া চা খাইতেছে। তাহার হাতে প্রবালের আংটি। নবকিশোরকে দেখিয়া সে মুচকি হাসিল একটু।

বার্নাডো সাহেবের ব্যাপার লইয়াই সকলে আলোচনা করিতেছিল, কিন্তু নবকিশোর তাহাতে যোগ দেয় নাই। একটি কথাও বলে নাই সে। চায়ের কাপটি নামাইয়া রাখিয়া সে উৎসাহের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল। অর্থ—চলুন বাইরে যাই।

বাহিরে গিয়া উৎসাহ বলিল, "আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম। জেঠুর একটি পরিচিত লোক এসেছিল আজ আমাদের বাড়িতে। এক বছর আগে তার বাড়িতে ডাকাতি হয়। তখন ডাকাতদের লাঠিতে তার হাত ভাঙে। ওখানকার ডাক্তাররা চিকিৎসা করেছিল, কিছু হয় নি। জেঠু বললেন ওকে, নিয়ে গিয়ে মেডিকেল কলেজে দেখাতে। ওকে এনেছি। এখন কি করতে হবে বলুন।"

"চলুন, সার্জিকাল আউটডোরে যাই। আগে ডাক্তার মুখার্জি ওঁকে দেখুন। তিনি যা বলবেন তাই হবে। প্রবালের আংটিটা পরেছেন দেখছি।"

"কাল তো বলেছি, জেঠুর আদেশ আর অমান্য করব না। জানেন ? ভৈরবী মা কাল থেকে অদৃশ্য হয়েছেন। রাত্রে ফেরেন নি। সকালে খোঁজ করেছিলুম। ব্যাপারটা আমার কাছে আলোর মতো স্বচ্ছ মনে হচ্ছে না।"

"তাই না কি।"

"হ্যাঁ। উনি ভারি অভিমানিনী। হয়তো আমি ওঁকে ছেড়ে চলে এলুম বলে—"

"না, না। উনি নিজেই তো বললেন উৎসাহ যদি যায় যাক, আমার আপত্তি নেই। উনি এখানে থাকবেনও না। কামরূপে যাবেন বললেন।"

"আমাকে তা বলেন নি। চলুন।"

"এই নিন। বরযাত্রী যেতে হবে কিন্তু। পণ্ডিতমশাই আর অতুলবাবুর নিমন্ত্রণ-পত্রটা কি আপনার হাতে দিয়ে দেব?"

নবকিশোর কয়েকখানা নিমন্ত্রণ-পত্র পকেটে করিয়া আনিয়াছিল। উৎসাহ নিমন্ত্রণ-পত্রটার দিকে চাহিয়া হাসিল।

"আপনাকে ট্রেনে প্রথম দিন দেখেই কিন্তু মনে হয়েছিল শিগগিরই আপনার বিয়ে হবে। সে কথা কিন্তু তখন বলি নি। বেশ, ও দুটো পত্রও আমাকে নাম লিখে দিয়ে দিন।"

"অতুলবাবুর পুরো নাম কি।"

"অতুলানন্দ বিশ্বাস। ওঁর সঙ্গে ভাল করে পরিচয় হয়েছে? পানের দোকান নিয়ে থাকেন বটে, কিন্তু যেমন বিদ্বান তেমনি ধনী, তেমনি খেয়ালী। আশ্চর্য লোক উনি।"

"কিছু পরিচয় পেয়েছি।"

"চলুন এবার কোথায় যাবেন।"

"একটা কথা বলব।"

"বলুন—"

"বাইরের পোশাকটা এবার ছেড়ে ফেলা যাক। অনেকক্ষণ পরে আছি। আর 'আপনি' নয়, এবার থেকে তুমি।"

"তথাস্তু।"

সার্জিকাল আউটডোরে ডাক্তার মুখার্জী রামেশ্বর পাণ্ডের ভাঙা হাত দেখিয়া বলিলেন—"অপারেশন করে এ হাড় জুড়তে হবে। একে উইলসন্ সাহেবের ওয়ার্ডে ভর্তি করে দিচ্ছি। সেখানেই নিয়ে যাও!"

ভর্তির কাগজখানি হাতে লইয়া তাহারা সার্জিকাল আউটডোর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রামেশ্বর পাণ্ডে তাগড়া স্বাস্থ্যবান পুরুষ। তাঁহার হাতটাই খালি ভাঙা, অন্যান্য অঙ্গ রীতিমত বলিষ্ঠ। তিনি একজন বড় ব্যবসাদারও। ব্যবসার উপলক্ষেই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বিরাট পণ্ডিতের একজন অনুরাগী শিষ্য হিসাবেই তাঁহার সহিত আজ দেখা করিতে গিয়াছিলেন তিনি। ডাকাতে যে তাঁহার হাত ভাঙিয়া দিবে ইহা না কি বিরাট পণ্ডিত অনেক দিন আগেই তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। আজ না কি বিরাট পণ্ডিত বলিয়াছেন ভাঙা হাত জোড়া লাগিবে কি না সন্দেহ আছে, তবু চেষ্টা করিতে হইবে। নিয়তির হাতে অসহায় পশুর মতো আত্মসমর্পণ করা মানুষের শোভা পায় না। ভাঙা হাড় যাহাতে জোড়া লাগে তাহার বিধিমতো চেষ্টা করিতে হইবে।

রামেশ্বর পাণ্ডে বিহারের লোক। তিনি হিন্দীভাষায় যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম এই যে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হইতে রাজি আছেন। কিন্তু অপারেশনটি শীঘ্র করাইয়া দিতে হইবে। হাসপাতালের বিছানায় শুইয়া শুইয়া তিনি কালক্ষয় করিতে পারিবেন না। তাঁহার বম্বে যাওয়ার কথা পনের দিন পরে। না গেলে ব্যবসায়ের প্রভূত লোকসান হইবে। তাহার মধ্যেই ব্যাপারটা মিটিয়া যাইবে এ প্রতিশ্রুতি না পাইলে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হইবেন না।

উইলসন সাহেবের ওয়ার্ডে গিয়া নবকিশোর দেখিল পুলিন মিত্র সেখানে সিনিয়র হাউস সার্জন হইয়া আসিয়াছেন। সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল। বলিল, "সার, এই 'কেস'টার যাতে তাড়াতাড়ি অপারেশন হ'য়ে যায় সে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।"

"করে দেব। বিরাট পণ্ডিত আমার সম্বন্ধে কিছু বললেন না কি।"

"না।"

"আমার মেয়ে জামাইয়ের কুষ্ঠি দেখেছেন কি ?"

"তা-ও জানি না।"

"সেটা জেনে এসে আমাকে খবর দিও।"

"আচ্ছা। এ 'কেস'টার যাতে—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি দেখব'খন।"

রামেশ্বর পাণ্ডেকে প্রিন্স অব ওয়েলস্ হাসপাতালে ভর্তি করিয়া নবকিশোর ও উৎসাহ ফিরিয়া আসিল।

নবকিশোর বলিল—"আমি নিজেই যাব পণ্ডিতমশায়ের কাছে। নিমন্ত্রণটা নিজে গিয়েই করা উচিত।"

"কখন যাবে—"

"তিনটে নাগাদ। আজ বিকেলে আমার ক্লাস নেই।"

"আমার কিন্তু আছে।"

"আমি একাই যাব। চিঠি দুটো দাও আমাকে।"

॥ এগারো ॥

দুপুরে কলেজ হইতে মেসে ফিরিয়া নবকিশোর দেখিল খাওয়ার মহাসমারোহ। মিঠুর তত্ত্বাবধানে মাছ ভাজা, মাছের কালিয়া, মাছের অম্বল হইয়াছে। সুনীলদা নিজের পকেট হইতে ঘি এবং পেশোয়ারি চালের দাম দিয়াছেন, পোলাও হইতেছে। নবকিশোরের বিবাহ উপলক্ষে মেসে উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মিঠু খবর দিল, ঠিক হইয়া গিয়াছে সকলে চাঁদা করিয়া নবকিশোরকে একটি উৎকৃষ্ট বিলাতী স্যুটকেস কিনিয়া দিবে। তাহার উপর লাল অক্ষরে লেখা থাকিবে 'তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীট হইতে' আর তাহার ভিতরে থাকিবে একখানি ভাল বেনারসী শাড়ি, একটি ভাল গরদের পাঞ্জাবি, একটি শান্তিপুরী জরিপেড়ে কাপড় এবং চাদর। ইহা ছাড়া কিছু এসেন্স এবং সাবান। কেশববাবু না কি স্যুটকেসটি কিনিবার জন্য হগ সাহেবের মার্কেটে চলিয়া গিয়াছেন। স্যুটকেস আসিলে বাকি জিনিস কেনা হইবে।

নবকিশোর আসিতেই সুনীলদা হাসিমুখে আগাইয়া আসিলেন।

"খুব খুশী হয়েছি ভাই। তোমার দাদা বৌদি এসেই চলে গেলেন। আমাদের সঙ্গে দেখা হ'ল না। একটু আগে তাঁরা এসে রাবড়িও দিয়ে গেছেন। ওপরে ওঠেন নি। বিয়ের দিন আলাপ করতে হবে!"

সুনীলদা উপরে চলিয়া গেলেন। তিনি তিনতলায় থাকেন। হরেনবাবু নবকিশোরের সাড়া পাইয়া নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

"ওয়াণ্ডারফুল মাছ ভাই। একখানা ভাজা চেখে দেখেছি। ওয়াণ্ডারফুল।"

একটু পরেই কেশববাবু প্রকাণ্ড স্যুটকেসটা লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাজির হইলেন। তিনি একটু মোটা মানুষ। নবকিশোরের ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—"দেখ পছন্দ হ'ল কি না।"

"কি—"

"স্যুটকেস, তোমার বিয়েতে দেব আমরা। তোমার পছন্দ হ'লে ওর উপর লাল অক্ষর দিয়ে লেখাতে হবে 'তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীট হইতে'। এর চেয়ে ভাল আর পেলাম না।"

"আপনারা কেন এত সব—"

কেশববাবু ধমক দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিলেন, "তা আমরা তোমার সঙ্গে ডিস্কাস্ (discuss) করতে চাই না। পছন্দ হয়েছে কি না বল—"

"খুব পছন্দ হয়েছে। চমৎকার জিনিস তো।"

"বাস—"

খাওয়াদাওয়া শেষ হইতে দেড়টা বাজিয়া গেল। যোগেন বলিল, "গণ্ডেপিণ্ডে তো গিললাম। পেট না ছেড়ে দেয়। একটু অ্যাকোয়া টাইকোটিস খেয়ে ফেলি, কি বল?"

যোগেন প্রায়ই অ্যাকোয়া টাইকোটিস খায়। ঘরেই সেলফের উপর শিশিটা ছিল। খানিকটা খাইয়া ফেলিল সে।

"এইবার একটু শোয়া যাক। তুমিও শুয়ে পড়। প্রচুর খাওয়া হয়েছে।"

গাউ করিয়া সে একটা ঢেঁকুরও তুলিয়া ফেলিল।

নবকিশোরও শুইয়া পড়িয়াছিল। ঘুমাইয়া সে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল একটা। বিরাট পণ্ডিত যেন একটা প্রকাণ্ড কাকের সামনে হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার কপাল দিয়া রক্ত পড়িতেছে।

"আপনার কপালে রক্ত কেন"—নবকিশোর যেন জিজ্ঞাসা করিল।

"ওই কাকটা ঠুক্‌রে দিয়েছে। কিছুতেই ওকে প্রসন্ন করতে পারছি না। মহাপুরুষ, তুমি একটু বল ওকে—"

নবকিশোরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল সে। ঘড়িতে দেখিল আড়াইটা। যোগেনের নাসিকাগর্জন শুরু হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি জামা ছাড়িয়া কাপড় বদলাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। একটা দুর্নিবার আকর্ষণে বিরাট পণ্ডিত তাহাকে যেন টানিতে লাগিলেন।

॥ বারো ॥

গলিতে ঢুকিয়াই অতুলের সঙ্গে দেখা। সে নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া পান সাজিতেছিল। নবকিশোরকে দেখিয়াই স্নিগ্ধ হাস্যে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"আসুন।"

যথারীতি একখিলি পান তুলিয়া ধরিল সে। পানটি লইয়া নবকিশোর বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রটি বাহির করিল।

"যাবেন দয়া করে।"

"হরিকিশোর মুকুজ্যে কি অধ্যাপক হরিকিশোর মুকুজ্যে না কি —"

"হ্যাঁ—"

"আরে! যখন প্রেসিডেন্সিতে পড়তুম, তখন আলাপ হয়েছিল ওঁর সঙ্গে। যদিও উনি বটানির ছাত্র ছিলেন কিন্তু শেলী, কীটস্ আর বায়রন নিয়ে সুন্দর বলেছিলেন একদিন আমাদের এক সাহিত্য সভায়। সেজন্য ওঁর কথাটা মনে আছে। উনি আপনার দাদা? বাঃ বাঃ শুনে সুখী হলাম। নিশ্চয় যাব বিয়েতে। আপনি কোথা যাচ্ছেন এখন?"

"পণ্ডিতমশায়ের কাছে। ওঁকেও নিমন্ত্রণ করতে হবে।"

"নিশ্চয়। উচ্ছে কোথা?"

"সে কলেজে। তার ক্লাস এখন।"

"শান্ত হয়েছে?"

"এখন তো কোনও গোলমাল নেই।"

"আবার বেগড়াবে। ওর মধ্যে জোয়ার-ভাটা খেলে। সেদিন শ্মশান ভৈরবীর সঙ্গে দেখা হ'ল?"

"হ্যাঁ"

"কি রকম লাগল।"

"অদ্ভুত। যা দেখলাম তা —"

"বুঝেছি। বলতে হবে না। বুদ্ধি দিয়ে ওঁদের বিচার করা যায় না। ওই ঠিকানাতেই আছেন এখনও?"

"না। শুনছি কামরূপে চলে গেছেন।"

"তাই না কি। কিন্তু উনি উচ্ছেকে ছেড়ে থাকতে পারবেন কি বেশী দিন? উচ্ছের উপর ওঁর মায়া পড়ে গেছে—"

"কিন্তু আমি যখন গেলাম বললেন উৎসাহ যদি ফিরে যায় আপত্তি করব না আমি—"

"ও 'যদি'টাই রহস্য। ওইটেই 'পিভট্' (pivot)। সাপের ব্যাপারটাও আমি কাল ভেবে দেখেছি। মনে হচ্ছে ওটাও ওই ভৈরবীর কাণ্ড।"

"কি রকম।"

"তন্ত্রের বই পড়ুন, বুঝতে পারবেন। যার কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েছে সে সব করতে পারে।"

নবকিশোরের কাছে এ-সব হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইতেছিল।

বলিল, "কি জানি মশাই। বড়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার এ সব। মাথায় ঢোকে না। আচ্ছা, আমি চলি। বিরাট পণ্ডিত আশা করি এখন একলা আছেন।"

"না। উদীয়মান ঔপন্যাসিক পিনাকীলাল চৌধুরী একটু আগে গেলেন তাঁর কাছে। যান আপনি—চিঠিটা দিয়ে আসুন। যদি গোলমাল বোঝেন সরে পড়বেন। চলে যান।"

অতুল মুচকি হাসিল।

বিরাট পণ্ডিতের দরজা খোলাই ছিল। নবকিশোর দ্বারপথে শুনিতে পাইল—"আপনার একাদশে ভাল গ্রহসংস্থান আছে। আপনার আয় ভাল হবে। কিন্তু মহৎ সাহিত্য আপনি সৃষ্টি করতে পারবেন না। কারণ আপনার বৃহস্পতি নীচস্থ, শুক্র চন্দ্রও খুব ভাল নয়।"

"সমালোচকরা তো আমার বই খুব ভালো বলেছেন।"

"সমালোচক আছে কে মশাই? আর লিখেছেনই বা কি আপনি? দুচারটে প্যানপেনে প্রেমের 'সেক্সি' কেচ্ছা, তা-ও বিলিতি বই থেকে চুরি। পয়সা যতদিন পিটতে পারেন পিটে নিন। আর বেশি কিছু আশা করবেন না।"

নবকিশোর ঢুকিয়া পড়িল।

"আসুন মহাপুরুষ।"

"আমি তাহলে উঠি—"

খানকয়েক নোট বিরাট পণ্ডিতের সামনে রাখিয়া বিখ্যাত ঔপন্যাসিক পিনাকীলাল নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

"কি খবর।"

নবকিশোর নিমন্ত্রণ-পত্রটি সসংকোচে বিরাট পণ্ডিতের হাতে দিল।

"শুভ বিবাহ! কার?"

"আমার। আপনি যদি যান, দাদা খুব খুশী হবেন।"

বিরাট পণ্ডিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রটি পড়িলেন।

"আমি তো কোথাও নিমন্ত্রণ খাই না। বিয়ের পর দিন গিয়ে বউমাকে আশীর্বাদ ক'রে ওই নীলার আংটিটা দিয়ে আসব, আর তাঁকে বলে আসব তিনি যেন ওটা আপনাকে পরিয়ে দেন। শনিটা আপনার একটু খারাপ। আর সব ভাল। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।"

নবকিশোর সামনের চেয়ারটায় বসিল।

"আমিও উচ্ছের বিয়ে দেব ঠিক করেছি। একটি সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়েও সন্ধানে আছে। উচ্ছেরও আপত্তি ছিল না। কিন্তু বাগড়া পড়ে গেল। বামাচরণ এসে গেছে। এতক্ষণ হয়তো উচ্ছের সঙ্গে দেখাও করেছে মেডিকেল কলেজে গিয়ে।"

"বামাচরণ কে।"

"বামাচরণ উচ্ছের মায়ের বাল্যবন্ধু। উচ্ছের জন্ম হবার পাঁচ বছর পরে তার একটি মেয়ে হয়। ওরা উচ্ছের পালটি ঘর। চাটুজ্যে। উচ্ছের মা মরবার কিছুদিন পূর্বে বামাচরণকে একটি চিঠি লিখেছিল। সেই চিঠিতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে যে উচ্ছের সঙ্গে বামাচরণের মেয়ের বিয়ে দেবে সে। এর কিছুতেই অন্যথা হবে না।

আমি মেয়েটিকে দেখেছি। দাঁড়কাকের মতো দেখতে। কালো লম্বা সুঁটকো, মাথায় চুল নেই, চিরুন-দাঁতী, পা খড়মের মতো। তার উপর মুর্খ। মাসতিনেক আগে বামাচরণ আমার কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। আমি মেয়েটির ঠিকুজি চাই। ঠিকুজিও পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঠিকুজি দেখে আমার চক্ষুস্থির। সপ্তমে শনি রবি, অষ্টমে মঙ্গল। উচ্ছেরও লগ্নে মঙ্গল। ও মেয়ে বিধবা হবে। আমি বলে দিয়েছিলাম ও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'তে পারে না। কাল আবার লোকটা এসে হাজির হয়েছে মনোরমার সেই চিঠিটা নিয়ে। উচ্ছের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। চিন্তিত হ'য়ে বসে আছি। উচ্ছে তার মায়ের চিঠি দেখে যদি—"

বিরাট পণ্ডিত থামিয়া গেলেন। তাঁহার রগের শির ফুলিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি বোমার মতো ফাটিয়া পড়িলেন।

"যেমন করে হোক, এ বিয়ে রুকতে হবে—। আপনি আমার সহায় হোন। আজ উচ্ছের সঙ্গে আপনার দেখা হ'বে কি।"

"ঠিক বলতে পাচ্ছি না। আমি এখন দাদার কাছে যাব।"

"একবার কলেজ হয়ে যান না। যদি তার দেখা পান শুধু বলবেন আমার সঙ্গে দেখা না করে সে যেন বামাচরণকে কিছু না বলে—"

"আচ্ছা, চেষ্টা করব। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনাকে না জানিয়ে সে কিছু করবে কি।"

"যে চাঁদ পুর্ণিমায় পুর্ণচন্দ্র, সেই চাঁদই অমাবস্যায় গায়েব। আপনি ওকে চেনেন না—"

একটা মোটর গাড়ি আসিয়া থামিল। পরমুহূর্তেই সেই পুলিশ অফিসারটি প্রবেশ করিলেন।

"বোম্বেতে পুলিশ একটি মেয়েকে অ্যারেস্ট করেছে। সে উইদাউট টিকিটে যাচ্ছিল। তার ফোটো ওরা নিয়েছে। সে ফোটো আসবে দু'চার দিন পরে। কিন্তু মেয়েটি যদি রেলের ভাড়া দিয়ে দেয় তাহলে তাকে বেশী দিন আটকে রাখা যাবে না। আপনি অনেক কাগজেই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, আমিও যতদূর পেরেছি পুলিশ মহলে খবর দিয়েছি। বম্বের খবরটা এখুনি পেলাম। সব চেয়ে ভালো হয়—"

একটু ইতস্তত করিয়া পুলিশ অফিসারটি থামিয়া গেলেন।

বিরাট পণ্ডিত উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "আমি আজকেই বম্বে রওনা হচ্ছি। আমি না গেলে সে আসবে না।"

"আপনি যাবেন?"

"হ্যাঁ। কোথায় যেতে হবে, আপনি—"

"আমি চিঠি দিয়ে দেব। লোকও না হয় দেব একজন। একটা ফোনও করে দিচ্ছি মেয়েটিকে যাতে না ছাড়ে! আপনি কষ্ট করে না গিয়ে আর কাউকে যদি পাঠাতে পারতেন—"

"আমার কেউ নেই। তীর্থের কাকরা এসে মাঝে মাঝে জড় হয়, তারপর কার্যসিদ্ধি হ'লেই চলে যায়। ওরে গাঁট্টা একটা ট্যাক্সি ডাক। বম্বে মেল তো সন্ধ্যার সময় ছাড়ে—"

"চলুন, আমিই না হয় আপনাকে তুলে দিয়ে আসি। সঙ্গে গাড়ি আছে।"

"তাহলে তো খুবই ভাল হয়। ওরে গাট্টা, আমার ট্রাঙ্কটা আর বিছানাটা তুলে দে মোটরে।"

বাক্স হইতে কিছু টাকা বাহির করিয়া আবার হাঁকিলেন, "ওরে গাট্টা এই টাকাগুলো বাক্সে পুরে দে—"

তাহার পর সহসা তিনি নবকিশোর সম্বন্ধে সচেতন হইলেন।

"মহাপুরুষ, ফিরে এসে বৌমাকে আশীর্বাদ করব। তুমি উচ্ছের সঙ্গে দেখা করে সব বৃত্তান্ত খুলে বোলো তাকে। ওকে রুকতে হবে। যেমন করেই হোক রুকতে হবে!"

"আমি তাহলে চলি—"

"আমরাই তোমাকে মেডিকেল কলেজের সামনে নাবিয়ে দিতে পারি।"

"জায়গা হ'বে তো গাড়িতে?"

পুলিশ অফিসার বলিলেন—"একটা ভ্যান নিয়ে এসেছি। প্রচুর জায়গা আছে—"

"ও হ্যাঁ"—বিরাট পণ্ডিত নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"এই খামটাও নিয়ে যাও। তোমাদের পুলিন ডাক্তারকে দিয়ে দিও। কুষ্টি-বিচার করে সব লিখে দিয়েছি। তিনি হয়তো এসে ফিরে যাবেন—"

নবকিশোর খামটি পকেটে পুরিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাট্টা বিরাট পণ্ডিতের ট্রাঙ্ক ও বিছানা লইয়া প্রবেশ করিতেই বিরাট পণ্ডিত তাহাকে বলিলেন—"তোমাকে একশ টাকা দিয়ে যাচ্ছি। উচ্ছে যদি আসে তাকে ভাল করে মাংসের কোর্মা করে দেবে। আমার ফিরতে যদি দেরি হয়, ওতলোর কাছ থেকে টাকা নিও—"

একটু পরেই সকলকে লইয়া পুলিশ ভ্যান বাহির হইয়া গেল।

॥ তেরো ॥

নবকিশোর মেডিকেল কলেজের সামনে যখন নামিল তখন পোনে পাঁচটা। সে কলেজের ভিতর ঢুকিয়া খোঁজ করিল ফার্স্ট ইয়ার ছেলেদের কোনও ক্লাস তখনও চলিতেছে কি না। হঠাৎ নজরে পড়িল 'অ্যানাটমি হল' খোলা আছে। হয়তো 'ডিসেক্শন্' আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। 'অ্যানাটমি হলে' ঢুকিয়া উৎসাহের দেখা পাইয়া গেল সে। উৎসাহ বিরাট একটা উপুড়-করা ফিমেল বডির নিতম্বদেশের খানিকটা মাংস কাটিয়া এবং চর্বি সরাইয়া কি যেন খুঁজিতেছে।

"উৎসাহ—"

"তুমি এখানে এখন!"

"দরকার আছে তোমার সঙ্গে একটু। কতক্ষণ কাজ করবে।"

"হ'য়ে গেল প্রায়। এত ফ্যাট (fat) যে নার্ভগুলো খুঁজে পাচ্ছি না।"

"খোঁজ। আমি তাহ'লে চললাম এখন। তুমি এখান থেকে বাড়ি ফিরবে তো?"

"না। অন্য আর এক জায়গায় যাবার কথা আছে।"

"আমি এখন দাদার কাছে যাচ্ছি। ফিরতে আটটা হবে। তখন তোমাকে কোথায় পাব।"

"ততক্ষণে বাড়ি ফিরে যাব।"

"তাহলে বাড়িতেই আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো, আমি আটটার পর সেখানেই যাব না হয়। বিরাট পণ্ডিতমশায় একটু আগে জরির খবর পেয়ে বম্বে চলে গেলেন!"

"জরি বম্বে চলে গেছে!"

"জরি কি না সেইটে ঠিক করতেই যাচ্ছেন উনি। পুলিশ সেখানে একটি মেয়েকে অ্যারেস্ট করেছে। তার চেহারা না কি অনেকটা জরির মতন।"

উৎসাহ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিল, "বেশ, বাড়িতে অপেক্ষা করব। তুমি এসো।"

হরিশ মুকুজ্যে রোডের বাড়িতে আনন্দের সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। যদিও নবকিশোরের নিকট আত্মীয়ের মধ্যে জ্যাঠাইমা, দিদি এবং বুলু ছাড়া আর কেহ নাই, তবু বাড়ি গমগম করিতেছে। জ্যাঠাইমার ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীরা, দিদির দুই মেয়ে কণিকা ও মণিকা তো আসিয়াছেই, উপরন্তু আসিয়াছে, হরিকিশোরবাবুর বন্ধুর ছেলেমেয়েরা। রঘুনাথ ভেইয়ার সঙ্গেও ভাগলপুরের পুরাতন বন্ধু-বান্ধব এবং তাহাদের পরিবারবর্গ আসিয়াছেন। নবকিশোর গিয়া দেখিল হরিকিশোর, জ্যাঠাইমা, দিদি এবং রঘুনাথ ভেইয়া একটা টেবিলে ব্রিজ খেলিতে বসিয়াছেন। জ্যাঠাইমার সমস্ত চুল সাদা, ব্যাটাছেলের মতো ছাঁটা, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা মোটা কালো ফ্রেমের। দেখিলে হঠাৎ পুরুষ বলিয়া ভ্রম হয়। মনে হয় কোন অধ্যাপক বা জজ বুঝি। ব্রিজ খেলায় তিনি না কি অপরাজেয়। হরিকিশোর অতি কাঁচা খেলোয়াড়। তাঁহাকেই পার্টনার লইয়া তিনি বসিয়াছেন এবং তবু জিতিতেছেন। রঘুনাথ ভেইয়ার মুখে চোখে একটা স্নিগ্ধ সম্ভ্রমপূর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মল্লযুদ্ধে তিনিও অপরাজেয়, কিন্তু তাসের ব্যাপারে তিনি নাচার। বড়দার অনুরোধে বসিতে হইয়াছে। তাছাড়া বড়ী মাইজি জিতিতেছেন ইহা তো গৌরবের কথাই। এই ধরণের একটা মিশ্রিত মনোভাব তাঁহার সারামুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। নবকিশোরকে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"এই যে ছোটদা, এসে গেছ। বুলু মা তোমার অপেক্ষায় বসে আছে। যাও ও ঘরে যাও—"

পাশের ঘরে যাইতেই বুলু ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। "আচ্ছা, তোমার কি কাণ্ড বল দেখি, কাকু। তোমার বিয়ে, তোমারই পাত্তা নেই! মাপ নেবে বলে দর্জি সেই কখন থেকে এসে বসে আছে। কাকিমার জন্যে একটা ব্লাউসে প্যাটার্ন তুলেছি, দেখবে? তোমার যদি পছন্দ না হয়, প্যাটার্ন বুক থেকে আর একটা পছন্দ করে দাও, এখনও সময় আছে—আর জানো কাকু—শোন—"

নবকিশোরের কানে কানে ফিস ফিস করিয়া বলিল, "বাবাকে বল না, গাড়িটা নিয়ে আমরা দু'জনে বেরিয়ে যাই। দিদু ব্রিজ খেলে আজ পর্যন্ত যা জিতেছেন তা সব জমিয়ে রেখেছিলেন। আমাকে বললেন, তুই পছন্দ করে নবুর জন্যে কিছু একটা কিনে দে। পাঁচশ' ছাপ্পান্ন টাকা দিয়েছেন। কি সুন্দর ছোট্ট মিণ্টি একটা রেডিও দেখে এসেছি দোকানে। নতুন এসেছে। কিনব সেটা তোমার জন্যে? ওই টাকাতে হ'য়ে যাবে। তোমার যদি পছন্দ হয় তাহলে ওদের বলি সোনার জলে কাকিমার নাম লিখে দিক তাতে। ওরা বলেছে লিখে দিতে পারবে। হস্র্ব এসে গেছে। চল না

তাকে নিয়ে বেরুই। বাবা তাস নিয়ে বসেছে, এখন উঠবে না। তুমি বল না বাবাকে একটু। হর্সুখ নিয়ে যাবে বলেছে—"

হর্সুখ (হর-সুখ) হরিকিশোরবাবুর ড্রাইভার।

নবকিশোর বলিল—"আমি দাদাকে বলতে পারব না।"

"আচ্ছা আমি দুধমাকে দিয়ে বলাচ্ছি তাহলে। দুধমা তেতলায় আছেন। চল। কণিকা আর মণিকাকে দেখেছ ইদানীং? কি মিষ্টি যে হয়েছে দেখতে। কণিকা পড়াশোনায় ভীষণ ভালো। কোনও সাবজেক্টে সেকেণ্ড হয় না। মণিকা পড়াশোনায় সাধারণ কিন্তু কী ছবি আঁকে! তোমার জন্যে একটা হর-গৌরী এঁকে এনেছে দেখবে চল—"

ঘরের বাহির হইতে না হইতেই কণিকা মণিকার সহিত দেখা হইয়া গেল। কণিকা শ্যামবর্ণা, মণিকা ফরসা। দুইজনেই হাসিমুখে আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল। ভাগলপুর হইতে আগতা দিদিমা-সম্পর্কের হৃষ্টপুষ্টা এক বয়স্কা বিহারী মহিলা নবকিশোরকে দেখিয়া বিহারী ভাষায় গান গাহিয়া উঠিলেন—

পহুনা আইলো রে ননদিয়া পানি দে
মোঢ়া তামাকু দে আম ক্ষীর সানি দে—

[ওগো ননদী, অতিথি এসেছে, তাকে জল দাও, মোড়া দাও, তামাক দাও, তারপর ক্ষীরের সঙ্গে আম মেখে দাও]

তাহার পর তিনি নবকিশোরের থুতনি নাড়িয়া আদর করিয়া হিন্দী ভাষায় বলিলেন—"এতক্ষণ কোথায় ছিলে? লুকিয়ে লুকিয়ে বউ দেখতে গেসলে না কি!"

একটা হাসির কলরব উঠিল। বুলু নবকিশোরকে টানিতে টানিতে তেতলায় লইয়া গেল। নাম যদিও দুধমা (বুলুকে ছেলেবেলায় দুধ খাওয়াইয়াছিলেন বলিয়া) রং কিন্তু বেশ কালো। মোটা থলথলে চেহারা। মুখটি অবিকল হরিকিশোরবাবুর মতো, কেবল গোঁফ নাই। তিনি একগাদা নূতন শাড়ি কাপড় লইয়া গোছাইতেছিলেন কাহাকে কোনটা দিতে হইবে। বুলু ঘরে ঢুকিয়াই আবদার-মাখা কণ্ঠে বলিল, "দুধমা, তুমি বাবাকে বল না একবার মোটরটা দিতে। কাকুকে নিয়ে একটু বেরুই। হর্সুখ তো এসে গেছে— "

"আমি বলতে গিয়ে বকুনি খেয়ে মরি আর কি। কেন এখন বেরুবি?"

"বাঃ, কাকুর যে এখনও কিছুই কেনা হয় নি। জুতো মোজা রুমাল। দোকানে না গেলে কিনব কি করে?"

"সে শ্রবণা বুঝবে। তুই মাথা ঘামাচ্ছিস কেন।"

"মায়ের মাথায় এখন পিয়ানো ঘুরছে! বাবার সঙ্গে কথা কাটা-কাটি হ'য়ে গেছে এই নিয়ে। রেগে টং হয়ে বসে আছে মা। তাকে এখন কিছু বলতে গেলেই বকুনি খেতে হবে। তুমি একবার চল না, তুমি বললেই বাবা রাজি হ'য়ে যাবে।"

"বাবা, বাবা! আচ্ছা চল।"

নবকিশোরের দিদির কোমরে বাত। বুলুর হাত ধরিয়া তিনি অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইতেই নবকিশোর তাহার দিদিকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। তিনি থুতনিতে হাত দিয়া চুমু খাইলেন।

"বলু দিদিকে কেন কষ্ট করে সিঁড়ি দিয়ে নাবতে বলছ—"

"না আমার কোন কষ্ট হবে না। একটু চললেই ঠিক হ'য়ে যাবে। তাছাড়া ও যখন জেদ ধরেছে ছাড়বে না কি। সমানে ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকবে। তার চেয়ে চল বলেই আসি। শ্রবণার ব্যাপারটাও শুনিগে।"

দুধমা নীচে গিয়া হরিকিশোরকে অনুরোধ করিলেন না, আদেশ করিলেন।

"হসুর্খকে বল গাড়িটা বার করতে। বুলু আর নবু বেরুবে। নবুর জুতো কেনা দরকার। আরও টুকিটাকি কি সব কিনবে। সেরে আসুক—"

হরিকিশোর তাসে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া ছিলেন। হাঁক দিলেন—"হসুর্খ। গাড়ি নিকালকে ছোটবাবুকো লে যাও।"

হসুর্খ উর্দি পরিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল। সেলাম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শ্রবণাও পাশের ঘর হইতে বাহির হইলেন।

"আমিও যাই ওদের সঙ্গে। পিয়ানোটা—"

হরিকিশোর তাস হইতে দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, "পিয়ানো কেনবার আগে জেনে এস প্রমীলা পিয়ানো বাজাতে পারে কি না। পিয়ানো বাজাতে না জানলে শুধু শুধু—"

"না জানলে মাস্টার রেখে শিখিয়ে নেব। আমার শখ ছিল হয় নি। নবুর বৌকে দিয়ে আমি সে শখ মেটাব।"

জ্যাঠাইমা একটা তাস ফেলিয়া বলিলেন, "যা, যা, কিনেই নিয়ে আয়। ওর শখ হয়েছে, তুমি বাধা দিচ্ছ কেন হরু—"

হরিকিশোর অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

"না, না, বাধা দেব কেন। মানে—"

শ্রবণা কাপড় বদলাইবার জন্য পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। যে কাপড় পরিয়া ছিলেন তাহাতে নিন্দনীয় কিছু ছিল না। ভালো শান্তিপুরের শাড়ি। কিন্তু তবু বাহিরে যাইবার পূর্বে কাপড়টা বদলাইয়া আয়নার সামনে একবার না দাঁড়াইতে পারিলে তিনি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেন।

এই উৎসব সমারোহের মধ্যে নবকিশোর সহসা কেমন যেন একটু বিমর্ষ বোধ করিতে লাগিল। উৎসাহের কথা মনে পড়িল তাহার। মনে হইল কি একটা অদৃশ্য অশনি যেন তাহার মাথার উপর উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। মনে প্রশ্নও জাগিল নানা রকম। উৎসাহ নিজে জ্যোতিষী—গার্ড সাহেবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া সে তাহার ভবিষ্যৎ বলিয়া দিয়াছে, অথচ নিজের বেলায়—। নিশ্চয় কিছু একটা রহস্য আছে। শবব্যবচ্ছেদরত উৎসাহের চেহারাটা বারবার মনে পড়িতে লাগিল তাহার। উৎসাহকে তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে, উহার মধ্যে কেমন যেন একটা প্রাণবন্ত বিশেষত্ব আছে। বিরাট পণ্ডিত উহার বাবা? উৎসাহ সে কথা জানে না নিশ্চয়। সে তাঁহাকে জ্যাঠা-মশাই বলিয়া জানে? জরিও তাঁহাকে জেঠু বলিয়া ডাকে। এ রহস্যের আড়ালেই বা কি আছে। কেন এই লুকোচুরি? উৎসাহের কথাই বারবার মনে হইতে লাগিল তাহার। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে উৎসব যে প্রাচুর্য উথলাইয়া উঠিতেছে, উৎসাহের জীবনে তাহা নাই কেন। কেন এ অসাম্য, এ বিসদৃশ ব্যবস্থার জন্য দায়ী কে, সমাজ না নিয়তি, ইহজন্ম না পূর্বজন্মের ফলাফল? উৎসাহের চেহারাটা আবার মনে

পড়িল। সত্যই উহার মধ্যে একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। বিরাট পণ্ডিতের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করিয়াছিল, অথচ সে-ই আবার বিরাট পণ্ডিতেরই পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আপনি এবার থেকে যা বলবেন তা আমি নির্বিচারে পালন করব।" দুইটি বিভিন্ন সত্তা যেন উহার মধ্যে দ্বন্দ্ব করিতেছে। একজন বিদ্রোহী আর একজন আত্মসমর্পণ করিবার জন্য উন্মুখ। আর ওই আশ্চর্য নারী শ্মশান-ভৈরবীর স্বরূপই বা কি? উৎসাহের সহিত তাহার কি সম্পর্ক? উৎসাহের প্রতি উনি অত অনুরাগিণী কেন? এইসব নানা কথা ভাবিয়া তাহার মনটা যেন কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ভয় হইল। মনে হইতে লাগিল উৎসাহের সব স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া যাক। তাহার দাদা, বৌদি, বুলু, দিদি, জ্যাঠাইমা, তাহার অদেখা বধূ প্রমীলা তাহার জীবনকে আলোকিত করিয়া থাকুক। কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জিত হইল সে। কেবল নিজেকে লইয়া থাকিব এ রকম স্বার্থপরের মতো প্রবৃত্তি তাহার মনে কেন জাগিতেছে?

"চল—"

এসেন্সের গন্ধ বিকীর্ণ করিতে করিতে সুসজ্জিতা শ্রবণা পাশের ঘর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে বুলু। সে-ও একটু প্রসাধন করিয়াছে। নবকিশোরের মনে হইল বুলু যেন শ্রবণার ছোট বোন, মেয়ে নয়।

মোটরে চড়িয়া শ্রবণা বলিলেন, "ঠাকুরপো, প্রমীলার বাড়ি যাব না কি। চল না একটা 'সারপ্রাইজ্' ভিজিট (surprise visit) দি। তুমি তো ওকে দেখ নি এখনও—"

"আপনারা দেখেছেন তো। বিয়ের পর একেবারে দেখা যাবে।"

"সত্যি খুব সুন্দর। ভয় হচ্ছে—"

"কেন।"

"ওকে পেয়ে আমাদের না ভুলে যাও।"

নবকিশোর কেবল একটু হাসিল, কোন উত্তর দিল না। কিছুদূর গিয়া বলিল, "আমাকে আটটার একটু আগে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সামনে কিংবা মদন চ্যাটার্জি লেনে নাবিয়ে দিও।"

"কেন—"

"ওখানে একজন বন্ধু আছে। দরকার আছে তার সঙ্গে।"

॥ চৌদ্দ ॥

বিরাট পণ্ডিতের বাড়ির সামনে হরিকিশোরবাবুর 'কার'টা নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। নবকিশোর নামিয়া পড়িতেই সেটা আবার বাহির হইয়া গেল। বাড়িটার সম্মুখে নবকিশোর দাঁড়াইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। স্বল্পালোকে বাড়িটা কেমন যেন রহস্যময় মনে হইতে লাগিল। সামনের কপাটটা খোলা। ভিতরে ঢুকিয়া আরও অবাক্ হইয়া গেল সে। একটা অপূর্ব গন্ধে সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ। ঘরে আলো নাই।

"উৎসাহ—"

"এসেছ? যাই—"

আলো জ্বলিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই উৎসাহ আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার চোখের দৃষ্টি প্রদীপ্ত, নাসারন্ধ্র ঈষৎ বিস্ফারিত। মনে হইল সে যেন একটু উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছে।

"ঘরে কিসের গন্ধ ভাই ? বড় চমৎকার গন্ধ।"

"সমস্ত বাড়ি গন্ধে ভরে আছে। মধুমতী এসেছিলেন।"

"মধুমতী ? তিনি কে।"

"ডামর-তন্ত্র, তন্ত্রসার, ভূতডামর এ সব বই নিশ্চয়ই পড় নি কখনও।"

"না।"

"পড়লে বুঝতে অসুবিধা হ'ত না মধুমতী কে। মধুমতী একজন যোগিনী। সাধনা করলে তিনি দেখা দেন। আমি আই. এসসি পাস করে যখন দারিদ্র্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তির অভাবে মেডিকেল কলেজে ঢুকতে পারলাম না, তখন দিনকতকের জন্য বিবাগী হ'য়ে যাই। সেই সময় শ্মশান-ভৈরবীর সঙ্গে দেখা হয় আমার। তাঁর কথা শুনে তাঁর চেহারা দেখে আমি খুব আকৃষ্ট হই তাঁর প্রতি। আমার সব কথা শুনে তিনি বললেন, তুমি মধুমতীর সাধনা কর—তাহলে তোমার ঐহিক ভোগসুখের কোনও অভাব হবে না। তুমি উপযুক্ত আধার, তোমাকে আমি দীক্ষা দেব। দীক্ষা দিলেন। আমি এক নির্জন প্রান্তরে বসে তাঁর উপদেশ মতো সাধনায় লেগে গেলাম। ক'দিন সাধনা করেছিলাম তা মনে নেই। হঠাৎ একদিন ভোরে—সবে তখন উষার আলো ফুটি-ফুটি করছে, পাখীরা তখনও জাগে নি, হঠাৎ দেখি অপরূপ গন্ধে ভরে গেছে চারদিক। এ গন্ধ আগে কখনও পাই নি। চোখ খুলে দেখি অপরূপ এক সুন্দরী আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। যে মন্ত্র অহরহ ধ্যান করছিলাম—

ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসংকাশাং নানারত্নবিভূষিতাং
মঞ্জীর-হারকেয়ূর-রত্নকুণ্ডল-মণ্ডিতাম্

সেই মন্ত্রই যেন মূর্তি ধরে আবির্ভূত হ'ল চোখের সামনে। মন্ত্রে গন্ধের কথা নেই, কিন্তু গন্ধে ভরে গেল দশদিক। আমি বিভোর বিস্মিত আচ্ছন্ন হ'য়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। আর বলতে লজ্জা করছে, কিন্তু না বললেও ব্যাপারটা তোমার কাছে আলোর মতো স্বচ্ছ হবে না—তাকে দেখেই আমি তার প্রেমে পড়ে গেলাম। হ্যাঁ, লভ্ অ্যাট্ ফার্স্ট সাইট (love at first sight)—সত্যি বলছি, পা হড়কে পড়ে গেলাম গভীর জলে। গভীর সমুদ্রে। মধুমতী আমার কাছে বসলেন এবং স্মিতমুখে বললেন—'আমি এসেছি। আমি তোমারই। আমি তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য দেব। স্বর্ণ দেব, রত্ন দেব, শক্তি দেব, দিব্যদৃষ্টি দেব। তুমি যে-কোনও লোককে দেখে তার বিপদ প্রত্যক্ষ করতে পারবে, যে-কোন উলঙ্গ লোকের দশাঙ্গ দেখে তার ভবিষ্যৎ বলতে পারবে। কিন্তু একটি বিষয়ে তোমাকে অন্ধ করে দিচ্ছি। নিজের সম্বন্ধে তুমি কিছু জানতে পারবে না, কিছু দেখতে পাবে না। কিছু জানতে চেও না। তুমি কেবল আমার থাক। কোনও ভয় নেই। এই নাও।' আমাকে একথলি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। বললেন—'সঞ্চয় কোরো না, খরচ করে ফেল। ফুরিয়ে গেলে আবার দেব'—এই বলে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন তিনি। শ্মশান-ভৈরবীকে বললাম সব। তিনি বললেন তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ। কিন্তু এখন তোমাকে খুব সাবধানে সংযমী স্বাবলম্বী হ'য়ে থাকতে হ'বে। মধুমতীর কাছ থেকে অর্থ নিও না। অর্থ অনর্থের মূল। ও টাকা

আজই কোথাও দান করে দাও। নিজের জন্য খরচ কোরো না। আর একটা কথা, অন্য কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি না হয় যেন। তাহলে মধুমতী সর্বনাশ করে দেবে। মধুমতী তোমাকে যে দিব্যদৃষ্টি দিয়েছেন তাতেও তুমি শান্তি পাবে না। কিন্তু ও শক্তি তোমার বেশী দিন থাকবে না, অহমিকার ধাক্কায় নষ্ট হয়ে যাবে ওটা। তুমি সাধনায় এত সহজে সিদ্ধি লাভ করতে পারবে, মধুমতীকে এত সহজে পাবে তা আমি আশা করি নি। তোমার শক্তি দেখে আশ্চর্য হয়েছি। তোমার অভাব অনটনের কথা শুনে তোমাকে মধুমতীর সাধনা করতে বলেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভুল বলেছিলাম। তোমার যা শক্তি তাতে তুমি ব্রহ্মপদ লাভ করতে পারবে। মধুমতীর ঐশ্বর্যে তুমি ভুলো না। ভৈরবীর আদেশ অনুসারেই আমি চলছি তার পর থেকে। মধুমতী কিন্তু এখনও আসে মাঝে মাঝে। এসে আমাকে প্রলুব্ধ করে। বলে, জীবনকে ভোগ কর। যখন আসে তখন আমি পাগলের মতো হ'য়ে যাই। কেমন যেন নেশা ধরে। মাঝে মাঝে মনে হয় ভৈরবীর কথা অগ্রাহ্য করে গা ভাসিয়ে দিই। কিন্তু পারি না। ভৈরবীকে ভয় করে।"

"ওই ভৈরবী কে? কি করে ওর সঙ্গে পরিচয় হ'ল তোমার? ওঁর মধ্যে ভয়ংকর তো কিছু দেখলাম না।"

"ও'র সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এক শ্মশানের ধারে জঙ্গলের মধ্যে। আমি তখন বিবাগী। যা পয়সা সঙ্গে করে বেরিয়েছিলাম যখন তা ফুরিয়ে গেল তখন হাঁটতে লাগলাম। একদিন হাঁটতে হাঁটতে এসে পেঁছিলাম ওই শ্মশানে। দেখলাম চিতা জ্বলছে। সরে গেলাম সেখান থেকে। সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছিল। শ্মশানের ধারে বড় বড় শিমুল আর তালগাছ। আর তাতে অসংখ্য শকুনি বসে আছে। আরও দূরে চলে গেলাম সেখান থেকে। গিয়ে প্রবেশ করলাম এক জঙ্গলে। সেখানেও বড় বড় গাছ। একটা বটগাছের নীচে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আর হাঁটতে পারছিলাম না। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। একটা অদ্ভুত হাসি শুনতে পেলাম। সে হাসিকে খিল খিল, খল খল বা হা হা বলে বর্ণনা করা যাবে না। কহ কহ কহ কহ বললে কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে। শুধু হাসি নয়, তার সঙ্গে ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ বাজনা। যেন পাঁয়জোর পায়ে দিয়ে হাসির তালে তালে কেউ নাচছে। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল আমার। গাছতলা থেকে উঠে পড়লাম। দেখলাম চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। গাছগুলোর আড়াল দিয়ে দেখতে পেলাম গাছগুলোর ওপারে ফাঁকা মাঠ রয়েছে একটা। সেইদিকেই এগুলাম আস্তে আস্তে। গিয়ে কি দেখলাম আন্দাজ কর তো—"

"আমি কিছুই আন্দাজ করতে পাচ্ছি না।"

"দেখলাম জীবন্ত ছিন্নমস্তা মূর্তি, নিজের মুণ্ডটা হাতে করে পাঁয়জোর পরে নেচে বেড়াচ্ছেন সেই ফাঁকা জায়গায়। রক্তের ধারা ফোয়ারার মতো উঠে কাটা মুণ্ডের উপর পড়ছে। আর মুণ্ডটা হাসছে কহ কহ কহ কহ। আমি চীৎকার করে অজ্ঞান হ'য়ে গেলাম। যখন জ্ঞান হ'ল তখন সকাল হ'য়ে গেছে। দেখলাম কার কোলে যেন মাথা রেখে শুয়ে আছি। উঠে পড়লাম টপ করে। দেখলাম একটি অপূর্ব সুন্দরী যুবতী বসে আছেন আর তাঁর আশ্চর্য দু'টি চোখ থেকে করুণার ধারা বিগলিত হয়ে

পড়ছে। মধুর কণ্ঠে বললেন, বাবা তুমি ভয় পেয়েছো। ভয়ের কোনও কারণ নেই। চল তুমি আমার সঙ্গে, আমার আশ্রমে। বেশী দূরে নয়, কাছেই। ভৈরবী মার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। তাঁর আশ্রমে গেলাম। ভৈরবী মা তাঁর সেই তেড়াবেঁকা জোড়া-লাগানো কাঠের আসনে বসলেন। পরে জেনেছি নানা চিতার কাঠ জুড়ে জুড়ে ওই আসনটি করিয়েছেন তিনি। সেই আসনে বসে তিনি আমার সব কথা শুনলেন। তার দু'দিন পরে আমাকে দীক্ষা দিলেন যোগিনী সাধনায়। ওই প্রান্তরে বসেই আমি মধুমতীর দেখা পাই। ভৈরবী মা একটি ফেনোমেনন (phenomenon)। তাঁর শক্তির কুল-কিনারা পাই নি। পাব এ আশাও নেই। তিনি ইচ্ছামত যে-কোনও রূপ ধারণ করতে পারেন। প্রথম দিন যে জীবন্ত ছিন্নমস্তাকে দেখেছিলাম, তিনি ভৈরবী মা-ই। পরদিন যে রূপসী যুবতীকে দেখলাম তিনিও ভৈরবী মা—তখন ষোড়শী মূর্তি ধারণ করেছিলেন। তুমি যাঁকে দেখেছ। সেই প্রৌঢ়া কার রূপ তা আমি জানি না, আমি তাঁকে ওই প্রৌঢ়া রূপে থাকতেই অনুরোধ করছি। সমাজে ঘোরাফেরা করতে হলে ওই সাদা-মাটা রূপই ভালো। উনি এখানে এসে ষোড়শী রূপে ছিলেন কিছুদিন। বিরাট পণ্ডিতের পর্যন্ত মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। জরি ওঁকে বলত ডাইনি। শেষ পর্যন্ত চলে যেতে হ'ল তাঁকে। সেদিন যে সাপটা এসেছিল আমার ধারণা সাপের বেশে ভৈরবী মা-ই এসেছিলেন আমাকে বাঁচাতে। বিরাট পণ্ডিত বুঝতে পেরেছিলেন সেটা, কিন্তু মহা বুদ্ধিমান লোক তো, আব একটা মানে বের করে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে। আমি যে জটিল জালে জড়িয়ে আছি এবার তা আলোর মতো স্বচ্ছ হয়েছে আশা করি।"

"না, হয় নি। ও সব অলৌকিক ব্যাপার আমি বুঝিও না, ও নিয়ে তর্ক করবার ইচ্ছেও নেই। বিরাট পণ্ডিতের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কিন্তু কি রকম গোলমেলে ঠেকছে আমার। এই তুমি ওঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছ, আবার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে ধরে কেঁদে বলছ আপনার কথা আর অমান্য করব না। আবার শুনছি ওঁর মতের বিরুদ্ধে কোথায় না কি বিয়ে করতে যাচ্ছ।"

"ও, শুনেছ একথা? মধুমতীও এসেছিলেন ওই জন্যে, তিনিও আমাকে শাসিয়ে গেছেন যদি আমি বিয়ে করি তাহলে আমার ভালো হবে না। মধুমতীও ডিক্‌টেটার। তাঁর ইচ্ছে আমি তাঁর স্লেভ (slave) হ'য়ে থাকি। আজও আবার অনেকগুলো মোহর রেখে গেছেন। দেখবে ."

উৎসাহ উঠিয়া গেল এবং পাশের ঘর হইতে বেশ বড় একটা থলি আনিয়া নবকিশোরের সামনে উপুড় করিয়া দিল। অবাক্‌ হইয়া গেল সে। একসঙ্গে এত মোহর সে আগে কখনও দেখে নাই। মোহরগুলি থলির মধ্যে পুরিতে পুরিতে উৎসাহ বলিল, "কিন্তু আমি কারও স্লেভ (slave) হব না, তা তিনি যে-ই হোন। বিরাট পণ্ডিতের ব্যাপারটা আলোর মতো স্বচ্ছ করে দেব? এই পৃথিবীতে উৎসাহ মুকুজ্যে তার অস্তিত্বের জন্যে কার কাছে ঋণী জান? বিরাট পণ্ডিতের কাছে। উনি আমাকে খাইয়েছেন, পরিয়েছেন, আমাকে অ আ ক খ থেকে আরম্ভ করে এম. এসসি. পর্যন্ত পড়িয়েছেন, শুধু স্কুল-কলেজের মাইনে দিয়েই নিজের কর্তব্য শেষ করেন নি, আমাকে সামনে বসিয়ে গুরুমশাইয়ের মতো পড়িয়েছেন রাত জেগে জেগে, বেত হাতে নিয়ে। ওঁর চেয়ে বড় হিতৈষী আমার

আর কেউ নেই। এ কথাটা আমি ভুলতে পারি না। ভুলতে পারি না যে বিরাটেশ্বর শর্মার নামটাই শুধু বিরাটেশ্বর নয়, মনীষাতেও উনি বিরাটেশ্বর, এত বিষয়ে এত অগাধ পাণ্ডিত্য আমি আর কারও দেখি নি। উনি না থাকলে আমি সংসার-স্রোতে খড়ের টুকরোর মতো ভেসে যেতাম। এ সব আমি ভুলতে পারি না। কিন্তু আর একটা কথাও ভুলতে পারি না। বিরাটেশ্বর শর্মার পাণ্ডিত্যের যেমন তুলনা নেই, তেমনই ও'র নীচতার, চরিত্রহীনতার, নিষ্ঠুরতার, মিথ্যাচারের, ভণ্ডামিরও তুলনা নেই। নিজের স্বার্থের জন্য উনি সব সহ্য করতে পারেন। এই বয়সেও ও'র একজন রক্ষিতা আছে সোনাগাছিতে। কোনও সংযমের ধার ধারেন না। নানা রকম বিচিত্র ধরনের খাওয়া উনি খান। কেবল খাসি মটন মুর্গিতে ও'র তৃপ্তি হয় না, মাঝে মাঝে অনেক টাকা খরচ করে হরিণ, ময়ূর, বটের, তিতিরের মাংসও খান উনি এই কলকাতা শহরে বসে। হেরিং স্যামনেও (salmon) রুচি খুব। নানারকম আতর ও'র রোজ চাই। আগে ঋণ করেও এ-সব কিনতেন। ঋণভারে জর্জরিত -হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুদিন থেকে রত্নের ব্যবসা করে উনি অবশ্য অনেক টাকা উপার্জন করছেন। আমার মনে হয় রত্নের ব্যবসাটা ও'র লোক-ঠকানো ব্যবসা। কিন্তু উনি খুব ভালো জ্যোতিষী, যা বলেন তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়, সেইজন্যে লোকে ও'র দেওয়া পাথর আগ্রহ করে কিনে নিয়ে যায়। এই সব কারণে মনটা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে আমার। মানে, ঠিক যেন দোলনা হয়ে যাই। কখনও এ এক্‌স্‌ট্রিমে (extreme) চলে যাই, কখনও ও এক্‌স্‌ট্রিমে। ব্যাপারটা আলোর মতো স্বচ্ছ হয়েছে? এইবার আমার বিয়ের ব্যাপারটা বলি। আমার মায়ের সঙ্গে বিরাট পণ্ডিতের ঠিক কি সম্পর্ক তা আমার জানা নেই। শুনেছি মা ও'র শিষ্যা ছিলেন। আমার বাবার খবরও আমি জানি না। জন্মে থেকে বিরাট পণ্ডিতকেই দেখেছি, বাবাকে দেখি নি। শুনেছি বাবা আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান, বিরাট পণ্ডিত নাকি তাঁর দূরসম্পর্কের দাদা, তিনিই আমাদের সমস্ত ভার নিয়েছেন। আমার ভার সর্বতোভাবে তিনি যে নিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। আমি কি খাব, কি পরব, কার সঙ্গে মিশব, কখন ঘুমুব, কখন উঠব, কি বই পড়ব,—সব বিরাট পণ্ডিত ঠিক করতেন। আমার মায়ের ইচ্ছে হ'ত আমাকে মাঝে মাঝে সাজাতে, আমাকে খেলনা কিনে দিতে কিন্তু বিরাট পণ্ডিতের ভয়ে কিছু করতে সাহস হ'ত না তাঁর। তিনি কিছু লেখাপড়া জানতেন, স্কুলে যখন পড়তাম তাঁর ইচ্ছে হ'ত আমি তাঁর কাছে বসে পড়ি, কিন্তু বিরাট পণ্ডিত দিতেন না। মেয়েদের বুদ্ধির উপর কিছুমাত্র আস্থা নেই তাঁর। তাঁর মতে ওরা শুধু মা,—আর কিছু নয়। আমার মা আমার সম্বন্ধে তাঁর কোন ইচ্ছা প্রকাশ করতে ভয় পেতেন। একবার লুকিয়ে তিনি আমাকে আচার খেতে দিয়েছিলেন, তার পরদিন আমার পেট খারাপ হয়। বিরাট পণ্ডিত কি করেছিলেন জান? আমার মাকে মেরেছিলেন সেজন্য। মাকে উনি মাঝে মাঝে মারতেন। আমার মায়ের সেই শীর্ণ মুখ, সভয় দৃষ্টি আমার মনে আঁকা আছে। আমার সেই মা তাঁর মরবার কিছুদিন আগে আমার সম্বন্ধে একটি মাত্র ইচ্ছা ব্যক্ত করে গেছেন। ঠিক করেছি সে ইচ্ছার সম্পূর্ণ মর্যাদা আমি দেব। মায়ের ছেলেবেলার বন্ধু বামাচরণবাবু আজ দেখা করেছেন আমার সঙ্গে। মায়ের একখানা চিঠি তিনি এনেছিলেন। তাতে মা লিখেছেন—বাবা, উৎসাহ—আমার খুব ইচ্ছে তুমি আমার বাল্যবন্ধু বামাচরণের মেয়েকে বিয়ে কর। মেয়েটি এখন খুব ছোট,

তুমিও ছেলেমানুষ ! বড় হ'য়ে তুমি বিয়ে কোরো ওকে, আমি খুব সুখী হ'ব তাতে। আমি হয়তো বেশীদিন বাঁচবো না, বেঁচে থাকলেও বিরাট পণ্ডিতের বিরুদ্ধে কিছু বলবার সাহস হবে না আমার। তাই বামাচরণের হাতে এই চিঠি দিলাম। আশা করি তুমি আমার ইচ্ছা পূর্ণ করবে। চিঠিখানা পড়ে আমি বামাচরণবাবুকে কথা দিয়েছি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করব !"

দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া উৎসাহ চুপ করিল। তাহার পর হাসিয়া বলিল, "ব্যাপারটা আলোর মতো স্বচ্ছ হয়েছে এবার ?"

নবকিশোর হাসিয়া উত্তর দিল—"মোর দ্যান্ (more than) স্বচ্ছ। কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করছি। তুমি যখন খুব ছেলেমানুষ ছিলে তখন তোমার মা মারা গেছেন। তাঁর হাতের লেখা কেমন ছিল, তোমার মনে আছে কি ? ও চিঠি জালও তো হ'তে পারে।"

"জাল যে নয় তার প্রমাণও পেয়েছি। বামাচরণবাবুই বললেন, তোমার মায়ের হলদে রঙের একটা ট্রাংক আছে। সেই ট্রাংকে সে কিছু শাড়ি রেখে গেছে তার ভাবী পুত্রবধূর জন্য। কিছু কাগজপত্রও আছে তাতে। তার মধ্যে এই চিঠির একটা কপিও সে রেখে গেছে। আমাকে অন্তত তাই বলেছিল। মায়ের একটা ট্রাংক আছে তা জানি। বিরাট পণ্ডিত সেটা সীল দিয়ে তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন। মানা করেছিলেন ওটা যেন আমি না খুলি। বিরাট পণ্ডিতের অনুপস্থিতিতে আজ সেই ট্রাংকের সীল আর তালা ভেঙে সেটা খুলেছি আমি। দেখলাম তাতে সেকেলে বেনারসী শাড়ি, পার্সি শাড়ি আর বোম্বাই শাড়ি আছে একটা করে। সেকেলে গয়নাও আছে কয়েকখানা। একটা বড় সিঁদুর কৌটো আছে। আর আছে কিছু সেকেলে বই—সীতার বনবাস, শরীর পালন, শিশুবোধক, কৃত্তিবাসী রামায়ণ—এইসব। আর সব চেয়ে নীচে আছে কিছু কাগজপত্র। সেই কাগজপত্র ঘেঁটে মায়ের ওই চিঠির নকলটা পেলাম। আর পেলাম আমার আসল কুষ্ঠিটা। বিরাট পণ্ডিতেরই করা কুষ্ঠি। আমি যখন জ্যোতিষ শিখি তখন আমার কুষ্ঠিটা চেয়েছিলাম বিরাট পণ্ডিতের কাছে। আজ বুঝলাম তিনি আমাকে আমার আসল কুষ্ঠিটা দেন নি। দিয়েছিলেন একটা বাজে মেকি ছক। মধুমতী আমাকে নিজের সম্বন্ধে অন্ধ করে দিয়েছিল বলে আমি আমার চেহারা থেকে ভেরিফাই (verify) ক'রে নিতে পারি নি যে সেটা ঠিক কি না। বিরাট পণ্ডিতকে অবিশ্বাস করবার কল্পনাও করি নি কখনও। তাই ওই মেকি ছককে বিশ্বাস করে আমি মেকি-স্বর্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম মাথা উঁচু করে। আসল কুষ্ঠিটা দেখে আজ বুঝতে পারলাম কেন উনি আমাকে প্রবাল পরাবার জন্যে ব্যস্ত। জেঠুর উপর রাগ হয়নি এজন্যে। আসল কুষ্ঠিটা দেখলে আমার মন ভেঙে যেত। ও কুষ্ঠি যদি সত্য হয় তাহলে আমি অতি হতভাগ্য স্বল্পায়ু লোক। তাই আমাকে আমার আসল কুষ্ঠি দেন নি জেঠু। আমাকে যে উনি কত ভালবাসেন এটা তারই একটা প্রমাণ। আমার দুর্ভাগ্যকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে উনি কি যুদ্ধই না করেছেন। আমার বিদ্যাস্থানের গ্রহগুলো ভালো নয়, কিন্তু জেঠুর পুরুষকারের জোরেই আমি এম. এসসি. পাস করেছি, ডাক্তারি পড়তে ঢুকেছি। উনি মস্ত বড় জ্যোতিষী, কিন্তু উনি ভাগ্যের চেয়ে পুরুষকারে বেশী বিশ্বাস করেন। যাক্, অনেক বকবক করলুম। আমাকে তুমি কি বলবার জন্যে এসেছিলে, বললে না তো।"

"বম্বে যাবার আগে বিরাট পণ্ডিত আমাকে বলে গেছেন বামাচরণবাবুর মেয়ের সংগে তোমার বিয়েটা যেন আমি ঠেকিয়ে রাখি—"

"তা পারবে না। বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। কালই বিয়ে হবে বামাচরণবাবুর সারপেনটাইন লেনের বাসায়। তুমি যদি যাও ঠিকানাটা দিতে পারি তোমাকে।"

"ও মেয়ের কুষ্ঠিতে শুনেছি—"

"কুষ্ঠি বি ড্যাম্‌ড্‌ (be damned)। আমার যে মা আমার সম্বন্ধে তাঁর কোন ইচ্ছাকেই পূর্ণ করতে পারেন নি জীবনে, তাঁর এ ইচ্ছা আমি পূর্ণ করবই। বিরাট পণ্ডিত, মধুমতী, কুষ্ঠি কেউ ঠেকাতে পারবে না। তুমি যাবে বিয়েতে? না, তোমার যাবার দরকার নেই। তোমাকে ঠিকানা দেব না। তোমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বিরাট পণ্ডিত হয়তো গুণ্ডার গ্যাং (gang) নিয়ে গিয়ে হাজির হবেন বিয়ে পণ্ড করে দিতে। সব পারেন উনি। না, ঠিকানা দেব না। রাত হয়ে গেছে। তুমি বাড়ি যাও। মোহরগুলো নেবে? নেবে না? আচ্ছা থাক, কোনও একটা সৎকার্যে ব্যয় করা যাবে। যাও, বাড়ি যাও। আমার কাছে বেশীক্ষণ থেকো না। তুমি সৌভাগ্যবান, সুখী লোক, নির্মল কুসুম। আমি দুর্ভাগা অসুখী, আমার মলিনতা হয়তো তোমার সুখের জীবনে ছায়াপাত করবে। এখানে থেকো না তুমি—যাও—"

উৎসাহ হঠাৎ ভিতরে চলিয়া গেল।

হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল নবকিশোর। উঠিয়া পড়িবে, না আর একবার উৎসাহকে বুঝাইবার চেষ্টা করিবে? পরমুহূর্তেই কিন্তু সে অনুভব করিল উৎসাহকে বুঝাইবার সামর্থ্য তাহার নাই। যাহাকে মধুমতী নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, বিরাট পণ্ডিতের বিরাট প্রভাব যেখানে নিষ্ফল হইয়া গেল, সেখানে দুদিনের বন্ধু সে কি করিবে! তাছাড়া সে যখন সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করিয়া স্বেচ্ছায় তাহার মৃতা জননীর মনোনীতা পাত্রীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে তখন তাহাকে বাধা দেওয়া কি উচিত? কুষ্ঠির ফল যে ফলিবেই এমনই বা কি নিশ্চয়তা আছে? অনেক কুষ্ঠির কোনও ভবিষ্যদ্বাণীই ফলে না এ রকম উদাহরণ তো বিরল নয়। মধুমতী? মধুমতী হয়তো উহার কল্পনার সৃষ্টি, হ্যালুসিনেশন (hallucination)। শ্মশান-ভৈরবী—সহসা তাহার চোখের সামনে শ্মশান-ভৈরবীর ষোড়শী মূর্তিটা ভাসিয়া উঠিল। এটা তো সে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহার পরই চোখে পড়িল মোহরের থলিটা। দুইটি মোহর তখনও বাহিরে পড়িয়াছিল। সে দুইটি যেন দুইটি জীবন্ত চোখের মতো তাহার দিকে চাহিয়া জ্বলিতে লাগিল। কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল তাহার। সে উঠিয়া পড়িল। পর মুহূর্তেই উৎসাহ প্রবেশ করিল আবার।

"আমার ভাই বড় অনুতাপ হচ্ছে।"

"কিসের অনুতাপ।"

"আমার সব কথা আবেগের মুখে তোমাকে বলে ফেলেছি বলে। এ সব কথা আর কাউকে বলি নি। তুমি হয়তো এর মর্যাদা রাখবে না, হয়তো মনে মনে উপহাস করবে—হয়তো ভাববে—"

"না, না—তা কেন—"

"একটা প্রতিশ্রুতি দাও তাহ'লে—"

"কি বল।"

"যা শুনলে তা কারো কাছে বলবে না। আমার বিয়ের কথা কেউ ঘুণাক্ষরে যেন না জানতে পারে।"

"আচ্ছা—। তাই হবে। এবার যাই তাহলে—"

"না, ওপরে চল। বিয়ের নিমন্ত্রণটা আগেই খেয়ে নাও। গাঁট্টা পোলাও আর মাটনের কোর্মা করেছে। চল—"

নবকিশোরকে লইয়া উৎসাহ উপরে চলিয়া গেল।

॥ পনেরো ॥

ইহার পর দুইদিন নবকিশোর উৎসাহের দেখা পাইল না। নিজের বিবাহ ব্যাপারে সে তো অন্যমনস্ক ছিলই, কলেজে আর একটা ব্যাপার হওয়াতে সে আর একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। খবরের কাগজে বার্নাডো সাহেবের বিরুদ্ধে মন্তব্য বাহির হইবার পর হইতে বার্নাডো সাহেব ঠিক ঘড়ি ধরিয়া আটটার সময় ওয়ার্ডে আসিতে লাগিলেন। আসিয়াই তিনি 'রোল-কল' করাইতেন। যে সব ছেলেরা ঠিক আটটার সময় উপস্থিত হইতে পারিত না, তাহারা 'পারসেনটেজ' হারাইতে লাগিল। এজন্য ছেলেদের মধ্যে অসন্তোষ ধোঁয়াইতেছিল, সেদিন তাহা অপ্রত্যাশিতরূপে এক অঘটন ঘটাইয়া বসিল। বার্নাডো সাহেব আসিয়া তাঁহার জুনিয়র হাউস সার্জনকে বলিলেন, 'রোল-কল' কর। জুনিয়র হাউস সার্জন কিন্তু রোল-কল না করিয়া বিব্রতভাবে এদিকে ওদিকে চাহিতে চাহিতে এ টেবিলে সে টেবিলে কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন।

"কি করছ, রোল-কল কর। আটটা বেজে পাঁচ মিনিট হ'য়ে গেছে—"

"রোল-কলের খাতাটা খুঁজে পাচ্ছি না সার। একটু আগে এই টেবিলটার উপর রেখেছিলাম, কোথায় গেল বুঝতে পারছি না।"

গর্জন করিয়া উঠিলেন কর্নেল বার্নাডো।

"অমন একটা দরকারী খাতা তুমি যেখানে সেখানে রেখে দিয়েছিলে! তোমার হাতে করে রাখা উচিত ছিল। এখন কি করবে?"

সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কর্নেল বার্নাডোই অবশেষে কর্তব্য নির্ধারণ করিলেন। তিনি হসপিটাল সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন—"সামনের গেটটি ছাড়া মেডিকেল কলেজের আর সব গেট বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দাও। যে গেটটি খোলা থাকবে সেখানে একজন লোক বসে থাকুক। আমার লেখা অনুমতিপত্র ছাড়া সে গেট দিয়ে কাউকে বেরুতে দেবে না। একটা দরকারি খাতা এখুনি হারিয়ে গেছে। তদন্ত করবার জন্য আমি টেগার্ট সাহেবকে এখুনি ফোন করছি।"

স্তম্ভিত বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল সকলে। একটু পরেই স্বয়ং টেগার্ট সাহেব আসিয়া হাজির হইলেন। আসিয়াই বার্নাডো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হারিয়েছে—"

"রোল-কলের খাতা।"

"কোথায় ছিল সেটা।"

জুনিয়র হাউস সার্জন বলিলেন—"এই টেবিলের উপর রেখেছিলাম।"

"ঠিক মনে আছে?"

"ঠিক মনে আছে। এই টেবিলেই রোজ রাখি।"

টেগার্ট সাহেব ওয়ার্ডের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত চাহিয়া দেখিলেন। ওয়ার্ডের শেষপ্রান্তে একটা বিছানায় রোগী ছিল না। খালি বিছানায় গদিটা পাতা ছিল শুধু। টেগার্ট সাহেব গটগট করিয়া সেই গদিটার দিকে আগাইয়া গেলেন এবং গদির কোণটা তুলিয়া ধরিলেন। রোল-কলের খাতাখানা বাহির হইয়া পড়িল। টেগার্ট সাহেব একটু মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন। সমস্ত ওয়ার্ডটা যেন থমথম করিতে লাগিল। তাহার পর সমস্ত ছাত্রেরা একযোগে বাহির হইয়া গেল ওয়ার্ড হইতে। কমনরুমে গিয়া একটা মীটিং করিল তাহারা। ঠিক হইল যে বার্নাডো সাহেব তাহাদের পুলিশ ডাকিয়া অপমান করিয়াছে, যে বার্নাডো সাহেবের ওয়ার্ডে তাহারা আর যাইবে না। ইহার জন্য তাহাদের যদি ছয় মাস নষ্ট হয় হোক। মীটিংয়ের পর নবকিশোরের মনে পড়িল ডাক্তার পুলিন মিত্রের সহিত দেখা করা দরকার। বিরাট পণ্ডিত তাঁহার মেয়ে জামাইয়ের কুণ্ঠি গণনা করিয়া খামের যে চিঠিটা দিয়েছেন সেটি তাঁহাকে দিতে হইবে। তাছাড়া হাতভাঙা রামেশ্বব পাণ্ডের কবে অপারেশন হইবে তাহাও জানা প্রয়োজন। পুলিন মিত্র অপারেশনের জন্য পুট আপ (put up) না করিলে তো অপারেশন হইবে না।

উইলসন সাহেবের ওয়ার্ডে গিয়াই পুলিন মিত্রের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

"আরে কি খবর! তোমরা শহীদ হবার মতলবে আছ না কি। শুনলাম টেগার্ট সাহেব তোমাদের ওয়ার্ডে এসেছিলেন। তোমরা না কি বড় সায়েবের বিরুদ্ধে স্ট্রাইক করেছ!"

নবকিশোর সত্য বিবরণ বিবৃত করিয়া অবশেষে বলিল, "পুলিশ আনাতে সকলে বড় অপমানিত বোধ করেছে।"

"দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নামে একজন কবি ছিলেন জান?"

"যার লেখা সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত—"

"হ্যাঁ তিনি। তাঁর সেরা লেখা হচ্ছে 'হাসির গান'। তাতে একটি কবিতা আছে--জিজিয়া কর। সে কবিতার প্রথম কলিটি হচ্ছে এই—

> 'পাঁচশ' বছর এমনি করে আসছি স'য়ে সমুদায়
> এইটি কি আর সইবে না কো দু'ঘা বেশী জুতার ঘায়
> সেটা নিয়ে মিছে ভাবা, দিবি দু'ঘা দেনা বাবা
> দু'ঘা বেশী দু'ঘা কমে এমনি কি আর আসে যায়'

আমারও পরামর্শ হচ্ছে দু'ঘা বেশী দু'ঘা কমে এমনি কি আসে যায়। সহ্য করে যাও। আখেরে ভালো হবে। শ্বেতাঙ্গরা শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের প্রভু। তাদের সঙ্গে ঝগড়া করবার তাগদ কৃষ্ণাঙ্গদের নেই। মিটিয়ে ফেল। বিরাট পণ্ডিতের কাছ থেকে কোনও খবর পেয়েছ?"

"এই যে তিনি কুষ্ঠি গণনা করে দিয়েছেন।"

খামটি বাহির করিয়া সে পুলিন মিত্রের হাতে দিল। পুলিন মিত্র তখনই সেটা পড়িলেন। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইতে কুঞ্চিততর হইতে লাগিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর নবকিশোরের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—'বোগাস'।

"কেন, কি লিখেছেন।"

"দেখ।"

নবকিশোর পড়িতে লাগিল।

সবিনয় নিবেদন,

মিত্র মহাশয়, আপনার কন্যা, জামাতা এবং আপনার কুষ্ঠিটা দেখিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। উত্তরটি আনন্দজনক হইলে আপনিও সুখী হইতেন, আমিও হইতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটি আনন্দজনক নহে। আপনার কন্যার বৈধব্য অনিবার্য। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও প্রভাব বিচার করিলে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে অন্য কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। কিন্তু ইহাতে হতাশ হইবেন না। জ্যোতিষশাস্ত্রই মানব-মনীষার শেষ সীমা নয়। জ্ঞানের আরও নানা দিগন্ত আছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিধানই যদি মানিতে চান তাহা হইলে প্রতিকারার্থে জ্যোতিষশাস্ত্রের যে-সব নির্দেশ আছে তাহাও মানিতে হইবে। আপনার মেয়েকে নীলা, গোমেদ ও সীসা ধারণ করানো উচিত। প্রত্যহ দক্ষিণাকালীর পূজার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। আপনার আগ্রহ থাকিলে আমি এ সব বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করিতে পারি। মেয়েকে যদি নীলা ও গোমেদ ধারণ করাইতে চান, যে-কোনও দোকান হইতে কিনিবেন না। প্রকৃত রত্ন অনেকেই চেনে না। জুয়াচোরেরও অভাব নাই। ন্যায্য মূল্য লইয়া আমি আপনাকে রত্ন সরবরাহ করিতে পারি। দুইটি রত্নে আন্দাজ পাঁচশত টাকা খরচ পড়িবে। ভগবান আপনার অশান্ত চিত্তকে শান্ত করুন। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীবিরাটেশ্বর শর্মা

নবকিশোর চিঠিটা পড়িয়া ফেরত দিল।

পুলিন মিত্র বলিলেন, "এক গ্লাস শরবতের আশায় গিয়েছিলাম। এক বোতল কুইনিন মিকশ্চার পাঠিয়ে দিয়েছে লোকটা। রত্ন ধারণ করাবার ফিকিরে আরও কিছু দোহনও করতে চায়। বোগাস।"

নবকিশোর প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইল।

"ওই হাত-ভাঙা কেসটাকে কবে পুট্ আপ্ করবেন সার।"

"ও তো বেশ শাঁসালো মাল হে! চট্ করে 'পুট্ আপ্' করে দিলে কিছুই পাব না যে। একটু খেলাতে হবে।"

"কিন্তু ও বেশীদিন হাসপাতালে থাকতে পারবে না। পনেরো দিন পরে ওকে বোম্বে যেতেই হবে।"

"কিছু টাকা ছাড়ুক। কালই পুট্ আপ্ করে দিচ্ছি! তুমি একটু হিন্ট্ (hint) দাও না।"

"সে আমি পারব না সার—"

"না পারবার কি আছে এতে! জীবনে ওই তো করতে হবে, নানা ফিকিরে টাকা

রোজগার করাই তো জীবনের লক্ষ্য। তোমার বিরাট পণ্ডিতও ওই করছেন। তুমি পারবে না কেন।"

"ওসব কথা বলতে আমার, মানে—"

"মানে বুঝেছি। তুমি একটি অপদার্থ। আচ্ছা, আমিই ব্যবস্থা করে নেব এখন। তুমি যাও।"

কথাটা শুনিয়া নবকিশোর কেমন যেন একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া আসিল সে। বাহিরে আসিয়া সে অনুভব করিল মনে মনে নিরন্তর সে যাহার কথা ভাবিতেছে সে কোথায়? উৎসাহের নাগাল সে কবে পাইবে? সত্যিই কি তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে? সত্যই কি সে মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ওই কালো কুৎসিত অলক্ষণা মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে? মেসের দিকে যাইতে যাইতে একটি প্রশ্নই সে বার বার নিজেকে করিতে লাগিল। উৎসাহ যাহা করিয়াছে সে কি তাহা করিতে পারিত? নিজের মায়ের কথা মনে পড়িল তাহার। মায়ের খুব শখ ছিল তাহাকে সাজাইবার। নানারকম শৌখিন জামা জুতা কাপড় কিনিতেন তাহার জন্য। তাহার কিন্তু মোটেই বাবু সাজিবার ইচ্ছা হইত না। মায়ের কেনা অনেক জামা জুতা সে পরে নাই। স্কুল-জীবনে সে জুতাই পরিত না। টুইল শার্ট আর মিলের সাধারণ ধুতি পরিয়াই স্কুলে যাইত। মা জমিদারের মেয়ে ছিলেন, তাঁহার এসব পছন্দ হইত না। সে বরাবর থার্ড ক্লাস গাড়িতে চড়িতে চায়, ইহাও মায়ের ঘোর আপত্তির কারণ ছিল। ছেলেবেলায় মায়ের সঙ্গে সে সেকেণ্ড ক্লাসে চড়িয়াছে বটে, কিন্তু একা যখনই যেখানে গিয়াছে, থার্ড ক্লাসে গিয়াছে। মায়ের এসব ইচ্ছা পূর্ণ করা কি তাহার উচিত ছিল? খুব ছেলেবেলায় মা তাহার মুখে দুধের সর আর কাঁচা হলুদ জোর করিয়া মাখাইতেন, তাহার পর জোর করিয়া চিরুনি দিয়া মাথা আঁচড়াইয়া দিতেন। নবকিশোরের মোটেই এসব ভালো লাগিত না। নিজের মায়ের কথাই নানাভাবে মনে পড়িতে লাগিল তাহার। কাল বুলু তাহার জন্য একটা সোনালী রঙের পামশু কিনিতে চাহিয়াছিল। সে কিন্তু সেটা কেনে নাই, একটা 'সোবার' বাদামী রঙের কিনিয়াছে। তাহার মনে হইল মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন হয় তো ওই সোনালী রঙেরটাই কিনিবার জন্য জেদ করিতেন। মেসের সামনে আসিয়া দেখিল তাহাদের গাড়িটা দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া হসুর্খ স্টিয়ারিং ছাড়িয়া নামিয়া আসিল এবং সেলাম করিল।

"মাতাজি উপর গ্যয়ী।"

উপরে গিয়া নবকিশোর দেখিল তাহার বউদিদি, বুলু এবং আর একটি অপরিচিতা ভদ্রমহিলা তাহার ঘরে বসিয়া আছেন। গদগদ মিঠ্ঠুর হাতে একটি প্রকাণ্ড টিফিনকেরিয়ার, উল্লসিত যোগেন বউদির পায়ের ধুলা লইতে লইতে গান ধরিয়াছে—

"ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ-- ।"

"কি ব্যাপার!"

"বউদি আমাদের জন্যে এক টিফিন-কেরিয়ার ভর্তি পানতোয়া এনেছেন। কাণ্ড দেখেছ! টিফিন-কেরিয়ারের সাইজ দেখ। পানতোয়াও ম্যাগনাম্ (magnum) সাইজের!"

শ্রবণা বলিলেন, "বাড়িতে ভিয়েন বসেছে যে। তাই তোমাদের জন্যে নিয়ে এলাম কিছু। সবাই না খেলে কি আনন্দ হয়—"

"হায় বউদি, আপনার মতো একথা যদি সবাই বুঝত! সেদিন এক জায়গায় নিমন্ত্রণ খেতে গেছি, একটি মাত্র ছোট্ট রসগোল্লা নাকের সামনে দোলাতে দোলাতে জিগ্যেস করছে—দেব? দেব? আরে বাবা, নেমন্তন্ন করেছিস, দিবি না কেন! সবাই অপচয় বাঁচাতে ব্যস্ত আজকাল!"

"আমি কিন্তু এবার উঠব ভাই। সুহাসকে আর বেশীক্ষণ আটকে রাখব না। নবু, ইনিই আমার বান্ধবী সুহাস। একজন পিয়ানো স্পেশালিস্ট। যে পিয়ানোটা কাল দেখে এসেছি সেটা একেও একবার দেখিয়ে নিতে চাই। যাবে তুমি আমাদের সঙ্গে?"

"আমার এখনও খাওয়া হয় নি যে।"

"চল না ওই অঞ্চলেই কোনও ভালো হোটেলে ঢুকব আমরা। সুহাসকে লাঞ্চ (lunch) খাওয়াব বলে নিমন্ত্রণ করে এনেছি। তুমিও চল।"

যোগেন মাথা চুলকাইয়া বলিল, "বউদি, আমারও পিয়ানো সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমি ছেলেবেলায় পিয়ানো বাজাতাম।"

"বেশ, তুমিও চল তাহলে—"

যোগেন সঙ্গে সঙ্গে মিঠুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "মিঠু আমরা দু'জনে তাহলে চললুম। আমাদের ভাতটা তোমরাই খেয়ে নিও। বউদির আদেশ অমান্য করতে পারি না।"

মিঠু সবিস্ময়ে বলিল, "আমাদের ভাত তো রেঁধেইছে।"

"তাহলে দিয়ে দিও কাউকে—কিংবা—"

"বেশ। সে যা হোক আমি করব। এ মিষ্টিগুলো কখন খাবেন।"

"রাত্রে। এখন তুমি প্রত্যেকের ঘরে কিছু কিছু দিয়ে এস। বাকিটা আমাদের জন্যে রেখে দিও।"

বুলু নবকিশোরকে চোখের ইঙ্গিতে ডাকিয়া বলিল, "কাকা শোন, একটা কথা আছে।"

নবকিশোরকে গাড়িবারান্দায় লইয়া গেল সে।

"রেডিওটাতে আজ নাম লেখাতে দেব। কি লিখতে বলব বল তো? প্রমীলা দেবী, না প্রমীলা মুখোপাধ্যায়।"

"মুখোপাধ্যায়ই তো ভাল।

'তাই, না? আমিও তাই ভাবছিলুম। চল তাহলে, তাই বলে দিই গে—"

"বুলু, আমারও আর একটা কথা মনে হচ্ছে। কাল জোর করে ওই বাদামী পামশুটা কিনলুম বটে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সোনালীটা কিনলেই হ'ত! বাদামীটা কি ওরা ফেরত নেবে?"

"নিশ্চয় নেবে। আর ফেরত দেবার দরকার কি। সোনালিটাও কিনে নি চল। দু জোড়া থাকলেই বা ক্ষতি কি।"

ঘরের ভিতর হইতে শ্রবণা তাগাদা দিলেন। •

"নবু আর দেরি কোরো না, চল। সুহাসকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি—"

সকলে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন। মেয়েরা আগে নামিয়া গেলেন। যোগেন ও নবকিশোর পিছনে ছিল। নবকিশোর যোগেনকে প্রশ্ন করিল—"তুমি পিয়ানো বাজাতে পার না কি।"

যোগেন হাসিয়া উত্তর দিল—"একদম না। কিন্তু ভাল হোটেলে লাঞ্চ খাওয়ার সুযোগ তো রোজ জুটবে না। আর বউদি আমাকে পরীক্ষাও করবেন না। তাই একটা গুল চালিয়ে দিলাম। তবে ওখানে ফপরদালালি যা করব তাতে তাক লেগে যাবে সকলের। তুমি কেবল দয়া করে সব ফাঁস করে দিও না যেন। ভাল কথা, কাল ওআর্ডে যাচ্ছ না তো ?"

"না। সবাই যখন ঠিক করেছ তখন আমি একা যাব কেন।"

"গুড্। দেখাই যাক না কি করে—"

সকলকে লইয়া মোটর চৌরঙ্গীর দিকে চলিয়া গেল।

॥ ষোলো ॥

বিরাট পণ্ডিত বোম্বে হইতে সকালের ট্রেনেই ফিরিয়াছিলেন। কিন্তু হাওড়া হইতে তিনি সোজা বাড়ি যান নাই। সন্ধ্যার পর একটা ছ্যাকড়া গাড়ি করিয়া তিনি বাড়ি ফিরিলেন। সঙ্গে একটি অতি কুৎসিৎ নয় দশ বছরের মেয়ে। রং কালো, নাক বসা, চোখ ট্যারা, মাথায় টাক। গাড়ি হইতে নামিয়া তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন —"গাট্টা, গাট্টা, কপাট খোল—"

কপাট বন্ধ ছিল। গাট্টা আসিয়া কপাট খুলিয়া দিতেই বিরাট পণ্ডিত প্রশ্ন করিলেন—"উচ্ছে বাড়িতে আছে তো ?"

"না। দু'দিন থেকে আসে নি। আপনি চলে যাবার পরদিন এসেছিল। তারপর যে চলে গেছে আর আসে নি।"

"আসে নি ? নবকিশোর এসেছিল ?"

"না, তিনিও আর আসেন নি।"

"আসে নি ! কেউ আসে নি ?"

বিরাট পণ্ডিত কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর মেয়েটাকে দেখাইয়া বলিলেন, "একে ভিতরে নিয়ে যা। খেতে দে—"

"এ কে"—বিস্মিত গাট্টা প্রশ্ন করিল।

"সে খোঁজে তোর দরকার কি ! তোকে যেমন একদিন কুড়িয়ে এনেছিলাম, একেও তেমনি এনেছি। আর একটা তীর্থের কাক। খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করব, তারপর মুখে লাথি মেরে চলে যাবে। সব জেনে শুনেই এনেছি। তোর নাম কি রে।"

মেয়েটি সসঙ্কোচে উত্তর দিল—"পুষ্প"।

"নামের বাহার আছে তো। একে খেতে দে আগে। খাবার আছে তো ঘরে ?"

"ওবেলার মাংস ভাত আছে, উচ্ছের জন্যে রেঁধে রেখেছিলাম। এস, ভিতরে চল—"

"ওকে খেতে দিয়ে ভৈরব ডাক্তারকে খবর দে। মেয়েটা রুগ্ন। ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে এখনি—"

গাট্টা পুষ্পকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। বিরাট পণ্ডিত গাড়োয়ানকে দিয়া ট্রাঙ্ক বিছানা বাস্কেট নামাইয়া লইলেন। তাহার পর তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিলেন। কিন্তু বাড়িতে ঢুকিলেন না। হনহন করিয়া তিনি অতুলের দোকানের দিকে চলিতে লাগিলেন। অতুল একটি বেহালা মেরামত করিতেছিল। উদ্‌ভ্রান্ত বিরাট পণ্ডিতকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি দোকান হইতে নামিয়া আসিল।

"উচ্ছের খবর জান ?"

"না। দু'তিন দিন তাকে দেখি নি তো।"

"নবকিশোরের ?"

"না, তিনিও আসেন নি।"

"নবকিশোর তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটে থাকে। তার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। তুমি কি যেতে পারবে।"

"এক্ষুনি যাচ্ছি।"

"যদি দেখা পাও উচ্ছের খবরটা জিগ্যেস কোরো। আর যদি আসতে চায় নিয়ে এস তাকে—"

অতুল তবু বিরাট পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া রহিল। যেন কিছু বলিবে, অথচ বলিতে সাহস করিতেছে না। তিনি যে জরির খোঁজে বম্বে চলিয়া গিয়াছেন এ খবর সে গাট্টার মুখে শুনিয়াছিল।

"অমন করে চেয়ে আছ যে—"

"জরিদির—"

বিরাট পণ্ডিত তাহার কথা শেষ করিতে দিলেন না। "যে মেয়েকে পুলিসরা ধরে রেখেছিল সে জরি নয়। অন্য মেয়ে। জরি আর ফিরবে না। তবু আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না। পুলিসকে দিয়ে লণ্ডনে, প্যারিসে, রোমে, বার্লিনে, মস্কোতে, সুইজারল্যাণ্ডে, বেলজিয়েমে, সুইডেনে, আমেরিকায় সব জায়গায় 'কেবল্' (cable) করিয়েছি। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে আমার। কিন্তু তবু আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করব তাকে খুঁজে বার করবার। উচ্ছেও মনে হচ্ছে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। জানি, সেও আসবে না। তবু আমি চেষ্টা করে যাব। তোমার চোখে হাসি চিকমিক করছে কেন ? ভাবছ এইবার নেমেসিস্ (Nemesis) এসে গেছে ? আমি জীবনে কোনও প্রতিধ্বনিকে কোন 'একো'কে (Echo) আমোল দিই নি বটে, কিন্তু তবু কোন 'নেমেসিস্' আমাকে কাবু করতে পারবে না। আমি শেষ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে লড়াই করে যাব। তুমি দেখ যদি উচ্ছের খবরটা আনতে পার। আমি বাড়িতেই আছি।"

বিরাট পণ্ডিত বাড়িতে ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন ভৈরব ডাক্তার বসিয়া আছেন। ভৈরব ডাক্তার সেকালের ক্যাম্বেল পাস ডাক্তার। বিরাট পণ্ডিতের বাড়ির কাছেই তাঁহার ডিস্‌পেন্সারি। ছোটলোক মহলে তাঁহার খুব প্র্যাকটিস। চার আনা, একটাকা যে যাহা দেয় বা যাহার কাছে যতটা আদায় করিতে পারেন তাহাতেই সন্তুষ্ট তিনি। বিরাট পণ্ডিতেরও যখন দরকার হয় তাঁহাকেই ডাকেন। ডাকিলেই ছুটিয়া

আসেন ভৈরব, কারণ তিনি বিরাটের গুণমুগ্ধ ভক্ত একজন। একদা ভৈরবের হাত দেখিয়া তাঁহার জন্মকুন্ডলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন বিরাট পণ্ডিত এবং সেই জন্মকুন্ডলী দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছে। ভৈরব ডাক্তারের চেহারাটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁহার মুখটি বিড়ালের মুখের মতো। এক জোড়া সুপুষ্ট লাল রঙের গোঁফ আছে, চোখের তারাও কটা। মাথার সামনের দিকে প্রশস্ত টাক, পিছনের দিকের চুলগুলিও লাল রঙের। কপালের মাঝখানে রক্তচন্দনের একটি বড় ফোঁটা। আড়ালে সকলে তাঁহাকে 'লাল ডাক্তার' বলে। দেখিলেই বোঝা যায় তিনি প্রচুর পান খান, পুষ্ট ওষ্ঠাধরও পানের রঙে রঞ্জিত। বিরাট পণ্ডিতকে দেখিয়া তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমাকে ডেকেছেন কেন পণ্ডিতমশায়।"

"আর একটা তীর্থের কাক জুটেছে। দেখ তো ওটাকে, মনে হচ্ছে খুব রুগ্ন। ওর চিকিৎসার ভার নাও। ওরে গাঁট্টা, পুষ্পকে নিয়ে আয়।"

একটু পরেই পুষ্পকে লইয়া গাঁট্টা প্রবেশ করিল।

"খেয়েছিস ?"

পুষ্প ঘাড় নাড়িয়া জানাইল খাইয়াছে।

গাঁট্টা বলিল—"মাংস ভাত খেয়েছে।"

বিরাট পণ্ডিত বলিলেন—"তুমি ভৈরবের জন্যে এক কাপ কড়া কফি তৈরি কর। আর আমার সঙ্গে যে খাবার বাস্কেটটা এসেছে তার ভিতর খুব ভালো মটন কাটলেট আছে খানচারেক। আমি দুপুরে একটা হোটেল থেকে এক ডজন আনিয়েছিলাম ; সবগুলো খেতে পারিনি। ওগুলো গরম করে ভৈরবকে দাও।"

ভৈরব ডাক্তার বিড়ালের মতোই চোখ মিটমিট করিয়া চাহিতে লাগিলেন। একটু আগেই তিনি এক গ্লাস সিদ্ধি খাইয়াছেন, এখন আর কিছু খাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না, কারণ তিনি বিরাট পণ্ডিতকে চেনেন।

"মেয়েটাকে দেখ তো ভাল করে।"

ভৈরব ডাক্তার তাহার দিকে এক নজর চাহিয়া একটি মাত্র কথা উচ্চারণ করিলেন—"সিফিলিস।"

"ওইটুকু মেয়ের :"

"কনজেনিটাল (congenital)"

"তা হ'তে পারে।"

"কোথা থেকে আনলেন ওকে।"

"সোনাগাছি থেকে। ঘাগী বেশ্যা পাঁচির কাছে দাসীবৃত্তি করছিল। পাঁচি অনেকদিন আগেই বলেছিল, 'আপনি ওকে নিয়ে যান, আমি ওকে আর পুষতে পাচ্ছি না। আমার নিজেরই ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলুচ্ছে না আজকাল।' আজ তাই নিয়ে এলাম। এখানেই থাক—"

ভৈরব মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আবার একটা ঝামেলা জোটালেন—"

"তুমি সিদ্ধি খেয়েছ বুঝি ? তাই বুদ্ধিটা ঘোলাটে হ'য়ে গেছে, তাই বুঝতে পারছ না যে জীবন আর ঝামেলা শব্দ দুটো সিননিমাস্ (synonymous), একার্থবোধক। জীবন মানেই ঝামেলার সঙ্গে লড়াই করা। আর সেই লড়াই-করাতেই মানুষের

মনুষ্যত্ব, তার পুরুষকারের পরীক্ষা। কি নিয়ে বেঁচে থাকব ? নিরালম্ব হয়ে থাকবার প্রবৃত্তি আমার নাই। বাঁচতে হ'লে অবলম্বন চাই।"

ভৈরব ডাক্তার সভয়ে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"অবলম্বন তো আপনার আছে পণ্ডিতমশাই—"

"না, নেই। উচ্ছে জরি সব সরে পড়েছে। লেখাপড়া শিখে লায়েক হয়েছে, এখন আর থাকবে কেন। গাঁট্টাটার লেখাপড়া কিছু হয় নি, ছেলেবেলায় মাস্টারের মাথায় গাঁট্টা মেরে রাসটিকেটেড (rusticated) হয়ে গিয়েছিল, আমি ছাড়া আর গতি নেই, তাই টিঁকে আছে। কিন্তু ওকে নিয়ে মন ভরে না। ও কেমন যেন বোদা গোছের। আমি যাকে নিয়ে তলোয়ারের খেলা খেলতে চাই, সে-ও ভালো খেলোয়াড় না হ'লে খেলা জমে না। জরি উচ্ছে দু'জনেই ভালো খেলোয়াড় ছিল। ওরা সরে পড়েছে। ভেবেছে আমাকে কাবু করে দেবে। কিন্তু কাবু হবার লোক আমি নই। ওরকম শত শত জরি উচ্ছে আমি সৃষ্টি করতে পারি। আমি ভগবান—"

ভৈরব ডাক্তার এ কথা শুনিয়া হেঁটমুণ্ড হইয়া টাকে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা, কিন্তু সাহসে কুলাইতেছে না। বিরাট পণ্ডিত ভৈরব ডাক্তারের এই দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গী দেখিয়া উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন—"তুমি ভাবছ এটা ভারী অহংকারের কথা হল ? অহংকারের কথা নয়, সত্য কথা। শংকরাচার্য বলেছেন—আমি মন নই, বুদ্ধি নই, অহংকার নই—আমি শুধু শিব। কিন্তু বিরাট পণ্ডিত বলতে চায়, আমি মন, বুদ্ধি, অহংকার, প্রতিভা, পুরুষকার—আমি স্রষ্টা ভগবান। হয়তো আমার সৃষ্টি হিমালয় বিন্ধ্যাচলকে মহাকাল শিব এক লাথিতে চুরমার করে দেবে শেষকালে, তবু আমি থামব না, আবার সৃষ্টি করব নূতন হিমালয়, নূতন বিন্ধ্যাচল—"

গাঁট্টা কফি ও কাটলেট লইয়া প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে পুষ্পও প্রবেশ করিল একটি ছোট টুল লইয়া।

"ওটা ডাক্তারবাবুর সামনে রাখ।"

টুলটি রাখিয়া সে একছুটে ভিতরে চলিয়া গেল এবং এক গ্লাস জল এবং একটি গামছাও লইয়া আসিল।

ভৈরব ডাক্তার কফিতে একটা চুমুক দিয়া বলিলেন, "বাঃ ! চমৎকার।"

"কাটলেট খেয়ে দেখ দিকি। করিমের দোকানটা ছোট্ট কিন্তু কাটলেট করে ভালো। নামজাদা দোকানগুলিতে এ রকম টেস্টও হয় না, 'সাইজ'ও হয় না।"

কাটলেট চিবাইতে চিবাইতে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে ভৈরব বলিলেন, "বাঃ খাশা—"

"এই মেয়েটার এখন কি করবে বল দিকি।"

"ওকে ডিসপেন্সারিতে নিয়ে গিয়ে প্রথমে ওর রক্তটা নেব। আগে ভাসারম্যান্ (Wassermann) টেস্টটা করাই। পজিটিভ্ হবেই। রিপোর্ট এলে তারপর ইনজেকশন শুরু করব।"

"রক্তপরীক্ষা করতে কত লাগবে।"

"চারুবাবু ষোল টাকা নেন—"

বিরাট পণ্ডিত বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিলেন।

"এই নাও। বত্রিশ টাকা দিলুম। ষোল টাকা চারুবাবুর আর ষোল টাকা তোমার

—দরকার হলে পরে আরও দেব। মেয়েটাকে ভালো করে তোল দিকি। দুধ রাখবার আগে বাসনটা পরিষ্কার হওয়া চাই।"

ভৈরব ডাক্তার কাটলেট চিবাইতেছিলেন, উত্তর দিতে পারিলেন না। কাটলেটটি গলাধঃকরণ করিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আমাকে আবার টাকা কেন!"

"যেখানে যা পাচ্ছ খুঁটে তুলে নাও। আমরা সবাই তীর্থের কাক, সামনে যা পাই টপ্ করে তুলে নি, ওইটেই আমাদের স্বভাব। ভণ্ডামি করছ কেন।"

ভৈরব ডাক্তার মৃদু হাসিয়া আর একটি কাটলেট মুখে পুরিলেন।

প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে।

বিরাট পণ্ডিত একা নীচের ঘরে বসিয়া একটা মানুষের মাথার খুলি লইয়া নিবিষ্টচিত্তে 'অ্যানাটমি' (anatomy) অধ্যয়ন করিতেছিলেন। পুষ্প আগেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গাট্টাকে তিনি অতুলের দোকানে বসাইয়া রাখিয়াছেন। অতুল ফিরিলেই তাহাকে যেন সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। নিস্তব্ধ বাড়িতে একা এঘর হইতে ওঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তিনি। উৎসাহের ঘরে ঢুকিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহার পর উৎসাহের হাড়ের বাক্সটা তাঁহার চোখে পড়িল। মড়ার মাথাটার শূন্য অক্ষিকোটর, বীভৎস হাসি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন তিনি। পাশেই বইয়ের শেল্‌ফে উৎসাহের ডাক্তারি বইগুলিও সাজানো ছিল। গ্রে সাহেবের লেখা বিখ্যাত অ্যানাটমির বইটিও তাঁহার চোখে পড়িল।

"এইটে নিয়েই সময় কাটানো যাক—"

গ্রে'র অ্যানাটমি আর মড়ার মাথাটা লইয়া তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন। তাঁহার বিশাল চক্ষু দুইটি হইতে এক অদ্ভুত জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। সহসা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি খুলিটার কপালের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তাহার পর অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন— "ললাটলিপি কি কপালের এই হাড়ের উপর লেখা থাকে? কিন্তু কই?"

বাহিরে মোটর থামার শব্দ হইল। তিনি অ্যানাটমি ও মড়ার মাথা সরাইয়া রাখিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিলেন। অতুল আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার পিছু পিছু গাট্টাও। গাট্টা সোজা উপরে চলিয়া গেল।

"তোমার এত দেরি হল?"

"নবকিশোরবাবু মেসে ছিলেন না। চাকরটা বললে তাঁর যে বাড়ি থেকে বিয়ে হবে সেই হরিশ মুকুজ্যে রোডের বাড়িতে গেছেন তিনি। ঠিকানা জানতাম। সেখানে গেলাম। সেখানেও দেখলাম তিনি নেই। তাঁর দাদা বললেন, সে একটু বেরিয়েছে, এখুনি আসবে, আপনি বসুন একটু। একঘণ্টা পরে নবকিশোরবাবু এলেন। তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম তাঁর মেসে। তিনি বললেন, তিনিও উচ্ছেকে দু'দিন দেখেন নি। উচ্ছে কোথায় আছে তা-ও তিনি জানেন না। এর বেশী তিনি আর কিছু বলতে চাইছিলেন না। অনেক পীড়াপীড়ি করাতে বললেন, আমার মনে হয় উৎসাহ তার জেঠুর মানা শোনে নি। তাঁর অমতেই বিয়ে করেছে। বোধ হয় কাল তার বিয়ে হয়ে গেছে—"

"বিয়ে হ'য়ে গেছে!"

বিরাট পণ্ডিত যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

"নবকিশোরবাবুর সেই রকম আন্দাজ। ঠিক অবশ্য উনি কিছু বলতে পারলেন না। মনে হ'ল বলতে চানও না।"

বিরাট পণ্ডিত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অতুলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, "তীর্থের কাক সব, আসে আর চলে যায়। ওতুলো, তুইও কি ত্যাগ করবি আমাকে? তোকেও শেক্স্পীয়র, মিলটন, অঙ্ক, ইতিহাস, সংস্কৃত পড়িয়েছিলাম, সুতরাং আমাকে ঘৃণা করবার যথেষ্ট কারণ আছে তোর! কিন্তু না, তুই পালাতে পারবি না। ওই পানের দোকানের খুঁটিতে তোর টিকি বাঁধা আছে। আমার এখানে থাকলে সরে পড়তিস এতদিন! তোরা সব পজিটিভ্ কারেণ্ট্ (positive current), আমিও তাই। সুতরাং উই রিপেল্ ইচ্ আদার্ (we repel each other). একটা তীর্থের কাক আর একটা তীর্থের কাককে সহ্য করতে পারে না। এই নিয়ম, কিন্তু কোন নিয়মের কাছে আমি কখনও নতি স্বীকার করি নি। এ নিয়মের কাছেও করব না। আমি আমার নিয়মে চলব। আরও তীর্থের কাক জুটিয়ে আনব আমি, ভাত ছড়িয়ে ছড়িয়ে। তুমি যাও, রাত হয়েছে। আমার জন্যে এত কষ্ট করলে—থ্যাংক্ ইউ (thank you)।"

অতুল কিছু বলিল না, প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বিরাট পণ্ডিত ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ঘুম পাতলা হইয়া আসিয়াছিল। ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি একটি স্বপ্ন দেখিলেন। প্রকাণ্ড একটা ঈগল পাখি যেন একটা কাককে তাড়া করিয়াছে। সে ঈগল পাখি সাধারণ ঈগল পাখি নহে। বহুবর্ণসমন্বিত তাহার ডানা। বক্র চঞ্চুটি স্বর্ণময়। দুই চোখে যেন দুইটি চুনী জ্বলিতেছে। পায়ের নখরগুলিতে শাণিত ইস্পাতের দ্যুতি। কাকটা ঊর্ধ্বশ্বাসে উড়িয়া চলিয়াছে। বিরাট পণ্ডিতের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বিছানায় উঠিয়া বসিলেন তিনি। বসিয়া অনুভব করিলেন একটা তীব্র মধুর গন্ধে চতুর্দিক ভরিয়া গিয়াছে। কিসের গন্ধ? তাঁহার আতরের শিশি কি উলটাইয়া গিয়াছে? তাকের উপর চাহিয়া দেখিলেন। না, গোলাপী, খস্, মুস্ক, চামেলী—সমস্ত আতরের শিশিগুলিই তো যথাস্থানে রহিয়াছে। এ গন্ধ তো আতরের গন্ধ নয়, এ যে অপূর্ব, অদ্ভুত একটা পাগল-করা গন্ধ! সহসা তাঁহার মনে হইল তিনি যেন একটা শব্দও শুনিতে পাইতেছেন। রুম ঝুম, রুম ঝুম, রুম ঝুম। অলংকারের শিঞ্জন-ধ্বনি। উৎসাহের ঘরে কে যেন নূপুর পায়ে দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

"কে—কে—কে—"

চীৎকার করিয়া উঠিলেন বিরাট পণ্ডিত। শব্দ থামিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া উৎসাহের ঘরে গেলেন। কেহ নাই। মনে হইল উৎসাহের বালিশে মাথা রাখিয়া কে যেন শুইয়াছিল। একটু আগে যখন তিনি আসিয়াছিলেন তখন বালিশে তো এ রকম খাঁজ ছিল না। হাত দিয়া দেখিলেন বালিশটা ভিজিয়া গিয়াছে। কেহ যেন এখানে শুইয়া কাঁদিয়াছে। কে সে? সহসা বিরাট পণ্ডিত শিহরিয়া উঠিলেন।

॥ সতেরো ॥

পরদিন সকালে উৎসাহ হাসপাতালে আসিয়া হাজির হইল। উইলসন সাহেবের ওআর্ডে গিয়া আগে খোঁজ করিল রামেশ্বর পাণ্ডেকে অপারেশনের জন্য 'পুট্ আপ' করা হইয়াছে কি না। দেখিল হয় নাই। শুধু তাহাই নয় রামেশ্বর পাণ্ডে আর হাসপাতালে থাকিতে চাহিতেছেন না। বলিতেছেন—এখানকার ডাক্তারবাবু 'পান' খাইতে চান। কিন্তু কত মূল্যের পান তাহা এখনও খুলিয়া বলেন নাই। সুতরাং এখন হাসপাতালের বিছানায় শুইয়া পানের মূল্য লইয়া দরদস্তুর করিতে হইবে। তাহা তিনি করিতে ইচ্ছুক নন। বিলম্ব হইয়া যাইবে। উৎসাহের মাথায় দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "বেশ, আপনি এই মুহূর্তে হাসপাতাল থেকে নাম কাটিয়ে আমার সঙ্গে চলুন।"

"কোথা যাব—"

"আপাতত গ্র্যাণ্ড হোটেলে চলুন। সেখানে আমি পাশাপাশি কয়েকখানা ঘর ভাড়া নিয়েছি। সেইখানে চলুন এখন। তারপর যা করবার আমি করছি।"

"কি দরকার অত হাঙ্গামা করবার। আমি বম্বে চলে যাই। সেখানে গিয়ে যা হয় করব।"

"না, এখানেই ব্যবস্থা করে দেব সব, চলুন।"

"না, না মানে—"

রামেশ্বর পাণ্ডে ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

"আপনাকে যেতেই হবে। চলুন।"

উৎসাহের চোখের দৃষ্টি দেখিয়া রামেশ্বর পাণ্ডে বুঝিলেন আপত্তি করা চলিবে না, যাইতেই হইবে।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে সত্যই কয়েকখানা ঘর ভাড়া করিয়াছিল উৎসাহ। তাহারই একটাতে রামেশ্বর পাণ্ডে এবং তাঁহার অনুচরকে রাখিয়া সে বাহির হইয়া গেল। গেল সোজা উইলসন সাহেবের বাড়িতে। কার্ড পাঠাইল, মানে একটি কাগজে লিখিয়া দিল—মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্র জরুরী দরকারে দেখা করিতে চায়। উইলসন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহার পর পাকা গোঁফে তা দিয়া সহাস্যদৃষ্টিতে প্রশ্ন করিলেন—"ব্যাপার কি?"

"একটি রোগী দেখতে হবে। আমার আত্মীয়। এখনি যদি দেখতে পারেন ভালো হয়। সে গ্র্যাণ্ড হোটেলে আছে। বাইরে থেকে এসেছে। এখানে বেশীদিন থাকতে পারবে না।"

"চল এখুনি যাচ্ছি—"

উৎসাহ সসম্ভ্রমে চৌষট্টিটি টাকা টেবিলের উপর রাখিল। তখনকার দিনে সাহেবদের ফী ষোল টাকা ছিল, ইহা উৎসাহ জানিত। তবু ইচ্ছা করিয়াই সে বেশী টাকা আনিয়াছিল।

"তুমি মেডিকেল কলেজের ছাত্র, তোমার আত্মীয় বলছ, তার কাছ থেকে আমি ফী নেব কি!"

উইলসন সাহেব আর একবার গোঁফে তা দিলেন।

"আমার ঠিক আত্মীয় নয়, চেনা লোক—"

"ও, আই সি। বেশ। আমার ফী ষোল টাকা। অত টাকা এনেছ কেন—"

উৎসাহ কিছু বলিল না। উইলসন সাহেব ষোল টাকা লইয়া বাকি ফেরত দিলেন।

উৎসাহের সঙ্গে গিয়াই উইলসন সাহেব রামেশ্বর পাণ্ডেকে দেখিলেন। বলিলেন, "মনে হচ্ছে এ আমার ওআর্ডে ছিল!"

"ছিল। কিন্তু ওআর্ডে অপারেশনের দেরি হবে বলে বাইরে চলে এসেছে। প্রাইভেটলি যদি কোন নার্সিং হোমে রেখে করে দেন তাহলে ভালো হয়—"

"না। হাসপাতালেই করব। কালই করব। ওকে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাও আবার। আমি পুলিনকে বলে দিচ্ছি। কালই ওর অপারেশন হবে।"

পুলিন মিত্র উৎসাহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মোটরের ধাক্কা লেগে তুমিই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে না?"

"হ্যাঁ সার।"

"তাই মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে তোমার। এখনই ওঁকে ডিসচার্জ করিয়ে নিয়ে গেলে, আবার নিয়ে এসেছ ভর্তি করবার জন্যে—"

"উইলসন সাহেবকে দেখিয়েছিলাম, তিনি যা বললেন তাই করেছি—"

সঙ্গে সঙ্গে উইলসন সাহেবও ওআর্ডে প্রবেশ করিলেন।

"পুলিন, এই ফ্রাকচার কেসটাকে ভর্তি করে নাও। কালই এর অপারেশন করব। এর একটু স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে। আমাদের স্টুডেন্টের কেস—"

"ইয়েস সার—"

ত্রস্ত পুলিন মিত্র আদেশ পালন করিতে ছুটিলেন।

একটু পরে উৎসাহ একটি রুপার ডিবায় এক ডিবা পান ভর্তি করিয়া আনিয়া হাসিমুখে ডাক্তার মিত্রকে বলিল, "পাঁড়েজি আমাকে বললেন ডাক্তারবাবু পান খেতে ভালবাসেন, ওঁকে কিছু পান এনে দাও। তাই এইটে এনেছি সার।"

পুলিন মিত্র অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

॥ আঠারো ॥

নবকিশোরের সুখের অবধি ছিল না। বউদির আগ্রহাতিশয্যে কাল সে প্রমীলাকে দেখিয়া আসিয়াছে। সুন্দরী বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় প্রমীলা তাহা নহে। সে অপরূপ সুন্দরী। তাহার বর্ণ উজ্জ্বল গৌর নয়, কিন্তু তাহা অবর্ণনীয়। তাহার আয়ত নয়নের লজ্জাস্নিগ্ধ উজ্জ্বল দৃষ্টি, তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া মার্জিত রুচির লাবণ্যময় প্রকাশ, তাহার বিকশিত যৌবনের সংযত মহিমা, তাহার মৃদু মিষ্ট আলাপ, তাহার বুদ্ধিদীপ্ত মুখচ্ছবি, তাহার সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসি নবকিশোরকে যে লোকে লইয়া গিয়াছিল, কোনও ভূগোলে তাহার নাম নাই। তাহা স্বপ্নলোক। তাহার দাদা বউদিদি,

তাহার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রাচুর্যের যে উৎসবের যে আনন্দের তুফান বহাইয়া দিয়াছেন তাহা আন্তরিক, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত, তাহা অনন্য। সত্যই নবকিশোরের সুখের অবধি ছিল না। কিন্তু বিচিত্র মানুষের মন। এত সুখের মধ্যেও সে কেমন যেন স্বস্তি পাইতেছিল না। এমন সুন্দর ঐক্যতানের মধ্যেও কি যেন একটা বেসুরা বাজিতেছিল। উৎসাহের কথা বারবার মনে পড়িতেছিল তাহার। তাহার জীবনের আলোকিত রঙ্গমঞ্চে উৎসাহের ছায়া একটা কালো প্রেতের মতো সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। নবকিশোর যদি সাধারণ স্বার্থপর লোক হইত, তাহার বন্ধুত্ব যদি আধুনিক যুগের ঠুনকো 'ফ্রেণ্ডশিপ্'-এর উর্ধ্বে না উঠিতে পারিত, তাহা হইলে এই সময়ে, যখন সুখের সাগরে অনুকূল বাতাসে রঙীন পাল তুলিয়া তাহার সাধের তরণী ভাসিয়াছে, এমন করিয়া উৎসাহের কথা তাহার মনে পড়িত না। উৎসাহকে সত্যই সে ভালবাসিয়াছিল। কলিকাতা শহরের মেকি মুখোশ পরা জনতার মধ্যে উৎসাহের মধ্যে সে তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল যাহা মেকি নয়, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত, যাহা জীবন্ত, যাহা অনাবৃত, যাহা অনবদ্য। উৎসাহ যদি স্ত্রীলোক হইত তাহা হইলে ইহাকেই রোমান্টিক প্রেম বলা চলিত, হয়তো নবকিশোর পূর্বনির্দিষ্ট বিবাহ-ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া উৎসাহকে বিবাহ করিবার জন্যই পাগল হইয়া উঠিত। কিন্তু তাহা হয় নাই. কারণ উৎসাহ পুরুষ। পুরুষকে ঘিরিয়াও কিন্তু রোমান্টিক প্রেম হয়। সত্যই যাহা প্রেম তাহা নারী-পুরুষ বিচার করে না। উৎসাহের সহিত তাহার আলাপ মাত্র কয়েকদিনের। কিন্তু নবকিশোরের মনে হইতেছে সে যেন তাহার চিরদিনের চেনা। তাহার আসন্ন বিপদ যেন তাহারই বিপদ, যে মেঘ তাহার ভাগ্যাকাশে ঘনাইয়া আসিয়াছে সে মেঘ কাটিয়া না গেলে তাহার যেন স্বস্তি নাই। অর্থ দিয়া, সামর্থ্য দিয়া, মনুষ্য-সাধ্য কোন কিছু দিয়া যদি সে বিপদকে দূর করা সম্ভব হইত, নবকিশোর তাহা নিশ্চয় করিয়া ফেলিত। কিন্তু ওই শ্মশান-ভৈরবী, ওই মধুমতী, গ্রহনক্ষত্রের ওই অশুভ অবস্থান এমন একটা জটিল, রহস্যময়, অনিশ্চিত পরিবেশ যে কিছু করিবার উপায় নাই। বুদ্ধি দিয়া তাহা বিচারযোগ্য নহে, বিজ্ঞানের নিকষে তাহাকে যাচাই করিবার উপায় নাই। তবু তাহা উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কেমন যেন ভয় ভয় করে। উড়াইয়াই বা দিবে কি করিয়া? সে শ্মশান-ভৈরবীর ষোড়শী রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, মধুমতীর গন্ধে আকুল হইয়াছে, মধুমতীর দেওয়া মোহরের থলি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে! উড়াইয়া দিবে কি করিয়া? এখন দুরু দুরু বক্ষে কেবল অপেক্ষা করিতে হইবে, ইহার পর কি হয়। বিরাট পণ্ডিত কাল রাত্রে অতুলকে তাহার কাছে পাঠাইয়াছিলেন। সে ইচ্ছা করিয়াই উৎসাহের খবর যথাসম্ভব গোপন করিয়াছে। কতটাই বা সে জানিত? অতুল তাহাকে বিরাট পণ্ডিতের কাছে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ওই শীর্ণকান্তি বিশাল চক্ষু রোষ-দীপ্ত বিরাট পণ্ডিতের কাছে যাইতে তাহার সাহস হইল না। পরদিন সকালে আসিয়াই সে খোঁজ করিল ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের ক্লাস কখন কখন। দেখিল দুপুরের আগে ক্লাস নাই।

হঠাৎ মহা কলরব করিতে করিতে যোগেন আসিয়া হাজির হইল।

"খবর শুনেছিস?"

"কিসের খবর।"

"বার্নাডো সাহেবের? ও যে এত 'গ্রেট' তা ধারণা ছিল না। ডাক্তার মজুমদার

বললেন বার্নাডো সাহেব না কি বলেছেন যে রাগের মাথায় পুলিসকে খবর দিয়েছিলেন বলে তিনি লজ্জিত। ছেলেরা ওআর্ডে জয়েন করুক। তাদের আমি একদিন খাইয়ে দেব। যে যা খেতে চায় তাই খাওয়াব। আমরা ঠিক করেছি দেশী বিদেশী দু'রকম খানাই খাব। পেলেটি আর ভীম নাগ, নীলমণি আর নবীন ময়রা কাউকে বাদ দেব না। কি বলিস?"

নবকিশোর স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার পেটের খবর কি—"

"ভালো নয়। অ্যাকোয়া টাইকোটিস্ আর এসিড্ হাইড্রোক্লোরিক ডিল্, এদের ভরসাতেই যুদ্ধ করে যাচ্ছি। সুনীলদা বলেছেন একটা কোর্স 'এমিটিন' দেবেন আমাকে। বড্ড ব্যথা হয় ভাই। তোর বিয়েটা চুকে যাক, ফিস্ট-টিস্টগুলো খেয়ে নি, তারপরে দেখা যাবে। চল্ এখন ওআর্ডে যাওয়া যাক—"

বার্নাডো সাহেব ঠিক আটটার সময় 'ওআর্ডে' আসিয়াছিলেন। সমবেত ছাত্রদের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আজ রোলকল হবে না। আজ সকলেই পার্সেন্টেজ্ পাবে। তোমরা স্ট্রাইক করেছিলে বলে আমি রাগ করি নি। বরং তোমাদের যে আত্মসম্মানবোধ আছে এ দেখে আমি খুশী হয়েছি। আমার ছাত্রেরা যে ভেড়া নয়—মানুষ, এ খবর আনন্দজনক। আমার সঙ্গে এক বিরাট পণ্ডিতের আলাপ আছে। তিনি একজন বহুদর্শী বিদ্বান লোক। তিনি বলেন পৃথিবীর বিশাল মন্দিরে আমরা সবাই কাকের দল। যেখানে যতটুকু খাবার পাই ছোঁ মেরে তুলে নি। বেগতিক দেখলে উড়ে পালাই। বিরাট পণ্ডিত নিজেকেও কাক বলেন। কিন্তু আমি জানি—হি ইজ্ মোর দ্যান্ এ মিয়ার ক্রো (he is more than a mere crow) —হি ইজ্ এ ফাইটার (he is a fighter)—যদিও তিনি খুব বড় একজন জ্যোতিষী তবুও তিনি কাউকে বলেন না তুমি ভাগ্যের কাছে নতিস্বীকার কর। বলেন, তুমি মানুষ, তুমি যোদ্ধা, তুমি বিরূপ ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে সেই ফাইটিং স্পিরিট (fighting spirit) দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। ডাক্তার মজুমদারকে বলেছি একটা ফিস্টের (feast) আয়োজন করতে। তোমরা কে কি খেতে চাও তাঁকে বোলো। একটা কথা আশা করি তোমরা মনে রাখবে, নর্ম্যাল হিউম্যান স্টমাকের (normal human stomach) কেপাসিটি (capacity) চার আউন্সের বেশী নয়। এইবার এস আমরা এই টাইফয়েড রুগীটাকে পরীক্ষা করি। এটা ওর থার্ড উইক (third week) শুরু হয়েছে, ওর এখন যা অবস্থা সেটাকে আমরা বলি টাইফয়েড স্টেট (typhoid state)."

বার্নাডো সাহেব একঘণ্টা ধরিয়া টাইফয়েড সম্বন্ধে চমৎকার একটি বক্তৃতা দিলেন। তাহার পর বলিলেন, "কিন্তু আমি যা বলছি তা তোমরা যেন বেদবাক্য বলে গ্রহণ কোরো না। তোমাদের বুদ্ধি বিদ্যে দিয়ে সেটা যাচিয়ে নেবে, বাজিয়ে নেবে। তোমাদের বেডের (bed) প্রত্যেক রুগীকে বই পড়ে পরীক্ষা করে নিজে ডায়াগনোসিস্ (diagnosis) করবার চেষ্টা করবে। ভুল হয় হোক, আমরা সেটা শুধরে দেব, কিন্তু তোমাদের নিজেদের চেষ্টা করতে হবে—"

যোগেন আগাইয়া গিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "স্যার, আমরাও যদি আপনাকে একদিন কোনও হোটেলে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াই তাহলে আপনি কি আপত্তি করবেন?"

"কিছুমাত্র না। তবে একটা ভোজের ধাক্কা আগে সামলানো যাক। তারপর ও কথা ভাবা যাবে।"

ছাত্রদের দল মুগ্ধ হইয়া ওআর্ড হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার পর নবকিশোর উইলসন সাহেবের ওয়ার্ডের দিকে গেল রামেশ্বর পাণ্ডের খবর লইবার জন্য। ডাক্তার পুলিন মিত্রের কথা শুনিয়া তাহার মন বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। সত্যই কি উনি 'ঘুস' না পাইলে উহাকে 'পুট্ আপ্' (put up) করিবেন না? মনে হইল উনি বোধ হয় রসিকতাই করিতেছিলেন। দেখা যাক কতদূর কি হইয়াছে।

সেখানে গিয়া উৎসাহের সহিত দেখা হইয়া গেল। সে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "পাঁড়েজির অপারেশন হচ্ছে। তোমাকে খবর দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু সময় পেলাম না। একটু পরেই তোমার মেসে যেতাম আমি।"

"ডাক্তার মিত্র তাহলে কাল আমার সঙ্গে রসিকতাই করছিলেন।"

"কি রসিকতা—"

"বলছিলেন, পাঁড়েজি শাঁসালো মাল, আমাকে কিছু পাইয়ে দাও।"

"ও, তোমাকেও বলেছিলেন না কি! পাঁড়েজিকেও বলেছিলেন। সে ব্যবস্থাও করেছি। পান খাইয়েছি তাঁকে। কিন্তু পান দেওয়াতে চটে গেলেন ভদ্রলোক।"

"কি রকম।"

উৎসাহ তখন তাহাকে সব খুলিয়া বলিল।

"গ্র্যাণ্ড হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়েছ তুমি! সে যে অনেক খরচের ব্যাপার।"

"মধুমতী অনেক টাকা দিয়ে গেছে আমাকে। টাকার অভাব নেই।"

"পাঁড়েজির জন্যই ঘর ভাড়া করেছিলে?"

"না, আগেই করেছিলাম। আমার বিয়ে হ'য়ে গেছে তো, কিন্তু ঘরের অভাবে এখনও ফুলশয্যা হয় নি। বামাচরণবাবু সারপেনটাইন লেনে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে মেয়ে এনে বিয়ে দিয়েছেন। সে বাড়িতে অত্যন্ত স্থানাভাব। তাই গ্র্যাণ্ড হোটেলে খানকয়েক ঘর নিয়েছি। ওইখানেই ফুলশয্যা হবে। কিন্তু তাতেও বাগড়া লেগেছে। বামাচরণবাবু আশা করতে পারেন নি যে আমি সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে করে ফেলব। মেয়ে-জামাইকে যে খাটটি তিনি দেবেন বলেছিলেন, সেটা এখনও পুরো তৈরি হয় নি। তাঁর ইচ্ছে ওই খাটেই আমাদের ফুলশয্যা হোক। সেইজন্যে দেরি হচ্ছে। কাল নাগাদ হ'য়ে যাবে মনে হচ্ছে। গ্র্যাণ্ড হোটেলের ম্যানেজারও একটা বাগড়া লাগাবার চেষ্টায় ছিলেন। বলছিলেন, আমাদের ফার্নিচার সরিয়ে দু'চার-দিনের জন্য বাইরের ফার্নিচার এনে ঢোকানো আমাদের নিয়ম নয়। আরও কিছু বেশী টাকা দিয়ে সে নিয়মের ব্যতিক্রম সৃষ্টি করতে হ'ল। হাঙ্গামা কি কম! কাল কিন্তু তোমাকে আসতে হবে। বিকেলে একটু খাওয়ার আয়োজন করব। তুমিই আমার একমাত্র অতিথি। আমার বিয়ের কথা আর কাউকে জানাই নি। তুমি কাউকে বল নি তো?"

"না। তবে অতুলবাবুকে কাল বিরাট পণ্ডিত আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, তোমার খবর জানবার জন্য। খবর তো আমি কিছুই জানতাম না সেই কথাই বললাম। তবে আভাসে জানিয়েছি যে তুমি হয়তো তোমার জেঠুর অমতে বিয়ে করে ফেলেছ।"

"জানিয়েছ না কি !"

উৎসাহ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। তাহার পর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"ভাগ্যের কি অদ্ভুত ষড়্‌যন্ত্র ! আমার যিনি সবচেয়ে আপন লোক তাঁকে আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের খবরটা দিতে পারলাম না। যে আশীর্বাদ আমার জীবনে মহামূল্য সম্পদ হ'ত তা থেকে বঞ্চিত হ'লাম। ফুলশয্যা হ'য়ে গেলে বউকে নিয়ে ওঁর কাছেই যাব, উনি মারুন ধরুন যাই করুন তবু যাব। জানি শেষ পর্যন্ত উনি ক্ষমা করবেন।"

"বউ কেমন হয়েছে ?"

"শুভদৃষ্টির সময় মিনিটখানেকের জন্য দেখেছিলাম। ভালোই তো লাগল। বড় মায়া হ'ল দেখে। ভীরু অসহায় চোখের দৃষ্টি—"

আবার উৎসাহ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তাহার চোখের সামনে কালো একটি শীর্ণ মুখ এবং দুইটি ভীরু চোখের দৃষ্টি আবার ভাসিয়া উঠিল।

"তোমার বিয়ে কবে ?"

"দিনচারেক পরে। তুমি তোমার বউকে নিয়ে এস। আসবে তো ?"

উৎসাহের মুখে আবার ম্লান হাসি ফুটিল।

"চেষ্টা করব। তোমার সুখের বিয়ে, সুখের সংসার, সবই সুখের। আমার দুর্ভাগ্যের স্পর্শ পাছে তোমার সুখকে মলিন করে ফেলে তাই ভয় হয় !"

"তুমি নিজেকে দুর্ভাগা মনে করছ কেন !"

"আমি নিজের আসল কুষ্ঠিটা দেখেছি যে। আমার মনে কোনও সংশয় নেই।"

একটু থামিয়া আবার বলিল, "কোনও ক্ষোভও নেই। যা কর্তব্য বলে মনে করেছি তাই করেছি নির্ভয়ে। তারপর যা হ'বার হোক—"

"প্রবাল তো পরেছ দেখছি। বিরাট পণ্ডিত বলেন ওতেই বিপদ কেটে যাবে।"

"বিরাট পণ্ডিত মুখে ও কথা বলেন সকলকে। কিন্তু মনে মনে তিনি জানেন যে পাহাড়ের ধস্ যখন ভেঙে পড়ে, আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা যখন উৎক্ষিপ্ত হ'তে থাকে, প্রবল বন্যা যখন বাঁধ ভাঙে তখন তাদের কিছুতে আটকানো যায় না ! কিন্তু তবু সব জানা সত্ত্বেও উনি বাঁশের ঠেকনো দিয়ে পাহাড়ের ধস্ আটকাবার চেষ্টা করেন, আগ্নেয়গিরিতে দু' বালতি জল ঢেলে নেবাতে ছোটেন, মনে করেন দু'চার ঝুড়ি মাটি ফেললেই বুঝি বানকে রোধ করা যাবে। উনি জানেন এসব চেষ্টা হাস্যকর কিন্তু তবু উনি থামতে পারেন না। কারণ উনি জাতবিদ্রোহী, পুরুষকারের প্রচণ্ড উপাসক। ভাগ্য ওঁকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করেছে কিন্তু ওঁর মেরুদণ্ড ভাঙতে পারে নি—"

তাহারা প্রিন্স অব ওএলস্ হাসপাতালের সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল। উপর হইতে একটি ছেলে নামিয়া আসিয়া উৎসাহকে বলিল, "আপনার কেস্‌টার অপারেশন হ'য়ে গেছে। তাঁকে ওআর্ডে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ক্লোরোফর্মের (chloroform) ঘোর এখনও কাটে নি।"

"চল দেখি গিয়ে।"

নবকিশোর ও উৎসাহ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

॥ উনিশ ॥

বিরাট পণ্ডিত পুষ্পকে লইয়া মাতিয়া উঠিলেন। নিজে বাজারে গিয়া তাহার জন্য ছোট ট্রাংক, ছোট আলমারি, ছোট টিনের স্যুটকেস এবং ছোট কাঠের আলনা কিনিয়া আনিলেন। তাছাড়া আনিলেন দাঁতের মাজন, আয়না, চিরুনি, মাথার তেল এবং সাবান। শাড়ি এবং জামাও আনিলেন কয়েকটা। একটা সাধারণ গামছা, একটা লোমওলা তোয়ালে, একটা আলাদা বালাতিও আনিলেন তিনি। পুষ্পের জন্য আলাদা একটা ঘর নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া বলিলেন, "এই ঘরটি তোর। তোর সব জিনিস কিনে দিলাম। বেশ করে গুছিয়ে রাখবি। দাঁত মাজবি ভাল করে। দাঁতে ছ্যাতলা পড়ে আছে। চোখে পিঁচুটি কেন? ভাল করে চোখ ধুবি। সাবান দিয়ে গা হাত পা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করবি, কত ময়লা জমে আছে দেখ তো। নিজের কাপড় নিজে কাচবি, নিজ শুকুতে দিবি, নিজে তুলে পাট করে রাখবি। গামছা তোয়ালে কাপড় জামা সব যেন ধবধবে পরিষ্কার থাকে। গাঁট্টার উপর নির্ভর করিস নি, ও মহা ফাঁকিবাজ। সব তোকে করতে হবে। পারবি তো?"

পুষ্প ঘাড় কাত করিয়া জানাইল পারিবে। বলিল, "আমি আপনারও কাপড় গামছা কেচে দেব, ঘর ঝাঁট দিয়ে দেব, বাসন মেজে দেব!"

"না, সে সব করতে হবে না। আগে নিজের কাজটা ভাল করে কর। তাছাড়া তোকে পড়তে হবে। পড়বি তো? কি ইচ্ছে তোর?"

পুষ্প ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছার কথা কেহ তো কখনও জানিতে চাহে নাই! কি ইচ্ছা প্রকাশ করিলে এই অদ্ভুত লোকটা খুশী হইবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। ট্যারা চোখের তির্যক দৃষ্টি বিরাট পণ্ডিতের মুখের উপর নিবন্ধ করিয়া একটু অপ্রস্তুতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

"কিরে, কি ইচ্ছে তোর? পড়বি তো।"

"আপনি যা বলেন তাই করব।"

"আমি যা বলি শেষ পর্যন্ত তা কেউ শোনে না। জরিকে আমার পড়াবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ও তো আমার কথা শোনে নি। তুমিও শেষ পর্যন্ত শুনবে না। একটু বড় হ'য়ে তুমি যখন দেখবে আর পাঁচটা মেয়ে ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে ইস্কুলে যাচ্ছে, তোমার মনে হবে তোমাকে না পড়িয়ে' আমি অন্যায় করেছি। তোমাকে সারাজীবন দাসী-বাঁদী করে রাখতে চাচ্ছি। এ অপবাদ আমি নিতে চাই না। তোকে পড়তে হবে। তারপর যা হ'বার হবে। অ আ ক খ জানিস?"

পুষ্প ঘাড় নাড়িয়া জানাইল জানে না।

"কাল তাহলে বর্ণ-পরিচয়ও কিনে আনব একটা। এম. এ. পর্যন্ত পড়াব তোকে। জরিকে যেমন পড়িয়েছিলাম। তার পর জরির মতো তুমিও আমাকে ছেড়ে পালাবে। সব জানি, তবু পড়াব।"

বিরাট পণ্ডিতের বিশাল নয়নে আগুনের শিখা যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পুষ্প সেদিকে সভয়ে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি আপনাকে কখনও ছেড়ে যাব না।"

"ও কথা সকলেই বলে প্রথম প্রথম। যা, আগে সাবান দিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করে ফেল। কাগের বাসা হয়ে আছে। সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে তারপর তেল মেখে চিরুনি দিয়ে আঁচড়া ভাল করে। ভাল গন্ধ তেল এনে দিয়েছি। চুল ভালো হয় ওতে। যা—"

পুষ্প ভিতরে চলিয়া গেল।

বিরাট পণ্ডিত গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন তিনি। গলিটা সহসা নির্জন হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ চলমান একটা রিক্শার শব্দে সে নির্জনতা বিঘ্নিত হইল। বিরাট পণ্ডিত উঠিয়া বাহিরের কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর আবার আসিয়া নিজের আসনে বসিলেন। তাঁহার চক্ষু বুজিয়া গেল। মনে মনে তিনি মঙ্গলস্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"মঙ্গলো মঙ্গলোকরো ভূতিদো মঙ্গলাকরঃ
শিবদঃ শান্তিদঃ শন্দঃ, শিবমূর্তিঃ শিবালয়ঃ"

এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ স্তোত্রটি তিনি মনে মনে আবৃত্তি করিয়া গেলেন। মঙ্গলের প্রদীপ্ত বীরমূর্তি তাঁহার চোখের সামনে জীবন্ত হইয়া উঠিল। ধরণীগর্ভ সম্ভূত বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভ মহাতেজা লোহিতাঙ্গ অঙ্গারক যেন তাঁহার মানসপটে মূর্ত হইয়া উঠিলেন। বিরাট পণ্ডিত মনে মনে বলিতে লাগিলেন—হে মহাশক্তিধর গ্রহ, জানি আপনি অজেয়, আপনি অমোঘ, জানি আপনিও নিয়তির নিয়মে অপরিবর্তনীয় পথে অনিবার্যগতিতে সঞ্চরণ করিতেছেন, জানি কোন প্রার্থনাই আপনাকে বিচলিত করিতে পারিবে না, কিন্তু তবু কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছি, হে ধনদ, রাজ্যদ, শ্রীদ, সুখদ, স্বস্তিদ, কামদোগ্ধা শরণাগতবৎসল গ্রহরাজ, উৎসাহকে রক্ষা করুন। আপনি আমাকে শাস্তি দিন, আমার দর্প চূর্ণ করুন, কারণ আমিও সারাজীবন স্বয়ং চণ্ডীর মতোই স্পর্ধিতকণ্ঠে বলিয়াছি—যো মাং জয়তি সংগ্রামে, যো মে দর্পং ব্যপোহতি, যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি। আমাকে যিনি সংগ্রামে জয় করিয়া আমার দর্প চূর্ণ করিবেন, তিনিই আমার স্বামী হইবেন। আমি জীবনে অনেক আঘাত পাইয়াছি। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছি, কুলিগিরি করিয়াছি, নাইট স্কুলে পড়িয়াছি, অনেক অপমান অনেক হীনতা সহ্য করিয়া টিউশনি, কেরানীগিরি করিয়াছি। কিন্তু জ্ঞানের চর্চা ছাড়ি নাই। তাই আপনাদের মতো প্রদীপ্ত মহাশক্তিশালী গ্রহদের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছি, আমাদের কাব্যে পুরাণে অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছি, গ্রীক পুরাণে দেব-দেবী ও টাইটানদের (Titan) উত্থান-পতন জয়-পরাজয়ের কাহিনী পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। পৃথিবীর ইতিহাসে মানব-পশুদের বিচিত্র আলেখ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছি, মানব-দেবতার ক্বচিৎ আবির্ভাবে মুগ্ধ হইয়াছি। নানা দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও আমি কিন্তু ভোগের পথে চলিয়াছি চিরকাল। আধ্যাত্মিক পথে চলিতে গিয়া বারম্বার পদস্খলন হইয়াছে। আপনাদের কুদৃষ্টিই আমাকে ও পথে চলিতে দেয় নাই। আঘাতের পর আঘাত পাইয়াছি। কিন্তু সংগ্রামে পরাজয় স্বীকার করি নাই, আমার দর্প এখনও চূর্ণ হয় নাই। হে গ্রহরাজ, আপনি আমাকে চূর্ণ বিচূর্ণ বিধ্বস্ত করুন, আপনি আমাকে দিয়া স্বীকার করাইয়া লউন যে আমি পরাজিত হইয়াছি—কিন্তু উৎসাহকে রক্ষা করুন আপনি। অমন একটা প্রতিভাময় সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিবেন না।

এ অঙ্কুরকে বিনাশ করিলে আমি আঘাত পাইব সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি পরাজয় স্বীকার করিব না। আপনি শরণাগতবৎসল, আপনি সত্যপ্রিয়, আপনি শিবালয়, আপনি শান্তিদ, আপনি স্বস্তিদায়ক, তাই আপনার মহাশক্তি মহামহত্ত্বের কাছে আমার আবেদন—উৎসাহকে রক্ষা করুন!

হঠাৎ বাহিরের দুয়ারে কড়াটা সজোরে নড়িয়া উঠিল।

"কে? গাট্টা, গাট্টা—"

ভিতর হইতে গাট্টার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"আমি কিমা পিষছি—"

বিরাট পণ্ডিত নিজেই উঠিয়া কপাটটা খুলিয়া দিলেন। দেখিলেন একটি উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টি লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

"কাকে চান আপনি?"

"বিরাট পণ্ডিতমশায়কে।"

"আমিই বিরাট পণ্ডিত। কি দরকার—"

"প্রশ্ন গণনা করাব একটা। ঠিকুজি সঙ্গে এনেছি।"

"একশ' টাকা লাগবে।"

"তা-ও এনেছি—"

"আসুন।"

ঠিকুজি লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি জানতে চান?"

"এর আয়ু কতদিন—"

"টাকাটা দিন।"

টাকাটা লইয়া বিরাট পণ্ডিত ছক্ দেখিয়া আর একটা ছক্ প্রস্তুত করিলেন। তাহার পর বলিলেন—"বেশী দিন পরমায়ু নেই। বড়জোর মাসখানেক। তবে যদি নীলা আর প্রবাল ধারণ করান—"

"না, ওসব কিছুই করাব না। আমি চাই ও তাড়াতাড়ি মরে যাক—"

"কেন?"

"যদিও ও আমার একমাত্র ছেলে, তবু ও শত্রু। আমার শত্রু, দেশের শত্রু। ঘরভেদী বিভীষণ। টাকার লোভে ধর্মত্যাগ করেছে। ও আপদ যত শীগ্‌গির বিদেয় হয় ততই ভালো। খুব আনন্দের সংবাদ শোনালেন। ধন্যবাদ।"

ভদ্রলোক উঠিয়া পড়িলেন এবং নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

"ও মশাই শুনুন, শুনুন—"

ফিরিয়া আসিলেন ভদ্রলোক।

"কি।"

"আপনার পায়ের ধুলোটা নেব। মহৎ লোক আপনি।"

বিরাট পণ্ডিত সত্যই হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন। ভদ্রলোক একটু বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। পদধূলি লইয়া বিরাট পণ্ডিত যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন দেখিলেন ভদ্রলোকের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে। তিনি আর দাঁড়াইলেন না, হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন। বিরাট পণ্ডিত নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর ঘরে ঢুকিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন।

॥ কুড়ি ॥

সেদিন বৈকালে আকাশে মেঘের অদ্ভুত সমারোহ হইয়াছিল। সমস্ত পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া আকাশে যাহা পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহা যেন মেঘ নয়, তাহা যেন রাশি রাশি কালো কোঁকড়ানো চুলের রাশি। ঘনকৃষ্ণ চুলের ফাঁকে ফাঁকে রক্ত-আভাও বিচ্ছুরিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন আগুনের শিখাও আছে উহার মধ্যে। মনে হইতেছিল বিরাট একটা মস্তক জবলজটায় সমস্ত আকাশ বুঝি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কালো মেঘের মাঝে সাদা মেঘও ছিল খানিকটা। তাহাতে কাহার একটা সুন্দর মুখও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে মুখের উপর রক্তাভকৃষ্ণ কেশদাম অবিন্যস্তভাবে লুটাইতেছিল। ছোট ছোট কালো মেঘের টুকরা সে মুখের উপর যে কালো চোখ ও ভ্রূ আঁকিয়া দিয়াছিল তাহা অতিশয় মনোহর। সে চোখে সে ভ্রূভঙ্গীতে যেন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন-সুষমা-মণ্ডিত একাগ্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল সে যেন পৃথিবীর দিকে একাগ্র দৃষ্টি মেলিয়া কাহাকে খুঁজিতেছে। এই বিরাট মেঘ-সমারোহ ধীরে ধীরে মধ্যগগনের দিকে বিসর্পিত হইতে লাগিল। হাওয়ার বেগ বাড়িল।

গ্র্যাণ্ড হোটেলের বারান্দায় খাওয়ার আয়োজন করিয়াছিল উৎসাহ। বারান্দা হইতে গড়ের মাঠ দেখা যায়। খাওয়ার টেবিল ফুলে ফুলে সজ্জিত করিয়াছিল সে। উৎসাহের নববধূ সাবিত্রী, উৎসাহ, বামাচরণবাবু, সাবিত্রীর ভাই সনাতন এবং নবকিশোর— মাত্র এই কয়জনের জন্য এত খাবারের আয়োজন করিয়াছিল যে তাহাতে কুড়ি পঁচিশ জন লোক স্বচ্ছন্দে খাইতে পারে। নানারকম খাবার এবং প্রত্যেকটাই প্রচুর।

"কি কাণ্ড করেছ তুমি! এত খাবে কে—"

"সব যে খেতেই হবে এ কথা তো বলছি না। যা পারো খাও। পাতে কিছু পড়ে না থাকলে বোঝা যায় না যে সবাই পুরো খেয়েছে।"

"তা বলে এত অপচয় করা কি ভালো"—বামাচরণবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন।

"পৃথিবীতে কিছুই অপচয় হয় না। এবারে বসা যাক—"

উৎসাহ একটু যেন উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল।

নবকিশোর একটি বেহালার বাক্স এবং একটি গহনার বাক্স সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল।

"অতুলবাবু এই বেহালাটা সাবিত্রী দেবীকে উপহার পাঠিয়েছেন। বলেছেন যে এটা খুব পুরোনো বেহালা। খুব ভালো আওয়াজ এর। সাবিত্রী দেবী যদি শিখতে চান, অতুলবাবু তার ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি আমার মেসে একটা চিঠি লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। এই নাও চিঠি। আর এই সামান্য গয়নাটা বন্ধুজায়ার জন্যে আমি এনেছি।"

উৎসাহ গহনার বাক্সটা খুলিয়া দেখিল—দামী একটা জড়োয়ার হার।

"তুমি এত টাকা খরচ করতে গেলে কেন! দাম নিশ্চয় অনেক নিয়েছে।"

"বউদি কিনে দিয়েছেন। দাম কত আমি জানি না।"

উৎসাহ অতুলের চিঠিটা পড়িল।

"ভাই উচ্ছে,

তোমার বিয়েতে আমি থাকব না এ অঘটন আমি কল্পনা করতে পারতুম না। বাস্তব কিন্তু কল্পনাকে হারিয়ে দিয়েছে। আমি যখন এই বেহালাটা বাজাতুম তুমি মুগ্ধ হ'য়ে শুনতে। তোমারও ইচ্ছে হয়েছিল বেহালা শেখবার। একটু শিখেওছিলে। তোমার বিয়েতে এই বেহালাটাই উপহার পাঠালাম তোমাকে। তোমার বউ শিখুক। আমি তার ব্যবস্থা করে দেব। কবে আবার দেখা হবে? ইতি

অতুল"

উৎসাহ অন্যমনস্ক হইয়া বিস্ফারিত চক্ষে মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"আকাশে অদ্ভুত মেঘ হয়েছে তো। আর মেঘের মধ্যে কেমন সুন্দর একটা মুখ। নবু দেখ, দেখ—"

ইহার পরই সেই অপূর্ব তীব্র মধুর গন্ধে চতুর্দিক ভরিয়া উঠিল। উৎসাহ আরও উত্তেজিত হইয়া পড়িল, তাহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া গেল, চক্ষুর দৃষ্টি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অস্থির হইয়া উঠিল সে।

"নবু, মধুমতী এসেছে—"

"কোথা—"

"গন্ধ পাচ্ছ না? সেদিন রাত্রে যে গন্ধ পেয়েছিলে এ সেই গন্ধ—এ সেই গন্ধ—"

নবকিশোরের মনেও সংশয় ছিল না।

হঠাৎ ঝড় উঠিল। বজ্রগর্জনে কাহার অট্টহাসি শোনা গেল যেন।

"ওই যে মধুমতী—"

"কই।"

"ওই যে মাঠের মাঝখানে—"

"কই।"

"ওই যে গাছের নীচে। যাই, ওকে ডেকে নিয়ে আসি। আমি বললে ও ঠিক আসবে—"

উৎসাহ দ্রুতপদে, প্রায় ছুটিতে ছুটিতে, সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

"মধুমতী কে?"

বিস্মিত বামাচরণবাবু প্রশ্ন করিলেন। নবকিশোর নির্বাক হইয়া রহিল, কোনও উত্তর দিতে পারিল না। ঝড় তুমুল হইয়া উঠিল। টেবিলের ফুলদানী উল্টাইয়া গেল।

"যাই, দেখি ও কোথায় গেল এই ঝড়ে।"

নবকিশোরও নামিয়া গেল। দেখিল উৎসাহ রাস্তা পার হইয়া মাঠের মধ্যে ছুটিতেছে। সে-ও রাস্তা পার হইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, কিন্তু পারিল না, থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল তাহাকে। বিরাট সর্পের মতো একটা বিদ্যুৎ সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া ঝলসিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া যে বজ্রপাত হইল তাহাতে ক্ষণিকের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া গেল সব যেন। তাহার পর গুরু গুরু গুরু গুরু শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল মেঘে মেঘে। বৃষ্টি শুরু হইল। তবু নবকিশোর রাস্তা পার হইয়া ভিজিতে ভিজিতে মাঠের ভিতর খুঁজিতে গেল উৎসাহকে। একটু পরেই দেখিতে পাইল একটা গাছতলায় কে যেন পড়িয়া আছে। ছুটিয়া গিয়া দেখিল উৎসাহ।

"উৎসাহ, উৎসাহ—"

উৎসাহ সাড়া দিল না। বজ্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

নবকিশোর সবিস্ময়ে দেখিল, সে যেন হাসিমুখে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

বিরাট পণ্ডিত নিজের ঘরে বসিয়া নিমীলিত নয়নে তারস্বরে দেবীকবচ আবৃত্তি করিতেছিলেন—

নারসিংহী মহাবীর্যা শিবদূতী মহাবলা
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা ॥
লক্ষ্মী পদ্মাসনা দেবী পদ্মহস্তা হরিপ্রিয়া
শ্বেতরূপধরা দেবী ঈশ্বরী বৃষবাহনা ॥ —

সহসা তাঁহার সম্মুখে নানালঙ্কারভূষিতা অপূর্বদ্যুতিময়ী ষোড়শী মূর্তি আবির্ভূতা হইলেন।

"বিরাট পণ্ডিত, তোমার চণ্ডীপাঠ ব্যর্থ হয়েছে। উৎসাহকে তুমি বাঁচাতে পারলে না। আমার হাতে যদি ওকে ছেড়ে দিতে তাহলে ওর এ অকালমৃত্যু হ'ত না। মধুমতী ওকে গন্ধর্বলোকে নিয়ে গেছে। তার দেহটা গড়ের মাঠে পড়ে আছে। নবকিশোর তার পাশে বসে কাঁদছে। তার সৎকারের ব্যবস্থা কর।"

"কে ! শ্মশান-ভৈরবী ! কি বললে—?"

ষোড়শী অন্তর্হিতা হইলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

উৎসাহের চিতা জ্বলিতেছিল।

বিরাট পণ্ডিতই মুখাগ্নি করিয়াছিলেন। জ্বলন্ত চিতার দিকে চাহিয়া প্রস্তর-মূর্তিবৎ বসিয়াছিলেন তিনি। অতুল শ্মশানের একধারে বসিয়া সেই বেহলাটায় বাগেশ্রী রাগিণী আলাপ করিতেছিল। তাহার পাশে নবকিশোর বসিয়াছিল নীরবে। তাহার সমস্ত মন যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। বিরাট পণ্ডিতের পিছনে নতমুখে বসিয়াছিল সাবিত্রী। বিরাট পণ্ডিত তাহাকে মাথার সিঁদুর মুছিতে দেন নাই। তাহার হাতের চুড়ি গলার হার যেমন ছিল তেমনি আছে। একটু দূরে কপালে হাত দিয়া বসিয়াছিলেন বামাচরণ এবং আরও কয়েকজন শ্মশান-বন্ধু। তাহারা বিরাট পণ্ডিতের দিকে পিছন ফিরিয়া বিড়ি টানিতেছিল।

সহসা বিরাট পণ্ডিত কথা কহিলেন, "অতুল—"

"আজ্ঞে—"

"চন্দনকাঠ বেশ ভালো ছিল তো।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"আর ঘি ?"

"ভালো গাওয়া ঘি এনেছি।"

"খুব ভালো গন্ধ বেরুচ্ছে না তো—"

অতুল চুপ করিয়া রহিল।

বিরাট পণ্ডিতও আর কিছু বলিলেন না।

॥ একুশ ॥

বিরাট পণ্ডিত খুব একটা শোক প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার দৈনন্দিন জীবন যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। সাবিত্রীকে তিনি নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার মাথার সিঁদুর, তাহার রঙীন শাড়ি, তাহার গহনা যেমন ছিল তেমনি রহিল। বামাচরণবাবু একদিন সকালে আসিয়া নানাকথার পর বলিলেন —"আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার আমার মুখ নেই, আপনি যা বলেছিলেন তা বর্ণে বর্ণে ফলে গেছে—আমি, মানে—"

"বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ কেন। তোমার ন্যাকা-ন্যাকা কথা শোনবার ধৈর্য বা অবসর আমার নেই। কাজের কথা যদি কিছু থাকে বল—, আর না থাকে তো সরে পড়—"

বামাচরণ আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "ভাগ্যে যা ছিল তাতো হ'য়ে গেছেই পণ্ডিতমশাই। এখন সমাজের যা বিধান তা মানতে হবে। সাবিকে এখন সিঁদুর গয়না পরিয়ে রাখাটা কি উচিত হচ্ছে—"

গর্জন করিয়া উঠিলেন বিরাট পণ্ডিত।

"দেখ এ বাড়িতে বিরাট পণ্ডিতের বিধান ছাড়া কোনও বিধান চলবে না। ও সিঁদুর শাড়ি গয়না সব পরবে। ওকে আরও শাড়ি আরও গয়না কিনে দেব। ওকে পড়াব, ওকে ডাক্তার করব। ও যদি কাউকে বিয়ে করতে চায় নিজে পৌরোহিত্য করে সে বিয়েও আমি দেব—আমি থামব না, আমি নত হব না—"

"কিন্তু—"

"দেখ, ও আমার পুত্রবধূ। ওর সম্বন্ধে আমি যা ঠিক করব তাই হবে। তোমার কাছে যতদিন ছিল তুমি কোনও কর্তব্য কর নি। ওকে সামান্য লেখাপড়া পর্যন্ত শেখাও নি। কেবলই চেষ্টা করেছ কি করে কম খরচে ফাঁকি দিয়ে ওকে পাত্রস্থ করে বাজিমাৎ করবে। তোমার সে চেষ্টা সফল হয়েছে, তীর্থের কাক তুমি, পরের ঠোঙায় ছোঁ মেরে খানিকটা খাবার তুলে নিয়েছ। যাও এবার সরে পড়।"

বামাচরণবাবু তবু বলিলেন—"আমি বলতে চাইছিলাম—"

"যা বলতে চাইছিলে তা বাইরে রাস্তায় গিয়ে বল—"

তবু বামাচরণবাবু দাঁড়াইয়া রহিলেন। বলিলেন. "আপনি বলছেন ওর আবার বিয়ে দেবেন? আমরা গোঁড়া কুলীন ব্রাহ্মণ—"

ক্ষেপিয়া গেলেন বিরাট পণ্ডিত।

"তোমার মতো মুর্খ, কুলীন ব্রাহ্মণ? আর বিদ্যাসাগর, আশু মুকুজ্যে এরা বুঝি মুচি ছিলেন? বেরিয়ে যাও এখান থেকে। সাবিত্রী যদি বিয়ে করতে চায়, একবার কেন, বারবার বিয়ে দেব তার—।"

"আমি বলছিলাম—"

"গাঁট্টা, গাঁট্টা—একে বার করে দে বাড়ি থেকে।"

বিরাট পণ্ডিত উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বামাচরণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সক্রোধে বাহির হইয়া গেলেন।

॥ বাইশ ॥

ইহার পর ষোলো বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পরই নবকিশোর সস্ত্রীক বিলাতে চলিয়া যায়। সেখানেই সে ডাক্তারি পড়া শেষ করিয়া এম ডি., এম. আর. সি. পি. ডিগ্রী লাভ করে। কিছুদিন নানা হাসপাতালে কাজ করিয়া সে অবশেষে একটি বড় জাহাজের কোম্পানীতে চীফ্ মেডিক্যাল অফিসারের কাজ পায়। কাজটি তাহার মনোমত হইয়াছে। অনেক অবসর। নিজের একটি ল্যাবরেটরি করিয়া তাহাতেই গবেষণা করিয়া সে অবসর যাপন করে। প্রমীলাও লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভালো ডিগ্রী অর্জন করিয়াছে। সে-ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে কাজ করে। তাহাদের একটি পুত্র এবং কন্যা হইয়াছে। লণ্ডনেই পড়াশোনা করে তাহারা। হরিকিশোরবাবু রিটায়ার করিয়াছেন। বুলু এম. এ. পাস করিয়াছে। সে বিবাহ করে নাই। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসারি করিতেছে। হরিকিশোরবাবু, শ্রবণা এবং বুলু ছুটিতে প্লেনে করিয়া নবকিশোরের কাছে আসে। প্রমীলা লণ্ডনে ভালো পিয়ানোবাদকের সহায়তায় সুন্দর পিয়ানো বাজাইতে শিখিয়াছে। শ্রবণা যখন লণ্ডনে আসেন তখন প্রমীলা প্রত্যহ তাঁহাকে পিয়ানো বাজাইয়া শোনায়। পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে যোগেন মাঝে মাঝে নবকিশোরকে চিঠি লেখে। সে বিহারের একটি শহরে ভালো প্র্যাকটিস জমাইয়াছে। কিন্তু তাহার পেটের অসুখ এখনও সারে নাই, উপরন্তু ডায়াবিটিস (diabetes) হইয়াছে। ডাক্তার পুলিন মিত্রও মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন। তিনিও রিটায়ার করিয়া কলিকাতায় প্র্যাকটিস জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চেষ্টা কিন্তু ফলবতী হয় নাই। এখন শুধু পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত নানা লোককে চিঠি লিখিয়া সময় কাটান। নবকিশোর প্রতি বৎসর স-বেতন দুই মাস ছুটি এবং জাহাজে করিয়া বিনা ভাড়ায় স-মর্যাদায় সপরিবারে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবার সুযোগ পায়। লণ্ডনের একটি মফস্বল শহরে সে ছোটখাটো একটি বাড়িও কিনিয়াছে।

সেদিন ডাক্তার পুলিন মিত্রের একটি চিঠি আসিয়াছিল। নানা কথার পর পুলিন মিত্র লিখিয়াছেন—"তোমার বিরাট পণ্ডিতকে মনে আছে? লোকটি সত্যই বিরাট। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। আমার কন্যা বিধবা হইয়াছে। যদিও প্রথম প্রথম লোকটির উপর বিরূপ হইয়াছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইয়াছে। উৎসাহের বিধবা বউকে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়াছেন। মেয়েটি প্রতি বছর সব বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিতেছে। বিরাট পণ্ডিত তাহার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন, সে কিন্তু বিবাহ করিতে চায় না। মাথার সিঁদুর কিন্তু মোছে নাই, শৌখিন শাড়ি গহনাও পরে। পুষ্প নামে আর একটি অভাগিনী মেয়েকেও তিনি মানুষ করিয়াছেন। সে গত বৎসর অঙ্কে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাস করিয়া ডি. ফিল দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মেয়েটি ট্যারা ছিল, কিন্তু চশমা পরিয়া তাহার চোখ ঠিক হইয়া গিয়াছে। পানের দোকানওলা অতুলবাবুই এখন বিরাট পণ্ডিতের সব দেখাশোনা করেন এবং প্রত্যহ তাঁহার নিকট বকুনি খান। বিরাট পণ্ডিত সত্যই বিরাট। এখনও নানারকম মাংস খান, নানারকম আতর কেনেন, নানাবিধ

পুস্তক সংগ্রহ করেন। সম্প্রতি তিনি একজন মিশরী পণ্ডিতের নিকট হায়ারগ্লিফিক্‌স্‌ (hieroglyphics)—প্রাচীন মিশরের চিত্রাক্ষরবিদ্যা শিখিতেছেন। মাঝে মাঝে পুলিসের নিকট খবর পাইয়া তিনি তাঁহার এক নিরুদ্দিষ্টা কন্যার খোঁজে বাহির হইয়া যান। এখনও কিন্তু মেয়েটির খোঁজ পাওয়া যায় নাই। সেদিন তিনি তাহার জন্য অমৃতসরে গিয়াছিলেন, কিন্তু হতাশ হইয়া ফিরিয়াছেন। কিন্তু হতাশ হইবার লোক তিনি নন, নিরন্তর সন্ধান করিয়া চলিয়াছেন। আমি প্রায় প্রত্যহ বিরাট পণ্ডিতের বাড়ি যাই এবং ধমক খাইয়া চলিয়া আসি। আবার যাই। সত্যই শ্রদ্ধেয় লোক। কুষ্ঠিগণনা করিয়া প্রত্যহ তিনি চার পাঁচশত টাকা রোজগার করেন। রোজই প্রচুর ভীড় থাকে। কিন্তু তিনি চার পাঁচটির বেশী প্রশ্ন গণনা করিতে চান না। যাহা বলেন তাহা নির্ভুল। আমার ছোট মেয়ের কুষ্ঠি দেখিয়া বলিয়াছেন, এ মেয়েটি রাজরাজেশ্বরী হইবে। এই আশ্বাসে বুক বাঁধিয়া আছি। তুমি ওদেশে বেশ আছ। এখানে আসিবার কল্পনাও করিও না। এখানে খালি দীনতা, হীনতা, পরশ্রীকাতরতা আর নীচতা। আমরা পঙ্কে ডুবিয়া আছি। ভালবাসা জানিবে। ইতি

পুলিন।"

কিছুদিন পরে ছুটি পাইয়া নবকিশোর ও প্রমীলা মিশর ভ্রমণে গিয়াছিল। নীলনদের ভিতর দিয়া তাহাদের জাহাজ চলিতেছিল। একটা বন্দরে তাহাদের জাহাজ ভিড়ল। তাহারা দেখিল, একদল স্কুলের মেয়ে বন্দরে আসিয়া ভিড় করিয়াছে। সম্ভবত কাছেই তাহারা কোথাও পিকনিক করিতেছিল। জাহাজ দেখিতে আসিয়াছে।

প্রমীলা বলিল, "দেখ, দেখ, ওই ফ্রক-পরা কালো মেয়েটি ঠিক জরির মতো দেখতে। নয়?"

নবকিশোরও সবিস্ময়ে দেখিল—হাঁ জরিই তো। বয়স দশ বছরের বেশী নয়, কিন্তু অবিকল জরি।

"জরি, জরি, জরি—"

ডাক শুনিয়া মেয়েটি মুখ তুলিয়া চাহিল। সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর মুচকি হাসিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল সে। নবকিশোর আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

জাহাজ আবার চলিতে শুরু করিল।

॥ এক ॥

সেদিন বড়ই গরম। চৈত্র মাস। আকাশে প্রতপ্ত সূর্য মীন রাশিতে অবস্থান করিয়া স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিতেছেন। কোথাও পাতাটি নড়িতেছে না। এখনকার হিসাবে কালটা সেকাল। এখন যেটাকে কলিকাতা বলি তখন সেটার নাম ছিল সুতানুটি! চারিদিকে তখনও গ্রাম্য ভাব অপরিবর্তিত। মাঝে মাঝে দুই একটি পাকাবাড়ি আছে বটে, কিন্তু খড়ের বাড়ি এবং খাপরার বাড়িও বিস্তর। টিনের চালও মাঝে মাঝে দেখা যায়। কাঁচা নালি রাস্তার দুইধারে ভটভট করিতেছে। রাস্তাও কাঁচা। বর্ষার সময়ে চারিদিক কাদায় পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। পুকুর ডোবাও কম নাই। প্রতি পল্লীতেই প্রায় একটা করিয়া পুকুর আছে। পুকুরের পাড়ে নারিকেল সুপারি ও তালের গাছ। ভাল পুকুরও আছে, আবার শ্যাওলা-ঢাকা মজা পুকুরেরও অভাব নাই। অনেক বাড়ির সামনে বা পিছনে ছোট ছোট সব্জি-বাগান। সেখানে বেগুন, পুঁইশাক, পালং শাক, লাউ গাছ, কুমড়ো গাছ প্রভৃতির ভিড়। কলাগাছও প্রচুর। এসব ছাড়াও মাঝে মাঝে আম জাম কাঁঠাল গাছও রাস্তার ধারে ধারে আছে। সেগুলির মালিক কোম্পানি, কিন্তু সেগুলির ফল ভোগ করে পাড়ার পাঁচজন। বড় রাস্তা হইতে কিছুদূরে বেশ বড় একটি বাগান। বাগানের একধারে ছোট একটি বাড়ি। বাড়ির দেওয়ালগুলি পাকা, কিন্তু ছাদ পাকা নয়। খাপরা, এবং একদিকে খানিকটা খড়ের চাল আছে। ইহার উপর একটি চারকোনা গৈরিক পতাকা উড়িতেছে। ইহার অর্থ বাড়িটির মধ্যে কোনও দেবতা আছেন। ঘরের পূর্ব দিকের দেওয়ালটায় ছোট একটি জানলা রহিয়াছে। একটিমাত্র দ্বার। সে দ্বারে প্রকাণ্ড একটি তালা ঝুলিতেছে। দেশী তালা নহে, বিদেশী ভালো তালা। বেশ বড় এবং ভারী। মন্দিরটির ভিতর আছে একটি শিবলিঙ্গ। স্বয়ম্ভূ বহুকাল পূর্বে নাকি স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়াছিলেন এই স্থানে, মাটি ভেদ করিয়া। তাহার পূর্বে একটি স্বপ্ন দিয়াছিলেন বর্তমান মালিক ধূর্জটিমঙ্গল চৌধুরীর পিতা মহেশমঙ্গল চৌধুরীকে। স্বপ্নে মহেশমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন—"দেখ্ মহেশ তোর এই বাগানের কোণে বহুদিন থেকে মাটির নীচে আছি। বাংলা দেশে পাল রাজত্ব শুরু হবার অনেকদিন আগে বীরভদ্র নামে একজন তান্ত্রিক হিন্দু আমাকে এখানে স্থাপিত করেছিলেন।' পাশে একটি কালীর মূর্তিও ছিল। কিন্তু অনাচারে অবিচারে অত্যাচারে যখন দেশ ছেয়ে গেল তখন বিদ্রোহ হল দেশে। পালবংশ স্থাপিত হল। তারা সব বৌদ্ধ। তারা হিন্দুদের মূর্তি সব লোপাট করতে লাগল। হঠাৎ একদিন দেখলাম আমার পাশের কালীমূর্তিটি অন্তর্ধান করেছে। রণরঙ্গিণী নিজেই অন্তর্ধান করেছেন, কেউ তাঁকে তুলে নিয়ে যান নি। আমিও ইচ্ছে করলে গা-ঢাকা দিতে পারতুম। কিন্তু আমি স্থাণু লোক, কোথাও নড়া-চড়া করতে চাই না। আমি থেকেই গেলুম। ভাবলাম, দেখাই যাক না কি হয় শেষ পর্যন্ত। বৌদ্ধদের আমলে আমার ভারী দুর্দশা হয়েছিল। আমার মন্দিরটা ভেঙে গেল। তাতে ভারী আরাম পেলুম। তুমি আর যেন মন্দির করাতে যেও না। ধুমধাম করে পুজো করবারও দরকার নেই। মনে মনে পুজো কোরো, তাহলেই আমি সন্তুষ্ট

হব। খোল্যা-মেল্যা জায়গাই আমার ভালো লাগে। তোমার বাগানটা পাহারা দেব আমি। চোরের দেশ তো, অনেকেই তোমার বাগানের ফল চুরি করে নিয়ে যায়। আমি তাদের নাম চিত্রগুপ্তের খাতায় লিখিয়ে দেব, বাছাধনরা পরে মজাটা টের পাবেন। আমি এখানে থাকব, কেউ আমাকে নাড়াতে পারবে না। তুমি কিছু ভেবো না।

মহেশমঙ্গল প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"মা কালী কোথায় গেলেন? তাঁকে কি খোঁজবার চেষ্টা করব?"

"না, চেষ্টা করলেও তুমি পারবে না। তিনি ইচ্ছা না করলে কেউ তাঁর নাগাল পায় না। তিনি সর্বত্র আছেন, এখানে আছেন। তিনি ইচ্ছাময়ী, যখন ইচ্ছা করবেন এখানে তিনি আবির্ভূতা হবেন। তুমি ও নিয়ে মাথা ঘামিও না।"

মহেশমঙ্গল বলিলেন—"কিন্তু আপনি বাবা একলা থাকবেন, সেটা কি ভালো দেখায়?"

মহাদেব হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—"আমি কখনও একা থাকি না। শক্তি সর্বদা আমার সঙ্গে থাকেন। ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না।"

মহেশমঙ্গল ইহা লইয়া আর মাথা ঘামান নাই। মহাদেবের পাকা মন্দিরও আর নির্মিত হয় নাই। তিনি স্বপ্নের কথাটা অবশ্য সকলকে বলিয়াছিলেন। সেই হইতেই কথাটা রটিয়া গিয়াছিল যে স্বয়ং মহাদেব তাঁহার বাগান পাহারা দেন এবং চোরদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া চিত্রগুপ্তের দফতরে পাঠান। কিন্তু অতি-বুদ্ধিমান ঘুঘু ধরনের লোকেরা কথাটা বিশ্বাস করিতেন না। বলিতেন—"মহেশবাবু চতুর লোক। তাই স্বয়ং মহাদেবকে বাগানের পাহারাদার রেখেছেন। কল্পনার জোর আছে চৌধুরী মশায়ের। কিন্তু কল্পনার মূলে কি আছে জানেন? গাঁজা আর কারণ। দিনে বিশ পঁচিশ ছিলিম গাঁজা খান আর বোতল বোতল কারণ। এরই জোরে উনি মহাদেবকে বাগানের পাহারাদার বানিয়েছেন। খলিফা লোক বটে।"

এইবার ধূর্জটিমঙ্গলের পূর্বপুরুষের ইতিহাস একটু স্মরণ করা যাক। মহেশমঙ্গল বিরাট বড়লোক ছিলেন। জমি জায়গা বিস্তর ছিল। নবাবী আমল হইতে যে সব বিষয়সম্পত্তি জায়গীরস্বরূপ পাইয়াছিলেন সেগুলি তো ছিলই, ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াও বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন তিনি। শোনা যায় আলিবর্দি খাঁর সুনজর ছিল তাঁহার উপর। তিনি যখন বঙ্গদেশে আসিয়া সরফরাজ খাঁকে গদিচ্যুত করিয়া সেই গদিতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন তখন মহেশমঙ্গল বালক মাত্র। তাঁহার পিতা শংকরমঙ্গল তখন এক বিখ্যাত ডাকাতদলের নেতা ছিলেন। শংকরমঙ্গলের ডাকাতরা আলিবর্দি খাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। আলিবর্দি নিজের সৈন্যদলে শংকরমঙ্গলকে ভর্তি করিয়া লইয়াছিলেন। আততায়ীদের সহিত এক সংঘর্ষে শংকরমঙ্গল মারা যান। তখন মহেশমঙ্গলের বয়স মাত্র ষোল বৎসর। আলিবর্দি তাঁহাকে অনেক জমি দান করেন। নানারকম ব্যবসার সুযোগ করিয়া দেন। নবাব-অন্তঃপুরে যে সমস্ত জরির কাপড়, জরির ওড়না, জরি-খচিত জামা ব্যবহৃত হইত তাহা সরবরাহ করিবার ভার মহেশমঙ্গলকে দিয়াছিলেন তিনি। বর্গীর হাঙ্গামার সময় সুযোগ পাইয়াও মহেশমঙ্গল সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করেন নাই। তিনি শান্তিপ্রিয় নির্বিবাদী লোক ছিলেন। আলিবর্দির শাসনকালেই তিনি সর্পাঘাতে মারা যান। মহেশমঙ্গল পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধূর্জটিমঙ্গলও

একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন মহেশমঙ্গলের। তাঁহার অনেকগুলি ভগ্নী ছিল, জগদম্বা, দুর্গা, জয়া, শ্যামাঙ্গিনী, মহামায়া ও বারাহী। সেকালের কুলপ্রথা অনুযায়ী সকলেরই কুলীনের ঘরে বিবাহ হইয়াছিল, প্রত্যেক কুলীনের ঘরে শতাধিক পত্নী ছিল, সুতরাং ধূর্জটিমঙ্গলের ভগ্নীরা কেহ পতিগৃহে গমন করেন নাই। টাকার লোভে পতিরাই মাঝে মাঝে পত্নীদের নিকট আসিয়া রাত্রিবাস করিয়া যাইতেন। তাঁহাদের বংশবৃদ্ধিও হইয়াছিল। ধূর্জটিমঙ্গলের দুই যমজ পুত্র শম্ভুমঙ্গল এবং জটামঙ্গল পলাশীর যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধূর্জটিমঙ্গলের তৃতীয় পত্নী জগদ্ধাত্রী তাঁহাদের জননী ছিলেন। জগদ্ধাত্রীর পিতা রামলোচন নবাব দরবার হইতে খান উপাধি পাইয়াছিলেন। নবাব সরকারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁহার রূপসী যুবতী কন্যা জগদ্ধাত্রীর উপর নবাব সরকারের জনৈক সিরাজ-পারিষদের কু-নজর পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি ভয় পাইয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে সিংভূমের জঙ্গলে এক সাহেবের আশ্রয়ে পাঠাইয়া দেন। সাহেব ব্যবসায়ী ছিলেন। নানারকম পশুচর্ম সংগ্রহ করিয়া তিনি বিলাতে চালান দিতেন। বিলাত হইতে আমদানী করিতেন বিলাতী মদ। নবাব দরবারে সে মদের খুব চাহিদা ছিল। দিল্লী এবং মুর্শিদাবাদে মদ বিক্রয় করিবার কেন্দ্র ছিল তাঁহার। কিন্তু তিনি বাস করিতেন সিংভূমের জঙ্গলে। তাঁহার জংলি কুঠি রক্ষা করিবার জন্য একদল বন্দুকধারী গোরা পাহারাদার ছিল। সাহেবের নাম ছিল জন। জন সাহেবের জংলি কুঠি বিখ্যাত স্থান ছিল ও অঞ্চলে। জগদ্ধাত্রীর পিতা রামলোচন খানের সহিত জন সাহেবের আলাপ হইয়াছিল মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে। রামলোচনের সহায়তাতেই তিনি নবাব সরকার হইতে ব্যবসায় করিবার অনুমতি লাভ করেন। এজন্য তিনি রামলোচনের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। রামলোচন একদিন গভীর রাত্রে সপরিবারে কয়েকটি পালকি করিয়া জন সাহেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'আমাকে রক্ষা করতে হবে। আমার বিবাহিতা মেয়েকে আর ওদের নজরের সামনে রাখবার সাহস হল না। আগামী পূর্ণিমায় আমার জামাই আসবার কথা, কিন্তু তা আর হয়ে উঠবে না মনে হয়। কারণ ব্যাপারটা আমি গোপন রাখতে চাই।"

জন সাহেব লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। গালের দুই-ধারে জমকালো মটন-চপ দাড়ি ছিল। রামলোচন যখন গেলেন যখন গভীর রাত্রি। জন সাহেব তখন তিনটি ওরাঁও যুবতীর গান শুনিতেছেন! একজন সম্মুখে, দুই জন দুই পাশে। চার জনই বেশ সুরাপান করিয়াছেন। রামলোচনের অভ্যাগমে রস-ভঙ্গ হইল। কুঠির বাহিরে কলরব শুনিয়া জন সাহেব বন্দুক লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ওরাঁও রমণী তিনটিও তিনটি শাণিত তরবারি লইয়া সাহেবের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। ইহারা শুধু সাহেবের প্রমোদ-সঙ্গিনী নহে, বডি-গার্ডও। বাহিরে বন্ধু রামলোচনকে দেখিয়া সাহেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার মুখে সব কথা শুনিয়া বলিলেন, "ভয় কি, আমি তোমাকে রক্ষা করব।" বলিলেন অবশ্য সাহেবী বাংলা উচ্চারণে। আমি সে বাংলা আমাদের উচ্চারণে লিখিলাম। কিন্তু রামলোচন যখন নিজের জামাতার কথা উল্লেখ করিলেন এবং সে আসিতে পারিবে না বলিলেন, তখন সাহেব ভ্রূযুগল উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিলেন—"হোয়াই ? সে নিশ্চয়ই আসবে। বাধা কি ? সে থাকে কোথায়, তার নাম কি বল।"

"নাম তার ধূর্জটি। থাকে বারাসতে। ওর সন্তানটিতে কিছু বিষয় আছে, মাঝে মাঝে সেখানে গিয়েও থাকে। এখন বারাসতে আছে।"

সাহেব ধূর্জটি নামটা কায়দা করিতে পারিলেন না। যাঁহারা গঙ্গাকে গ্যাঞ্জেস করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে শুদ্ধভাবে ধূর্জটি উচ্চারণ করা শক্ত। জর্জ শব্দটা তাঁহাদের পরিচিত। জন বলিলেন, "জর্জটিকে এখানে আসতে হবে। তাকে আনতে আমি আমার গোরাদের পাঠাব। সঙ্গে ঘোড়া ও পালকি থাকবে। ভয়ের কোন কারণ নেই। ইউ সি দিস?"

বন্দুকটা তুলিয়া দেখাইলেন।

"এর ভয়ে সবাই কাবু।"

তাহার পর পকেট হইতে একটি মোহর বাহির করিয়া বলিলেন, "আর এর কাছে সবাই জব্দ। আলিবর্দি দিল্লীর বাদশাহকে কয়েক কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে বাংলার মসনদে কায়েম হবার অনুমতি পেয়েছিল। জান?"

"জানি না। আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখি না।"

"বাট্ ইট ইজ এ ফ্যাক্ট। জর্জটিকে আনতে যারা যাবে তাদের সঙ্গে বন্দুক আর মোহর দুইই থাকবে।"

একটি ওঁরাও মেয়ের দিকে চাহিয়া জন আদেশ করিলেন, "রোমনি তুমি দানিয়েলকে ডেকে আন।"

রোমনি মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল।

রামলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, "দানিয়েল কে?"

"দানিয়েল পর্তুগীজ। দুর্ধর্ষ জলদস্যু একজন। আগে ওদের হুগলীতে কুঠি ছিল। প্রবল প্রতাপ ছিল ওর বাবার। শাহজাহান যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলা দেশে চলে আসেন তখন তিনি শাহজাহানকে নৌবহর দিয়ে সাহায্য করেন। কিন্তু মমতাজ বেগমের দুটো বাঁদীর রূপে মুগ্ধ হয়ে কেলেঙ্কারী কাণ্ড করে ফেললেন ভদ্রলোক শেষকালে। তাদের অপহরণ করে বেইজ্জত করলেন। শাহজাহান ক্ষেপে গেলেন এই শুনে। তিনি হুগলীর সমস্ত পর্তুগীজদের বন্দী করে দিল্লী পাঠাবার হুকুম দিলেন। কিছু পর্তুগীজ অবশ্য পালাতে পেরেছিল।"

জনের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পুনরায় পকেট হইতে মোহরটি বাহির করিয়া বলিলেন—"এর জোরে। আমি পাঁচ হাজার মোহর ঘুষ দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছিলাম দানিয়েলকে এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের। দানিয়েলের বাবার সঙ্গে আমার বাবার বন্ধুত্ব ছিল। আমার বাবা সবে তখন এদেশে এসেছেন। জাহাঙ্গীর বাদশার হুকুম মতো সবে তখন তিনি এদেশে ব্যবসা করবার অনুমতি পেয়েছেন। দানিয়েলের বাবা তখন খুব সাহায্য করেছিলেন তাঁকে। লুটের মালপত্তর খুব সস্তা দামে বিক্রি করতেন তাঁর কাছে। সেই মাল বাবা বিলেতে চালান করতেন। তাই আমি যখন শুনলাম দানিয়েল বিপদে পড়েছে, তখন তাকে ছাড়িয়ে আনলাম। দানিয়েল এখন আমার বিশ্বাসী বন্ধু। তার উপরই জর্জটিকে আনবার ভার দিচ্ছি।"

রোমনি একটু পরেই দানিয়েলকে ডাকিয়া আনিল।

দানিয়েল গ্যাট্টাগোট্টা বলিষ্ঠ ব্যক্তি। মুখে লাল গোঁফ দাড়ি। দেখলেই মনে হয় খুব ধূর্ত ও বেপরোয়া।

জন হাসিমুখে আগাইয়া গেল এবং দানিয়েলের সহিত করমর্দন করিয়া বলিল—"দানিয়েল, রোমনি তোমাকে একটি অনুরোধ করতে চায়। কিন্তু নিজে সে লজ্জায় সেটা বলতে পারছে না। তাই আমাকে দিয়ে বলাচ্ছে—তোমাকে কিছু বলতে ও স্বভাবতই লজ্জা পায়।"

রোমনি মুখ ফিরাইয়া হাস্য গোপন করিল।

জন বলিতে লাগিল—"আমার বন্ধু রামলোচন তাঁর মেয়েকে এখানে এনেছেন নবাবের ভয়ে। তাঁর জামাই জর্জটি আছেন বারাসতে। সেই জামাইকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। আপনার মেয়ের নাম কি—"

রামলোচন বলিলেন, "জগদ্ধাত্রী—"

"জাগাট্রি। রোমনির খুব ভালো লেগেছে জাগাট্রিকে। ওর ইচ্ছে জাগাট্রির স্বামী এখানে আসুক। তুমি ছাড়া এ ভার কাকে দিই বল। রোমনি মুখ ফুটে তোমাকে বলতে পারছে না, তাই আমিই বলছি—"

দানিয়েল রোমনির দিকে এক নজর চাহিয়া দেখিল। তাহার পর রোমনিকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"আই ক্যান প্লাক দি স্টারস ফ্রম দি স্কাই ফর ইউ ডার্লিং।" তাহার পর জনের দিকে চাহিয়া বলিল—"রেস্ট অ্যাসিওর্ড, আই শ্যাল ব্রিং জর্জটি হিয়ার। হোয়্যার ইজ হি ?"

রামলোচন তাহাকে ধুর্জটিমঙ্গলের ঠিকানা দিলেন।

দানিয়েল অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

রামলোচন জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রোমনিকে এর মধ্যে জড়ালেন কেন—"

রোমনি কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

"ওসব সাহেবের ছুতা গো। চালাকি—"

জন হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"শি ইজ রাইট। ইট্ ইজ্ এ ট্রিক। দানিয়েল রোমনিকে ভালবাসে। ওর প্রেমে দানিয়েলের নাক পর্যন্ত ডুবে গেছে। কিন্তু রোমনি ওকে আমোল দেয় না। আর আমারও কড়া হুকুম বলাৎকার করা চলবে না। ওকে যদি রাজি করাতে পার, আপত্তি নেই। কিন্তু জবরদস্তি চলবে না। রোমনি রাজি হচ্ছে না, দানিয়েল হাবুডুবু—এই এখন অবস্থা। তাই রোমনির নাম দিয়ে অনুরোধটা জানালাম, দানিয়েল প্রাণ দিয়ে করবে। রোমনি এদের থাকবার ব্যবস্থাটা কোথায় করা যায়—রুক্কিণী দেবীর মন্দিরের কাছে আমাদের যে কুঠিটা আছে—"

"সেটাতে কেউ নেই। মন্দিরে ঝামরি আছে—"

জন রামলোচনকে বলিলেন—"ওইখানেই তোমরা থাকো। বেশ বড় কুঠি। বড় হাতা আছে। পুকুরও আছে একটা। একটু দূরে রুক্কিণীর মন্দির, সেখানে ঝামরি থাকে—"

"ঝামরি ? সে আবার কে—"

"ঝামরি রুক্কিণীর সেবায়েত। এমনি লোক বেশ ভালো। মাঝে মাঝে ওর ভর হয়। তখন অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করে। শি বিকামস এ স্ট্রেঞ্জ ওম্যান। কিন্তু অন্য সময় খুব ভালো। তির্কের কি রকম আত্মীয় হয়, না ?"

আর একটি ওরাঁও মেয়ে বলিল—"আমার পিসী। বাপের বহিন—"

"তুমিই তাহলে এদের নিয়ে যাও তার কাছে। আলাপ করিয়ে দাও—"

"আসেন। আপনিও সাহেব আসেন। আপনাকে পিসি খুব ভক্তি করে। বলে সাহেব রুক্মিণী মায়ের সেরা ভক্ত। আপনাকে দেখলে পাগলী বড় খুশী হয়। আপনিও চলেন সঙ্গে।"

রামলোচন বলিলেন, "পাগলী না কি—"

"পাগলী না তো কি। কখনও কাপড় পরে, কখনও ন্যাংটা থাকে। মাথায় তেল দেয় না। কখনও কাঁচা মাংস খায়, কখনও পোড়া মাংস খায়। কখনও কাঁদে কখনও হাসে, কখনও নাচে, কখনও দিনের পর দিন ঘুমায়! দিনের পর দিন উপবাস করে। পাগলীই তো। কিন্তুক ওর খ্যামতা আছে। দানিয়েল সাহেবের গুণ্ডা ভাইটাকে ঝামরিই তো খতম করলেক বাণ মেরে। বলেছিল খবরদার আমার যখন ভর হয় তখন এসে হাল্লা করবি না, করিস তো চিরতরে মুখ বন্ধ করে দেব তোর। দিলেক তো। আসেন আপনারা—"

রামলোচন, জন সাহেব এবং জগদ্ধাত্রী তির্কি'র পিছু পিছু গেলেন। রামলোচন ঝামরিকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। ভয়ও পাইলেন একটু। রুক্মিণীর মন্দিরের কাছে উলঙ্গিনী ঝামরি দাঁড়াইয়া ছিল। হাতে একটি পোড়া কাঠ। ঝামরি পীন-পয়োধরা তন্বী। পূর্ণ যুবতী। চোখ দুইটি বড় বড় এবং চোখের দৃষ্টি মর্মভেদী। মাথার চুল তৈল-বিহীন। মনে হয় যেন মাথায় চামর বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কুচকুচে কালো রং, যেন কালো পাথর কুঁদিয়া কোন প্রতিভাবান শিল্পী ঝামরিকে সৃষ্টি করিয়াছে। জন সাহেবকে দেখিয়া ঝামরি পোড়া কাঠখানা ফেলিয়া দিল। তাহার পর আগাইয়া আসিল। "কি গো সাহেব। তোমার রুক্মিণীকে একটু শাসন কর না কেন। সহজে মুখ খুলতে চায় না। কাল থেকে সাধ্যসাধন করছি, কিছুতেই উত্তর দেয় না। শেষে আজ নিমগাছের ডাল পুড়িয়ে ঠেঙালাম, তখন জবাব দিল।"

"কিসের জবাব চাও"— জন জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ইংরেজের সঙ্গে সিরাজের লড়াই হবে। জগা জানতে চায় সে যুদ্ধে কে জিতবে—"

"জগা কে—"

"জগৎ শেঠ গো। সে হরু পুরুতকে পাঠিয়েছে আমার কাছে। কাল থেকে উপোষ দিয়ে ধরনা দিচ্ছে, বামুনটা আমার ঘরে। এদিকে রুক্মিণী মুখ খোলে না। বড় বেয়াড়া হয়েছে আজকাল। ঠেঙালাম, তখন বললেক—ইংরেজরা জিতবেক।"

তাহার পর হঠাৎ জগদ্ধাত্রীর দিকে চাহিয়া ঝামরি বলিয়া উঠিল—"আরে ই কে—"

হাসিমুখে আগাইয়া আসিল তাহার দিকে। তাহার পর তাহার পেটে একটা খোঁচা মারিয়া—দুইটি আঙুল তুলিয়া দেখাইল। জগদ্ধাত্রীর গর্ভে যে যমজ সন্তান হইবে এই ইঙ্গিতই করিয়াছিল ঝামরি। কিন্তু তখন তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। পাগলীর কাণ্ড ভাবিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল সকলে। জগদ্ধাত্রী ভয় পাইয়া গিয়াছিল।

জন সাহেব বলিলেন—"এ মেয়েটি এখন সপরিবারে তোমার কাছেই থাকবে ওই কুঠিতে। ও'র বাবা রামলোচন খান আমাদের বন্ধু লোক। সিরাজের আমলারা ও'র

মেয়ের উপর কু-নজর দিয়েছে। তাই পালিয়ে এসেছে তোমার কাছে। তোমার ভরসায়—"

ঝামরির চোখের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে প্রখর হইয়া উঠিল।

"মিছা কথা বলছিস কি লেগে? ওরা আইছে তোর কাছে তোর ভরসায়। তুই তো একটা মরদের মতো মরদ। বরগিদের এখানে ঢুকতে দিস নাই। তোর কাছে আসবেই তো। বরগিরা যখন আমার বুইন খার্জারিকে ধরেছিল তখন যদি তুই থাকতিস সে বেঁচে যেত। আমিও তোর কাছে পালিয়ে এসে বেঁচেছি। ওরাও থাক, আমি দেখাশোনা করব—সিরাজ ধ্বংস হবেক।"

॥ দুই ॥

জন সাহেবের আশ্রয়ে জগদ্ধাত্রী অনেকদিন ছিলেন। রামলোচন মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার খোঁজখবর করিয়া যাইতেন। জগদ্ধাত্রীর স্বামী ধূর্জটিমঙ্গলও আসিতেন মাঝে মাঝে। শিকারে তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। বন্দুক দিয়া নিরীহ পশু-পক্ষী শিকার করিতেন না তিনি। যাহারা করিত, তাহাদের তিনি বলিতেন, "পাখী-মারা বীর ওরা। মহাবীরই বলতাম, কিন্তু লাফিয়ে সমুদ্র পার হতে পারে না যে। কেবল দূরে থেকে গুলি ছুঁড়ে নিরীহ পাখিগুলোকে মারে। বাঘের হাঁকাড় শুনলে ছুটে পালায়, কিন্তু নিরীহ খরগোশগুলোকে তাড়া করে তাদের মারে আর খেয়ে ফেলে। বীর ওরা, কিন্তু এখানেও মহাবীরের সঙ্গে তফাত আছে ওদের, কারণ মহাবীর মাংসাশী ছিলেন না। আমি বাঘ, ভালুক, নেকড়েদের মারি সম্মুখ যুদ্ধে, আর তারা যখন মারা পড়ে তখন তাদের মাংস আমি খাই না।" ধূর্জটিমঙ্গল সত্যই বড় শিকারী ছিলেন। হাতে একটা ছোট বল্লম এবং কাঁধে বেঁটে একটা শালকাঠের মুগুর লইয়া তিনি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিতেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে বাঘ, ভালুক, নেকড়ে, চিতা প্রভৃতি শিকার করিতেন। প্রায়ই দেখা যাইত মুগুরের ঘায়ে তিনি শিকারের মাথাটা ফাটাইয়া দিয়াছেন, তাহার পর তাহার বুকে বিদ্ধ করিয়াছেন শাণিত বল্লমটা। জন সাহেবের কুঠিতে অনেকদিন ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা যখন বাংলার মসনদে বসিয়া পাশবিকতার পঙ্ককর্দমে নিজেকে অবলিপ্ত করিতেছিল, যখন তাহার কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের প্রকোপ হইতে হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান কাহারও নিস্তার ছিল না, যখন সতীনারীদের আর্তনাদে, গুপ্তঘাতকের নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতে নিহত নর-নারীদের অভিশাপে, ভীত রাজপুরুষদের জটিল ষড়যন্ত্রে বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মীর ললাট ভ্রূকুটিকুটিল—ঠিক সেই সময় ধূর্জটিমঙ্গল সুতানুটি ত্যাগ করিয়া সিংভূমের জঙ্গলে জন সাহেবের কুঠিতে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আগে তিনি মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করিতেন, কিন্তু ইংরেজদের সহিত নবাবের মনোমালিন্য যখন বেশ পাকিয়া উঠিল তখন তিনি সুতানুটিতে থাকা আর নিরাপদ মনে করিলেন না। কলিকাতার আশেপাশে থাকাটাও বিপজ্জনক মনে হইল তাঁহার। তিনি যখন সুতানুটিতে ছিলেন তখনই সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিয়াছিলেন। সে বিভীষিকা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিলে ভুল হইবে,

কারণ সে সময় তিনি ও ঝক্‌মারি সুতানুটি জঙ্গলের ভিতর আত্মগোপন করিয়াছিলেন। শুধু তিনি নয়, আরও অনেক লোকও 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই নীতি অনুসরণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। ধূর্জটিমঙ্গল লোকমুখে যতটুকু শুনিয়াছিলেন তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন জন সাহেবের কাছে।

বলিয়াছিলেন—"সায়েব, নবাব ক্ষেপে গেছে। অনেকে বলছে, যে হোসেন কুলি খাঁকে উনি হত্যা করেছিলেন তারই ভূত না কি ও'র কাঁধে ভর করেছে। তাই উনি পাগলের মতো কাণ্ড করছেন। কোলকাতায় তোমাদের যে বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল তা তো শেষ করে দিলে লোকটা। শুনলাম তোমাদের বিরুদ্ধে খবর দিয়েছিল মেদিনীপুরের ফৌজদারী রাজরাম সিং। তোমরা যে বাগবাজারে কেল্লা করছ এ খবরটা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছেন নবাব। রাজরাম তাঁর ভাই নারান সিংয়ের হাতে চিঠি দিয়ে তোমাদের সব খবর নবাব বাহাদুরকে জানিয়েছে। নবাব বাহাদুর তাঁর মাসতুতো ভাই পূর্ণিয়ার নবাব শওকৎজঙ্গের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছিলেন। নারান সিংকে বললেন তুমি ছদ্মবেশ ধরে কলকাতায় যাও, আর ইংরেজদের সম্বন্ধে সব খবর যোগাড় কর। আমি শওকৎজঙ্গকে খতম করে তারপর ইংরেজদের ব্যবস্থা করব। নারান সিং ফিরিওলার ছদ্মবেশে কলকাতায় এসে ঘুরতে লাগল। আমার কাছেও কাপড় বিক্রি করতে এসেছিল একদিন। এসেই বললে—কোলকাতার কোনও সায়েবের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে কি? আমাকে কোনও বড় সায়েবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন না। ও'রা যে রকম আমীরী চালে থাকেন তাতে মনে হয় ওঁদের কাউকে খদ্দের পেলে আমার দামী মসলিনগুলো বেচতে পারব। আমি একটু ন্যাকা সাজবার চেষ্টা করলাম—বললাম, সাহেবরা আমীরী চালে থাকেন না কি! ওরা তো বেনে, বনেদী বড়লোক তো নয়। 'ফেরিওলা বললে—আরে মশাই, বেনেই হোক আর বনেদীই হোক, ওদের গাড়ি-ঘোড়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, চাকর-বাকর, নাচ-মোচ্ছব দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় মশাই। আমাকে একটা সায়েবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। আপনার ভাইপো জেমসের ঠিকানা বলে দিলাম তাকে। আমি বুঝতেই পারিনি যে লোকটা গুপ্তচর। কিন্তু তার পর দিনই ধরা পড়ে গেল লোকটা। গভর্নর ড্রেক হুকুম দিলেন কান পাকড়ে বার করে দাও লোকটাকে কোলকাতা থেকে। কোলকাতা যখন তোমাদের জমিদারি তখন তোমরা তা দিতে পার। কিন্তু তবু আমার মনে হয় অতটা অপমান না করলেই চলত। এর ওপর গুজব শুনলাম গভর্নর ড্রেক নাকি সিরাজউদ্দৌলাকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন যে, জগৎবল্লভের ছেলে শরণার্থী হয়ে এসেছে তাঁদের কাছে, তাকে তিনি নবাবের হাতে সমর্পণ করবেন না। নবাব নাকি তাই চেয়েছিলেন। এর পরেই নবাবের দেখা হল নারান সিংয়ের সঙ্গে। নবাব শওকৎজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন বলে রাজমহল পর্যন্ত পেঁছোছিলেন, নারান সেইখানে গেল আর তাঁর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল—হুজুর, জাঁহাপনা, খোদাবন্দ, আমার মানইজ্জত কিছু রইল না, আপনার হুকুমে কলকাতায় গিয়ে ওই বেনেগুলোর হাতে অপমানিত হতে হল। আপনি একটা বিহিত করুন। কলকাতায় জমিদারি করে ওরা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। ওরা আপনাকে নবাব বলে আমোলই দেয় না। তখন নবাব সাহেবের মনে পড়ে গেল যে তিনি যখন বাংলার মসনদে নবাব হয়ে বসেন, তখন ইংরেজেরা তাঁকে নজরানা দেয়নি তো। সত্যি ওদের বাড় খুব বেড়েছে, ওদের

ফিট্‌ করা দরকার। নব্যাব রাজমহল থেকে ফিরলেন। উদ্দেশ্য ইংরেজদের শায়েস্তা করা।

জন সাহেব বলিলেন, "এত কাণ্ড হয়েছে তা তো জানি না। তারপর কি হল! নবাব এসে পড়ল কলকাতায় ?"

"পড়ল বলে পড়ল। হৈ হৈ করে এসে পড়ল।"

"ইংরেজরা কোন বাধাই দিলে না—?"

"বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। নবাব আসছেন শুনে পেরিন বাগানের কাছে তোমাদের যে গড় ছিল সেইখানে গোটাকয়েক কামান এনে ফেলেছিল সাহেবরা। নবাবের একদল সৈন্য চিৎপুর খালের ধারে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অত হাতী ঘোড়া বড় বড় কামান আর পল্‌টন্‌ নিয়ে সে রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় না। পেরিন সাহেবের বাগানে পেরিন্স পয়েন্টের ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে এনসাইন পিকার্ড নবাবের সৈন্যের সঙ্গে লড়ে গেলেন। অনেক নবাব সৈন্য মারা গেল। বনে জঙ্গলে পালিয়ে গেল অনেকে। সেখানেও তাদের তাড়া করে গেলেন পিকার্ড সাহেব। নবাব সাহেবের সেনাপতি ছিলেন মীরজাফর, তিনি পিছু হটতে লাগলেন। নবাব হয়তো হটেই যেতেন শেষ পর্যন্ত কিন্তু উমিচাঁদের এক জমাদার জগন্নাথ সিং নবাবের ছাউনিতে গিয়ে হাজির হল। সে নবাবকে কলকাতায় ঢোকবার একটা গোপন রাস্তা দেখিয়ে দিলে। দমদম থেকে কোলকাতা আসবার রাস্তায়, প্রায় টালার কাছাকাছি একটা ছোট সাঁকো ছিল। গরু ঘোড়া চরাতে যেত ও অঞ্চলের লোক সেটার উপর দিয়ে। ইংরেজরা নবাবের আসবার খবর পেয়ে সব সাঁকো ভেঙে দিয়েছিল, এইটেই কেবল ভাঙতে ভুলে গিয়েছিল। এই ভুলের সুড়ঙ্গ দিয়ে নবাব কিছু সৈন্য নিয়ে কলকাতায় ঢুকল। পরদিন শেয়ালদার কাছে মারাঠা ডিচের উপরবার এক নীচু সাঁকো দিয়ে নবাবের বাকি সৈন্যরা হাতি ঘোড়া উট আর কামান সুদ্ধ এসে হুড়মুড়িয়ে পড়ল কোলকাতার উপর। প্রথমে বউবাজারে পড়ল, তারপর বড়বাজারে ঢুকে সমস্ত লুঠপাট করে আগুন লাগিয়ে দিলে চারিদিকে। নবাব গেলেন হালসিবাগানে উমিচাঁদের বাগানবাড়িতে!"

জন সাহেব বলিলেন—"জর্জটি তুমি হাঁপিয়ে পড়েছ। এক পেগ পোর্ট কি শেরি খাবে? ইট উইল পিক ইউ আপ—"

ধুর্জটি বলিলেন—"একপাত্র ভাং খাওয়াতে যদি পার খেতে পারি। মদ খাব না। ভাং আছে—?"

"আছে। আমার এখানে সব থাকে। বোয়—"

একটি চাপরাসী গোছের লোক আসতেই তিনি হুকুম দিলেন, "জর্জটির জন্যে একগ্লাস মেওয়া ভাং নিয়ে এস।"

ধুর্জটি বলিলেন—"কোলকাতা থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়েছে নবাব সাহেব। ফোর্ট উইলিয়ম এখন নবাবের দখলে। কোলকাতার ইতর ভদ্র সব লোক পালিয়েছে। আছে কে জান?"

"কে?"

"গোবিন্দ মিত্তির—"

"ও, দ্যাট্‌ ব্লাক জমিন্‌দার? ইয়েস, হি ইজ এ টাফ্‌ নাট্‌।"

কিসমিস পেস্তা বাদামবাটা-মেশানো দুধ চিনি গোলাপজল দেওয়া একগ্লাস চমৎকার ভাং আসিয়া পড়িল। ঢকঢক করিয়া সেটা পান করিয়া ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন "—'আঃ'—"

জন বলিলেন—"আর এক গ্লাস দেবে ?"

"না, আর চাই না। তোমার ভাইপো জেমসের কিন্তু কোনও সংবাদ পেলাম না। শুনলাম সব সাহেবরা ফলতায় গিয়ে জমা হয়েছে। সেখানে যাওয়া গেল না। চারদিকে মিলিটারি পাহারা, বাইরের কোন লোকের যাওয়ার উপায় নেই।"

জন হাত খুলিয়া বলিলেন—"থামুস্। চুপ কর।"

জন মুর্শিদাবাদ দিল্লীতে ঘোরাফেরা করিয়া দুই চারিটা হিন্দী এবং উর্দু কথা শিখিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে তাক মাফিক সেগুলি কথাবার্তার মধ্যে লাগাইয়া দিতেন।

ধূর্জটিমঙ্গলও হিন্দী-উর্দু বুঝিতেন। তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

জন কপালের মাঝখানে দক্ষিণ হস্তের তর্জনীটি ঠেকাইয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত।

তাহার পর হাঁক দিলেন—বোয়।

খানসামা আবার আসিল।

জন হুকুম দিলেন—হুইস্কি সোডা।

জন নীরবে উপর্যুপরি পাঁচ পেগ হুইস্কি পান করিয়া ফেলিলেন। তাহার পরও গুম হইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ।

ধূর্জটিমঙ্গল তখন প্রশ্ন করিলেন—"সায়েব, কি হল তোমার!"

জন উত্তর দিলেন, "ঠিক করে ফেলেছি। আমি কয়েকজন গোরা সৈন্য নিয়ে আজই বেরিয়ে পড়ব জেমসের খোঁজে। ফলতায় যাবো। দরকার হয় ইংরেজের সেনাদলে ভর্তি হয়ে সিরাজের সঙ্গে লড়ব। আমি যতদিন না ফিরি তুমি ততদিন এখানে থাক।"

"তার মানে ? তুমি যুদ্ধে যাচ্ছ, যদি না ফের—"

"ওয়েট এ বিট।"

জন উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। একটু পরে একটি কাগজ হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

"এই নাও—"

"কি এটা।"

"পড়ে দেখ।"

"আমি ইংরেজি পড়তে পারি না।"

জন গড়গড় করিয়া পড়িয়া গেলেন। তাহার পর বাংলা করিয়া বলিলেন, "এর মানে আমার সিংভূমের সমস্ত বিষয়সম্পত্তি জাগৃষ্টির স্বামী জর্জটির তত্ত্বাবধানে রেখে আমি যুদ্ধে চললাম। আমার অবর্তমানে এ বিষয়ের সমস্ত আয় জর্জটি ভোগ করবে। কুড়ি বছরের মধ্যে যদি আমি না ফিরি বা আমার ভাইপো জেমস্ না ফেরে তাহলে জর্জটিই এ বিষয়ের উত্তরাধিকারী হবে। এখন বুঝলে ? এতে রাজী তো ?"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"এখনই তাড়াহুড়ো করে যুদ্ধে না-ই গেলে ? দু'দিন অপেক্ষা করেই দেখ না হাওয়া কোন দিকে বয়—"

জন সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"নো নো নো। আই ক্যানট ওয়েট এ মোমেণ্ট। জেমস আমার প্রিয় ভাইপো, আমাদের একমাত্র বংশধর। তার খোঁজে আমাকে এখনই বেরুতে হবে। তুমি এখানে থাকো। আর এই দলিল তুমি রাখ—"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"দলিলে তুমি আমার এবং আমার স্ত্রীর যে নাম লিখেছ তা ঠিক নাম নয়। আমার নাম ধূর্জটি, আমার স্ত্রীর নাম জগদ্ধাত্রী, তুমি লিখেছ—"

তাহাকে থামাইয়া দিয়া জন বলিলেন—"অল্ রাইট্ তুমি বাংলায় একটা দলিল লিখে ফেল, আমি তাতে সই করে দিচ্ছি।"

ধূর্জটিমঙ্গল জন সাহেবের সহিত তাঁহার আপিসঘরে গেলেন এবং বাংলায় দলিলটি লিখিয়া ফেলিলেন।

তাহার পর সাহেব বলিলেন, "যাওয়ার আগে ঝামরির সঙ্গে একবার দেখা করে যাব। সে কি বলে শোনা যাক।"

ঝামরি মন্দিরের কাছেই আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া ঘুমাইতেছিল! অনেক ডাকাডাকিতেও সে উঠিল না। সাড়া পর্যন্ত দিল না। মুখের ঢাকা যেমন ছিল তেমনি রহিল।

জন সাহেবের সঙ্গিনী তিন জন সাহেবের হাঁকডাক শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সাহেব বলিলেন—"ঝামরিকে ডেকে তোল। আমি কলকাতা যাব। ওর সঙ্গে দেখা করে যাই।"

তিকি প্রশ্ন করিল—"কোলকাতা যেছ কেন?"

"নবাবের সঙ্গে লড়াই করতে।"

"ওমা! কি হবেক গো! লড়াই করতে?"

রোমনি বলিল—"আমরাও যাব তুর সঙ্গে।"

শাউনিও বলিল—"হাঁ, আমরাও যাব। আমরাও লড়ব নবাবের সঙ্গে।"

জন সাহেব হাসিমুখে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"তোরা পারবি না।"

তিন জনই সমস্বরে বলিল—"খুব পারব।"

জন সাহেব আবার খানিকক্ষণ হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"তবে চল। দানিয়েল কিন্তু এখানে থাকবে। ওর দেখাশোনা করবে কে—"

"কেন কস্তুরী আছে, লালীর সঙ্গেও দানিয়েল জমাইছে খুব। ওর জন্যে ভামনা করিও না। ও মিনসা খুব তালেবর—" বলিতে বলিতে রোমনি হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

"আচ্ছা তাহলে ঝামরিকে ওঠা—"

"ও এখন উঠবেক নাই। ওর ভর হইছে—"

সাহেব বলিলেন—"বেশ ওর ভর নামুক। তারপর আমি যাব। ততক্ষণ সব ঠিকঠাক করি। কালো পলটনরা এখানে থাকবে। আমি গোরাদের নিয়ে যাব। পাঁচটা ঘোড়া এখানে থাকবে, বাকিগুলো আমি নিয়ে যাব। তোরা পুরুষের বেশে ঘোড়ায় চ'ড়ে যেতে পারবি তো?"

তিনজনেই সমস্বরে উত্তর দিল—"হুঁ—অ"

"তবে তৈরি হয়ে থাক। কালো পলটনদের জামা আর পাতলুন পরে নে তোরা। কাল দশটায় বেরুব আমরা। ততক্ষণ ঝামরির ভর নেমে যাবে।"

ঝামরি তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল।

বলিল—"তুই এখনই বেরিয়ে পড়্। দুপহর রাতে যখন কালপেঁচাটা ডেকে উঠবে সেই সময় বেরিয়ে যাবি। তাহলে কোন বিপদ হবেক নাই। ওর ডাকই তোকে আগলাবেক। ওই নবাবটাকে ধরে তার নাক কান কেটে দিয়ে আয়। আজই ও দান শা ফকিরের নাক কান কেটেছে। বড় ভালো ছিল লোকটা। মরে নাই, এখনও বেঁচে আছে। আমি রংকিণীর সিঁদুর মনসাপাতায় দিব। সেটা লাগাতে বলিস, ঘা সেরে যাবেক।"

জন প্রশ্ন করিলেন—"এত খবর তুমি জানলে কি করে ঝামরি?'

"আমার ভর হইছিল যে। রংকিণী আমাকে বলে গেল।"

"আমার ভাইপো জেমসের খবরটাও নাও না।"

"খবর জানি। কিন্তুক বুলব না—"

তাহার পর হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল সে। তাহার ভ্রূকুটিকুটিল মুখ ভয়ংকর হইয়া উঠিল, মনে হইল চক্ষু দুইটি বুঝি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। রংকিণী মন্দিরের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল—"ওই রক্তখাকীকে শুধা। ও লরবলি চায়। বলে তুরা না দিবি তো আমি জোগাড় করে লিব।"

ঝামরি হনহন করিয়া মন্দিরের পিছনে জংগলের ভিতর চলিয়া গেল, আর ফিরিল না।

সেদিন মধ্যরাত্রে পেচক ডাকিয়া উঠিল বু-ওম, বু-ওম, বু-ওম। জন তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সন্ধ্যা হইতে ক্রমাগত মদ্যপান করিয়া তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। রোমনি আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল—"সাহেব উঠ উঠ। প্যাঁচাটা চেঁচাচ্ছে। উঠ, যাবার সময় হল—"

সাহেবের সাড়াশব্দ নাই।

রোমনি তখন ঠেলা দিল তাঁহাকে।

"প্যাঁচাটো ডাকছে গো, উঠ উঠ—"

'ড্যাম ইওর প্যাঁচা। লেট মি স্লীপ। কাল সকালে যাব। এখন তোরাও ঘুমো—"। জন পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন সকালে যখন তাঁহার ঘুম ভাঙিল তখন চারিদিকে রোদ উঠিয়া গিয়াছে।

জন সসৈন্যে যাত্রা করিলেন কলকাতার দিকে।

রোমনি, শাওনি এবং তিঁকি'ও পুরুষের বেশে ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার অনুগমন করিল।

॥ তিন ॥

জন আর ফেরেন নাই। ধূর্জটিমংগলও কিছুদিন পরে সিংভূমের জংগল ত্যাগ করিয়া কলিকাতার দিকে রওনা হইয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার ঘরবাড়ি বিষয়-সম্পত্তি ছিল, সেগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল। তিনিও

অনেকদিন ফিরিলেন না। তাঁহার অবর্তমানেই জগদ্ধাত্রী দুইটি যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। দানিয়েল সাহেব জগদ্ধাত্রীকে নিজের কুঠিতে লইয়া গিয়াছিলেন। দানিয়েল সঙ্গিনী প্রসব করাইয়াছিল শিশু দুইটিকে। দুইটিই পুত্রসন্তান। কস্তুরীকে যদিও দানিয়েল বিবাহ করে নাই, কিন্তু কস্তুরীই দানিয়েল-সংসারের কর্ত্রী ছিল। সে যাহা বলিত তাহাই হইত, সে যাহা চাহিত তাহাই পাইত। সে যখন বলিল—যখন দুটো ছেল্যা হইছে, তখন আমি একটা লিব, লালী একটা লিক। সেই নামকরণ করিল তাহাদের। একটার নাম দিল খাম্বা, আর একটার নাম দিল খুঁটি। কস্তুরী খাম্বার পরিচর্যা করিত, আর লালী খুঁটির। জগদ্ধাত্রী একদিন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তোদের ছেলেমেয়ে হয়নি কেন? কস্তুরী হাসিয়া জবাব দিল—"আমাদের যে বিয়া হয় নাই গো। আমরা সায়েবের। কিন্তুক সায়েবটা যে বুড়া আর বেয়ারামি। আমাদের ছেলেপুলে হবেক নাই। তোর ছেলেই আমরা পালব।"

ঝকমারি পিসী, ধূর্জটিমঙ্গলের সহিত আসিয়াছিল। সে বলিল—"তোমরা ওদের মানুষ কর; তোমাদের দেওয়া নাম খাম্বা আর খুঁটি ওদের ডাক নাম থাকতে পারে, কিন্তু ওদের বংশে সকলের নামের শেষে মঙ্গল থাকে। তাই ওদের ভালো নামও রাখতে হবে।" সেই ছেলে দুটির নামকরণ করিল—শম্ভুমঙ্গল, আর জটামঙ্গল।

ঝকমারি পিসীর একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। সে রক্তসম্পর্কে ধূর্জটিমঙ্গলের ভগ্নী নয়। ধূর্জটিমঙ্গলের পিতামহ শঙ্করমঙ্গল ডাকাতের সর্দার ছিলেন। এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার দলে ভোজপুরের এক বিহারী ডাকাত ছিল, নাম ঝঙ্কার সিং। বিপুলকায় শক্তিমান লোক। একাই দশজনের মহড়া লইতে পারিত। কিন্তু এই পালোয়ান লোকটাই ডাকাতি করিতে গিয়া একদিন মারা গেল। যে বাড়িতে ডাকাতি হইতেছিল সেই বাড়িরই একটি যুবতী মেয়ে একটি কুড়ুল দিয়া আঘাত করিল ঝঙ্কার সিংকে। তাহার মাথা দুফাঁক হইয়া গেল। ঝঙ্কার সিং মারা যাইবার পর শঙ্করমঙ্গল তাঁহার একমাত্র সন্তান রাজমণিকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিলেন। রাজমণি তখন বিধবা, কিন্তু অন্তঃস্বত্ত্বা। রাজমণির মা আগেই মারা গিয়াছিলেন। রাজমণি একটি কন্যাসন্তান প্রসব করিয়া মারা গেল। শঙ্করমঙ্গল তাহার নাম রাখিলেন ঝঙ্কারিণী। ধূর্জটিমঙ্গলের মা অর্থাৎ মহেশমঙ্গলের স্ত্রী মানুষ করিয়াছিলেন ঝঙ্কারিণীকে। কিন্তু শিশু ঝঙ্কারিণী সকলের জীবন নাকি অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। দিনরাত চীৎকার করিত। ধূর্জটিমঙ্গলের মা সুবর্ণময়ী তাহার নামটা একটু বদলাইয়া ঝকমারিতে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিলেন। পোশাকী ঝঙ্কারিণী নামটা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ঝকমারি নামটাই টিকিয়া গেল শেষ পর্যন্ত। খাম্বা ও খুঁটির যখন জন্ম হয় তখন ঝকমারি পিসি যুবতী। বয়স ষোল বৎসর। তাহার চোখেমুখে বাঙালী মেয়ের কমনীয়তা ছিল না, ছিল কেমন যেন একটা পুরুষালি ভাব। অবলীলাক্রমে বড় বড় গাছে উঠিতে পারিত, সাঁতারে তাহার জোড়া কেহ ছিল না, মারপিটেও অদ্বিতীয়া ছিল ঝকমারি। তাহার মেয়ে সঙ্গী বড় একটা কেহ ছিল না, পুরুষ সঙ্গীই বেশী। কপাটি খেলা, ধাপসা খেলা এমন কি কুস্তিতেও তাহাকে কেহ হারাইতে পারিত না। বৌদিকে—ধূর্জটিমঙ্গলের স্ত্রীকে সে বড় ভালবাসিত। ভয়ও করিত। তিনিই কিছুদিন আগে তাহাকে পুরুষ সঙ্গীদের সহিত মিশিতে বারণ

করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"তুই মেয়ে ছেলে, তুই বেটাছেলেদের সঙ্গে কুস্তি করবি ? তোর লজ্জা করে না ? তোকে আর ওদের সঙ্গে মিশতে হবে না।"

ঝকমারি বলিল—"বাঃ আমি কি করব তাহলে—"

"তুই আমার ঠাকুরঘর নিয়ে থাক। তারপর বিয়ে হলে শ্বশুরঘর করবি—"

"ইস আমি বিয়ে করবই না।"

"তোর দাদা যা ঠিক করবে তাই হবে। তোর দাদা বলেছে ভোজপুরী সিপাহীর সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে। অযোধ্যার নবাবের পলটনে সে নাকি কাজ করে।"

ঝকমারি আবার মাথা নাড়িয়া বলিয়াছেন—"আমি বিয়ে করবই না।"

কিন্তু জগদ্ধাত্রীর কথা সে অমান্য করে নাই। জগদ্ধাত্রীর ঠাকুরঘরের ভার সে লইয়াছিল। জগদ্ধাত্রীর ঠাকুরঘরে অনেক ঠাকুর। শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, গণেশ তো আছেনই। আরো সব ছোট বড় নুড়ি আছে অনেক। কোনটা মা শীতলা, কোনটা ওলা বিবি, কোনটা পাষাণপুরের শিব, কোনটা হরিঘাটার জাগ্রত পীর সাহেবের কবরের নিকট কুড়াইয়া পাওয়া পাথর, কোনটা ইতু লক্ষ্মী, কোনটা তুষু ঠাকুরণ, কোনটা মা ষষ্ঠী—এই রকম অনেক। সমবেতভাবে ইহাদেরই সকলেরই পূজা করিত জগদ্ধাত্রী। ঠাকুরদের ভোগ দিয়া প্রত্যহ প্রসাদ বিতরণ করিত সে। এই ঠাকুরঘরের ভার লইয়াছিল ঝকমারি। ঘরটা পরিষ্কার করিত দুইবেলা, ফুল তুলিত, ফল কুঁচাইত, চন্দন ঘষিত। ধূপধুনা জ্বালাইত। এই ঠাকুরঘর শেষে তাহাকে পাইয়া বসিল। ঠাকুরঘরে বসিয়া সে আপনমনে মালা গাঁথিত। রামায়ণ পড়িত, গানও গাহিত! এই ঠাকুরঘরে বসিয়াই সে একদিন আত্ম আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাহার পূর্বজন্মের জীবন সহসা একদিন ছবির মতো ফুটিয়া উঠিল তাহার মানসপটে। ছবিটা অনেকক্ষণ ধরিয়া সে নিজেই দেখিল। তাহার পর জগদ্ধাত্রীকে গিয়া বলিল ঘটনাটা।

"বৌদি আজ ভারী একটা মজার কাণ্ড হয়ে গেল ঠাকুরঘরে বসে। আমি আর এক জন্মে ফিরে গিয়েছিলাম। কি যে সব দেখলাম স্বচক্ষে—"

"কি দেখলি—"

ঝকমারি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"উঃ, কোথায় চলে গিয়াছিলাম—"

"কোথায় ?"

"আমেদনগরে। সেখানে বাদশাহী তাঁবুতে বুড়ো সম্রাট আলমগীর, বিছানায় শুয়ে হাঁপাচ্ছেন। আমি তাঁকে হাওয়া করছি।"

"তুই ?"

"হ্যাঁ আমি। আমি তখন ঝকমারি নই, আমি শাহানসার বাঁদী রাবেয়া। বাদশাহ দাক্ষিণাত্য থেকে শাহাজানাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু আমেদনগরে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। পা দু'টো ফোলা ফোলা, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, ক্রমাগত কাশছেন। হাকিম সাহেব জবাব দিয়ে গেছেন। বাদশাহ তাঁর পেয়ারের ছোটছেলে কামবক্সকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলেই বললেন তোমাকে বিজাপুরের নবাব করে দিলাম, তুমি এখনই সৈন্যসামন্ত নিয়ে নবাবের মর্যাদা অনুসারে শোভাযাত্রা করে বিজাপুরের উদ্দেশে বেরিয়ে সেখানকার সিংহাসন দখল কর।"

ঝকমারি আবার চুপ করিল।

"তারপর ?"

"কয়েকদিন নিঃঝুমের মতো পড়ে রইলেন। সাতদিন পরে ডাকলেন আর এক ছেলে আজিম শাকে। তাঁকে বললেন, তুমি মালওয়া চলে যাও। সেখানকার নবাব হও তুমি। তবে খুব তাড়াতাড়ি যেও না। রোজ পাঁচ ক্রোশ যাবে, তার বেশী নয়। এখনি বেরিয়ে পড়, দেরি কোরো না। আমি এখানেই বিশ্রাম করি। আজিম শাহ চলে গেলেন। তখন আমি খোজা পয়গম্বরকে ডেকে জিগ্যেস করলাম, 'এ সময়ে উনি ছেলেদের দূরে পাঠিয়ে দিলেন কেন ?' খোজা পয়গম্বর অনেকদিনের পুরোনো লোক, আমাকে মেয়ের মতো ভালবাসত। খোজা চুপিচুপি বললে—বাদশা নিজের বুড়ো বাপকে কয়েদ করেছিলেন। তাই তাঁর ভয় হয়েছে তাঁর ছেলেরাও যদি তাই করে। সেইজন্য ওদের সরিয়ে দিলেন দূরে। চালাক লোক তো—"

ঝকমারি চুপ করিয়া গেল আবার। ফ্যালফ্যাল করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

"থেমে গেলি কেন ? তারপর কি হল—"

ঝকমারি যেন আপন মনে বলিতে লাগিল—"আলমগীর মরে গেছে। কফিনে পুরে ফেলা হয়েছে তাঁর দেহ। আজিম শা কফিনটা কাঁধে তুলে কিছুদূর এগিয়ে গেল। তারপর রেখে দিল সেটা।"

আবার চুপ করিল ঝকমারি। তাহার পর আবার বলিতে লাগিল।…"আওরঙ্গাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হল বাদশার দেহ। সেখানেই কবর দেওয়া হল তাঁকে। কুরবানিও হল। আজিম শা নিজেকে বাদশা বলে ঢ্যাঁঢরা পিটিয়ে দিল চারদিকে। তারপর নিজে সিংহাসনে উঠে বসল—আমি ছিলাম আলমগীরের বাঁদী, হয়ে গেলাম আজিম শার। সিংহাসনে উঠে আজিম শা অনেক খেলাত বখশিস দিলে সবাইকে। আমিও পেলাম একটা দামী মসলিনের ওড়না আর পঞ্চাশ আসরফি। নাচগান আমোদপ্রমোদের তুফান বইতে লাগল। কিন্তু এত সুখ সইল না বেশী দিন। আলমগীরের আরও তিনজন ছেলে খবর পেলেন যে বাদশা খুব অসুস্থ। ছোটছেলে কামবক্স ছিলেন বিজাপুরে। আলমগীর তাঁকে বিজাপুরের শাসনকর্তা করে গিয়েছিলেন। তাই নিয়েই সন্তুষ্ট হলেন তিনি। আজিম শা তাঁকে আরও কিছু জমিদারি দিলেন, নিজের নামে টাকা তৈরি করবার অনুমতি দিলেন, তাঁর নামে খোতবাও পড়া হতে লাগল মসজিদে মসজিদে। কিন্তু বাদশার বড়ছেলে, সুলতান মোয়াজ্জিম বাগ মানলেন না সহজে। তিনি কাবুলের শাসনকর্তা ছিলেন আলমগীরের মৃত্যু সময়ে, তাঁর মেজছেলে আজিমউস্সান ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। এঁরা দুজনে মিলে যাত্রা করলেন আমেদনগরের উদ্দেশে। একবারাবাদে এসে মোয়াজ্জিম খবর পেলেন বাদশা মারা গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। তারপর তিনি চিঠি লিখলেন আজিম শাকে—বাবা তোমাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা করে গেছেন, তুমি তাই নিয়ে যদি সন্তুষ্ট থাক আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি যদি হিন্দুস্থানের সিংহাসনের লোভ কর তাহলে তোমার ভাল হবে না। খোজা পয়গম্বর খবরটি সংগ্রহ করে এনে চুপিচুপি বললেন আমাকে। তারপর বললেন—এইবার বেধে গেল।

ঠিক তাই হল। আজিম শা উত্তর দিলেন—এক সিংহাসনে দু'জনের স্থান নেই। সত্যিই তারপর যুদ্ধ বেধে গেল। সৈন্যসামন্তরা চলতে শুরু করল একবারাবাদের

দিকে। আমাদের তাঁবুও চলল তাদের পিছু পিছু। নানারকম গুজব শুনতে লাগলাম। একদিন শুনলাম সুবে বাংলা থেকে দেওয়ান যে এক কোটি টাকা রাজস্ব দিল্লীতে পাঠাচ্ছিলেন আজিমউস্‌সান নাকি সেটা আটক করেছেন। আরও শুনলাম তিনি বিদ্‌রবখ্‌তের শ্বশুর একবারাবাদের শাসনকর্তা মোক্তার খাঁকে বন্দী করেছেন। মোক্তার খাঁ আজিম শার বন্ধু ছিলেন। তিনি আজিমউস্‌সানের তম্বি গ্রাহ্যই করলেন না।

এর পরই সুলতান মোয়াজ্জিম, তাঁর বড়ছেলে মুয়াজ্জিদ্দিনকে নিয়ে এসে পড়লেন একবারাবাদে। সুলতান মোয়াজ্জিমের সৈন্যরা মাইনে পায়নি বলে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। আজিমউস্‌সান যে কোটি টাকা আটকে ছিলেন তা তাঁর বাবাকে দিলেন। তাঁর বাবা সে টাকা দিয়ে সৈন্যদের মাইনে তো মিটিয়ে দিলেনই, আরও অনেক দান খয়রাৎও করলেন। তারপর যুদ্ধ লেগে গেল। আজিম শার আফগান সেনাপতি মুনেশ্বর খাঁর পাঁচ হাজার আফগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুলতান মোয়াজ্জিমের উপর। কিন্তু কিছুই হল না। আজিম শা হেরে গেলেন। শুধু তাই নয় মারা গেলেন তিনি। মুনেশ্বর খাঁও মারা পড়লেন। আমরা সবাই বন্দী হলাম। আমি তাঁবুতে চুপ করে বসে আছি এমন সময় সুলতান মোয়াজ্জিমের একটা মাতাল সৈন্য আমার তাঁবুর সামনে এসে চীৎকার করে বললে—ওই বাঁদীটাকে আমার শোবার ঘরে পাঠিয়ে দাও। খোজা পয়গম্বর তাঁবুতে ঢুকল। আমি তার পায়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আমাকে বাঁচাও। খোজা বললে—বাঁচবার একটি উপায়ই আছে। বললাম, সেই উপায়ই আমাকে বলে দিন। খোজা তৎক্ষণাৎ খাপ থেকে তলোয়ার বার করে আমার গলাটা কেটে দিলে। দড়াম করে পড়ে গেলাম আমি···মরে গেলাম।"

হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল ঝকমারি।

"কিন্তু আমি মরিনি তো। এই তো একটু আগে তোমার ঠাকুরঘরে ঠাকুরের ভোগ রাঁধছিলাম। মনে মনে ডাকছিলাক, দাদা এবার ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক। নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের গোলযোগ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কি যে হচ্ছে কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। দাদা ফিরলে নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু বৌদি আমি এখনি যেটা দেখলাম সেটা কি সত্যি? সত্যিই কি আমি রাবেয়া ছিলাম বাদশা আলমগীরের সময়! কিন্তু যা দেখলাম তা তো স্বপ্ন নয়, জেগে জেগে স্বচক্ষে দেখলাম—"

জগদ্ধাত্রী বলিলেন—"মাথা খারাপ হ'য়ে গেলে লোকে জেগে জেগেও অনেক কিছু আজগুবি দেখে। আমাদের গাঁয়ের নবু ঠাকুর বলতেন আমি গত জন্মে সরফরাজ খাঁ ছিলাম, আমাকে তোমরা কুর্নিশ কর। তোরও হয়তো মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তোর দাদা ফিরুন তখন তোর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে একটা। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—"

"আমি বিয়ে করবই না—"

এক বৎসর পরে ধুর্জটিমঙ্গল ফিরিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন নীলাম্বর রায়, ধুর্জটিমঙ্গলের বন্ধু। তাঁহারা খবর আনিলেন। ক্লাইভ মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসিয়া পেঁৗছাইয়াছেন। নবাবের সহিত এইবার যুদ্ধ হইবেই। চতুর্দিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে।

নীলু রায় ছোটখাটো খর্বাকৃতি ব্যক্তি। রং কালো। চোখ দুইটি ছোট ছোট।

মুখে চাপদাড়ি। চোখের দৃষ্টিতে ধূর্তামি মাখানো। অথচ কেমন যেন কাতর দৃষ্টি। সর্বদাই মৃদু মৃদু হাসেন এবং চাপদাড়িতে হাত বোলান। জংলি কুঠিতে যেসব কালা পলটন জন সাহেব রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাদের ক্যাপ্টেন সরদার মাখনলালের সহিত নীলু রায়ের বন্ধুত্ব জমিয়া গেল। মাখনলালকে নীলু রায় ক্লাইভের খবর সবিস্তারে সব বলিলেন। সর্বঘটে যেমন কাঁঠালি কলা থাকে নীলু রায়ও তেমনি সর্বঘটে বিরাজ করিবার ক্ষমতা রাখিতেন। তিনি কলিকাতায় নবাব নিয়োজিত শাসনকর্তা মানিকচাঁদের দরবারে যেমন অনায়াসে যাতায়াত করিতেন তেমনি অনায়াসে যাতায়াত করিতেন ফলতায় ইংরেজ মহলে। নীলু রায়ের মাধ্যমে মাণিকচাঁদ অবৈধ উপায়ে লোকের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহাদের উপর অনুগ্রহ বৃষ্টি করিতেন। ফলতায় ইংরেজরা বড় দুর্দশার মধ্যে ছিলেন। ভালো খাওয়া জুটিত না, মদ পাওয়া যাইত না, তাহার উপর আর এক বিপদ হইয়াছিল ম্যালেরিয়া আর পেটের অসুখ। নীলু রায় মাণিকচাঁদের অগোচরে ইংরেজদের খাবার, মদ এবং ঔষধ সরবরাহ করিতেন। কবিরাজী এবং হেকিমি ঔষধও পাঠাইয়া দিতেন তাহাদের জন্য। অনেক সময় ইহাতে বেশ উপকারও হইত। নীলু রায়ের মাধ্যমে কলিকাতার অনেক বড়লোক ইংরেজদের টাকাও ধার দিতেন। বরের ঘরের মাসী এবং কনের ঘরের পিসী হইয়া নীলু রায় দুই পক্ষেরই হাঁড়ির খবর সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকাতে মাখনলালকে ক্লাইভের আগমনের যে বর্ণনাটা তিনি দিলেন সেটা মিথ্যা নয়। আর একটা কথাও গোপনে তিনি বলিলেন যে যদিও মাণিকচাঁদ আপাতদৃষ্টিতে নবাবের লোক কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনিও ইংরেজদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তাহা না হইলে ইংরেজরা ফলতাতেও থাকিতে পারিতেন না। কারণ ফলতাও নবাবের রাজত্বের মধ্যে। মাণিকচাঁদ খামখেয়ালী নবাবকে ভয় করেন, মনে মনে বোধহয় ঘৃণাও করেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন ইংরেজদের। সাধারণ লোকেদের সহিত ইংরেজদের ব্যবহার খুব ভালো। তাঁহারা পয়সা দিয়া জিনিস কেনেন, তাঁহাদের সৈন্যরা সাধারণ লোকদের বাড়িঘর সম্পত্তি লুট করেন না; ন্যায়ের প্রতি তাঁহাদের প্রবল নিষ্ঠা। কথার খেলাপ করিবার লোক তাঁহারা নহেন। এইসব কারণে মাণিকচাঁদ ইংরেজদের বিশ্বাস করেন। অবশ্য বাহিরে বাহিরে তাঁহাকে দেখাইতে হয় যে তিনি নবাবের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই তিনি বজবজে যদিও ক্লাইভের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু সেটা লোক দেখানো যুদ্ধ।

মাখনলাল জিজ্ঞাসা করিল—"ক্লাইভ লোক কে বল তো? এর নাম তো আগে শুনিনি—"

"ক্লাইভ সাধারণ লোক নয়, ওস্তাদ লোক, সাংঘাতিক লোক। আসল আসরফি। ছিল মাদ্রাজ আপিসের কেরানী, এখন কর্নেল। কেরানীর কাজ মোটে ভাল লাগত না ওর, দিক্ হয়ে তাই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। দু'বার নিজের মাথা লক্ষ্য করে রিভলবার ছুঁড়েছিল, কিন্তু একবারও গুলি লাগল না। মনে হয় স্বয়ং মা কালী ওর সহায়। ও সোজা লোক নয় মাখনলাল, আসল জাত সাপ—'

"কিন্তু কেরানী থেকে কর্নেল হল কি করে—"

"দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেল যে ইংরেজদের। তাই অনেক কেরানীকে তারা সেনাদলে বহাল করে ফেললে। সেই সময় ক্লাইভ কলম ছেড়ে ধরল তলোয়ার। লড়ল দুপ্লেক্সের সঙ্গে। অনেক যুদ্ধে জিতে নাম কিনে ফেললে ছোকরা।

হু হু করে কর্নেল হয়ে গেল। এখন তো ওই সর্বেসর্বা। ও যেরকম জাঁকজমক করে এসেছে কি হবে শেষ পর্যন্ত ভগবানই জানেন—"

"জাঁকজমক মানে?"

"ক্লাইভের সঙ্গে এসেছেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্‌ পাঁচখানা যুদ্ধজাহাজ নিয়ে, দু'খানা জাহাজ যদিও মাঝপথে লোপাট হয়েছে তবু যা এনেছেন তা প্রচুর। তার ওপর আছেন মেজর কিলপ্যাট্রিক। দুঁদে লড়িয়ে একজন, দেশী সিপাইদের ক্যাপ্টেন। ক্লাইভ ফলতা থেকে মাণিকচাঁদকে, শুধু মাণিকচাঁদকে কেন স্বয়ং নবাবকেও এমন চিঠি ঝেড়েছে যে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে সকলের—"

"কি চিঠি—"

"চিঠি আমি দেখিনি। কিন্তু তার মর্ম হচ্ছে, মানে মানে কলকাতা ছেড়ে চলে যাও। তা না হলে যুদ্ধং দেহি। মাণিকচাঁদ হয়তো ভেগে পড়ত কিন্তু নবাবের বিনা অনুমতিতে সেটা করা সম্ভব নয়। তাই পালালেন না। শিবপুরের দুর্গটা মেরামত করে সেনাসামন্ত নিয়ে বজবজে গিয়ে ইংরেজের রাস্তা আগলে বসে রইলেন। কিন্তু যখন ক্লাইভ আর মেজর কিলপ্যাট্রিক এসে হাজির হলেন তখন আধঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধ খতম। একটা গুলি মাণিকচাঁদের মাথার পাগড়িটাই উড়িয়ে নিয়ে গেল। এক ছুটে তিনি কলকাতায় গিয়ে হাঁফ ছাড়লেন। তাঁর সৈন্যরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঢুকে পড়ল বজবজের দুর্গে। ওয়াটসন ছিলেন জাহাজে। সেখানে থেকে দুটি গোলা ফেললেন তিনি। প্রকাণ্ড গোলা। এই গোলার দাপটে বজবজের ফুটফাট গোলাগুলি একদম বন্ধ হয়ে গেল। ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল মাণিকচাঁদের সৈন্যরা দুর্গের ভিতর। ক্লাইভ ঠিক করেছিলেন সকালে এসে দুর্গটি দখল করবেন। কিন্তু রাত্রে একটা ভুতুড়ে কাণ্ড হ'য়ে গেল।"

"ভুতুড়ে কাণ্ড? কি রকম?"

"রাতদুপুরে দেখা গেল দুর্গের দেওয়ালের উপর চড়ে কে যেন খনখনে গলায় বলছে—এ দুর্গ আমাদের। তোমরা অবিলম্বে পালাও। যদি না পালাও তাহলে তুলকালাম কাণ্ড করব আমি। জন দুই নবাবের সেপাই বেরিয়ে এসে তম্বি করতে গিয়েছিল। ভুতটা সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মেরে ফেললে একজনকে। দেখা গেল তার হাতে একটা খাঁড়াও রয়েছে। দ্বিতীয় সেপাইটার মুণ্ড সে এক কোপে উড়িয়ে দিলে। তৃতীয় একটা সেপাই আসতেই তাকে এক ঘুঁষিতে ধরাশায়ী করে ফেললে। হৈচৈ পড়ে গেল। ইংরেজের সৈন্যরা এসে পড়ল। নবাবের সৈন্যরা যে যেদিকে পারল পালাল!"

"ভুত? একটা ভুত এই কাণ্ড করলে? বল কি—"

হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন নীলু রায়। বলিলেন—"না, ভুত নয়। ছিটগ্রস্ত একটা সাহেব সৈন্য। মদ খেয়ে ওই কাণ্ড করেছিল। কিন্তু ইংরেজ জাতের আইন-নিষ্ঠার গল্পটা শোন। আমার তো শুনে তাক লেগে গিয়েছিল! ওই মাতালটার জন্যেই বজবজ দুর্গ-জয় সহজ হয়ে গেল। ইংরেজের একটি সৈন্যও মরল না। ও লোকটা যদি নবাব সাহেবের চাকর হত নবাব ওকে বকশিস করতেন, হয়তো ওকে মনসবদার বানিয়ে দিতেন, ক্লাইভ কিন্তু ওর কোর্ট মার্শাল করলেন। বললেন, বিনা হুকুমে কেন ও কেল্লার দেওয়ালে চড়েছে। লোকটাকে ক্ষমা চাইতে হ'ল। বলতে হ'ল এমন কাজ আর কক্‌খনো করব না। এর থেকেই বোঝ ইংরেজ আর মুসলমানে কত

তফাত। ইংরেজরা নিয়ম অনুসারে চলে। কোলকাতার ফোর্ট-উইলিয়াম কেল্লা তো ওরা দখল করে নিয়েছে—"

"অ্যাঁ, বল কি! ফোর্ট দখল করে নিয়েছে—"

"হ্যাঁ। ওয়াটসন এসে দমাদ্দম গোলা ফেলতেই সব চোঁচা দৌড় দিলে। মাণিকচাঁদ পালাল হুগলিতে। ফোর্ট দখল করে নিলে ওরা।"

"আমাদের মালিক জন সাহেবের কোনও খবর পেলে না?"

"নাঃ। ধূর্জটি অনেক খোঁজখবর করলে তো। তার কিংবা তার ভাইপোর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।"

এমন সময় মধু সামন্ত আসিয়া হাজির হইল। তাহার স্কন্ধে একটি মুণ্ডহীন বলি দেওয়া পাঁঠা। পাঁঠাটা নামাইয়া সে বলিল—"একটু তামুক খাওয়াত তো মাখন।"

"পাঁঠা কি রঙ্কিণী মায়ের কাছে মানত ছিল?"

"হ্যাঁ মানতই ছিল। মানত করেছিল আমার পরিবারটি। ভারী ভীতু মেয়েমানুষ সে। আমার কিছু জমি চেপে নিয়েছিল খালিমুল্লা। আমি নালিশ করেছিলাম তার নামে। খালিম না কি ভূইঞা ঈশা খাঁর আত্মীয়। তাই ভয় ছিল বিচারক সুবিচার করবে কিনা। আমার পরিবারটি ভীতু লোক - ভয়ে ভয়ে রঙ্কিণীর কাছে মানত করে বসল মা মকোর্দমা জিতিয়ে দাও, তোমার কাছে বলি দেব। আমাকে কিন্তু তদারকী করতে হল অনেক। সৈদুল্লার মারফত ফৌজদারের কাছে কিছু ভেট পাঠাতে হল। ভেট নিয়ে যাওয়ার জন্য সৈদুল্লাকেও দিতে হল কিছু। রঙ্কিণীর উপর নির্ভর করে আমি বসে থাকতে পারলুম না। মকোর্দমা জিতেছি। পরিবার বললে, পাঁঠা মানত করেছিলাম দিয়ে এস। ভাবলুম অনেকদিন মাংস খাইনি, তাছাড়া যখন মানত করেছে একটা, তখন দেওয়াই উচিত। নিয়ে এলুম একটা পাঁঠা কিনে। ৪০০ কড়ি দাম নিলে। কামার মুণ্ডুটা নিলে, তাছাড়া আরও দশটা কড়ি। ঝামরি বলছে তাকে একটু মায়ের প্রসাদ দিতে হবে। তাই ভাবছি পাঁঠাটা কেটেকুটে এইখানেই রান্না করে ফেলি, খানিকটা রাঁধা মাংস ঝকমারিকে দিয়ে বাকিটা বাড়ি নিয়ে যাব। ভাই মাখন তুমি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পার? ও কি, তুমি অমন বিমর্ষ হ'য়ে বসে আছ কেন?"

"শুনেছি নবাবের সঙ্গে ইংরেজের লড়াই বাধবে। তার মানেই আমাদেরও হয়তো যুদ্ধে যেতে হবে। আমরা ইংরেজদের অধীনে চাকরি করি বটে, কিন্তু নবাবকে ইংরেজরা সত্যি সত্যি হারিয়ে যদি এদেশের রাজা হয়ে বসে তাহলে সেটা খুব খারাপ লাগবে ভাই—"

নীলু রায় বলিলেন, "খারাপ লাগবে কেন। ওরকম একটা পাজী কামুক অর্থ-পিশাচ নিষ্ঠুর লোককে মসনদ থেকে নামিয়ে দেওয়াই তো উচিত। ইংরেজরা যদি রাজা হয়, তাহলে দেশের ভাগ্য বলে মানব সেটা "

মধু সামন্ত প্রশ্ন করিলেন—"কেন? ইংরেজরা কি দেবতা? তারা কি কম কামুক, কম পাজী? এই যে তোমাদের জন সাহেব। ও কি শুকদেব? তোমাদের নাকের উপর দিয়েই তো তিনটে ছুঁড়িকে নিয়ে সরে পড়ল। ওদের বড় বড় চাঁইরাও রাখনি রাখে। রোজার ড্রেকের নামেও অনেক কথা শুনেছি।"

"কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার মতো কামুক পাষণ্ড—"

মধু সামন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"হবেই তো, এই হচ্ছে দস্তুর। সব নবাবরাই ওই জাতের। সব শিয়ালের এক রা। আলিবর্দি খাঁই খালি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ছিল। একটিমাত্র বিবি ছিল তার। অন্য কোনও মেয়েমানুষের দিকে নজর দেয়নি সে। কিন্তু সে ভাল লোক ছিল বলে কই তোমরা তো দলবদ্ধ হয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াওনি যখন সে বর্গির হাঙ্গামার সময় নাস্তানাবুদ হচ্ছিল? এখন তোমরা তো সিরাজের আশেপাশেই ঘুরঘুর করছ, অনেক মহাত্মা নিজেদের বউ বেটি বোন উপহার দিচ্ছে তাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্যে। সিরাজ না হয় খারাপ কিন্তু তোমরাই কি ভালো?"

"কিন্তু সিরাজ হোসেন কুলি খাঁকে অমনভাবে মেরে ফেললে—"

"মারবে না? হোসেন কুলি যে প্রেমিক ছিলেন। সিরাজের মা আর মাসী দু'জনের সঙ্গেই প্রেম করতেন তিনি। সিরাজ তেজী লোক, এ অপমান সে সইবে কেন?"

"বল কি!"

"যা শুনেছি তাই বলছি। জগৎশেঠের একজন গোমস্তা আমাকে বলেছিল। মতিঝিলে তার আনাগোনা ছিল। সে বললে—হোসেন কুলি ঘসেটি বেগম আর আমিনা বেগম দু'জনের প্রেমেই হাবুডুবু খাচ্ছিল। ওরা সব সমান। সিরাজের আর এক মেসো সৈয়দ আহম্মদ যখন উড়িষ্যায় ছিল, সেখানে সে উড়েনিদের নিয়ে টানাটানি করত। খবর শুনে আলিবর্দি খাঁ সেখান থেকে ওকে সরিয়ে দেন। শুধু সিরাজ খারাপ, একথা বললে শুনব কেন, ওরা সবাই খারাপ। আমরাও! আমরাই ওদের খোসামোদ করে ঘুষ দি, আমরাই ওদের মেয়েমানুষ সরবরাহ করি। আমিও সেই পাপে পাপী।"

হঠাৎ মধু সামন্ত নিজেই নিজের গালে চড় মারিতে লাগিলেন। "আমাদের গাঁয়ের গরীব ঝুনিয়াকে আমিই তুলে দিয়েছি পাপিষ্ঠ বকাউল্লা বক্‌শির হাতে। ঝুনিয়ার অবশ্য কপাল ফিরেছে, তার বাপমায়ের দারিদ্র্যও ঘুচেছে, কিন্তু আগুন লেগে গেছে আমার মনে। বুঝলে? আমরা কেউ ভালো নই, আমরা সবাই পাজির পাঝাড়া, সবাই হারামজাদা, সবাই শয়তান, সবাই নচ্ছার। রায় মশায় সিরাজকে শয়তান বলছেন, নিজে সাধু সাজবার জন্যে নাকি?"

নীলু রায় দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"আমি ভাই যা জানি তাই বলছি। আপনি যা বলছেন তাও হক কথা, আমরা সব কীটস্য কীট, মানুষ নই।"

মাখন বলিল—"পাঁঠাটা যদি এখানেই রান্না করেন তাহলে আর দেরি করবেন না, উঠুন—"

মধু সামন্ত পাঁঠাটা লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। এমন সময় দেখা গেল ধূর্জটিমঙ্গল আসিতেছেন। তিনি এতক্ষণ পূজা করিতেছিলেন। তাঁহার কপালে ও বাহুতে চন্দনের ছাপ, পরিধানে পট্টবস্ত্র, পায়ে খড়ম, গায়ে কোনও জামা নাই। সেকালে অধিকাংশ লোকই বাড়িতে নগ্নগাত্র হইয়া থাকিতেন। মধু সামন্তের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। মধু সামন্ত পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোক। বেশ কিছু জমিজমা আছে, ও অঞ্চলের অধিবাসী কিছু প্রজাও আছে তাঁহার। অর্থাৎ ওই অঞ্চলের খানিকটা অংশের ইজারা লইয়াছেন তিনি। পাশেই আর একজন ইজারাদার খালিমুল্লা। তাঁহার

সহিত প্রায়ই খিটিমিটি বাধে। তিনি আগাইয়া গিয়া ধূর্জটিমঙ্গলের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন ; ধূর্জটিমঙ্গল ব্রাহ্মণ। তাছাড়া জন সাহেবের বন্ধু লোক।

"কি মধু, পাঁঠা কি রুক্মিণী মাকে নিবেদন করলে নাকি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এইখানেই রান্না করে নিয়ে যাব ভাবছি। ঝামরিকে একটু প্রসাদ দিতে হবে।"

"প্রসাদ আমরাও পাব। তুমি আজ আমাদের বাড়িতে খাবে—"

"আমিই রান্নার ব্যবস্থা করছি, তোমার বৌদিই রাঁধবেন,—ওরে হোকনা—"

একটি আদিবাসী ভৃত্য আসিয়া হাজির হইল।

তাহার পর মধু সামন্তের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তোমার পুরুত আর কামার কি চলে গেছে ?"

"অনেকক্ষণ।"

ধূর্জটি হোকনাকে আদেশ করিলেন—"তাহলে তুই রামু পুরুত আর পাঁচু কামারকে ডেকে আন। আর কাল ওই যে ওরাঁও পাড়া থেকে পাঁঠা বেচতে এসেছিল এক বুড়ী, তার কাছ থেকে পাঁচ শ' কড়ি দিয়ে পাঁঠাটাকে কিনে ফেল। কড়ি তোর গিন্নীমার কাছ থেকেই পাবি—। যা চট্ করে যা—"

মধু সামন্ত বলিলেন—"আপনিও কি একটা পুজো দেবেন নাকি ?"

"দিতেই হবে। তা না হলে একটি পাঁঠায় এতগুলো লোকের কুলোবে কি করে ?"

হোকনা চলিয়া যাইতেছিল, ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে আর একটা ফরমাস করিলেন।

"ঝামরি কোন দিকে আছে দেখ তো—"

সামন্ত বলিল—"ঝামরি এখন কবুতর ঝলসাচ্ছে। সকালে চেরো মাগীরা দশটা কবুতর বলি দিয়েছিল মা রুক্মিণীর কাছে। তার থেকে দুটো ঝামরিকে দিয়ে গেছে। তাই সে ঝলসাচ্ছে একটু আগেই দেখে এলাম। আমাকেও বলেছে মাংসের ভাগ চাই। কেন কি দরকার ওর সঙ্গে—"

"আমি তো জন-এর সন্ধান পেলাম না। ও যদি কিছু বলতে পারে। মাঝে মাঝে ঠিক ঠিক বলে দেয়। অদ্ভুত ক্ষমতা ওর। কিন্তু বড্ড খামখেয়ালী। চল একটু বলে যাই ওকে—"

রুক্মিণীর মন্দিরের পিছনে যে জঙ্গল ছিল, সেখানে ছিল একটা কৃষ্ণচূড়ার বড় গাছ। তাহারই তলায় ঝামরি বসিয়া কবুতরের হাড় চিবাইতেছিল। সামন্তকে দেখিয়া বলিল—"ওকি, মাংস এখনও কাটিস নাই ? খাব কখন ? ক্ষিধা লেগেছে যে—"

সামন্ত বলিল—"ধূর্জটি মশায়ও একটা পাঁঠা বলি দেবেন এখনি মায়ের কাছে ! তখন দুটো পাঁঠা একসঙ্গে রান্না হবে। তোমাকে দিয়ে যাব এক বাটি—"

ধূর্জটির দিকে তাকাইয়া ঝামরি বলিল—"তুইও পাঁঠা বলি দিবি ? পাঁঠা খেয়ে খেয়ে রুক্মিণার অরুচি ধ'রে গেছে। অন্য বলি চায় উ।"

"অন্য বলি আবার কি—"

খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ঝামরি।

"রক্তখাকি নরবলি চায়। নরবলি—। পারবি দিতে ?"

"না তা আমি পারব না। বলি দেওয়ার মানুষ পাব কোথা ?"

"চেষ্টা করলেই পাবি। টাকা ফেললেই পাবি। কিনতে পাওয়া যায়।"

"ওসব পাগলামি ছাড়। জন সাহেব কোথা গেল বল—"

ঝামরি বলিল—"জানি। বলব না।"

বলিয়াই উঠিয়া পড়িল। তাহার কোমরে যে বস্ত্রখণ্ড জড়ানো ছিল সেটাও খসিয়া পড়িল। মন্দিরের ভিতর চলিয়া গেল সে।

সেদিন ধূর্জটি শুধু সামন্তকেই নয় মাখনলাল আর তাহার সহকারী জয়রামকেও নিমন্ত্রণ করিলেন। ইঁহাদের সহিত নীলু রায় তো ছিলেনই। জগদ্ধাত্রীই স্বহস্তে সব রন্ধন করিয়াছিলেন। এই কয়জন লোকের জন্য পাঁচ সের বাঁশফুলি চালের ভাত প্রস্তুত করিয়াও তাঁহার আশংকা হইয়াছিল শেষ পর্যন্ত না কম পড়িয়া যায়। কিন্তু কম পড়ে নাই। ভাতের সঙ্গে ছিল গব্য ঘৃত, মুগের ডাল, বুটের ডালের বড়া। তাছাড়া ছিল বেতের আগার তরকারি, পুঁইশাকের চচ্চড়ি, মোচার ঘণ্ট, পোস্তবাটা, সিমের সড়সড়ি, মাগুর মাছ দিয়া জিরার ঝোল. আমচুর দিয়া শোল মাছ, কলার অম্বল আর আদা কাসুন্দী। ইহার উপর মাংস তো ছিলই। মাংসে লাউ, ছোলা ভিজানো, হিং গোলমরিচ আদা প্রভৃতি দিয়া অপরূপ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিল জগদ্ধাত্রী। ইহার উপর ছিল পায়েস, মনোহরা এবং চন্দ্রপুলি। জগদ্ধাত্রী ধনীর গৃহিণী। কিন্তু তিনি নিজেই মাথায় ঘোমটা দিয়া এবং গাছকোমর বাঁধিয়া স্বহস্তে সকলকে পরিবেশন করিলেন। ঝকমারি তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিল। অতিথিরা প্রত্যেকে দামী কার্পেটের আসনে উপবেশন করিয়া রূপার থালা বাটিতে ভোজন করিলেন। রূপার গ্লাসে সুগন্ধী সুশীতল জল পান করিয়া তৃপ্ত হইলেন। আহারান্তে রূপার তবক দেওয়া পান প্রত্যেকের হাতে দিবার পর ঝকমারি রূপার আতরদান খুলিয়া প্রত্যেককে আতরও মাখাইয়া দিল। মধু সামন্তের সহিত পাচক ব্রাহ্মণ গেল দুইজন। শুধু মাংস নয় সমস্ত রকম খাবার গুছাইয়া নিজে দাঁড়াইয়া দুইটি পালকিতে তুলিয়া দিলেন। মধু সামন্ত পালকিতেই গেলেন। চওড়া লালপাড় শাড়ি, শাড়ির লাল আঁচল, মাথায় সিঁদুর, হাতে লাল শাঁখা এই বেশেই জগদ্ধাত্রীকে সত্যই যেন জগদ্ধাত্রী বলিয়া মনে হইতেছিল। যাইবার সময় মধু সামন্ত বলিয়া গেলেন, "মা ঠাকরুণ কাল আবার আসব, আপনার কাছেই প্রসাদ পাব, কর্তার সঙ্গে কিছু বৈষয়িক আলোচনা আছে।"

মধু সামন্ত পরদিন এক হাঁড়ি মধু, এক হাঁড়ি দই, এক হাঁড়ি সন্দেশ এবং একটি নধর ভেড়া লইয়া দেখা দিলেন অতি প্রত্যূষেই। পদব্রজেই আসিয়াছিলেন তিনি। সঙ্গে তিনটা চাকর হাঁড়ি তিনটা মাথায় করিয়া আনিয়াছিল। চতুর্থ চাকর ভেড়াটি স্কন্ধে বহিয়া আনিয়াছিল। স্নান করিয়া আসিয়াছিলেন সামন্ত মহাশয়। তাঁহার কাঁধে ভিজা কাপড় এবং মাথায় ভিজা গামছা। পরিধানে পিরাণ এবং চওড়া-পাড় তাঁতের ধুতি। পায়ে মজবুত মিলিটারি বুট এক জোড়া।

"কি হে সামন্ত তুমি যে স্নান শেষ ক'রে এসেছ দেখছি—"

"হ্যাঁ, কইলি নদীতে স্নানটা সেরেই নিলাম। আমার উর-ধুকের ব্যায়ারাম আছে, তাই ভোরেই স্নানটা করে নি। এই মুটেগুলোকেও খাইয়ে দিয়েছি নদীর ধারে। সঙ্গে চিঁড়ে এনেছিলাম। গুড়ও এনেছিলাম। বনে কিছু মহুয়াও পেলাম। আমিও জলযোগ সেরে নিয়েছি।"

ধূর্জটিমঙ্গল প্রত্যেক মুটেকে পঁচিশটি কড়ি দিলেন এবং আরও খাইতে দিলেন। মুড়ির মোয়া আর বাতাসা। মুটে চারটি কৃষ্ণকায় ওঁরাও, সরল সদা-সপ্রতিভ,

হাসিখুশিতে ভরপুর। তাহারা প্রত্যেকেই মাথা ঝুঁকাইয়া ধূর্জটিকে প্রণাম করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

উহারা চলিয়া গেলে সামন্ত মহাশয় বলিলেন—"এই সব আসকারা দিয়েই আপনারা মুনিসদের পায়াভারি ক'রে দিচ্ছেন। আমি তো ওদের মজুরি খাওয়া সব দিয়েই দিয়েছি, আপনি আবার দিতে গেলেন কেন?"

নীলু রায় কাছেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"ওটা ওর স্বভাব।"

ধূর্জটিমণ্ডল যাহা বলিলেন তাহা সে যুগের পক্ষে একটু আশ্চর্যজনক। বলিলেন, "ওরাই রাজা, তাই ওদের খাজনা দিলাম। ও কথা যাক, বস। আমি গিন্নীকে খবর দিয়ে আসি—"

খড়ম খটখট করিতে করিতে তিনি ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। একটু পরেই তিনি ফিরিলেন। তাঁহার পিছনে একটি চাকর একটি পিতলের হাঁড়িতে গরম দুধ আনিয়া হাজির করিল। আর একটি চাকরের হস্তে তিনটি রুপার বাটি এবং ছোট ছোট গামছা।

ধূর্জটিমণ্ডল বলিলেন—"এক বাটি করে গরম দুধ খেয়ে নিয়ে তারপর চল ওই মাঠে গিয়ে বসি। কি বৈষয়িক কথা বলবে তুমি—?"

"আগে দুধটা খেয়ে নেওয়া যাক, তারপর বলছি সব।"

বাটিতে গরম দুধ ঢালিয়া দিল ভৃত্যরা। তাহার পর গামছা পাঠ করিয়া প্রত্যেকের দুই হাতের অঞ্জলিতে গামছাগুলি পাতিয়া দিল। তাহার পর সেই গামছাগুলির উপর গরম দুধের বাটি বসাইয়া দিয়া গেল তাহারা। প্রত্যেকে ফুঁ দিয়া দিয়া গরম দুধ পান করিতে লাগিলেন। ভৃত্যরা তিনটি ছোট ছোট ঘটিতে জলও দিয়া গেল। দুগ্ধ পানান্তে সকলে হাত ধুইলেন। সামন্ত আলগোছে একটু জলও পান করিলেন।

"চল এবার মাঠে বসা যাক।"

মাঠে কয়েকটি মোড়া পাতাই ছিল। সেখানে গিয়া তিনজনেই উপবেশন করিলেন। মহুয়া ফুলের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। অদূরে মনরঙ্গোলি গাছটায় প্রচুর ফুল ফুটিয়াছে। পিছনের বন হইতে বনমোরগের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে।

সামন্ত বলিলেন—"শুনছি নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই বাধছে। এখন আমাদের কি কর্তব্য?"

"কিসের কর্তব্য—?"

"আমরা কোন পক্ষে থাকব?"

"আমরা চুনোপুঁটি, আমরা কোন পক্ষে থাকলাম বা না থাকলাম তাতে ওদের কিছু এসে যাবে না।"

"যাবে বই কি। আমরা যে পক্ষে থাকব সেই পক্ষকে টাকা দিয়ে লোক দিয়ে সাহায্য করব। সে সাহায্য হয়তো যৎসামান্য, কিন্তু মনে রাখবেন কাঠবেড়ালিও রামচন্দ্রকে সেতু নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন।"

বলিয়াই একদৃষ্টে তিনি ধূর্জটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নীলু রায় বলিলেন—"আপনার কথাবার্তা থেকে তো মনে হয় আপনি নবাবের দিকে।"

এইটুকু বলিয়া তিনি অন্যদিকে চাহিয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

সামন্ত বলিলেন—"তা যদি মনে করেন করুন। আপনার মন তো আমার ঘোড়া নয় যে লাগাম টেনে যেদিক ইচ্ছে ঘুরিয়ে দেব। আমি নবাবের পক্ষে এটা যদি আপনার মনে হয়ে থাকে তাহলে তাই মনে করুন। তবে এটা জানবেন কোন নবাবের উপরই আমার ভক্তি নেই। আমি এদের পক্ষে থাকতে চাইছি স্বার্থের খাতিরে। আমার ঠাকুর্দার বাবা আজিমুদ্দিনের সময় নবাব সরকারে চাকরি করতেন। সে সময় অনেক সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন তিনি। যখন খুশি খাজনা দিতেন, যখন খুশি দিতেন না। তারপর আলিবর্দীর আমলে আর অতটা যা-খুশি করা যেত না। কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে ভয়ানক কড়াকড়ি হয়ে গেল। খাজনা জমা না দিলেই বৈকুণ্ঠবাস। সেই নিয়মই এখনও চলছে। তবু আমরা মোটামুটি ভালই আছি। বছরে বছরে খাজনা দিয়ে দিই, কখনও বাকিও রাখি, সদরে কিছু ঘুষঘাস দিলেই কেউ তাগাদা করে না। নিজের নিজের জায়গিরের হর্তাকর্তা বিধাতা আমরাই। তাছাড়া আর একটা কথা ভাবুন। শুনেছি পাঠানদের আমলে এদেশে প্রত্যেকেই ধনী ছিলেন, অনেকের ফলাও ব্যবসায় ছিল, কিন্তু মোগলদের আমলে আমাদের আর তেমন বাড়বাড়ন্ত রইল না, টাকা অনেক কমে গেল। তার কারণ গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে সব টাকা দিল্লী চলে যেতে লাগল। ইংরেজরা রাজা হয়ে যদি আরও কড়াক্কড়ি করেন তাহলেই তো আমাদের দফা নিকেশ। নবাবরা হাজার বদমায়েশ হলেও নবাব, দিলদরিয়া, কিন্তু এরা হল বেনে। এরা যদি রাজ্যপাট পায় আর এদেশের টাকা নিজেদের দেশে চালান করে, তাহলেই তো এদেশের আর কিছু থাকবে না মশাই। ছিবড়ে ক'রে ফেলবে সব।"

নীলু রায় বলিলেন—"আপনি খুব দূরদর্শী লোক সামন্ত মশায়। আপনি যা বলছেন তা-ই হয়তো হবে। কিন্তু একটা কথা বলতে পারেন, যে-কলসীতে শত শত ফুটো, সে কলসীতে জল কতক্ষণ রাখতে পারবেন ? মোগল সাম্রাজ্য টলমল করছে। বাংলা নবাবদেরও সেই অবস্থা। বর্গীর আক্রমণে ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেছে সব। আলিবর্দীর রাজকোষে টাকা ছিল না। এই বিদেশী বেনেদের কাছ থেকেই তিনি সাহায্য নিয়েছিলেন। দিনাজপুরের রাজা রামনাথ, নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও অনেক টাকা দিয়েছিলেন তাঁকে ! তাছাড়া অনেক জমিদারদের কাছ থেকে 'আবওয়াব' আদায় করেছিলেন তিনি এজন্য। তাও সামলাতে পারেন নি। তাঁর উত্তরাধিকারী সিরাজ টাকার জন্যে হন্যে কুকুরের মতো ঘুরছেন চারদিকে। যেনতেনপ্রকারেণ টাকা চাই। এর উপর আছে লাম্পট্য আর বিলাস। এ রাজ্য কি বেশীদিন টিকবে মনে করেন ? টিকবে না। তখন আর কেউ আসবে। হয় বর্গীরা আবার মাথা চাড়া দেবে, তা না হ'লে হয়তো রাজপুতরা, কিংবা হয়তো বাইরে থেকে আহমদ শা দুরানীর মতো কোন ডাকাত এসে হানা দেবে আবার। কিংবা কোন বিদেশী জাত, যারা এখন বেনে হয়ে ব্যবসা করছে এদেশে তাদের মধ্যেই কেউ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। আমি যতদূর জানি ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ আর ইংরেজের মধ্যে ইংরেজরাই সব চেয়ে ভালো। পর্তুগীজরা তো ডাকাত। যেই হোক নবাবদের নাভিশ্বাস উঠছে। এ অবস্থায় নবাবের সহযোগিতা করা মানে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা। তাছাড়া আমাদের শক্তিই বা কত ? কিই বা আমরা করতে পারি। এই ধরুন না নবাব যখন কলকাতা আক্রমণ করে বড়বাজারে আগুন ধরিয়ে দিলে তখন আমরা বনে জঙ্গলে

পালিয়েছিলাম। তারপর আবার যখন ইংরেজরা কোলকাতায় এল তখন তারাও নিজেদের পাড়াটি বাঁচিয়ে চারদিকে আগুন লাগিয়ে দিলে। আবার আমরা যে যেদিকে পারলাম পালালাম। পালানো ছাড়া আমরা কি করতে পারি বলুন। তবে মনে মনে আমি সায়েবদের দিকে—ওরা মুসলমানদের চেয়ে ভালো।"

ধূর্জটি এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এইবার বলিলেন, "দেখ মধু, আমি নবাবের আমলাদের ভয়ে সুতানুটি থেকে পালিয়ে এসেছি এই জঙ্গলে। জন সাহেব আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তার বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করবার ভার সে দিয়ে গেছে আমাকে। আমি এমন কিছুই করব না যাতে তার অনিষ্ট হয়—। কলকাতায় আমার ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে দিয়েছে নবাবরা। আমার প্রথম পরিবার ভানুমতীকে দ্বিতীয় পরিবার লক্ষ্মীমণিকে আর ছোট বোন বারাহীকে নবাবের পাষণ্ড সেনারা লুট ক'রে নিয়ে গেছে। আমার আরও চারটি বোন ছিল, তাদের ছেলেমেয়েরা ছিল, তারা কে কোথায় পালিয়ে গেছে, খোঁজ পাইনি। শুনেছি ভানুমতী আর লক্ষ্মীমণি আত্মহত্যা করেছে। শুনেছি বারাহী বেঁচে আছে এখনও, সে নাকি ওই দুরাত্মা মুসলমান ওমরাওয়ের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে পালিয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় আছে তা জানি না। এ অবস্থায় তুমি কি প্রত্যাশা কর যে আমি চাইব ওই নবাব এদেশের উপর আধিপত্য করুক? তা আমি কখনও চাইব না। আমি চাইব সে নিপাত যাক—"

নীলু রায় দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার চোখ দুইটি জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

মধু সামন্ত তখন গলা খাঁকারি দিয়া বলিলেন—"আমি সবই শুনেছি। তবু আপনাকে বলছি এখন আপনি নবাবের পক্ষেই থাকুন। কারণ চেনা শত্রুকে কায়দা করা সহজ। কি পেলে তারা খুশী হয় তা আমরা জানি। টাকা আর মেয়েমানুষ এই তারা চায়। বকাউল্লা বক্‌শি এখন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। নবাব অন্তঃপুরের অনেক দাসী বাঁদী এইখান থেকেই যায়। আপনার বন্ধু জন সাহেবও অনেক দাসী বাঁদী বিক্রি করতেন পর্তুগীজ ব্যবসাদারদের কাছে। তাদের অনেককে আমি চিনি। তাদের যারা প্রণয়ী তাদেরও। এদের সাহায্য নিয়ে আপনার ভগ্নীদের খোঁজ করা অসম্ভব নয়। হয়তো তাদের ফিরেও পেতে পারেন, হয়তো তাদের সাহায্যে আপনার আরও উন্নতি হতে পারে। সেইজন্যে বলছি আপনি নবাবের দলে থাকুন।"

ধূর্জটি ইহার উত্তরে একটু হাসিয়া বলিলেন, "মধু, তোমার আসল উদ্দেশ্যটা তুমি খুলে বলছ না। আমি কিভাবে নবাবকে সাহায্য করতে পারি তাও বলছ না। সব খুলে বল। এতে তোমার কি লাভ হবে কিছু?"

মধু সামন্ত কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন।

"লাভ হবে। দশহাজার আসরফি।"

"কি রকম? অত টাকা কে দেবে তোমাকে—"

"সিরাজের বেগম লুৎফুন্নিসা।"

"তুমি তার নাগাল পেলে কিরূপে—"

"মোমিন বিবির কৃপায়—"

"মোমিব বিবি কে?"

"আমার জমিদারিতে সে কিছুদিন আগে বাস করত। এখন সে লুৎফুন্নিসার রঙমহলের দাসী। লুৎফুন্নিসা তাকে ভালবাসে এবং বিশ্বাস করে। সে—"

তাহাকে থামাইয়া দিয়া নীলু রায় বলিলেন—"এখানকার যারা বাসিন্দা তারা প্রায় সকলেই তো আদিবাসী। হয় ওঁরাও, নয় কোল, নয় মুণ্ডা, নয় চের। কিছু বাউরিও আছে। তাদের মধ্যে মোমিন নামটা বড় শুনিনি তো—"

সামন্ত বলিলেন—"মোমিন বিবি খাঁটি আদিবাসী নয়। তার মা আদিবাসী, কিন্তু তার বাপ ছিল একজন পর্তুগীজ দস্যু। দস্যুটা ডাকাতি করতে গিয়ে মারা যায়। তার মা মেয়েটাকে পালন করছিল। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটা। অনেক টাকা দিয়ে একজন আমীর তাকে কিনে নেন। এখন সে লুৎফুন্নিসার রঙমহলে প্রধান বাঁদী। এখানকার মেয়ে বলে সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। কয়েকদিন আগে সে আমাকে বলে পাঠিয়েছে যে, বেগম সাহেবা চারটি চিঠি লিখেছেন। একটি জগৎ-শেঠকে, একটি দুর্লভরামকে, একটি উমিচাঁদকে আর একটি রাজবল্লভকে। বলেছেন চিঠিগুলি গোপনে ওঁদের কাছে পোঁছে দিতে হবে। এর জন্যে তিনি দশহাজার আসরফি বখশিস দেবেন। মোমিন বিবি জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছে আমি একাজ পারব কি না। আমি রাজি হয়েছি। চিঠি চারখানি আমার কাছে এসে পোঁছেচে—"

নীলু রায় প্রশ্ন করিলেন, "চিঠিতে কি আছে জান ?"

"চিঠি সীলমোহর করা। তাছাড়া আমি ফারসী পড়তে জানি না। তাই চিঠি খুলিনি।"

ধুর্জটিমঙ্গল বলিলেন--"আমি গরীব মানুষ। ওঁদের কারো সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। তবে জগৎশেঠের একজন পুরোহিত এখানে রুক্মিণীর পুজো দিতে আসেন। তাঁকে ধরতে পারি এবং তাঁর মারফত চিঠিটা জগৎশেঠের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি—"

"ব্যাপারটা চাউর হয়ে যাবে তাহলে। লুৎফুৎন্নিসা সেটা চান না। কথাটা নবাব সাহেবের কানে যদি যায় তাহলে অনর্থ বাধবার খুবই সম্ভাবনা।"

নীলু রায় বলিলেন—"কিন্তু চিঠিগুলিতে কি আছে তা না জেনে সেগুলি বিলি করবার ভার নেওয়া কি ঠিক হবে ? চিঠিগুলিতে কি রকম সীলমোহর আছে ?"

সামন্ত বলিলেন—"গালার। তার উপর একটা গোল আংটির ছাপ আছে। বোধহয় লুৎফুন্নিসার আংটির ছাপ।"

নীলু রায় বার দুই দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"গোল আংটি একটা আমার কাছেও আছে। গালার সীল ভেঙে আবার গোল আংটির ছাপ দিয়ে দেওয়া যায়। চিঠি এনেছেন সঙ্গে ?"

"এনেছি। আমার পিরানের পকেটে আছে—"

"পিরান কোথায় ?"

"পেটরার মধ্যে আছে—"

"পেটরাই বা কই ? আপনি তো শুধু গায়ে এলেন ভিজে কাপড় কাঁধে করে—"

"পেটরা আছে পাল্কিতে। পাল্কি কইলি নদীর ধারে নামিয়ে স্নান করে এসেছি আমি। অনুমতি করেন তো নিয়ে আসি চিঠিগুলি—"

"আপনি যাবেন কেন ? আমার একটা চাকর পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"না, চাকর আনতে পারবে না। আমি সঙ্গে একজন আর্মেনি খোজা এনেছি! সে তলোয়ার আর পিস্তল নিয়ে পাল্কি পাহারা দিচ্ছে। আমি যাব আর আসব। আপনার কুঠি থেকে বেশীদূরে পাল্কি রাখিনি। কইলি নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে সেইখানেই আছে পালকী—"

"তবে যান—"

মধু সামন্ত চলিয়া গেলেন।

নীলু রায় ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ লোকটিকে তুমি চেন?"

"চিনি। এখানকার ইজারাদার একজন। কিন্তু লোকটিকে যত সামান্য বলে মনে হয়, তত সামান্য নয়। ধলভূমের রাজা ওর বন্ধু। আমার মনে হচ্ছে ও তারই দূত হয়ে আমাদের কাছে এসেছে। আমরা যদি ওর কথায় সায় না দিই তাহলে এখানে টেকা যাবে না। এই সম্পত্তি যদিও দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে নজরানা দিয়ে জন সাহেব কিনেছিল কিন্তু ধলরাজার সঙ্গে ঝগড়া হলে এ সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাবে। ধলরাজার পাইক পেয়াদা আছে, সৈন্যসামন্তও আছে। দেশী সৈন্য আছে, পর্তুগীজ সৈন্যও আছে। সুতরাং ওকে চটিয়ে এখানে থাকা যাবে না। তুমি যেন বেফাঁস কিছু বলে ফেল না। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ওরা নবাবের স্বপক্ষে। আমাদের মনে মনে যাই থাক বাইরে অন্যরকম ভান করতে হবে—"

"ধর যদি তোমাকে ওই চিঠি নিয়ে যেতে বলে তুমি যাবে? জগৎশেঠের নাগাল পাবে তুমি?"

"দেখ নীলু, পৃথিবীতে অসম্ভব কিছু নেই। মুর্শিদাবাদে যাওয়াটাই শক্ত। ঘোড়ায় যেতে হবে। পথও নিরাপদ নয়। দূরও অনেক। দেখা যাক চিঠিতে কি আছে, তারপর বিবেচনা করা যাবে।"

একটু পরেই মধু সামন্ত চিঠি চারখানি আনিয়া হাজির করিল।

নীলু রায় সীলমোহরগুলির পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"এ সাধারণ গোল আংটির ছাপ। আমার আংটি দিয়েও এরকম সীলমোহর করা চলবে।"

মধু সামন্ত বলিলেন—"আপনারা কি ফার্সি জানেন?"

"জানি"—নীলু রায় দাড়িতে একবার হাত বুলাইয়া লইলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"নীলু ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত বেশ ভালভাবে জানে। ইংরিজিও শিখছে। ও চিঠিগুলো পড়ুক, পড়ে আমাদের বাংলায় বুঝিয়ে দিক বেগম লুৎফুন্নিসা কি চান। তারপর ব্যবস্থা করা যাবে—"

নীলু রায় চারটি চিঠিই খুলিয়া ফেলিলেন। চারটি চিঠিই পড়িলেন। তাহার পর বলিলেন—"চারটি চিঠিই এক। ঠিকানাগুলোই খালি আলাদা আলাদা। আমি একটা চিঠি অনুবাদ করে আপনাদের শোনাচ্ছি।"

খোদাতাল্লা আপনার উপর অজস্র কৃপাবর্ষণ করিয়া আপনাকে সর্বদা সুখী করুন এই প্রার্থনা করি। আমি নবাব মনসুরোলমোল্লা সিরাজউদ্দৌল্লাশাহা কুলী খাঁ-মিরজা মহম্মদ-হায়বৎজঙ্গ বাহাদুরের ধর্মপত্নী লুৎফুন্নিসা। নিতান্ত বিপদে পড়িয়া আপনার নিকট সংগোপনে এই পত্র লিখিতেছি। আমি আপনার কন্যাসমা, আশা করি কন্যার গোস্তাকি আপনার স্বাভাবিক ঔদার্যগুণে মাফ করিবেন। আমি লক্ষ্য করিতেছি হারেমে নবাবের অনেক উপপত্নী আছেন, তাঁহারা নবাবের নিকট হইতে নিত্য নতুন

উপহার লইয়া থাকেন, কিন্তু কেহই তাঁহার হিতৈষী নহেন। তাঁহার মঙ্গল চিন্তা করেন না, সকলেই তাঁহাকে সর্বনাশের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার বন্ধুরাও কেহ তাঁহাকে সুপথে চলিবার পরামর্শ দেন না। আমার সৎপরামর্শ তিনি শুনিয়াও শোনেন না। তাঁহার নামে যে সব কলঙ্ককাহিনী লোকে প্রচার করে তাহার কিছু অতিরঞ্জিত। কিন্তু কিছু যে সত্য তাহা আমি জানি। কিন্তু এসব দোষ সত্ত্বেও আমি তাঁহাকে ভালবাসি, আমি মনে করি অন্তরে তিনি খারাপ লোক নহেন, কুসঙ্গই তাঁহাকে মন্দপথে লইয়া যাইতেছে। আপনি একজন প্রবীণ লোক, আপনি তাঁহাকে সুপথে ফিরাইবার চেষ্টা করুন। ভাল কাণ্ডারী বিপন্ন নৌকাকেও তুফানের মুখে রক্ষা করিতে পারে। আপনি স্বর্গীয় নবাব আলিবর্দীর আমলের লোক, আপনার নিকট আমার মিনতি আপনি তাঁহার সহায় হউন, তাঁহার বিপক্ষতা না করিয়া তাঁহার বন্ধু হউন। শুনিতেছি তাঁহার বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্র হইতেছে, আপনার নিকট আমার কাতর প্রার্থনা আপনি যদি আন্তরিকতার সহিত আমার স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করেন এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হইয়া যাইবে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি আমি আপনার কন্যাসমা, আপনি এ বিপদে কন্যার সহায় হউন। আমি যদিও নবাবের ধর্মপত্নী তবু আমি বড় হতভাগিনী। করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি আমাকে রক্ষা করুন। আর একটি প্রার্থনা, আমি যে আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি তাহা যেন প্রকাশ না পায়। আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। ইতি লুৎফুন্নিসা—

নীলু রায় একটি পত্রপাঠ শেষ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "চারটি চিঠিই একরকম। শুধু উপরের ঠিকানাগুলি আলাদা আলাদা—"

মধু সামন্ত উৎসুক নেত্রে ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়াই রহিলেন ধূর্জটিমঙ্গল। কি বলিবেন ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় একটি ওঁরাও বৃদ্ধ এবং আরও কয়েকজন আসিয়া হাজির হইল। তাহারা বলিল—গতরাত্রে একটা বাঘ তাহাদের গোয়ালে ঢুকিয়া তাহাদের গরু লইয়া গিয়াছে। পাশের গ্রাম ফুরুলডাঙ্গাতেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। এ বাঘটিকে না মারিলে এ অঞ্চলের গরু ভেড়া ছাগল আর থাকিবে না। মানুষও মরিবে। কিছুদিন আগে একটি অর্ধভুক্ত শম্বরকেও তাহারা বনের মধ্যে দেখিয়াছে। মাঝে মাঝেই ময়ূরের দল ডাকিয়া উঠিতেছে। তাই মনে হয় বাঘটা পাশের জঙ্গলেই আছে। পূর্বে জন সাহেব তাহাদের রক্ষাকর্তা ছিলেন। তিনি যাইবার পূর্বে বলিয়া গিয়াছেন তাঁহার অবর্তমানে ধূর্জটিমঙ্গলই তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তাই তাহারা তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন।

ধূর্জটিমঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—"চল এখনই আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। তোমাদের যে গরুটা নিয়ে গেছে সেটার কোনও পাত্তা পেয়েছ? বাঘ সাধারণতঃ যেদিন মারে সেদিনই সবটা খায় না, আধখাওয়া করে রেখে যায়। পরদিন আবার সেখানে আসে—"

একজন ওঁরাও বলিল—"সেটা পাওয়া গেছে। মহুলটুলির বড় শালগাছটার নীচে পড়ে আছে সেটা—"

"ভালই হয়েছে তাহলে আমি শালগাছটার উপর চড়ে বসে থাকি। বাঘটা এলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব—"

মধু সামন্তর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"নবাব থাকুক আর যাক আমি তেমন গ্রাহ্য করি না। কিন্তু লুৎফুন্নিসার চিঠি শুনে বড় কষ্ট হয়েছে। তাঁকে আমি সাহায্য করবার চেষ্টা করব। চিঠি চারখানি নিয়ে আমি নিজেই মুর্শিদাবাদ যাব। কিন্তু পথ অনেকটা। পথে চোর ডাকাতও আছে। তাছাড়া বন আর পাহাড়ের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। সঙ্গে হাতিয়ার-বন্দ লোকলস্কর চাই। ঘোড়ায় গেলে তাড়াতাড়ি হবে। পথে ঘোড়া বদলের ব্যবস্থা থাকলে আরও তাড়াতাড়ি হবে। সঙ্গে একদল অশ্বারোহী পলটন নিয়ে কিভাবে তাড়াতাড়ি পেঁছিতে পারি সেটা ভেবে দেখ। আমি বাঘটা মেরে আসি —নীলু যাবে না কি সঙ্গে—"

নীলু বলিলেন—"তুমি তো মুগুর আর বর্শা নিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়বে। আমি তার মধ্যে গিয়ে কি করব ?"

"তুমি একটা বড় ছোরা নিয়ে চল। যদি বাঘটা আমাকে বেকায়দায় ফেলে দেয়, তখন তুমি সাহায্য করতে পারবে।"

"বেশ চল।"

মধু সামন্ত বলিলেন—"আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা সব হয়ে যাবে। আমি ধলরাজার কাছে যাচ্ছি। তিনি ঘোড়া লোকজন সব দেবেন। আজই একজন লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি ঘোড়ায়। সে রাস্তার মাঝে মাঝে ঘোড়ার বন্দোবস্ত রাখবে। কিন্তু আপনি তো চললেন বাঘের মুখে—"

"যদি না ফিরি, তাহলে তো খেল খতম। তুমি তখন অন্য লোক দেখো—নীলু যদি অক্ষত ফিরে আসে সে-ও যেতে পারে।"

"আমি তাহলে চিঠিগুলো কি করব।"

"ফিরে নিয়ে যাও, কাল এসো।"

"কিন্তু তাতে একটু বাধা আছে। খবর পেয়েছি একটা গুপ্তচর না কি ওই চিঠি-গুলো চুরি করবার মতলবে ঘোরা-ফেরা করছে। তাই চিঠিগুলো আমার কাছে রাখতে চাই না।"

"ধলরাজার সঙ্গে যখন আলাপ আছে তখন সেইখানেই রেখে দাও না।"

মধু কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, "শুনেছি ওই গুপ্তচরটা নাকি ধলরাজারই কর্মচারী। ধলরাজা জানতে পারলে অবশ্য এখনি তার মুণ্ডচ্ছেদ করবেন। কিন্তু আজকাল সবাই মুখোশ পরে থাকে, কে বিশ্বাসী কে বিশ্বাসঘাতক, তা চেনা শক্ত। চিঠিগুলি আপনার কাছেই থাক। আমি কাল আসব।"

মধু সামন্ত চিঠি চারখানি ধূর্জটিমঙ্গলকে দিয়া চলিয়া গেলেন। ধূর্জটিমঙ্গল সেগুলি জগদ্ধাত্রীর কাছে লইয়া গেলেন।

"আমি বনে বাঘ মারতে যাচ্ছি। তুমি এ চিঠি চারখানি সিন্দুকের ভিতর পুরে তালা বন্ধ করে রেখে দাও। সিন্দুকের চাবি নিজের কাছ ছাড়া কোরো না—"

"কি চিঠি ওগুলো—"

"তা বলব না। খুব দরকারি আর খুব গোপনীয় এইটুকু শুধু জেনে রাখ।"

জগদ্ধাত্রীর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। অধর দুইটি কাঁপিয়া উঠিল।

"অত গোপনীয় চিঠির ভার আমি নিতে পারব না। তুমিই যেখানে রাখবার রাখ।

কিছুই না জেনে অত বড় দায়িত্বের বোঝা বওয়া যায় না। আর আমার উপর তোমার যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে এ ভার আমাকে দিচ্ছই বা কেন?"

ধূর্জটিমঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিলেন যে জগদ্ধাত্রীর আত্মসম্মানে ঘা লাগিয়াছে। জগদ্ধাত্রী বড় অভিমানিনী। তাহার কম্পিত অধর, আনত অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি, তাহার কঠোর মুখভাব দেখিয়া ধূর্জটিমঙ্গল বুঝিলেন তাহাকে অবিলম্বে প্রসন্ন না করিয়া তিনি শিকারে যাইতে পারিবেন না।

বলিলেন, "তোমাকে সব কথা খুলে বলতে আমার আপত্তি নেই। তোমাকে কখনও অবিশ্বাস করতে পারি? বলিনি, কারণ শুনলে তুমি ভয় পাবে। ভেবেছিলাম শিকার থেকে ফিরে এসে তোমাকে সব বলব। বেশ, তবে এখনই সব শোন।"

ধূর্জটিমঙ্গল সব কথা খুলিয়া বলিলেন।

সব শুনিয়া জগদ্ধাত্রী বলিলেন, "যে নবাবের অত্যাচারে আমরা এত বিব্রত, সেই নবাবের সাহায্য তুমি করবে?"

"নবাবকে আমি সাহায্য করছি না, আমি লুৎফুন্নিসার অনুরোধ পালন করছি মাত্র। সে শুনেছি পতিপ্রাণা। তাছাড়া হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক রাজরানীই হোক বা ভিখারিণীই হোক মেয়েমানুষের নির্যাতন আমি সইতে পারি না। লুৎফুন্নিসা সিরাজের বেগম তবু তিনি নির্যাতিতা! তিনি সিরাজ দরবারের জনকতক বড় বড় ওমরাহকে চিঠি লিখেছেন যাতে তাঁরা সিরাজকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। আমি তাঁদের কাছে চিঠিগুলি পেঁছে দিয়ে আসব এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এখানকার ধলরাজা নবাবের পক্ষে। যদি আমি অস্বীকার করতাম তাহলে ধলরাজা খুব অসন্তুষ্ট হতেন। সামন্ত ধলরাজারই দূত। আর ধলরাজা যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে আমরা এখানেও থাকতে পারব না। এইসব কারণেই আমি চিঠিগুলি নিয়েছি। আমি বাঘটা মেরে ফিরে আসি, তারপর যাব—"

"এখন বাঘ শিকারে না-ই গেলে। কাল তোমাকে বেরুতে হবে—"

"কিন্তু এখানে আমি যে জন সাহেবের প্রতিনিধি। তাঁর প্রজাদের রক্ষা করা আমার কর্তব্য। তাছাড়া বাঘটাকে মেরে না ফেললে ও কোনদিন তোমাদেরই উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। জন সাহেবের গরু মোষ ভেড়া ছাগল তো কম নেই।"

জগদ্ধাত্রী একথার জবাব দিতে পারিল না।

ঝকমারি নিকটেই বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল। সেই জবাব দিল। বলিল, "সবই বুঝলাম, কিন্তু তুমি কবে বুঝবে যে আমরা পাথর নই? আমাদের ভাবনা চিন্তাগুলো তো তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে না। সেগুলো যে আমাদের মনকে গামছা-নেংড়ানো করবে—"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন, "বেশ তো তোমরাও চল না আমার সঙ্গে। কিন্তু ওই কাঁচ ছেলে দুটোকে নিয়ে এই দীর্ঘপথ যাওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? অবশ্য ছেলেদের জন্যে ভাবি না, ছেলে দুটো তো চব্বিশ ঘণ্টা লালী আর কস্তুরীর কাছে থাকে। মায়ের দিকে ফিরেও তাকায় না ওরা। আমাদের ছেড়ে অনায়াসে থাকতে পারবে। একবছরের উপর তো বয়স হল ওদের।"

জগদ্ধাত্রী বলিল, "না আমি ছেলেদের ছেড়ে কোথাও যাব না। তবে ঝকমারি যদি যেতে চায় তোমার সঙ্গে যাক না।"

ঝকমারি চুপ করিয়া রহিল।

জগদ্ধাত্রী বলিতে লাগিলেন, "তোর দাদা তো একবছর পরে এই সবে ফিরেছেন। এসেই আবার চললেন। আবার ফিরতে হয়তো একবছর লাগবে। আগে জন সাহেবের ভরসায় আমরা নির্ভয়ে থাকতাম। এখন কার কাছে আমাদের রেখে যাচ্ছ? ওই দানিয়েলের কাছে?"

"দানিয়েল বিশ্বাসী লোক। তাছাড়া সাহেবের কালা পলটন তো থাকবে। মাখনলাল খুব প্রভুভক্ত। এতেও যদি তোমরা ভয় পাও মধু সামন্তকে ভার দিয়ে যাব। ধলরাজার লোকেরা এখানে এসে থাকবে—"

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া উত্তর দিলেন—তোমার দানিয়েল বিশ্বাসী হ'তে পারে, কিন্তু ওকে দেখে ভয় করে বাপু। মনে হয় ও লোকটাও যেন ছোটখাটো একটি সিরাজ। ধলরাজার লোকেরা কেমন হবে জানি না। যাক তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর, চিরকাল তাই তো করেছ। আমাদের ভরসা অদৃষ্ট। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। লক্ষ্মী দিদি আর ভানু দিদিকে তো আত্মহত্যা করে মান বাঁচাতে হয়েছে, আমরাও না-হয় তাই করব। কি বলিস ঝকমারি—"

ঝকমারি ফণিনীর মতো ফোঁস করিয়া উঠিল।

"আমি আত্মহত্যা করতে যাব কোন দুঃখে। যদি মরতেই হয় যুদ্ধ করতে করতে মরব।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন, "তোমরা কে কিভাবে মরবে তা তর্ক করে ঠিক কর, আমি বাঘটাকে মেরে আসি ততক্ষণ।"

অকুস্থলে গিয়া ধূর্জটিমঙ্গল দেখিলেন মরা বাছুরটা শালগাছের নিকট পড়িয়া আছে। তাহার গলার খানিকটা বাঘে খাইয়া গিয়াছে। দেখিলেন শালগাছটা খুব উঁচু। অনুভব করিলেন অত উচুতে উঠিয়া বসিলে সুবিধা হইবে না। প্রথমতঃ বাঘটা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে দ্বিতীয়তঃ অত উঁচু হইতে বাঘের উপর লাফাইয়া পড়িলে তাঁহার নিজেরই হাত-পা ভাঙিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ধূর্জটিমঙ্গল এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন বেশ একটু দূরে একটা গোলপাতার ছাউনি কুঁড়ে ঘর দেখা গেল। সঙ্গে যে ওরাঁওটি আসিয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও ঘরটা কার?"

"মায়ের ঘর।"

আদিবাসীরা বনের মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখে রঙ্কিণী দেবীর জন্য। তাহাদের ধারণা রঙ্কিণী দেবী তাহাদের খবর লইবার জন্য বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান। ঘুরিয়া বেড়াইলেই শ্রান্তি হয়, শ্রান্তি অপনোদনের জন্য ওই কুটিরগুলি। খালিই পড়িয়া থাকে সেগুলি। অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা সেখানে রাত্রে আড্ডাও দেয়। ভাঙিয়া পড়িলে মাঝে মাঝে কেহ মেরামত করিয়া দেয়।

ধূর্জটিমঙ্গল নীলু রায়কে বলিলেন, "চল ওরই মধ্যে আমরা ঢুকে বসে থাকি। এখনও সূর্য অস্ত যায়নি সূর্য অস্ত গেলে বাঘ আসবে। দূর থেকে দেখতে পেলেই আমরা বেরিয়ে আসব।"

ধূর্জটিমঙ্গল সঙ্গে তাঁহার ছোট মুগুর এবং শাণিত বর্শাটি আনিয়াছিলেন। নীলুরায়ের হাতেও ছিল বেশ বড় ছোরা একটা। উভয়ে সেই খালি ঘরটিতে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

ঘরে ঢুকিয়াই নীলু রায় প্রশ্ন করিলেন—"কথাটা পেড়েছিলে ?"

"জগদ্ধাত্রীকে জিগ্যেস করেছিলাম, সে বললে ওর বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই। বিয়ে করতে চায় না, এ অবস্থায় জোর তো করতে পারি না।"

"কিন্তু মেয়েদের একটু জোরই করতে হয়। ঢের আগেই ওর বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

"চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পাত্র পাইনি। ওর পরিচয় গোপন করে তো সম্বন্ধ করতে পারি না। কিন্তু ও বেহারী আর ডাকাতের নাতনী শুনে কেউ ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। দু'একজন ফৌজি বেহারী সিপাহীকেও বলেছিলাম, তারাও রাজি হয়নি। কয়েকটা বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যেতে ও এখন বেঁকে দাঁড়িয়েছে। বলছে বিয়েই করব না। তোমার যে হঠাৎ ওকে এত ভালো লেগে যাবে তা তো বুঝতে পারিনি, তাহলে তোমার সঙ্গেই আগে ওর বিয়ে দিয়ে দিতাম। কিন্তু এখন ওর মত না হলে কিছুই করা যাবে না। তোমার বয়স কত হল ?"

"ত্রিশ—"

"এতদিন পর্যন্ত তুমি একটাও বিয়ে করনি এটা সত্যি বিশ্বাস হয় না। আমি তোমার চেয়ে ছোট কিন্তু তিনটে বিয়ে করে ফেলেছি।"—হাসিয়া বলিলেন,—"তাছাড়া দু'একটা উপরি প্রণয়িনীও আছে—"

"তা তো জানি। মুর্শিদাবাদে কিছুদিন আগে তোমার মৈনি বিবির গান শুনে এলাম। দারুণ গলা। শুনলাম ও নাকি আগে হিন্দু ছিল ?"

"কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে। ঔরংজেবের আমলে জিজিয়া কর থেকে রেহাই পাবার জন্য ওর বাবা মুসলমান হয়ে যায়। তিনি গানের খুব বড় ওস্তাদ ছিলেন। মেয়েটা যদি রূপসী হ'ত তাহলে অবশ্য মুসলমানদের হারেমে চলে যেত এতদিনে। কিন্তু ওই কুৎসিত মেয়েকে কেউ নিতে চাইল না। তখন ওর বাবা ওকে গান শেখালেন।"

"তোমার সঙ্গে আলাপ হল কি করে ?"

"অত বৃত্তান্ত নাই বা শুনলে। গান শুনে মুগ্ধ হয়েছি। শুধু আমি নই, অনেকেই মুগ্ধ। অনেক বড়লোকের রঙমহলে ওর যাতায়াত আছে। চিঠিগুলো ওর সাহায্যেই পাঠাব ভাবছি—"

"আমার কিন্তু একটা কথা জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে। ওই কুৎসিত মেয়েকে তোমার মতো শৌখিন লোক পছন্দ করল কি করে। সারা মুখে বসন্তর দাগ, কুচকুচে কালো রং, বড় বড় দাঁত, বাখারির মতো চেহারা—"

ধূর্জটিমঙ্গল হাসিয়া বলিলেন—"যারা সত্যিকার শৌখিন তারা রূপকেও ভালবাসে, গুণকেও ভালবাসে। গুণও একরকম রূপ। তাছাড়া আমি বিষয়ী লোক। আমি দেখলাম ও মেয়েটাকে যদি হাতে রাখতে পারি তাহলে আমার অনেক সুবিধা হবে। অনেক বড়লোকের বাড়িতে ওর যাতায়াত। রূপ নেই কিন্তু মেয়েটি সত্যিই ভালো। ওকে মুর্শিদাবাদে একটা বাড়ি কিনে দিয়েছি বেনামীতে। কিছুতেই নিতে চায় না, জোর করে দিয়েছি—"

"তোমার পরিবার এসব কথা জানে ?"

"রামঃ। এসব ওকে জানিয়ে লাভ কি ? মাঝ থেকে অশান্তি। ওর কোন অভাব রাখিনি তো। আমার কষ্ট হয় আমার আগেকার বউ দুটোর জন্যে। তারা আত্মহত্যা

করল ! ওদেরও বড় ভালবাসতুম। বড় বৌটা বাঁজা ছিল, মেজ বৌ মুখরা ছিল। আমাদের সুতানুটির বাড়ির পাশে কুস্তির আখড়া ছিল একটা। অনেকে এসে সেখানে গোলমাল করত। ভোর চারটে থেকে সবাইয়ের তাল ঠোকা চলত। মেজ বৌয়ের ঘুম ভেঙে যেত তাতে। তিনি একদিন বেরিয়ে এসে এমন দাবড়ি দিলেন সকলকে, যে দুড়-দাড় করে পালাল সবাই। তারপর আখড়াটা ভেঙেই গেল। সবাই বলল, না বাবা ওই রায়বাঘিনীর বাড়ির কাছে আমরা যাব না। সবাই তাকে ওই নামেই ডাকত। কিন্তু সে উগ্রচণ্ডা ছিল না। অপরূপ রূপসী ছিল সে। গম্ভীর ছিল, স্পষ্টবাদী ছিল, তার নিজস্ব জগৎ ছিল একটা, সেখানে আমাকেও ঢুকতে দিত না। আমাকে আমল দিত না বলেই আমি জগদ্ধাত্রীকে বিয়ে করি। ওই মেয়েকেও আত্মহত্যা করতে হল। শুনেছি, বঁটি দিয়ে সে একটা গুণ্ডার ধড় থেকে মুণ্ডু নাবিয়ে নিয়েছিল। শেষে নিজে কুয়ার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।"

"আর একজন ?"

"সে ঘরে খিল দিয়ে গলায় দড়ি দেয়। গুণ্ডাগুলো কপাট ভেঙে দেখল সে আড়কাটা থেকে ঝুলেছে।"

ধূর্জটিমঙ্গল নীরব হইলেন। তাহার পর বলিলেন—"এ রকম অত্যাচার কতদিন চলবে বলতে পার ?"

"যতদিন আমরা সহ্য করব ততদিন চলবে। ওদের কামের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি আমরাই তো দিচ্ছি। মোহনলাল মহারাজা হলেন, অতবড় পদ পেলেন, বোনের দৌলতে। অনেকেই এরকম করছে। আমরাই পাষণ্ড নরাধম, আমাদের এ শাস্তি হওয়া উচিত।"

"কোনও প্রতিকার নেই বলছ ?"

"আপাততঃ মনে হচ্ছে ইংরেজই এর প্রতিকার। ওরা চতুর, ওরা বীরও। এতদিন ওরা ঘুষঘাস দিয়ে নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সিরাজোদ্দৌল্লা ওদের ন্যাজে পা দিয়েছে। ওরা ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। মাদ্রাজে ক্লাইভ যা করেছে তা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এখানে এসেই যা করছে তা-ও কম না। ফোর্ট উইলিয়ম ওদের দখলে এসে গেছে—দেখা যাক এবার কি করে।"

"যে যাই করুক আমাদের পক্ষে কোনটা ভালো হবে না। মধু সামন্ত যে কথাটা বললে সেটা নিতান্ত ফেলনা নয়। এক একবার রাজা বদলেছে আর আমাদের অবস্থা খারাপ হয়েছে। পাঠানদের আমলে আমাদের যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল মোগলদের আমলে তা রইল না। ইংরেজরা যদি রাজা হয়—"

"দেখ ধূর্জটি ওসব নিয়ে ধানাইপানাই করে লাভ নেই। যা হবার তা হবেই। ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশী মাথা ঘামিও না। জীবনটা দাবা খেলা, এখনই যে চালটা দিতে হবে তাই নিয়ে মাথা ঘামাও। আমি হিমালয়ের উপর পাহাড়ীদের মধ্যে গিয়ে থাকব ঠিক করেছি। মনোমত যদি সঙ্গিনী পাই, তাহলে সেইখানে গিয়েই বাস করব। তোমার ঝকমারিকে পছন্দ হয়েছে, যদি ওকে আমার হাতে সমর্পণ কর—"

"আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে ঝকমারির মতটা হওয়া দরকার। ওর মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া যাবে না। তুমি বরং এখানে থেকে যাও, ওর হৃদয়-হরণ করবার চেষ্টা কর। তুমি এখানে থাকলে আমিও অনেকটা নিশ্চিন্ত হব।"

"কোনও নারীর হৃদয়-হরণ করবার চেষ্টা তো কখনও করি নি। সে সবের সন্ধান-শুলুকও জানি না।"

"কি করলে তাহলে এতদিন?"

"লেখাপড়া করেছি খালি। গানবাজনার চর্চাও করেছি—"

"ঝকমারি মুখ্যু। লেখাপড়ার মর্ম ও বুঝবে না। গানবাজনার দিক দিয়ে চেষ্টা করতে পার। আমার এখানে দিলরুবা আর সেতার আছে। ঝকমারির আর একটা ক্ষমতা আছে। ও মাঝে মাঝে ওর পূর্বজন্মে ফিরে যায়। তখন সব আশ্চর্য আশ্চর্য কথা বলে, মনে হয় ওকে ভুতে পেয়েছে—"

"তাহলে মেয়েটিতো রহস্যময়ী।…"

"চুপ, চুপ। বাঘটা দূরে একটা ঝোপ থেকে বেরুচ্ছে।"

সত্যই বাঘটা ঝোপ হইতে সন্তর্পণে মুখ বাহির করিয়াছিল। ধূর্জটিমঙ্গল আর বিলম্ব করিলেন না। মুগুর ও বর্ষা লইয়া বাঘের দিকে ছুটিয়া গেলেন। এত শীঘ্র তিনি বাঘের সম্মুখীন হইলেন যে বাঘটা ভাবিতেই পারিল না সে কি করিবে। ধূর্জটিমঙ্গল প্রচণ্ড বেগে মুগুরটা বাঘের মাথায় মারিলেন। বাঘটা কিন্তু সহজে কাবু হইল না। দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিয়া গেল। ধূর্জটিমঙ্গল ক্ষতবিক্ষত হইলেন। কিন্তু বাঘের কাছে হার মানিলেন না। তিনি যখন বাঘটার বুকে বল্লম বিঁধাইয়া তাহাকে দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন তখন নীলু রায়ও ছোরা হস্তে ছুটিয়া আসিয়া বাঘটাকে আঘাত করিতে গেলে ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে বারণ করিলেন।

"চামড়াটা আর নষ্ট কোরো না। মোক্ষম মার দিয়েছি ওকে। আর উঠতে পারবে না। দেখ তো আমার পিঠটার অবস্থা—"

"পিঠ তো রক্তে ভেসে যাচ্ছে—"

"ওখানে একটা থাবা বসিয়েছিল, দাঁত বসাতে পারেনি কোথাও। রক্ত এখুনি থেমে যাবে—"

ওরাঁওরাও আশেপাশের জঙ্গলে লুকাইয়াছিল। তাহারাও আসিয়া পড়িল। বাঘটা সত্যই মারা গিয়েছিল। জঙ্গল হইতে গাছের ডাল কাটিয়া শীঘ্রই জংলীরা একটা ডুলি বানাইয়া ফেলিল। সেই ডুলিতে বাঘটাকে তুলিয়া লইল তাহারা। ধূর্জটিমঙ্গলের জন্যও তাহারা পালকি আনিবে কি না জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন—না, আমি হেঁটেই যেতে পারব। আমার জন্যে কিছু মহুয়ার মদ এবং মধু যোগাড় কর। ধূর্জটি হাঁটিয়াই বাড়ি ফিরিলেন। তাঁহার পিঠটা অবশ্য একটা বড় চাদর দিয়া সকলে বাঁধিয়া দিয়াছিল। খুব বেশী রক্তপাত হয় নাই। কিন্তু কাপড়ে প্রচুর রক্ত লাগিয়াছিল। তাহা দেখিয়া জগদ্ধাত্রী আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমাকে না দেখে বাঘটাকে দেখ। আমার কিচ্ছু হয়নি। প্রকাণ্ড বাঘ, ও আমাকে কখনও ওমনি ছেড়ে দেয়?"

ঝকমারি আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল ধূর্জটিমঙ্গলকে।

"গড় করি তোমার পায়ে—"

ধূর্জটিমঙ্গলের মুখে হাসি ফুটিল।

"রাগ করবি না বল? তাহলে একটা কথা বলি—। কিছু ঘুগনি কর তো। আজ মহুয়ার মদ খাব। তার সঙ্গে মধু আর সেরখানেক গরম দুধ। তাহলেই ঠিক হয়ে

যাবে সব। বানুছিকে ডাকতে পাঠা। সে এসে তার জরিবুটির মলম তৈরি করুক। আর ওদের সবাইকে খবর দে। নাচগান হোক—”

বানুছি ওরাঁওদের মোড়ল এবং সূচিকিৎসক। সে একটু পরেই আসিয়া পড়িল। লোকটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং বেশ লম্বা। মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা। চূড়ার উপর কয়েকটি পালক। হাতে মোটা তামার বালা। গলায় একটি প্রকাণ্ড মাদুলি সোনার শিকল হইতে দুলিতেছে। মাদুলিটি বাইসনের শিঙের টুকরা একটি। তাহার দুই পাশে দুইটি সবুজ রঙের পাথরও রহিয়াছে। বানছি ধূর্জটিমঙ্গলের ক্ষতটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। তাঁহার নাড়ী দেখিল, চোখ দেখিল, জিভও দেখিল। তাহার পর বলিল—তাহাদের ভাষাতেই বলিল—“ভয় নেই। ভাল হয়ে যাবে। আমি সব সঙ্গে করে এনেছি।”

বানুছির সহিত তিনটি লোক আসিয়াছিল। একটির মাথায় একটি প্রকাণ্ড ঝুড়ি। আর দুইজনের মাথায় দুটি মাটির ছোট কলসি। ঝুড়িতে ছিল তাহার জড়িবুটি। একটি কলসীতে ছিল ময়াল সাপের পিত্ত, আর একটি কলসীতে বাঘের চর্বি।

বানুছি প্রকাণ্ড ঝুড়ির ভিতর হইতে একটা কুচকুচে কালো শিল এবং নোড়া বাহির করিল।

“এ দুটো পুড়িয়ে পবিত্র করে নে—”

বানুছির অনুচর কাঠকুটা দিয়া আগুন জ্বালিয়া শিল-নোড়াকে পুড়াইতে লাগিল। বানুছি ঝুড়ির ভিতর হইতে কিছু শুকনা ডালপালা এবং কিছু সবুজ গাছপালাও বাহির করিল। তাহার পর ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে ফিরিয়া বলিল—“এইবার এমন একটি জিনিস চাই যা তোমাদের কাছেই আছে, আমার কাছে নাই। শিল নোড়াটা বার করে ঠাণ্ডা করো। বাঘের চর্বিটা গলাও। আগুনের কাছে রাখ, আপনিই গলে যাবে।”

ধূর্জটিমঙ্গল প্রশ্ন করিলেন, “কি জিনিস চাই বল—”

বানুছি সহাস্যদৃষ্টিতে ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল—“যে মেয়েটি তোমাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে তার চোখের জল চাই কয়েক ফোঁটা। যে মলম তৈরি করব তাতে গাছগাছড়া, বাঘের চর্বি, ময়াল সাপের পিত্তি এসব তো থাকবেই, তোমার ভালবাসার লোকের চোখের জলও চাই একটু—”

ধূর্জটিমঙ্গল হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, “আমার পক্ষে তা ঠিক করা শক্ত কে আমাকে বেশী ভালবাসে।”

বানুছি বলিল—“ঝামরি পারবে। কেউ গিয়ে ঝামরিকে ডেকে আনুক।”

“আরে, ওই যে ঝামরি এসে গেছে—”

নিকটেই বাঘটাকে রাখা হইয়াছিল। ঝামরি তাহার উপর হুমড়ি খাইয়া তাহার গোঁফ ছিঁড়িতেছিল।

মোড়লই তাহাকে ডাকিল।

“ঝামরি শোন শোন। এদিক পানে আয় একবার—”

ঝামরি কয়েক গাছা গোঁফ ছিঁড়িয়াছিল।

“তুর কাছে আসছিলাম। এইগুলো দিয়ে আমাকে তাগদের ওষুধ বানিয়ে দে একটা। বুড়ো হ'তে চাই না। অনেক দিন আগে একটা বুনো কাড়ার বুকের

ধুকধুকিটা খেয়েছিলাম, জন সাহেব মেরেছিল কাড়াটাকে। শুনেছি বাঘের গোঁফ দিয়েও তাগদের ওষুধ হয়।"

মোড়ল বলিল, "দেব। এখন তুই একটা কাজ কর দিকি। এ লোকটাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে কে সেটা বার করে দে। তুই ছাড়া এ কাজ আর কেউ পারবে না—"

"কি করবি তাকে নিয়ে—"

"তার চোখের জল চাই। মলমে মেশাতে হবে।"

"ওকে যে কে বেশী ভালবাসে তা উয়াকেই শুধাও না—"

ধুর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমি জানি না।"

"ইস্ ন্যাকা সাজছিস কেনে? তুই জানিস না?"

"না। জগদ্ধাত্রী?"

"আরে না না, জগদ্ধাত্রী তোকে ভক্তি করে। আর ভালবাসে ওই ছুঁড়িটা। ঝকমকি না কি যে নাম তার—"

ঝকমারি বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। এই কথা শুনিয়া সে একছুটে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

"দাঁড়া ওকে ধরে আনছি আমি"—

ঝামরিও অন্দরের দিকে ছুটিল।

একটু পরেই ঝকমারিকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিল সে।

"এই লাও, এর চোখের জল পাবে কি করে? এ তো দজ্জাল মেয়ে, কাঁদবেক নাই—"

মোড়ল বলিল—"আমি চোখে একটু ওষুধ দেব। অনেক জল বেরিয়ে পড়বে। কোন ভয় নাই মা! বস। কোন কষ্ট হবে না। তোমার চোখের জল না পেলে এ মলমে ভালো কাজ হবে না।"

ঝকমারি ঝপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। ঝামরি কোমরে একটা হাত বঙ্কিম ভঙ্গীতে রাখিয়া হাসিমুখে চাহিয়া রহিল ঝকমারির দিকে। তাহার সে নীরব হাসিটাও অদ্ভুত।

মোড়ল কি একটা গুঁড়া ঝকমারির চোখে দিতেই প্রচুর অশ্রুপাত হইতে লাগিল। একটি ছোট বাটিতে মোড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রু সংগ্রহ করিয়া বলিল—"এতেই হবে। তুমি এবার যাও। ভিতরে গিয়ে জল দিয়ে চোখটা ধুয়ে ফেল ভাল করে।"

ঝকমারি চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া গেল। ভিতরে গিয়াই সে জগদ্ধাত্রীকে বলিল—"বৌদি, তুমিও গিয়ে চোখের জল দিয়ে এস।"

"আমি আবার কেন। তুই তো দিয়ে এলি।"

"তোমার চোখের জলেই বেশী কাজ হবে। তুমি যাও। তুমি দাদাকে কত ভালবাস তা আমি জানি না? পাগলি ঝামরি কি জানে? ও কি ওজন দাঁড়ি হাতে করে বসে আছে, কার ভালবাসা কম, কার ভালবাসা বেশী তা মাপবে? মরণ আর কি! তুমি চল। দাঁড়াও আমি চোখে একটু জল দিয়ে নিই—"

ঝকমারি চোখ ধুইয়া ফেলিল। তাহার পর জগদ্ধাত্রীকে লইয়া মোড়লের কাছে গেল।

"মোড়ল তুমি বউদির চোখের জলও নাও।"

মোড়ল হাসিয়া বলিল—"বেশ তো, বেশ তো। বস।"
ঝামরি হো হো করিয়া হাসিয়া এক ছুটে অন্তর্ধান করিল।

একটু পরেই নর্তক-নর্তকীর দল আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের প্রত্যেকের মাথায় পলাশফুল, গলায় মহুয়া ফুলের মালা। পরনে খাটো বস্ত্র। মেয়েদের বক্ষে কোনও আবরণ নাই। পুরুষদের মাথায় একগোছা করিয়া বাজরার শিষ। গলায় হাড়ের মালা। পুরুষদের মধ্যে দুইজন মাদল বাজাইতেছিল, দুইজন বাঁশি। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মুখে হাসি। সকলেই হাতে এবং বাজুতে রুপার অলংকার। সকলে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, মাদলের তালে তালে সকলেরই অংগ দুলিতে লাগিল। তাহার পর শুরু হইল গান। গানের বাংলা তর্জমা করিলে সে গানের মাধুর্য বোঝানো যাইবে না। কারণ তাহাদের ভাষার এবং উচ্চারণের বিশেষ মিষ্টত্ব সে অনুবাদে ফুটিবে না। তবু অনুবাদ দিতেছি—

ছায়া-ঢাকা পাখী-ডাকা নদীর কিনারে
দাঁড়িয়েছিল মহুয়া
রসবতী মহুয়া
কার লাগি দাঁড়িয়েছিল কে জানে
তা কে জানে
সুড়সুড়িয়ে বাতাস এসে বলল কানে কানে
তার বললে কানে কানে
ওৎ পেতে বসে আছে দেখ না ভাল করে
ও কি রে তোর মিতা
মহুয়া দেখে বসে আছে সোনার বরণ চিতা
দেহভরা কালো কালো চোখ
অনেকগুলো চোখ
চোখে পলক পড়ে না
হাজার চোখে চেয়ে আছে চিতা
চোখে পলক পড়ে না
মহুয়ার বুকের ভিতর কাঁপে বারে বারে—
ছায়া-ঢাকা পাখী-ডাকা নদীর কিনারে।
ওরে নদীর কিনারে—

মোড়ল নানান জিনিসপত্র মিশাইয়া মলমটা প্রস্তুত করিয়া ফেলিল অবশেষে। তাহার পর সেটাকে রেশমের মজবুত কাপড়ের উপর বিছাইয়া ধূর্জটিমংগলের পিঠের উপর বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল। গান ও নাচ চলিতে লাগিল। ধূর্জটিমংগল বলিলেন—"আমাকে কাল সকালে কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে কলকাতার দিকে যেতে হবে। পারব ত?"

"খুব, খুব—"

মোড়ল ভরসা দিল।

"পনেরো দিন পট্টিটা বাঁধা থাকবে। তারপর ওটা খুলে ফেলতে হবে। আমি সংগে লোক দেব। সেই সব করবে।"

হঠাৎ ঝামরি আবার আসিয়া উপস্থিত হইল।

মোড়লের দিকে বাঘের গোঁফের লোমগুলি আগাইয়া দিয়া বলিল—"নে, আমার ওষুধ বানিয়ে দে—"

"ওষুধ বানাতে একমাস দেরি হবে। আমার কাছে আর একটা বাঘের গোঁফ থেকে তৈরি বড়ি আছে। নিবি ?"

"না। এইটে থেকেই বানিয়ে দে। এ বাঘটা আমার নাগর যে—"

"নাগর ? বলিস কি !"

"হুঁগো। হাঁকাড় দিয়ে রোজ ডাকত আমায়। বলত আয় আয় কাছে আয়, তোর ঘাড় মটকে খাই। এখন আমি বাগে পেয়েছি, আমিই তার গোঁফ ছিঁড়ে নিলাম। হি হি হি হি—"

হাঁসিয়া লুটাইয়া পড়িল ঝামরি।

তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া ধুর্জটিকে প্রণাম করিয়া ফেলিল একটা।

"তুই বীর বটিস। আমার নাগরটাকে আমার কাছে এনে দিলি। আর কেউ পারতোক না। ও কি মরেছে ? মরে নাই। ওরা মরে না – আড়ালে লুকিয়ে থাকে।"

ধুর্জটিমঙ্গল হাসিয়া বলিলেন—"বাঘ ভাল্লুক যে কারো নাগর হয় তা তো জানতাম না।"

ঝামরি বলিল—"মানুষ নাগরও তো বাঘ-ভাল্লুক গো। আমার মানুষ নাগর নাই। আমার নাগররা সব বুনো জানোয়ার। হাতী, কাড়া, চিতা, শম্বর এরাই আমার নাগর। রঙ্কিণী বলেছে তোর নাগরদের কেউ যদি মারে আমি তাকে দণ্ড দেব। তোকে দণ্ড দেবে রঙ্কিণী মনে রাখিস সেটা—"

এই বলিয়া সে ধুর্জটিমঙ্গলের দিকে আঙুল নাড়িয়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসিতে লাগিল।

মোড়ল ধমকাইয়া উঠিল।

"এখন নাখড়া করিস না ঝামরি। বাবুকে একটু ঘুমাতে দে। কাল ভোরে আবার যেতে হবে—"

"বেশ বেশ আমি যেছি—"

অভিমানের ভান করিয়া কিন্তু মুচকি হাসিতে হাসিতে গা দোলাইয়া ঝামরি চলিয়া গেল।

ধুর্জটিমঙ্গল উঠিয়া ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন এমন সময় পালকির শব্দ পাওয়া গেল। শব্দ করিতে করিতে একদল পালকিবাহক একটি সুসজ্জিত পালকি লইয়া প্রবেশ করিল।

পালকি হইতে অবতরণ করিলেন—একটি দীর্ঘাকার প্রৌঢ় ব্যক্তি। তাঁহার মাথায় পাখীর পালকের মুকুট, হাতে ধনুক, কাঁধে তূণীর, তূণীরে অনেক শাণিত তীর। অঙ্গেও তাঁহার বহুমূল্য ভূষণ। গলার হারে একটা বহুমূল্য হীরকই বোধহয় জ্বলিতেছিল। নগ্নগাত্রে ভেলভেটের একটা জামা অনেকটা ফতুয়ার মতো। গলায় একটা রেশমের চাদর দুইই জরির কাজ-করা। মুখ-ভাব বুদ্ধিদীপ্ত, বীরত্ব-ব্যঞ্জক।

পালকির সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়াছিলেন মধু সামন্ত। তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বলিলেন—"ধলরাজা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

নমস্কারাদি বিনিময়ের পর ধূর্জটিমঙ্গল ধলরাজাকে স-সম্ভ্রমে বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। বৈঠকখানা জন সাহেবের রুচি অনুসারে সজ্জিত। ধলরাজা ধনুকটি তাঁহার একজন পার্শ্বচরের হাতে দিয়া একটি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। চেয়ারে ঠেস দিলেন না, খাড়া হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি যে ভাষায় কথা বলিলেন তাহা ওঁরাও ভাষা।

মধু সামন্ত দো-ভাষীর কাজ করিলেন। বাংলায় অনুবাদ করিয়া তাঁহার বক্তব্যটি ধূর্জটিকে শুনাইলেন।

মধু সামন্ত বলিলেন, "আপনি মুর্শিদাবাদে যাচ্ছেন এই খবর পেয়েই ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি একটি খবর গুপ্তচরের মারফত পেয়েছেন, জন সাহেব না কি নবাবদের হাতে বন্দী হয়ে মুর্শিদাবাদ গারদখানায় আছেন। তাঁর সঙ্গে যে তিনটি ওঁরাও যুবতী গিয়েছিল তাদের কিন্তু কোনও খবর পাওয়া যায়নি। আমার বিশ্বাস কারারক্ষীকে কিছু ঘুষ দিলে জন সাহেব জেল থেকে পালাতে পারবেন।

ধলরাজা বলছেন জন সাহেব যদিও বিদেশী লোক তবু তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি আমাকে অনেক দামী দামী মদ উপহার পাঠাতেন। আমাদের উৎসবে গিয়ে নৃত্য করতেন অনেক সময়। ভারী আমুদে লোক ছিলেন। ভালো হরিণের মাংস পেলেই উপহার পাঠাতেন আমাকে। নবাবের কাছে একবার খাজনা পাঠাবার সময় আমার পাঁচশ আসরফি কম পড়েছিল। জন সাহেব সেটা দিয়ে দিয়েছিলেন, আর ফেরত নেন নি। বলেছিলেন বন্ধুর বিপদের সময় সামান্য টাকা দিয়েছি তা আবার ফেরত নেব কেন। আমি যদি কখনও বিপদে পড়ি তখন না হয় দেবেন। জন সাহেব আজ বিপদে পড়েছেন, আমি হাজার আসরফি তাঁর জন্যে এনেছি। সেটা আপনি নিয়ে যান। আমার বিশ্বাস কারারক্ষী একশ আসরফি পেলেই তাঁকে ছেড়ে দেবে। আর ওই যুবতী তিনটিরও খোঁজখবর করবেন একটু। আমি দু'জন ঘোড়সোয়ার পাঠিয়েছি, তারা আপনার জন্যে পথে তাজা ঘোড়ার বন্দোবস্ত রাখবে। বিশ ক্রোশ অন্তর অন্তরই আপনি নূতন ঘোড়া পাবেন একটা। তাছাড়া আপনার সঙ্গে থাকবে দশটি ডুলি। আর কিছু সৈন্যসামন্ত। কিছু ঘোড়সোয়ারও আপনার সঙ্গে থাকবে। আর আগে পিছে দুটি দল তীরধনুক নিয়ে পায়ে হেঁটে যাবে। ইনি আপনাকে আর একটা কথা জিগ্যেস করছেন। জন সাহেবকে যদি আমরা উদ্ধার করতে না পারি তাহলে তাঁর বিশাল সম্পত্তির কি হবে? তিনি কি যাওয়ার আগে আপনাকে কিছু বলে গিয়েছিলেন।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"তিনি বলে গিয়েছিলেন আমি যদি না ফিরি তাহলে আপনিই আমার এ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন। আরও বলে গিয়েছিলেন আমি যতদিন না ফিরি এ সম্পত্তি আপনিই ভোগ দখল করবেন।"

মধু সামন্ত বলিলেন—"ধলভূমের রাজা শুনেছেন এ সম্পত্তির অধিকার তিনি দিল্লীর বাদশাহর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। বাংলার নবাব সরকারে নিশ্চয় কর দিতে হয়। সেটা কি আপনি দেবেন?"

"আমিই দেব। আপনার আসল উদ্দেশ্যটা খুলে বলুন।"

ধলভূমের রাজা হাসিমুখে ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর যাহা বলিলেন তাহার অনুবাদও করিলেন মধু সামন্ত।

"ধলরাজা বলছেন এ আমাদের দেশ। সিংবোঙা এদেশের মালিক, আমরা তাঁর প্রজা। যদিও আমরা বাইরের লোকদের অনাদর করি না কিন্তু তবু আমরা এটা চাই না যে কোনও বিদেশী এখানে পাকাপাকি বসবাস করুক। পাকাপাকি বসবাস করলে মেয়েদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। ফলে কিছুদিন পরে এমন সব ছেলেমেয়ে জন্মাতে থাকে যাঁরা হো নয়, ওঁরাও নয়। একটা খিচুড়ি জাত তৈরী করার পক্ষপাতী আমি নই। তাই আমার ইচ্ছা যে জন সাহেব এখানে যদি না ফিরে আসেন তাহলে তাঁর বিষয় সম্পত্তি আমিই দখল করব। আপনাকে যদি তিনি উত্তরাধিকারী করে গিয়ে থাকেন আমি আপনাকে ন্যায্য মূল্য দিয়ে তাঁর এ বিষয়টা কিনে নেব। আপনি এ কথাটা ভেবে দেখবেন। অবশ্য জন সাহেব যদি ফিরে আসেন তাহলে তাঁর সঙ্গেই এ বিষয়ে আলোচনা করব। আপনিও আমাকে বন্ধু বলে জানবেন, আর যা বললাম তা বন্ধুর মন দিয়ে বিচার করে দেখবেন। আর একটা কথা। ইংরেজরা এদেশে প্রভুত্ব করুক সেটা আমি চাই না। নবাবদের নানারকম অত্যাচার আছে তা মানছি কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব নবাবরা নামেই নবাব। আমাদের দেশের প্রকৃত মালিক আমরাই আছি। ইংরেজ প্রভু হ'লে হয়তো তা থাকবে না। নবাবরা নবাব! তারা নবাবি ছাড়া আর কিছু চায় না। এরা নবাব নয় ব্যবসাদার, এরা ওপর ওপর আমাদের উপর হয়তো কিছুটা সুবিচার করবার ভান করবে, কিন্তু এরা নবাব নয় এরা ব্যবসাদার এরা আমাদের শোষণ করবে। আপনি গিয়ে চেষ্টা করুন যাতে নবাব পক্ষের জয় হয়। চিঠি চারখানি দিয়ে আসুন; যদি যুদ্ধ বাধে আমরা সৈন্য দিয়ে নবাবকে সাহায্য করব। সেটা কিভাবে করা সম্ভব তা-ও জেনে আসুন। মীরজাফর শুনেছি নবাব সাহেবের সেনাপতি। পারেন তো তার সঙ্গেও দেখা করবেন। আর জন সাহেব আমাদের বন্ধু লোক তাঁর সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই, তাঁকে আমরা রক্ষা করবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করব। আর একটা কথা। শুনলাম আপনি কাল সকালে যাবেন ঠিক করেছেন। কিন্তু আমার পরামর্শ এখনই বেরিয়ে পড়ুন। বাঘে আপনার পিঠে থাবা মেরেছে, মোড়ল বলছে একটু মাংস ছিঁড়ে গেছে, ভয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু ওই নিয়ে আপনি যদি এখন শুয়ে পড়েন, কাল সকালে উঠতে পারবেন না। ভয়ানক ব্যথা হবে। ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারবেন না। এখন যদি বেরিয়ে পড়েন রাস্তায় চলতে চলতে ব্যথা কমে যাবে। ঘুম ব্যথা বাড়িয়ে দেয়। আপনার সঙ্গে সঙ্গে পালকিও থাকবে। ঘোড়ায় চড়তে যদি অসুবিধা হয় পালকিতে চড়ে যাবেন। কিন্তু জেগে থাকবেন। মোড়ল বলছে আপনি ঘোড়াতে চড়েই যেতে পারবেন।"

"বেশ তাই যাব। খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ব।"

"খুব বেশী খাবেন না—"

"না। ভাত রুটি খাব না। একটু দুধ, মধু, আর মহুয়া খাব।"

"সেই ভালো হবে। আপনার সঙ্গে খাবার থাকবে প্রচুর। তাছাড়া শিকারী যাচ্ছে কয়েকজন, তারা পথে শিকারও করবে—ভয়ের কোনও কারণ নেই। বন্দোবস্ত সব ঠিক থাকবে। খেয়েদেয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ুন। আমি তাহলে এখন উঠি—"

ধলরাজা উঠিয়া পড়িলেন। এমন সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। ভিতর

হইতে ঝকমারি বাহির হইয়া আসিয়া ধূর্জটির দিকে চাহিয়া বলিল—"আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তারও ব্যবস্থা কর।"

"তুমি আমার সঙ্গে যাবে! সে কি"—ধূর্জটিমঙ্গল সত্যই বিস্মিত হইয়া গেলেন।

"আমি তোমাকে একা যেতে দেব না। আমি তো ঘোড়ায় চড়তে জানি। তোমার পিছু পিছু ঘোড়ায় চড়েই যাব। আমার জন্যে একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে বল ধলরাজাকে—"

ধলরাজা নিজের নামটা শুনিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মধু সামন্তের দিকে চাহিয়াছিলেন।

মধু সামন্ত তাঁহাকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতেই ধলরাজা বলিলেন—"স্ত্রীলোক নিয়ে পথ চলায় বিপদ আছে। কিন্তু উনি যদি না-ছোড় হন নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। উনি ঘোড়ায় চড়তে পারবেন তো? না, পালকির ব্যবস্থা করতে হবে?"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন, "পারবে। ওর বাইরেটাই স্ত্রীলোকের মতো। ভিতরে ও পুরুষ!"

"উনি আপনার কে হন?"

ধলরাজার এই প্রশ্নের উত্তরে ধূর্জটি বলিলেন, "রক্তের সম্পর্ক নেই। কিন্তু ও আমাদের বাড়ীতে মানুষ হয়েছে। বারাসতের বাড়ীতে ছিল, এবার আমার সঙ্গে এসেছে—"

"আমি তাহলে তৈরী হয়ে নি?"

ঝকমারি ভিতরে চলিয়া গেল।

নীলু রায় এতক্ষণ কিছু বলেন নাই। কিছু না বলিয়াই তিনি বাহিরের প্রাঙ্গণে গিয়া পদচারণা শুরু করিলেন।

ধলরাজা এবং মধু সামন্তও ধূর্জটিমঙ্গলকে পুনরায় আশ্বাস দিয়া প্রস্থান করিলেন। অন্দরের দিকে গেলেন ধূর্জটিমঙ্গল। গিয়া জগদ্ধাত্রীর খোঁজ করিলেন। ঝকমারিকেও দেখা গেল না। জগদ্ধাত্রীর খাস পরিচারিকা রুলা বলিল—"মা ঠাকুরঘরে।"

ধূর্জটি ঠাকুরঘরে গিয়া দেখিলেন জগদ্ধাত্রী উপুড় হইয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেছেন। ঠিক তাহার পিছনে প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া আছে ঝকমারি। ধূর্জটিমঙ্গলও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সরিয়া গেলেন।

॥ চার ॥

নীলু রায় অন্ধকার প্রাঙ্গণে পদচারণ করিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন এবার কি করা কর্তব্য। তিনি দাবা খেলোয়াড়, সঙ্গীতবিশারদও। দাবার যে চালটা ভাবিয়া তিনি ধূর্জটিমঙ্গলের সহিত কলিকাতা হইতে এতদূর আসিয়াছিলেন, অনুভব করিলেন সে চালটায় বাজি মাত করা সম্ভব নয়। সেতারের যে সুরটা বাজাইবেন ভাবিয়াছিলেন সে সুরটা বাজানো গেল না, গোড়াতেই সেতারের তারটা ছিঁড়িয়া গেল। নীলু রায়কে ধূর্জটিমঙ্গলের বন্ধু বলিয়াছি। কিন্তু সে বন্ধুত্ব লৌকিক বন্ধুত্ব, মৌখিকও বলিতে পারেন। কয়টা লোকের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুত্ব হয় আমাদের

জীবনে ? নীলু রায়ও ধূর্জটিমঙ্গলের প্রকৃত বন্ধু নহেন। সুতানুটিতে উভয়ের একপাড়ায় বাড়ি, ছেলেবেলায় এক পাঠশালায় সীতারাম পণ্ডিতের হাতে উভয়েই শাস্তিভোগ করিয়াছিলেন, বন্ধুত্বের সূত্র এইটুকু। শত্রুতার সূত্রও আছে। প্রথম এবং প্রধান সূত্র অবস্থা-বৈষম্য। ধূর্জটি বড়লোক, তাঁহার অনেক বিষয়সম্পত্তি, অনেক লোক তাঁহার কথায় উঠে বসে, অনেক লোক তাঁহাকে খাতির করে। নীলু রায় সে তুলনায় নিষ্প্রভ। তিনি সাধারণ গৃহস্থ। খাওয়া-পরার অভাব নাই, কিন্তু তিনি ধনী নহেন, মধ্যবিত্ত। ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়ীতে যেমন বারো মাসে তের পার্বণ, সেখানে সর্বদাই যেমন দীয়তাং ভুজ্যতাং, নীলু রায়ের বাড়ীতে তেমন নাই। ধূর্জটিমঙ্গলের মতো লোকলস্কর দারোয়ান চোপদার, ঘোড়া, পালকি, তাঞ্জাম ডুলি, নীলু রায়ের নাই। নীলু রায় পদব্রজেই ভ্রমণ করেন। দূরে যাইতে হইলে তাঁহাকে গাড়ি কিম্বা ঘোড়া ভাড়া করিতে হয়। ধূর্জটিমঙ্গলের মতো উজ্জ্বল বংশপরিচয়ও তাঁহার নাই। ধূর্জটিমঙ্গলের পিতা বিখ্যাত মহেশমঙ্গল, কিন্তু নীলু রায়ের পিতা কুখ্যাত ব্যক্তি। তিনি আগ্রায় থাকেন, আচারআচরণ মুসলমানী। যৌবনকালেই ভাগ্য অন্বেষণ মানসে তিনি আগ্রা চলিয়া যান। সেখানেই একটি ফলের দোকান করেন, এবং তাঁহার কিশোরী স্ত্রী ফুলমণিকে সেখানেই লইয়া যান। কলিকাতার বাড়িতে তাঁহার বাল্যবিধবা ভগ্নী দুর্গা এবং তাঁহার দেবর বালক দ্বিজদাস বসবাস করিতেন। জমিজমা হইতে যে আয় হইত তাহাতে সংসার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবার কথা। কিন্তু নীলু রায়ের পিতা জনক রায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বেশী উপার্জন-আকাঙ্ক্ষায় উত্তর প্রদেশে চলিয়া গেলেন। আগ্রায় ফলের দোকান করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং ফুলমণিকেও লইয়া গেলেন। তাহার পর সহসা একদিন তিনি আবার আবির্ভূত হইলেন। সঙ্গে ছয় মাসের একটি শিশু। পোশাক-পরিচ্ছদ মুসলমানী। গোঁফ কামাইয়া নুর রাখিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গে যে মুসলমান ভৃত্যটি আসিয়াছে সে তাঁহাকে জনুনু মিঞা বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। জনুনু মিঞা বলিলেন—এই শিশুটি প্রসব করিবার সময় ফুলমণি মরমর হইয়াছিল। আগ্রার হেকিমদের চিকিৎসা নৈপুণ্যে কোনক্রমে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু শরীর তাহার ভাঙিয়া পড়িয়াছিল. আয়ুও শেষ হইয়াছিল, কিছুদিন আগে সে মারা গিয়াছে। তাই দুর্গার কাছেই সে শিশু-পুত্রটিকে রাখিয়া যাইতে চায়। দ্বিজদাসকে কিছু টাকা দিয়া বলিলেন—ভালো দেখে গাই একটা কিনে নিও। আমি তো বিষয়-আশয় থেকে এক পয়সাও নিইনি, নেবও না। তবে ছেলেটার যেন অযত্ন না হয়। এর বেশী আমি আর কিছু চাই না। বাঙালীর ছেলে বাংলা দেশেই মানুষ হোক। ওদেশে মানুষ হলে ও আর বাঙালী থাকবে না। আমার দশা দেখছ না ! আমি কি আর বাঙালী আছি ?"

দ্বিজদাস জনুনু মিঞার মুসলমান ভৃত্যটির নিকট যে সংবাদটি পাইয়াছিলেন তাহা অনেকদিন কাহাকেও বলেন নাই। না বলাই সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন এই কারণে যে ইহা প্রকাশ করিয়া কোনও লাভ নাই বরং ক্ষতিরই সম্ভাবনা। জনুনু মিঞা গানবাজনা চর্চায় উৎসাহী ছিলেন। সারেঙ্গী নামক যন্ত্রটি তিনি নাকি খুবই ভালো বাজাইতে পারিতেন। আগ্রার ফলের দোকানটি যে কিভাবে উঠিয়া গেল তাহার খবর দ্বিজদাস জানিতে পারেন নাই। এইটুকু শুধু জানিয়াছিলেন যে, জনুনু মিঞা এখন ফলের ব্যবসা করেন না, বাইজী লইয়া গানবাজনার ব্যবসা করেন, আমীর

ওমরাহদের বাড়িতে 'মুজরা' করিয়া বেড়ান, তাঁহার অধীনে নাকি কয়েকটি খপসুরৎ বাইজী আছে। এ খবরটা তিনি কাহাকেও বলেন নাই। দ্বিজদাসবাবু যথাসময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন। বধূ যাদুমণিকে দুর্গার কাছেই আনিয়াছিলেন তিনি। নিজের বাড়ীতে না লইয়া গিয়া দুর্গার কাছেই আনিয়াছিলেন কারণ তাঁহার নিজের বাড়ি বেহাত হইয়া গিয়াছিল। নবাব সরকারের একজন গোমস্তা রমজান আলীকে তিনি বাড়িটি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনেকদিন নাকি খাজনা দেওয়া হয় নাই, দ্বিজদাসের বাড়ি এবং কয়েক বিঘা জমি নাকি নীলামে উঠিয়াছিল, নবাব সরকারের উক্ত গোমস্তাটি বলিলেন, 'তোমার বাড়িতে যদি আমাকে থাকিতে দাও এবং তোমার জমি যদি আমাকে ভোগ করিতে দাও তাহা হইলে তোমার বাড়ি জমি নীলাম হইবে না। নবাব সরকারের আমলার সম্পত্তি নীলাম হয় না। এখানকার ফৌজদারও আমার ফুফা। আমি তোমাকে মাসে মাসে কিছু ভাড়া দিব এবং তাহা দিয়াই তোমার বাকি খাজনার উশুল করিব। সুতরাং সম্পত্তি তোমারই থাকিয়া যাইবে শেষ পর্যন্ত। দ্বিজদাসকে কিন্তু আমরণ তাঁহার বৌদিদি দুর্গার কাছেই থাকিতে হইয়াছিল। বাড়ি বা সম্পত্তি তিনি ফেরত পান নাই। পরিবর্তে অবশ্য পাইয়াছিলেন রমজান আলীর বন্ধুত্ব। নবাবী আমলে সেটাও কম নয় সুতরাং দ্বিজদাস যখন বিবাহ করিলেন তখন বধূ যাদুমণিকেও দুর্গার সংসারেই আনিতে হইল। কিছুদিন বেশ ভালোভাবেই কাটিল। কিন্তু যাদুমণির একটি পুত্রসন্তান হওয়ার পর দ্বিজদাসকে উপলব্ধি করিতে হইল যে জননীরা ব্যাঘ্রিণীর মতো। দুই ব্যাঘ্রিণী একসঙ্গে থাকিতে পারে না। নীলুকে দুর্গা পুত্রবৎ মানুষ করিতেছিলেন, যাদুমণিও দেখিলেন তাহার পুত্রটির যতটা যত্ন হওয়া উচিত এ সংসারে ততটা হইতেছে না। আপাতদৃষ্টিতে যাহা অতি তুচ্ছ ইহাদের দৃষ্টিতে তাহা উচ্চ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কলহ এমন পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত উঠিল যে যাদুমণি একদিন বাপের বাড়ি চলিয়া গেলেন। হরিপালে বাপের বাড়ি। একটি গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া চলিয়া গেলেন তিনি, স্বামী দ্বিজদাসকে বলিয়া গেলেন, আর ফিরিবেন না। যাদুমণি বাপের একমাত্র সন্তান, সুতরাং পিতৃগৃহে তাঁহাকে অমর্যাদা করিবার মতো লোক ছিল না। যাদুমণির মাতা বাতরোগে কাতর হইয়া থাকিতেন, কন্যা আসাতে সংসারের যাবতীয় ভার তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি ঠাকুরঘর আশ্রয় করিলেন। যাদুমণির পিতা রত্নেশ্বর খুব বড়লোক না হইলেও সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। ঘরে গাই ছিল, পুকুর ছিল. গৃহসংলগ্ন ছোটোখাটো বাগানও ছিল একটা। ভাগে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াও জমি হইতে যে পরিমাণ ধান পাইতেন তাহাতে তাঁহাদের সম্বৎসর নিজেদের খাওয়াপরা তো চলিতই —অন্যান্য খরচও চলিয়া যাইত। যাদুমণি এই সংসারে সর্বেসর্বা হইয়া রহিলেন। ঘরজামাই হইয়া শ্বশুরবাড়িতে থাকিতে দ্বিজদাসের আত্মসম্মানে কিন্তু বাধিল। তিনি মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়িতে আসিতেন দুই একদিনের জন্য, দুর্গার কাছেই অধিকাংশ সময় কাটাইতেন তিনি। দুর্গার বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধানও করিতেন। এইভাবেই চলিতেছিল। কিন্তু বেশীদিন চলিল না। বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল। দুর্গা ম্যালেরিয়াতে ভুগিতেছিল বহুদিন হইতে। কবিরাজের পাচন, তারকেশ্বরের মানত, গ্রহশান্তির মাদুলি কোন কিছুই তাহাকে নিরাময় করিতে পারে নাই। ইহার উপর যখন সে আমাশয় রোগে পড়িল, তখন আর সামলাইতে পারিল না। ত্রিশ বৎসর

বয়সেই তাহাকে জরাজীর্ণা বৃদ্ধার মতো দেখাইত। তাহার পর হজমের গোলমাল হইয়া যখন অতিসার রোগে ধরিল তখন শয্যা লইতে হইল তাহাকে। কিছুদিন পরে মারা গেল সে। মৃত্যুকালে সে দ্বিজদাসকে বলিয়া গেল—"আমার পাপের জন্যেই এই শাস্তি। তোমার বৌয়ের সঙ্গে আমি মানিয়ে চলতে পারি নি। সেটা আমার দোষ। আমি চললুম। তাকে আবার এই সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে এস। তা না হলে চারবছরের ছেলে নীলুকে দেখবে কে। তোমার ছেলে আর নীলু দু'জনেই যাদুমণির কাছে মানুষ হোক।" যাদুমণি প্রথমে আসিতে রাজি হন নাই। বুড়ো বাবা-মাকে কে দেখিবে। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায়ের স্বরূপ আবার প্রকটিত হইল। যাদুমণির বাবা সন্ন্যাসরোগে হঠাৎ মারা গেলেন। দ্বিজদাস তখন প্রস্তাব করিলেন যে যাদুমণি তাহার মাকে লইয়াই সুতানুটিতে চলুক। হরিপালের বিষয়ের তত্ত্বাবধান সে সুতানুটিতে বসিয়াই করিবে। তাহাই হইল। দুই বৎসরের শিশুপুত্র এবং বৃদ্ধা মাতাকে লইয়া যাদুমণি আবার স্বামীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীলুর বয়স তখন চার বৎসর।···

নীলু রায় অঙ্গনে পরিক্রমণ করিতে করিতে নিজের অতীত জীবন পর্যালোচনা করিতেছিলেন। সবটা স্পষ্ট মনে ছিল না। কিছুটা লোকমুখে শুনিয়াছিলেন। দুর্গাকে তাঁহার মনে পড়ে না। যাদুমণিকে পড়ে। ছয় বৎসর যাদুমণির স্নেহের অত্যাচার তিনি সহ্য করিয়াছিলেন। যাদুমণির ক্ষুধিত স্নেহ যেন নাগপাশের মতো তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। হরিপাল হইতে আসিবার বছর দুই পরেই তাঁহার পুত্রসন্তানটি সর্দিজ্বরে মারা যায়। শেষে তাহার নাকি দমবন্ধ হইয়া গিয়াছিল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে পারে নাই। দ্বিজদাস কিছুকাল পূর্বে পশ্চিমদেশীয় এক সাধুর নিকট মন্ত্র লইয়াছিলেন। পুত্রের মৃত্যুর পর হঠাৎ তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। ছয় মাস তাঁহার কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না। পাড়ার নিমু গোঁসাই পিতৃপিণ্ড দিবার জন্য গয়াধামে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত দ্বিজদাসের দেখা হইয়াছিল। বলিলেন দ্বিজু সন্ন্যাস লইয়াছে, সে আর সংসারে ফিরিবে না। তাহার গুরুর আশ্রম লছমন-ঝোলার কাছে। সেইখানেই সে বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিবে। দ্বিজদাস সত্যই আর ফেরেন নাই। তখন সংসারের হাল ধরিলেন যাদুমণি। তাহার মা শয্যাগত হইয়া বহুকাল বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহার সমস্ত সেবা যাদুমণি করিতেন। নীলুকে স্বহস্তে তিনি স্নান করাইতেন। নিজে তাহাকে খাওয়াইয়া দিতেন। কোনও ওজর-আপত্তি শুনিতেন না। নীলু খাওয়ার সময় দুর্গার কাছে নানা বায়না করিত। এটা ঝাল, এটা তেতো, পলতা খাব না, ওল খাব না ইত্যাদি নানারকম ওজর তুলিয়া খাইতে চাহিত না। দুধ খাওয়ানো একটা সমস্যাই ছিল। কিন্তু যাদুমণির আমলে ছবি বদলাইয়া গেল। তিনি তাহাকে ঘাড় ধরিয়া স্বহস্তে খাওয়াইতেন। ভাত ডাল তরকারির গোলা পাকাইয়া মুখে গুঁজিয়া দিতেন। নীলু বেশী আপত্তি করিলে ঠাস ঠাস করিয়া চড়াইয়া দিতেন তাহাকে। মুখে স্বহস্তে দুধের বাটি ধরিতেন, এবং দুধ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত ধরিয়া থাকিতেন। সামনের মাঠে নীলু যখন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলিত তখনও তিনি সেদিকে জানালা খুলিয়া তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তাহার পালঙ্কটা খুব উঁচু ছিল, যাদুমণি তাহার চারিদিকে উঁচু কাঠের বেড়া বানাইয়া লইয়াছিলেন পাছে নীলু রাত্রে ঘুমের

ঘোরে বিছানা হইতে পড়িয়া যায়। সেই বিছানাতেই তিনি নীলুর পাশে শুইতেন। রাত্রে মাঝে মাঝে নীলুর ঘুম ভাঙিয়া যাইত। নীলু দেখিত যাদুমণি ঘুমের ঘোরে তাহাকে সবলে জাপটাইয়া ধরিয়াছে। কিছুতেই যেন ছাড়িবে না।

বিষয়-সম্পত্তির ভারও লইয়াছিলেন যাদুমণি। তাঁহার দূর-সম্পর্কের এক জ্ঞাতিভাই সর্বেশ্বরকে মাসিক দশ টাকা বেতনে বহাল করিয়াছিলেন। সেকালের পক্ষে মাসিক দশ টাকা বেশ ভালো বেতন। সর্বেশ্বরকে হরিপালের বিষয় এবং সুতানুটির বিষয় সম্বন্ধে যাবতীয় কাজ করিতে হইত। প্রজাদের জমি বিলি করা, ধান আদায় করিয়া আনা, সে ধান বিক্রয় করা, জমিদারকে খাজনা দেওয়া, গোমস্তাদের সহিত ভাব-সাব রাখা—এ সবই করিতে হইত তাহাকে। হরিপালের বসত বাটিতে কৃষ্ণ বাচস্পতিকে বাস করিতে দিয়াছিলেন তিনি। কৃষ্ণ বাচস্পতি পণ্ডিত লোক, কিন্তু অতি দরিদ্র, জীর্ণ পর্ণকুটিরে বাস করিতেন। তিনি নিঃসন্তান, বৃদ্ধা পত্নীটিই তাঁহার একমাত্র আত্মীয়। বাল্যকাল হইতেই বাচস্পতি মহাশয়কে ভক্তি করিতেন যাদুমণি। ছেলেবেলায় তাঁহারই পাঠশালায় যাদুমণি কিছুদিন পড়িয়াছিলেনও। বাচস্পতি মহাশয়কে তিনি হরিপালের বাড়ির ভদ্রাসনে বসাইয়া বলিলেন, "পণ্ডিত-মশায়, আপনি এখানেই থাকুন। সর্বেশ্বর আপনার দেখাশোনা করবে। আমার জমি থেকেই আপনাদের ভরণপোষণ হবে। আপনি আপত্তি করবেন না। আশীর্বাদ করুন আমার নীলু যেন বেঁচে থাকে। আমার তো সব গেছে, আপনাদের আশীর্বাদে নীলু যদি ভালো থাকে, ও যদি মানুষের মতো মানুষ হয় তাহলেই যথেষ্ট। আর আমি কিছু চাই না। নীলু প্রণাম কর বাবা পণ্ডিতমশাইকে—"

হরিপালে যখনই যাইতেন যাদুমণি নীলুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন।

পিছনের দিকে হস্তনিবদ্ধ করিয়া পদচারণ করিতে করিতে নীলু রায়ের সহসা মনে হইল বিধাতা তাঁহার প্রতি সুবিচার করেন নাই। যখনই তাহার জীবনে সৌভাগ্যের অংকুর গজাইয়াছে অমনি সেটাকে তিনি যেন দুপায়ে মাড়াইয়া পিষিয়া দিয়া গিযাছেন। তাহার বয়স যখন বারো বছর তখন যাদুমণিও মারা গেলেন হঠাৎ। ওলাউঠার মহামারী বন্যায় নীলু রায়ের স্নেহের একমাত্র আশ্রয়নীড়টি ভাসিয়া গেল। নীলুর তখন ধূর্জটিমঙ্গলের সহিত ভাব হইয়াছে। একই পাঠশালায় পড়েন, একই মাঠে খেলাধুলা করেন। ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতেও যাতায়াত ছিল। ধূর্জটিমঙ্গলের মা তাহাকে স্নেহ করিতেন। ঝকমারিকে তিনি শৈশব হইতেই দেখিয়াছেন। ধূর্জটিমঙ্গলরা খুব ধনী, কিন্তু তাঁহাদের ঐশ্বর্যের উত্তাপ ছিল না। সাধারণ সাদা-মাটা চালই ছিল তাঁহাদের। ধূর্জটিমঙ্গল বড় হইয়া একটি ঘোড়া কিনিয়াছিলেন, কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গলের বাবার আমলে নিজেদের কোনও যানবাহন ছিল না তাহাদের। পোশাক-পরিচ্ছদেও বিশেষ কোন চটক ছিল না। খাওয়াদাওয়াতেও না। সাধারণ গৃহস্থের মতই থাকিতেন তাঁহারা। বাড়িতে অবশ্য বারো মাসে তের পার্বণ হইত এবং সে পার্বণে পাড়ার সবাই যোগ দিত। অনেক দুঃস্থ এবং গরিব লোককে প্রতিপালন করিতেন তাঁহারা। যাদুমণি যখন মারা গেলেন তখন ধূর্জটির মা সর্বমঙ্গলা নীলুকে ডাকিয়া একদিন বলিলেন—তুই আমাদের বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া করিস। সর্বমঙ্গলার সহিত ঘনিষ্ঠতাটা এমন নিবিড় হইয়াছিল যে নীলু রায় এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সংকোচবোধ করিলেন না। ধূর্জটিমঙ্গলদের পরিবারেরই একজন হইয়া গেলেন

তিনি। রাত্রে অবশ্য নিজের বাড়িতে শুইতে যাইতেন। তাঁহার বাড়িটা ক্রমশঃ পাড়ার ছেলেদের আড্ডাঘর হইয়া পড়িল। তাস-পাশা খেলা হইত। ধূর্জটিমঙ্গল কয়েকটা হুঁকা এবং একটা বড় গড়গড়াও আমদানী করিয়াছিলেন সেখানে। যৌথভাবে তামাক খাওয়া চলিত। কিছুদিন পরে সেখানে কেরামত মিঞা নামক একটি যুবক মুসলমানও জুটিল। এখন যেমন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা শত্রুতার প্রাচীর উঠিয়াছে তখন তেমন ছিল না। নবাবসরকারেও উচ্চপদে হিন্দু কর্মচারীরা বহাল হইতেন। মুসলমানের সহিত হিন্দুর বন্ধুত্বের কোন বাধা ছিল না। কেরামত মিঞার পিতা ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। দিল্লীতে, পাটনায়, মুর্শিদাবাদে, ঢাকায় কারবার ছিল তাঁহার। বেগমও অনেকগুলি ছিল। কেরামতের অনেকগুলি ভাইবোন। তাহার কয়েকটি ভাই পিতার ব্যবসাই দেখাশোনা করিত। কেরামত ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। গানবাজনা মজলিস তয়ফা লইয়াই থাকিত সে। ওই সবই ভালোবাসিত। ধূর্জটিও ভালোবাসিত বাইজিদের নাচ দেখিতে। বাইজিদের নাচের আসরেই কেরামত মিঞার সহিত তাহার আলাপ হয়। ক্রমে নীলু রায়ের সহিতও আলাপ হইল এবং সে আসিয়া হাজির হইল একদিন নীলু রায়ের বাড়িতে। কেরামত মিঞাই গান-বাজনা আরম্ভ করিল সেখানে। সেতার, এস্রাজ, সারেঙ্গি, বেহালা, ডুগিতবলা একে একে শুধু হাজিরই হইল না, নিজেদের প্রতিপত্তিও বিস্তার করিল। নীলু রায় গানবাজনায় বেশ ওস্তাদ হইয়া উঠিলেন। ধূর্জটিমঙ্গল দুই একটা যন্ত্র বাজাইতে শিখিলেন বটে, কিন্তু উহা লইয়া মাতিয়া উঠিলেন না। ধূর্জটিমঙ্গল একটু অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। তিনি সবেতেই থাকেন, অথচ কিছুর মধ্যে ডুবিয়া যান না। পদচারণা করিতে করিতে এই কথাটাই বিশেষভাবে মনে হইতে লাগিল নীলু রায়ের। ধূর্জটি তাঁহার আবাল্য বন্ধু, কিন্তু তাঁহাকে তিনি ভালো করিয়া চেনেন না। স্বল্পবাক ধূর্জটিমঙ্গল কখন যে কি ভাবিতেছে, কোন মতলবে কোনদিকে চলিতেছেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ধূর্জটি জগদ্ধাত্রীকে এই সিংভূমের জঙ্গলে এতদিন ফেলিয়া রাখিয়াছেন কেন ইহাও নীলু রায় ঠিক বুঝিতে পারেন না। ধূর্জটির শ্বশুর যে মুসলমান ওমরাহটির ভয়ে জগদ্ধাত্রীকে জন সাহেবের আশ্রয়ে লইয়া গিয়াছিলেন সে ওমরাহটি বহুদিন হইল ঢাকায় চলিয়া গিয়াছেন তবু জগদ্ধাত্রীকে এখানে ফেলিয়া রাখিবার অর্থ কি ইহা নীলু রায় বুঝিতে পারেন না। বুঝিতে পারেন না তাহার কারণ বন্ধুত্ব সত্ত্বেও ধূর্জটি কখনও তাঁহাকে বলেন নাই যে জন সাহেব তাহার সমস্ত সম্পত্তির ভার তাঁহাকে দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এখানে একটা আস্তানা রাখা দরকার। জগদ্ধাত্রীকেই এই গৃহস্থালীর অধিষ্ঠাত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা তাঁহার, একথাও তিনি নীলু রায়কে বলেন নাই। অথচ সকলেই বলে নীলু রায় নাকি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। এক হিসেবে দক্ষিণ হস্ত তো বটেই। ধূর্জটির সমস্ত বিষয়-আশয়ের দেখাশোনা সে-ই করে। যাদুমণির বাপের বাড়ির বিষয়টা শেষ পর্যন্ত নীলু রায়ই পাইয়াছিলেন। ঠিক পাশেই ছিল ধূর্জটির ছোটখাটো একটা মহাল। বছরে হাজার পাঁচেক টাকা আয় ছিল তার। ধূর্জটি সেটা নীলু রায়কেই দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন ও মহালটা তুমিই নাও। এর বদলে আমার অন্যান্য বিষয়সম্পত্তিগুলোর দেখাশোনাও তুমি কর। ওসব ঝঞ্ঝাট আমি পোয়াতে পারি না। তুমি চৌকশ লোক, তুমিই কর এসব।"

"আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে তো ঠিক"—নীলু রায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

"না পারবার কোনও হেতু নেই। তোমাকে এতদিন ধরে দেখছি। তোমার সঙ্গে রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই, কোনও কুটুম্বিতা নেই, তুমি আমাদের আত্মীয় নও, অথচ তোমার চেয়ে আপনার লোক আমার আর কেউ নেই। আমার যদি অবিবাহিতা একটা বোন থাকত তোমার সঙ্গে তার বিয়ে দিতাম।"

নীলু রায়ের এই তো স্বপ্ন। তিনি ধূর্জটির আত্মীয় হইতে চান। এই কথার পিঠেই হঠাৎ তিনি বলিয়া বসিলেন—"কেন ঝকমারি তো আছে।"

এ কথায় ধূর্জটিমঙ্গল বিস্মিত হইবেন ইহাই নীলু রায় প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিস্মিত হন নাই। বেশ সহজভাবেই উত্তর দিয়াছিলেন—"ঝকমারি কাউকে বিয়ে করবে না। ও বেহারী মেয়ে। আমাদের বাড়িতে মানুষ হয়েছে। ওর মতের বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে পারব না। তবে তুমি যদি ওর মত করাতে পার, আমার আপত্তি হবে না।"

কথাটা ধূর্জটিমঙ্গল এমনভাবে বলিয়াছিলেন যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়, নীলু রায় যদি ঝকমারির সম্মতিটা আদায় করিতে পারেন তাহা হইলে বিবাহ নির্বিঘ্নে হইয়া যাইবে। নীলু রায় ঝকমারিকে আগে অনেকবার দেখিয়াছেন, নারী হিসাবে তাহাকে তাঁহার মোটেই মনোরম মনে হয় নাই। কেমন যেন মদ্দা মদ্দা চেহারা, কাটখোট্টা ভাব। না নীলু রায় ঝকমারির প্রেমে পড়েন নাই। কিন্তু সহসা সেদিন তাঁহার মনে হইয়াছিল ঝকমারিকে বিবাহ করিলে ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহার আপনলোক হইবেন। নীলু রায়ের জীবন মরুভূমির মতো, আত্মীয়স্বজন সব মরিয়া গিয়াছে, ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতেই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়, ধূর্জটিমঙ্গলের মা তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে। ধূর্জটিমঙ্গল কিন্তু এখনও তাঁহাকে স্নেহ করেন। সেই ধূর্জটিকে সামাজিক আত্মীয়তার গণ্ডীর মধ্যে পাইবার আগ্রহই তাঁহার প্রবল। কিন্তু বারবার তাঁহার মনে হয় ধূর্জটি রহস্যময়।

এখানেও আজ যে ঘটনাটা ঘটিল তাহার বিন্দুমাত্র আভাস ধূর্জটি তাঁহাকে আগে দেন নাই। ঝকমারি ধূর্জটিকেই ভালোবাসে, ধূর্জটিও তাহা জানেন। কিন্তু নীলু রায় ঘুণাক্ষরেও ইহা জানিতেন না। নীলু রায় যখন ঝকমারিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তখন ধূর্জটি বিস্ময়প্রকাশ করেন নাই। কেন করেন নাই তাহা এখন নীলু রায় বুঝিতে পারিলেন। এখন কি করিবেন তিনি? ঝকমারি তো ধূর্জটির সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া যাইবে। তাঁহার কর্তব্য কি? প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে একটা মোড়া ছিল। তাহার উপর তিনি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সুতানুটিতে ফিরিয়া যাইবেন? কিন্তু সেখানে গিয়া কি হইবে? নবাব সেন্যরা সুতানুটি পুড়াইয়া দিয়াছিল, ইংরেজরাও কালা আদমীদের আশ্রয় দেয় নাই, লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। অনেক লোক কলিকাতার বাহিরে দূর গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। নীলু রায় তখন হরিপালে চলিয়া গিয়াছিলেন। হরিপালের অনেক ঘটনা মনে পড়িল তাঁহার। হরিপালে কেবল বাড়িটাই ছিল, আর কেহ ছিল না। বৃদ্ধ বাচস্পতি বহুদিন আগে সস্ত্রীক মারা গিয়াছেন। নীলু রায় খালি বাড়ির বারান্দায় একা বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কোথায় করা

যায়। সেকালে গ্রামে গ্রামে হোটেল ছিল না। দুই একদিনের জন্য আসিলে গ্রামেরই চেনাশোনা কাহারও নিকট অতিথি হিসাবে থাকিতে হইত। কিন্তু নীলু রায়কে যে কতদিন এখানে থাকিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। পাশেই গাঙ্গুলীদের বাড়ি। কিন্তু সেখানেও কাহারও দেখা পাইলেন না নীলু রায়। বাড়িতে তালাবন্ধ। গাঙ্গুলীরা থাকিলে নীলু রায় সেখানে দিনকয়েক স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। শেষে ভাবিলেন—এই বাড়িতেই স্বহস্তে ভাতেভাত ফুটাইয়া লইলেই চলিবে। দেখিলেন বাগানে প্রচুর তরিতরকারি ফলিয়াছে। গোয়ালা পাড়ায় গিয়া কিছু দুধ বন্দোবস্ত করিলে চলিয়া যাইবে কোনক্রমে। তিনি রঘু গয়লাকে একটি গাভী দান করিয়া গিয়াছিলেন এখান হইতে যখন বাস তুলিয়া সুতানুটিতে চলিয়া যান। গোয়ালার খোঁজ করিতে হইবে। হঠাৎ ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে একটি কালো কিশোরী মেয়ে আসিয়া হাজির হইল।

"গড় করি দাদাঠাকুর। আপনি কখন এলেন—"

"এখুনি এসেছি। তুমি কে—"

"আমি ছিরি।"

নীলু রায়ের চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখিয়া মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "আমি খিরির মেয়ে—"

তখন সব মনে পড়িল নীলু রায়ের। খিরি তাহাদের বাড়ির ঝি ছিল। যাদুমণি খুব ভালোবাসিতেন তাহাকে। মনে পড়িল তাহার একটা খোঁড়া মেয়ে ছিল।

"খিরিদিদি কোথায়? তাকেই আমি খুঁজছি। এখানে দিনকতক থাকতে হবে। নিজে হাতেই রেঁধে খাব ভাবছি সে যদি এসে একটু যোগাড় করে দেয়—"

"মা তো মারা গেছে। কি যোগাড় করতে হবে বলুন না, আমিই করে দিচ্ছি সব।"

নীলু রায় তখন সব বলিলেন।

"আপনি কখনও রেঁধেছেন আগে?"

"না।"

"তাহলে আপনি রাঁধবেন কেমন করে? আমিই সব রেঁধে দেব। আপনি ভাতটা নাবিয়ে নেবেন খালি। আমি কম জল দিয়ে চড়িয়ে দেব, ফ্যান গালতে হবে না। ফ্যানেভাতে ভালই হবে—"

এই বলিয়া মুচকি হাসিল সে। তাহার সেই মিষ্ট হাসিটা মনে পড়িল নীলু রায়ের। ছিরি সেদিন স্বহস্তে দুইটা উনান প্রস্তুত করিল, শুকনো কাঠ যোগাড় করিল, বঁটি এবং বাসন-কোসন আনিল। ঝাড়ু আনিয়া ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিল। নীলু রায় দিনেরবেলা সাধু ময়রার দোকানে মিষ্টান্ন খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। মণ্ডা, গজা, নিখুঁতি, মতিচুর আর দই। খাওয়া নিতান্ত মন্দ হইল না। ছিরি মুদির দোকান হইতে চাল, ডাল, মসলাপাতি কিনিয়া আনিয়াছিল। বলিল, "উনুন তো আজ শুকোয় নি। কাল আঁচ দেব। আজ চলুন সাধু-মামার দোকানেই আপনার জন্যে রান্নার ব্যবস্থা করি। ও'র উনুনেই রান্না করে দেব আজ। সাধু মামাকে চলুন বলি গিয়ে।"

সাধু ময়রা শুনিয়া হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। বলিল,—"আমারই অতিথি হবেন উনি আজ। রাধিকে ডেকে পাঠাচ্ছি সেই সব করে দেবে—তুমি রাঁধবে কেন।"

রাধী বেণীবাবুর বাড়ির রাঁধুনী। প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণকন্যা। সে আসিয়া বলিল—"আমি ওদের রান্না সেরে তবে আসব। হয়তো একটু দেরী হবে।"

নীলু রায় বলিয়াছিলেন—"ওবেলা তোমার দোকানে অনেক খেয়েছি সাধু। খুব ক্ষিধে পায়নি এখনও। রাত্রে না খেলেও চলবে—"

"সে কি হয়—"

সেদিন অধিক রাত্রে ভূরিভোজন করিয়াছিলেন নীলু রায়।

রাধি ভাল রাঁধুনী। তাহার শাকের ঘণ্ট, মুগের ডাল, রুই মাছের ঝোল, বেগুন ভাজা, মৌরলা মাছের অম্বল প্রত্যেকটাই চমৎকার। সাধুর দোকানের ঘন ক্ষীর আর গরম সন্দেশের কথা এখনও মনে আছে তাঁহার। সাধুর বাড়িতে নৈশভোজন সমাধা করিয়া নীলু রায় নিজের বাড়িতেই ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে বিছানা আনিয়াছিলেন। প্যাঁটরাও ছিল একটা। বেতের তৈরী প্রকাণ্ড প্যাঁটরা একটা। তাহাতে কাপড় পিরান গামছা টাকাকড়ি সব ছিল। তিনি একটা গরুর গাড়ি করিয়া আসিয়াছিলেন। হাঁটিয়াই আসিয়াছিলেন অবশ্য অধিকাংশ পথ, গরুর গাড়ি লইয়াছিলেন বিছানা এবং প্যাঁটরাটার জন্য। গরুর গাড়ির চালক দামোদর তাঁহার পূর্বপরিচিত ছিল। তাহার সহিত গল্প করিতে করিতে বেশ আনন্দেই পথ হাঁটিয়াছেন তিনি। ক্লান্ত হইলে মাঝে মাঝে গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছেন। ছিরি একটি প্রদীপও সংগ্রহ করিয়াছিল। পিতলের একটি পিলসুজও। সাধুর বাড়ি হইতে ফিরিয়া নীলু রায় দেখিলেন ছিরি তাঁহার জন্য পরিপাটিরূপে বিছানা করিয়া রাখিয়াছে। নীলু রায়ের অপেক্ষাতেই ছিরি বারান্দায় বসিয়াছিল। নীলু রায় আসিতেই বলিল—"আমি এবার বাড়ি যাচ্ছি। বাবাকে গিয়ে পাঠিয়ে দেব? আপনার বাইরের বারান্দায় শুয়ে থাকবে। তাই পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাড়িটা এতদিন খালি পড়েছিল তো, একা থাকা ঠিক নয়। কাল এসে আমি রান্নাবান্না সব করে দেব। ক'দিন থাকবেন দাদাঠাকুর?"

"থাকব এখন কিছুদিন। সুতানুটিতে বড় গোলমাল বেধেছে।"

"তাই নাকি! লক্ষ্মণ জেলেও তাই বলছিল। সে সুতানুটিতে মাছ বিক্রি করত। সে-ও পালিয়ে এসেছে—আমি বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

ছিরি চলিয়া গেল। একটু পরেই ছিরির বাবা কৈলাস আসিয়া হাজির হইল। বেশ বলিষ্ঠগঠন ব্যক্তি। বয়স যদিও ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু দেখিলে মনে হয় চল্লিশ। মাথার চুল একটিও পাকে নাই। জাতিতে কর্মকার। চাষাদের জন্য ফাল, অশ্বারোহীদের জন্য ঘোড়ার নাল, গৃহস্থদের জন্য খুন্তি, শাবল, কোদাল এই সব প্রস্তুত করে সে। বাড়ির পিছনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে। সেখানে কুস্তির আখড়া আছে তাহার। সেখানে সন্ধ্যার পর গ্রামের যুবকেরা কুস্তি লড়ে। কৈলাস নিজেও একজন ভালো কুস্তিগীর। কৈলাস বগলে করিয়া একটি মাদুর এবং একটি ছোট বালিশ আনিয়াছিল। বারান্দায় সেগুলি নামাইয়া নীলু রায়কে ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

"বাবাঠাকুর সুতোনুটি থেকে চলে এলেন কেন—"

"ওখানে ইংরেজ আর নবাবে হুজুৎ লেগেছে। আমাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে সব—"

"হ্যাঁ ভাণ্ডারহাটির লক্ষ্মণ জেলে সেই কথা বলছিল এক দিন। সে-ও চলে এসেছে। বলছে এখানেই হাটে হাটে মাছ বেচব।"

"এখানে কোনও গোলমাল হয়েছে নাকি—"

"এখানে কিছু হয় নি। যেমন চলছিল তেমনি চলছে। গোয়ালারা দুধ যোগাচ্ছে, হারাধন, মধু, নারায়ণ, মহেশ চাষ করছে, দিগু নাপতে বাড়ি বাড়ি কাঁসার দর্পণ নিয়ে বাবুদের খেউরি করছে, সাধু ময়রা মিষ্টি বানাচ্ছে, নগেন তাঁতি কাপড় গামছা তৈরি করছে আমি ফাল পিটছি আর তহশীলদার নবি মিঞা দিব্যি নবাবী করে যাচ্ছে। আর একটা ঘোড়া কিনেছে, আর একটা নিকেও করেছে—"

কৈলাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল—"এখানে আমরা খাসা আছি বাবাঠাকুর, আমাদের গায়ে স্বতোনুটির আগুনের আঁচটি পর্যন্ত লাগে নি। রাত হয়েছে এইবার শুয়ে পড় বাবাঠাকুর। আমি এই বারান্দাটায় শুয়ে পড়ছি।"

নীলু রায় ভদ্রতা করিয়া বলিয়াছিলেন - "তোমার তো এখানে শুতে কষ্ট হবে!"

"তা হবে। কিন্তু উপায় কি। ছিরির হুকুম অমান্য করলে আরও কষ্ট। সে বলছে দাদাঠাকুর ও বাড়িতে একলা কি করে শোবে? তুমি গিয়ে শোও। তাই চলে এলাম। আমার জন্যে ভাবনা কোরো না। বাড়িতেও আমি এই মাদুরেই শুই—"

"ছিরি বলেছে কাল আমার রান্নাবান্নার সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

"দেবেই তো। ওর মা যে তোমাকে বড্ড ভালবাসত। তুমি হলে ওর দাদাঠাকুর। দেবে বই কি, নিশ্চয়ই দেবে—"

"তোমার বাড়িতে আর কে আছে? তুমি চলে এলে ছিরি একলা থাকবে না কি! বাড়িতে আর কে আছে তোমার? তোমার একটি ছেলে ছিল, যতদূর মনে পড়ছে—"

"সে আর নেই বাবাঠাকুর। ওলাবিবি তাকে ছিনিয়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। ছিরির বিয়ে দিয়েছি নবীন কামারের নাতির সঙ্গে। সে-ই এখন থাকে আমার কাছে। শুয়ে পড়ুন বাবাঠাকুর, আমাকে আবার ভোরে উঠতে হবে—"

মাদুরটা বিছাইয়া শুইয়া পড়িল কৈলাস।

নীলাম্বর রায় অতীতের চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছিলেন। হরিপালে যে কয়টা দিন ছিলেন তাহার স্মৃতি-স্বপ্নে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন তিনি। চলিয়া আসিবার সময় ছিরিকে একটা রঙীন ধনেখালি শাড়ী আর কয়েকগাছ রুপার চুড়ি করাইয়া দিয়াছিলেন। কিছু বেতনও দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সে তাহা লইতে চাহে না। মাথা নাড়িয়া ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে পলাইয়া গিয়াছিল। একটু দূরে গিয়া বারবার দুই হাত নাড়িয়া বলিয়াছিল, "তোমার কাছ থেকে মাইনে আমি নিতে পারবো নি দাদাবাবু। দাদার সেবা করে কি কেউ মাইনে নেয়।"

"তাহলে আমার বাড়িতেই থাকিস তোরা। চাবি তোকে দিয়ে যাচ্ছি—"

"বেশ। তা থাকব। থাকা উচিতও। বাড়ি খালি ফেলে রাখা ঠিক নয়। আমি ঝাঁটপাট দেব। আর আমাদের বুধি গাইটাকে তোমার গোয়ালে রাখব—"

হঠাৎ নীলু রায় চমকাইয়া উঠিলেন।

"নীলু কোথা গেলে—"

ধূর্জটিমঙ্গল খুব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কাছে কেহ নাই।

নীলু রায় উঠিয়া পড়িলেন।

"আমরা তো বেরুচ্ছি। তুমি যাচ্ছ তো আমার সঙ্গে—?"

"আমি আর গিয়ে কি করব! যা করবার তুমিই কর গিয়ে। আমি এইখানেই থাকি। এখানেও তো একজনের থাকা দরকার। বৌঠান আছেন, ছেলে দুটি আছে—"

"ঝকমারি আমার সঙ্গে যাচ্ছে—"

"ভালোই তো, ভালবাসার লোক সঙ্গে থাকা ভালো।"

অন্য লোক হইলে ইহা লইয়া আলোচনা করিত। ধূর্জটিমঙ্গল কিছুই করিলেন না। চকিতদৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিলেন কেবল।

বলিলেন—"এখানে বন্দুক আছে। জগদ্ধাত্রীর হাতে কিছু টাকা দিয়েছি। তোমার হাতেও কিছু দিয়ে যাচ্ছি। এস।"

নীলু রায় তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলেন ঝকমারি পুরুষের বেশে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কোমরে একটি কোমরবন্ধ, কোমরবন্ধ হইতে তরবারি ঝুলিতেছে। মাথায় পাগড়ি, পাগড়িতে একটি লাল রঙের পালক।

নীলু রায় বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ। তুমি তলোয়ার চালাতে জান নাকি—"

"জানি—"

ঝকমারির মুখে কিন্তু হাসি নাই।

ধূর্জটিমঙ্গল একতোড়া টাকা আনিয়া নীলু রায়কে দিলেন। বলিলেন—"পাঁচ শ' মোহর আছে। আরও যদি দরকার পড়ে মধু সামন্তকে বলে দিয়েছি, সে তোমাকে দেবে।"

বাহিরে ঘোড়াটা ডাকিয়া উঠিল। জগদ্ধাত্রী বাহির হইয়া আসিলেন। গলবস্ত্র হইয়া নীরবে ধূর্জটিমঙ্গলকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর নীরবেই চলিয়া গেলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল বাহির হইয়া গেলেন। পিছু পিছু ঝকমারিও গেল। নীলু রায়ও অনুসরণ করিলেন। বাহিরে দুইটি পাহাড়ী ঘোড়া দাঁড়াইয়া ছিল। দুইটি পাল্কিও ছিল। তাছাড়া আরও অনেক ঘোড়া ও অশ্বারোহী। একজন অশ্বারোহীর হাতে একটি তূর্য ছিল। সে তূর্যধ্বনি করিল। রাত্রির অন্ধকার কাঁপিয়া উঠিল।

॥ পাঁচ ॥

অন্ধকার রাত্রি। মাথার উপরে প্রকাণ্ড প্রজ্বলন্ত হীরকখণ্ডের মতো লুব্ধক নক্ষত্র জ্বলিতেছে। চারিদিকে অরণ্য। শোঁ শোঁ করিয়া শব্দ হইতেছে একটা, কিন্তু বায়ুর বেগ তেমন প্রবল নয়। মাঝে মাঝে বন্য পেচকের ডাক শুনা যাইতেছে। অনেক দূরে হায়নার ডাকও। ধূর্জটিমঙ্গল অশ্বারোহণে একটি পর্বত হইতে অবতরণ করিতেছিলেন। তাঁহার আগে পিছে কয়েকজন অশ্বারোহী। ঝকমারি ঠিক তাহার পিছনেই। আগে পিছে কয়েকজন মশালধারী মশাল জ্বালাইয়া আসিতেছে। তাহাদের পিছনে পাল্কি। এই অন্ধকারকে আর একটা জিনিসও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—মহুয়ার গন্ধে অন্ধকারও বুঝি বিভোর হইয়া রহিয়াছে।

সহসা সম্মুখে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। সামনের মশালবাকেরা পিছন দিকে

ছুটিয়া আসিল। সামনের কয়েকটা ঘোড়াও উলটা মুখে দৌড়িতে লাগিল। একজন চীৎকার করিয়া বলিল, "এখন এগোনো যাবে না, সামনে হাতীর দল—"

হাতীর চীৎকারও একটা শোনা গেল।

"হাতীর দল, চরবার জন্যে নেমেছে ওখানে। ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না এখন—। পাশের রাস্তা দিয়ে নেবে পড়ুন—"

পাশে কোন রাস্তা ছিল না। ঢালু পাহাড়ের গা বাহিয়া তবু সবাই নামিতে লাগিল। মশালের আলোকে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল নীচে খানিকটা সমতলভূমি রহিয়াছে। কিছুদূর নামিয়া বোঝা গেল একটি ঝরনাও আছে। ঝরনার জলধারা সেই ক্ষুদ্র উপত্যকাটির উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

সকলে নীচে যখন সমবেত হইয়াছে তখন ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"এদিকে কোনও পথ আছে কিনা তা যখন আমাদের জানা নেই তখন এইখানেই রাতটা কাটানো যাক। তোমরা খাওয়া দাওয়ার আয়োজন কর। এইখানেই কয়েকটা তাঁবু খাটিয়ে দাও।"

ঝকমারি ধূর্জটিমঙ্গলের পিছনেই ছিল।

বলিল—"ওই অনেক দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। ওখানে কি কোন গ্রাম আছে ?"

ধলরাজের একজন অনুচর বলিল—"না, ওখানে কোন গ্রাম নাই। আমার এ দিকটা ঘোরা আছে। ও অঞ্চলটা সব পাহাড়। পাহাড়ে গুহা আছে মাঝে মাঝে—"

"এরা ততক্ষণ তাঁবুটাঁবু ঠিক করুক, চল আমরা দেখে আসি আলোটা কিসের।"

"বেশ চল। দুজন রক্ষীও চলুক আমাদের সঙ্গে।"

দুইজন রক্ষীকে সঙ্গে লইয়া ঝকমারি ও ধূর্জটিমঙ্গল অন্ধকারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূরে গিয়া তাঁহারা একটি ছোট নদীরও সন্ধান পাইলেন। যে ঝরনাধারাটি দেখিয়াছিলেন সেইটিই সম্ভবতঃ নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে। খরস্রোতা বটে, কিন্তু জল খুব বেশী নয়। ঘোড়াগুলি অনায়াসেই পার হইয়া গেল। হঠাৎ একদল শৃগাল একযোগে ডাকিয়া উঠিল।

একজন রক্ষী বলিল—"পহর পার হ'ল একটা।"

অন্ধকারে ঘোড়া ছুটাইবার সুযোগ নাই। ঘোড়াগুলি খুব সন্তর্পণে চলিতেছিল। বেশ কিছুক্ষণ চলিবার পর তাহারা আলোকের সমীপবর্তী হইল। দেখা গেল একটা গুহার সম্মুখে একটি ছোট মশাল জ্বলিতেছে। লোকজন কেহ নাই।

"এখানে কেউ আছ না কি ? সাড়া দাও।"

ধূর্জটিমঙ্গলের গম্ভীর কণ্ঠ পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইল।

কিছুক্ষণ কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ধূর্জটিমঙ্গল তখন একজন সহচরকে আদেশ করিলেন, "তুমি মশালটা নিয়ে গুহার ভিতরটা দেখ, কেউ আছে কি না। গুহার মুখে দু'একটা মাটির বাসনপত্র দেখছি, গুহার মুখে একটা ঝাঁপও রয়েছে। মনে হচ্ছে কোনও মানুষ আছে—"

সহচরটি ঘোড়া হইতে নামিল এবং প্রথমেই গুহামুখের পরদাটা সরাইয়া ফেলিল। ভিতর হইতে একটি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"খোদা মেহেরবান।"

সহচরটি তখন মশাল লইয়া গুহার ভিতর প্রবেশ করিল। দেখিল গুহাটি বেশ বড়; একটি প্রশস্ত ঘরের মতো। একধারে একটি দড়ির খাটিয়ায় একটি প্রৌঢ় লোক

শুইয়া আছেন। গুহার মেঝেতেও খড়ের উপর একটি বিছানা রহিয়াছে। এককোণে একটি কলসী, তাহার পাশে কিছু মাটির ছোট ছোট বাসন। কয়েকটি হাতপাখাও রহিয়াছে। যিনি শুইয়া আছেন তাঁহার দাড়ি লাল, নাকটি শুকচঞ্চুর মতো।

"আপনি কে?"

"আমার নাম মীর মহম্মদ। আপনারা কে?"

"আমরা মুসাফির। মুর্শিদাবাদের দিকে যাচ্ছিলাম, পথে একপাল হাতী রয়েছে। তাই আমরা এইদিকে সরে এসেছি। আপনি এই গুহায় কতদিন থেকে বাস করছেন?"

"অনেকদিন থেকে।"

"এই জঙ্গলে কে আপনার দেখাশোনা করে?"

"আমার দুটি মেয়ে আছে। তারাই সব করে। আপনি কি একা, না সঙ্গে আরও লোকজন আছে?"

"লোকজন অনেক আছে। আমাদের মালিক আপনার খবর নিতে এসেছেন। বাইরে অপেক্ষা করছেন তিনি।"

"তাঁর পরিচয় কি?"

"তিনি মস্ত লোক। জায়গীর জমিদারি ফলাও কারবার, সব আছে তাঁর। এখানে জন সাহেবের সমস্ত জায়গীর জমিদারির ভারও তাঁর উপর—"

"জন সাহেব? জন সাহেবকে চেনেন না কি তিনি?"

"খুব চেনেন। দু'জনে খুব বন্ধুত্ব ছিল—"

"তাঁকে ভিতরে আসতে বলুন। জন সাহেবের খবর দিতে পারব—আল্লা মেহেরবান।"

প্রৌঢ় হস্ত দুইটি প্রসারিত করিয়া চক্ষু দুইটি মুদিত করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা আত্মসমর্পণের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

সহচরটি বাহিরে গিয়া সব বলিতেই ধূর্জটিমঙ্গল ঝকমারিকে লইয়া গুহার ভিতর প্রবেশ করিলেন।

"সেলাম আলেকুম। মনে হচ্ছে আপনি বিপন্ন। আপনার কোন সাহায্য করতে পারলে আমি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করব। এই জঙ্গলে এই গুহায় আপনি কেন এসেছেন, আপনার পুরো পরিচয় কি তা আমাকে জানান। নির্ভয়ে জানান, আমাকে আপনার বন্ধু মনে করুন। শুনলাম আপনি আমার বন্ধু জন সাহেবের খবরও জানেন। কিন্তু সর্বাগ্রে আপনার পরিচয়টা আমি জানতে চাই। মনে হচ্ছে আপনি একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক—"

প্রৌঢ় বলিলেন, "এখন আমার একমাত্র পরিচয় আমি হতভাগ্য। আমার সবচেয়ে বেশী কষ্ট হচ্ছে আপনার মতো লোককে আমি ভালো ক'রে অভ্যর্থনা করতেও পাচ্ছি না। আপনাকে বসতে দেবার মতো আসনও এখানে নেই। পাশের ওই বিছানাটিতে আমার মেয়ে দুটি শোয়। ওইখানেই আপনারা দয়া করে বসুন—"

"এসব তুচ্ছ কারণে আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা বসছি—"

পাশের শয্যাটির উপরই তাঁহারা উপবেশন করিলেন। তাহার পর বলিলেন— "এবার বলুন আপনার কাহিনী।"

প্রৌঢ় কিন্তু যে কাহিনী বলিলেন তাহা সত্য নহে, বানানো কাহিনী। কিছুটা সত্য, কিছুটা বানানো।

"আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। আমি সম্ভ্রান্ত বংশেরই সন্তান। আমার পিতামহের পিতা নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অধীনে জায়গীরদার ছিলেন। আমার পিতামহও মুর্শিদকুলি খাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু সীতারাম রায়ের সঙ্গে যখন তাঁর যুদ্ধ হল তখন আমার পিতামহ গোপনে গোপনে সীতারাম রায়কে সাহায্য করেন। শুনেছি মুর্শিদকুলি খাঁ এ জন্য রেগে যান খুব। কিন্তু জায়গীর কেড়ে নেন নি। মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাই সুজাউদ্দিন খাঁর সঙ্গে তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর ঝগড়া বেধে গেল। সরফরাজ খাঁই মুর্শিদকুলির মনোনীত উত্তরাধিকারী। আমার পিতামহ তারই পক্ষ নিলেন। কিন্তু সুজাউদ্দিন দখল করলেন সিংহাসন। আমার পিতামহ রাজদ্রোহ অপরাধে কারারুদ্ধ হলেন। সুজাউদ্দিনের দরবারে হাজি আহমদ আর তাঁর ভাই আলীবর্দির খুব প্রভাব ছিল। হাজি আহমদ আমার এক পিসীর রূপ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে নিকে করতে চাইলেন। আমার পিতামহ বললেন তাঁকে যদি কারাগার থেকে মুক্ত করা হয়, তাহলে তিনি আপত্তি করবেন না। তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হলেন, আমার পিসীর সঙ্গে হাজি আহমদের নিকে হয়ে গেল। আমার পিতামহ রাজদরবারে সম্মানিত হলেন, কিন্তু তিনি সরফরাজ খাঁর সঙ্গে গোপনে গোপনে যোগাযোগ রাখতে লাগলেন। কারণ তিনি জানতেন সুজাউদ্দিনের পর সরফরাজ খাঁই নবাব হবেন। তাই হলেন। তখন আমার বয়স খুব কম। শুনতাম সরফরাজ খাঁ দরবারে আসেন না, অধিকাংশ সময়ই বেগমের নিয়ে থাকেন। আমি যখন ষোল বছরের সেই সময় আলীবর্দি খাঁ পাটনা থেকে সসৈন্যে এসে বাংলা আক্রমণ করলেন। খুব যুদ্ধ হল। যুদ্ধে সরফরাজ খাঁ পরাজিত ও নিহত হলেন। আলীবর্দি দিল্লীর বাদশাহকে প্রচুর টাকা দিয়ে বাংলাদেশের সুবেদারির সনদ পেয়ে গেলেন। আমিও আলীবর্দির দরবারে একটা চাকরি পেলাম। সৈন্য বিভাগেই ছিলাম আমি। বর্গিরা যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করে তখন আমি বর্গিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলুম। সেই সময় আমি একটি ঘোরতর অন্যায় কাজ করেছিলাম। তা এখন স্বীকার করছি। আমি একটি হিন্দু ব্রাহ্মণকন্যাকে হরণ করি। তাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করেছিলাম আমি। কিন্তু তাকে পোষ মানাতে পারি নি। মনে হত সারাজীবন যেন একটা বাঘিনীকে নিয়ে ঘর করছি। তার গর্ভে একটি মেয়ে হয়েছিল আমার। মেয়েটিও দেখলাম একটি বাঘিনী হয়েছে। তার বয়স যখন দশ বছর তখন আসানুল্লা বলে একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল। তার কাজ ছিল যুবক নবাব সিরাজের জন্য উপপত্নী সংগ্রহ করা। সে রাজ্যের অনেক যুবতী মেয়েকে ছলে বলে কৌশলে কিংবা টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যেত নবাবের ভোগের জন্য। সে একদিন আমাকে এসে বললে একটি খুব অল্পবয়স্কা কুমারী মেয়ের খোঁজ করছি আমি। নবাবের এক দোস্তের ফেরঙ্গ ব্যাধি হয়েছে। একজন নাকি তাঁকে বুঝিয়েছে খুব কম বয়সের প্রকৃত কুমারীর সঙ্গে বিয়ে হলে তাঁর ব্যাধি সেরে যাবে। আমাকে তিনি বলেছেন এক হাজার আসরফি পর্যন্ত দাম দিতে রাজি আছেন এরকম মেয়ের জন্য। তাছাড়া আমাকে আলাদা বখশিস তো দেবেনই। তবে তিনি 'রইস্' লোক, ছোট-লোকের মেয়ের সংস্পর্শে আসতে চান না। আমি তখন

অর্থাভাবে পড়েছিলাম। আলীবর্দি খাঁ খুব সুনীতিপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি চাইতেন যে তাঁর কর্মচারীরাও সুনীতিপরায়ণ হোক। যে-ই তিনি শুনলেন আমি একটি ব্রাহ্মণকন্যা অপহরণ করে জোর করে তাকে বিয়ে করেছি, অমনি তিনি আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন। যুদ্ধে আমার পায়ে চোট লেগেছিল। তাই আমি বড় দুরবস্থায় পড়ে গেলাম। প্রজারা খাজনা দিত না এবং প্রজাদের উপর অত্যাচার করারও উপায় ছিল না আলীবর্দির আমলে। অর্থাভাবে ছিলাম খুব। হাজার আসরফির লোভ সামলাতে পারলাম না। আমার স্ত্রীকে বললাম একজন খুব বড় রইসের বাড়ি থেকে মেয়ের সম্বন্ধ এসেছে। সত্যি তিনি খুব ধনী লোক ছিলেন, বিবাহের কথা পাকা করবার জন্যে তিনি যে সব দামী দামী উপহার পাঠালেন তাই দেখে আমার স্ত্রীর চোখ ধেঁধে গেল। তার জন্যে তিনি যে মসলিনের ওড়না আর কাশ্মীরের শাল পাঠিয়েছিলেন তা বহুমূল্য। তাছাড়া ভালো ভালো কিংখাব, হাতীর দাঁতের বাক্স, হাতীর দাঁতের শীতলপাটি, রূপোর গোলাপ-পাশ, আতরদান, মোতিবসানো প্রকাণ্ড পানের বাটা, বহু রকম উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন তিনি। আমার স্ত্রী আর আপত্তি করলেন না। বরং বললেন, আমাদের এ দুরবস্থায় খোদাই মেহেরবানী করেছেন আমাদের উপর। তুমি আর অমত কোরো না।

আমাদের মেয়ের বয়স তখন দশ বৎসর। গয়নাপত্তর দেখে সে-ও হকচকিয়ে গেল। ভাবল বাপজান আমাকে সুপাত্রেই অর্পণ করছেন। বিয়ে হয়ে গেল নির্বিঘ্নে। আর তারপরই আমি একটা বিপদে পড়ে গেলাম। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অফিসাররা 'দসতুক' বিক্রি করে জানেন বোধহয়। বাদশাহের ফরমান অনুসারে তারা কোন শুল্ক না দিয়ে ব্যবসা করতে পারে, এজন্য তাদের কাছে 'দসতুক' থাকে, সে দসতুক দেখালে আর সরকারকে কিছু দিতে হয় না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী বাইরের লোকের কাছে সেই দসতুক বিক্রি করে। আমি সেই রকম একটা দসতুক নিয়ে ধরা পড়ে গেলাম। সিরাজ এ নিয়ে খুব কড়াক্কড়ি করছিলেন। আমার কয়েদ হ'য়ে গেল। সেই সময় আপনার বন্ধু জন সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁর সঙ্গে তিনটি মেয়ে ছিল। তাদেরও কয়েদ হয়েছিল এবং তাদের নিয়ে যথেচ্ছাচার চলছিল কয়েদখানায়। তারাই কারারক্ষীকে বশ করে আমার মুক্তির ব্যবস্থা করে। টাকা অবশ্য দিতে হয়েছে অনেক। দুটি মেয়ে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু তৃতীয় মেয়েটি জন সাহেবকে ছেড়ে আসতে চাইল না। কারারক্ষী বলল জন সাহেবকে ছাড়তে পারব না, কারণ নবাব সাহেবের হুকুম সাহেবদের উপর খুব কড়া নজর রাখতে হবে। যদি কোন সাহেব কোনরকমে পালায় তাহলে ওই কারারক্ষীরই প্রাণদণ্ড হবে। সাহেবের সঙ্গে একটি মেয়ে কিন্তু থেকে গেল। দুটি মেয়ে আমার সঙ্গে চলে এল।"

মীর মহম্মদ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন এবং মাথার শিয়র হইতে ছোট একটি কুঁজা লইয়া সেইটিই মুখে লাগাইয়া কি যেন পান করিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। তাহার পর আবার শুইয়া পড়িলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল প্রশ্ন করিলেন—"ওষুধ খাচ্ছেন না কি!"

"আজ্ঞে না, শরাব। আগে যখন অবস্থা ভালো ছিল তখন সিরাজী খেতাম। এখন মহুয়ার মদ খাচ্ছি। আমার মেয়ে দুইটি যোগাড় করে এনে দেয়। মহুয়া খেয়েই এখন বেঁচে আছি।"

"মেয়ে দুটি কি আপনার নিজের মেয়ে ?"

"না। এরা আমার সেই জেলের সঙ্গিনী। এরা জন সাহেবের সঙ্গে বন্দী হয়েছিল। আমার সঙ্গে জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। সেই থেকে বরাবরই আমার সঙ্গে আছে।"

ঝকমারি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। একথা শুনিয়া বলিল, "মেয়ে দুটির নাম কি ? জন সাহেবের সঙ্গে রোমনি, শাওনি আর তির্কি গিয়েছিল।"

মীর মহম্মদ বলিলেন—"এদের নাম আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু এরা বললে—'নাম বলব না। তুমি আমাদের নূতন নাম রাখ'। তাই একজনের নাম দিয়েছি 'রোশনি' আর একজনের নাম দিয়েছি 'খুসবু'। মেয়ে দুটি বোধহয় এই অঞ্চলের, কারণ ওরাই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। ওরাই আমার সেবা-শুশ্রূষা করছে, খাবারও যোগাড় করে আনছে।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"একটা কথা বুঝতে পারছি না। আপনি এই জঙ্গলে চলে এলেন কেন। জেল থেকে পালিয়ে অবশ্য কিছুদিন আত্মগোপন করা প্রয়োজন, কিন্তু আমার মনে হয় শহরে আত্মগোপন করা সহজ। শহরে থাকলে আপনি গোপনে কিছু রোজগারও করতে পারতেন। নবাবের আমলারা সহায় হলে আপনাকে কেউ কিছু বলত না। হয়তো শেষ পর্যন্ত নবাব সরকারেই আপনি চাকরি পর্যন্ত পেয়ে যেতেন। টাকা ছড়ালে সবই তো হয় আজকাল—"

"ঠিকই বলেছেন। টাকা ছড়ালে সবই হয়। কিন্তু আমার এখন টাকা নেই। আমি গরীব হয়ে গেছি। মেয়েকে ওই পাষণ্ডটার হাতে সঁপে দিয়ে আমি যে হাজার আসরফি পেয়েছিলাম সেটা আমার স্ত্রীকেই দিয়েছিলাম। কিন্তু স্ত্রী এখন আমার শত্রু। সে আমার প্রাণ নেবার চেষ্টা করছে। গুণ্ডা লাগিয়েছে আমাকে খুন করবার জন্যে। সেই ভয়েই আমি জঙ্গলে চলে এসেছি—"

"আপনার স্ত্রী গুণ্ডা লাগিয়েছেন আপনাকে খুন করবার জন্যে ? বলেন কি—!"

"যা বলছি তা সত্যি। কিন্তু দোষটা আমার। আমি যখন কয়েদখানায় তখন আমার মেয়ে তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল। ওই ফেরঙ্গ ব্যাধি তাকেও ধরেছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে পালিয়ে এসেছিল তার মায়ের কাছে। আর ওই আসানুল্লা লোকটা যে টাকার লোভ দেখিয়ে ওই লম্পটটার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল সে এসে জুটল আমার স্ত্রীর সঙ্গে। সে-ও একটা লম্পট। আমার স্ত্রীও অপরূপ সুন্দরী। তার বয়স তিরিশের কোঠায়, কিন্তু দেখলে মনে হয় ষোল সতেরো বছর। আসানুল্লা জুটে গেল তার সঙ্গে। তাকে বললে যে আমি সব জেনেশুনেই টাকার লোভে ওই ব্যাধিগ্রস্ত লোকটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। তারপর আরও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল একটা। আমার মেয়ে ইদারায় লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। সে নাকি রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিল না আর। শুনে আমারও খুব অনুতাপ হল। আমি ঘুষ দিয়ে কয়েদখানা থেকে ছাড়া পেলাম। বাড়ি এসে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। কিন্তু তার মায়ের চোখ দিয়ে একফোঁটা জলও পড়ল না। যখন তাকে গোর দিতে নিয়ে গেলাম তখনও সে সঙ্গে গেল না। যখন ফিরলাম তখন দেখলাম সে বাড়ি নেই। চাকররা বললে আসানুল্লা সাহেব একটা তাঞ্জাম পাঠিয়েছিলেন, সেই তাঞ্জামে চড়ে তিনি কোথায় গেছেন। কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরল তখন দেখি মুখ

থমথম করছে, চোখে অগ্নিদৃষ্টি। আমার সঙ্গে একটি কথাও না বলে সে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিল। রাত্রে শুয়ে ঘুমুচ্ছি হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আমার স্ত্রী একটা শাণিত ছোরা নিয়ে বাঘিনীর মতো চেয়ে আছে আমার দিকে। আমাকে জেগে উঠতে দেখে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। কিন্তু আমাকে মারতে পারে নি। আমি তার হাতটা মুচড়ে কেড়ে নিয়েছিলাম ছোরাটা। তারপর পালিয়ে গিয়েছিলাম জানলা দিয়ে। সোজা গিয়ে উঠলাম জগৎ শেঠের আত্মীয় গোপাল শেঠের বাড়ি। সে আমার খুব হিতৈষী বন্ধু ছিল। সে বললে যা বলছ তা যদি সত্যি হয় তাহলে তোমাকে খুন করবার জন্য গুণ্ডাও লাগাবে। তুমি এখানে থেকো না। এখান থেকে পালাও। সে যখন আসানুল্লার সঙ্গে জুটেছে তখন তোমার আর রক্ষা নেই। তাছাড়া তুমি কয়েদখানা থেকে পালিয়েছ, তোমার মুর্শিদাবাদে থাকা ঠিক হবে না। রোশনি আর খুসবুও জেল থেকে পালিয়েছিল আমার সঙ্গে। একটা সরাইখানায় তাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। তাদের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি তারা নেচে গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে তুলেছে। তাদের বললাম, আমি এখান থেকে পালাচ্ছি। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে, না থাকবে। তারা বলল—যাব। ভাগ্যে ওদের সঙ্গে এনেছিলাম, তা না হলে এই অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি কি যে করতাম জানি না।"

ধূর্জটিমঙ্গল প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কোথায় যাবেন শেষ পর্যন্ত? এখানে এভাবে তো বেশীদিন থাকা যাবে না!"

"আমি উড়িষ্যায় যাব। সেখানে এখনও মারাঠারা সর্বেসর্বা। আমার বন্ধু গোপাল শেঠ একজন মারাঠা সেনানায়কের নামে চিঠি দিয়েছেন আমার হাতে। সে চিঠিতে বলেছেন আমাকে আশ্রয় দিলে আমি তাদের বাংলাদেশ পুনরাক্রমণের সুযোগ-সুবিধা করে দেব। সিরাজের আমীর ওমরাহরা সিরাজের অত্যাচারে বিব্রত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, সুতরাং সিরাজ যুদ্ধে জিততে পারবে না। মীরজাফর, জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ, ইয়ারলতিফ—সবাই ইংরেজের পক্ষে। কিন্তু ইংরেজদের সৈন্যবল বেশী নেই। এই সময় মারাঠারা যদি আবার বাংলাদেশ আক্রমণ করে তাহলে বাংলাদেশ তারা জয় করতে পারবে। কিন্তু আমার ভয় পাছে কোনও গুপ্তঘাতক আমাকে হত্যা করে। তাই আমি এই ঘুর পথে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উড়িষ্যায় যাবার চেষ্টা করছি।"

ঝকমারি এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এইবার সহসা সে বলিয়া উঠিল—"তুমি যদু!"

সকলে তাহার দিকে সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইল।

দেখিল ঝকমারি বিস্ফারিত নয়নে মীর মহম্মদের দিকে চাহিয়া আছে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইত ঝকমারির দৃষ্টি মীর মহম্মদের উপর নিবদ্ধ ছিল না, তাহা যেন বহুদূরে অবস্থিত আর একটা কিছু দেখিতেছিল। উন্মুখ ঔৎসুক্যসহকারে সুদূর অতীতের দিকে চাহিয়াছিল সে। জাতিস্মর ঝকমারি পূর্ব কোনও জন্মে ফিরিয়া গিয়াছিল সহসা!

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"যদু! যদু কে—"

"যদু রাজা গণেশের ছেলে! ছেলে নয় কুলাঙ্গার।"

"রাজা গণেশ ! সে-ই বা কে—"

"পাঠান যুগের স্বাধীন হিন্দুরাজা। ভাতুড়িয়ায় তাঁর জমিদারি ছিল। ইলিয়াস শাহী বংশের আমীর ছিলেন তিনি। আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে যুদ্ধে পরাজিত করে মুসলমান আধিপত্যকে স্তব্ধ করে দেন বাংলায়। তারপর বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু বাংলার দরবেশরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল।…"

"তুমি এসব কোথা থেকে জানলে—"

"আমি জানব না ? আমি ছিলাম রাজা গণেশের স্ত্রীর সহচরী। আমার নাম ছিল হিংগুলা ! আমি সব জানি।"

"তারপর ?—"

"বাংলার দরবেশদের নেতা নুর কুতুব আলম চিঠি লিখলেন জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর কাছে। লিখলেন তুমি এসে এই হিন্দু কাফেরকে উচ্ছেদ কর। জৌনপুরে ছিলেন আর এক দরবেশ আশরফ সিমানী। তিনিও উৎসাহিত করলেন ইব্রাহিমকে। ইব্রাহিম সসৈন্যে বেরিয়ে পড়লেন। ত্রিহুতে রাজা শিবসিংকে হারিয়ে তিনি এলেন বাংলায়। তখন রাজা গণেশের ছেলে যদু বাবার সিংহাসনে বসবার জন্য তার সংগে যোগ দিলেন। শুধু যোগ দিলেন না, নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করে হয়ে গেলেন জলালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ। ইব্রাহিম চলে যাবার পর গণেশ আবার আক্রমণ করলেন ওই কুলাংগার জলালুদ্দিনকে। তাকে সিংহাসনচ্যুত করে বন্দী করলেন। নিজে দনুজমর্দনদেব নাম নিয়ে আবার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কিন্তু তিনি দু'বছরের বেশী রাজত্ব করতে পারেননি। হঠাৎ খাওয়ার পর তিনি খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। অনেকের বিশ্বাস যদুই ষড়যন্ত্র করে তাঁর খাবারের সংগে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। তুমি সেই যদু। তুমি জানু নত করে আমার প্রণয়ভিক্ষা করেছিলে, বলেছিলে আমাকেই পাটরাণী করবে। আমি তোমার মুখে লাথি মেরেছিলাম। তোমার বাবার মৃত্যুর পর তুমি যখন রাজা হলে তখন তোমার ঘাতক আমার শিরশ্ছেদ করেছিল। আমার সেই ছিন্ন মুণ্ডটাও আমি দেখতে পাচ্ছি। যদু, ইচ্ছে করলে সে মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি এখনই নিতে পারি।"

ধূর্জটিমংগল তাহাকে ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন—"কি করছিস তুই ঝকমারি—"

ঝকমারি আত্মস্থ হইল। লজ্জিত হইয়া মীর মহম্মদকে বলিল—"মাপ করবেন। আমি মাঝে মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। কিন্তু যা বললাম তা মিথ্যা নয়, আপনার এবং আমার অতীত আমি স্বচক্ষে দেখলাম এখনি। তবে প্রতিশোধ আমি নেব না। যদু যে অন্যায় করেছিল তার প্রতিশোধ মীর মহম্মদের উপর নেওয়া যায় না। ভগবানই এর শাস্তি দেবেন আপনাকে। হয়তো আপনার শাস্তি শুরু হয়ে গেছে—"

মীর মহম্মদ সবিস্ময়ে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

"আপনি কে ! আপনার পোশাক পুরুষের মতো, কিন্তু গলার স্বর তো পুরুষের মতো নয়। কে আপনি—"

ধূর্জটিমংগল বলিলেন—"ওর পরিচয় এখন না-ই শুনলেন। ও খামখেয়ালী পাগল, ওর কথা এখন থাক। আমি আপনাকে দু'একটি প্রশ্ন করছি তার জবাব দিন। জন কি এখন মুর্শিদাবাদেই বন্দী হয়ে আছে ?"

"মুর্শিদাবাদেই ছিল। এখন কোথায় আছে কি করে বলব। আশা করি এখনও

সেখানেই আছে। একটা দোতলা বাড়িতে রেখেছে ওকে। বিশ জন পাহারাদার আছে, দশজন দিনে পাহারা দেয়, দশজন রাত্রে। ওর সঙ্গে যে মেয়েটা আছে সে ওই বিশজনকেই মজিয়েছে। তাদের ওপরওলা যে দারোগা আছে—রমজান আলী, তাকেও মজিয়েছে। তারা সাহেবকে ছেড়ে দিতে রাজী, কিন্তু রমজানের যিনি ওপরওলা তুর্বক্ খাঁ তিনি অর্থপিশাচ একটি। তাঁকে প্রচুর ঘুষ না দিলে রমজান জন সাহেবকে ছেড়ে দিতে পারবে না। আমি তুর্বককে পাঁচশো আসরফি দিয়েছিলাম। তিনি টাকাটা নিলেন, কিন্তু আমাকে ছাড়লেন না। আমার বন্ধু জমীরুদ্দিন আমাকে ধার দিয়েছিলেন টাকাটা। আমাকে সে টাকাটা শোধ করতে হবে। কিন্তু কি করে যে করব তা জানি না। গোপাল শেঠ ভরসা দিয়েছে সে সব ঠিক করে দেবে। হয়তো দেবে। জগৎ শেঠের পেয়ারের লোক সে। সিরাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে তার 'কলকাঠি' না কি গোপালেরই হাতে। জগৎ শেঠের ভয় সে যদি ব্যাপারটা সিরাজের কানে তুলে দেয় তাহলে নবাব জগৎ শেঠকে কয়েদ করতে পারে, কত্‌লও করতে পারে —ও যে রকম দুর্দান্ত ওর অসাধ্য কিছু নেই। এই ভয়ে জগৎ শেঠ গোপালকে খুব তোয়াজ করে রেখেছে টাকাকড়ি দিয়ে। গোপাল এখন ধনী লোক। সে অনায়াসেই আমার পাঁচশ আসরফির ধারটা শুধে দিতে পারে। দেবে কিনা জানি না। গোপালের টিকি যার কাছে বাঁধা তার সঙ্গে যদি দেখা করে তাকে সব কথা বলে আসতে পারতাম তাহলে দিত। সে আমাকেও খাতির করে খুব। কিন্তু দেখা করে আসতে পারিনি—"

"কে তিনি ?"

ধূর্জটিমঙ্গল প্রশ্ন করিলেন।

"মৌন বিবি।

"তয়ফা মৌন ?"

"হ্যাঁ। চমৎকার গান গায়, চমৎকার নাচে।"

"তাকে আপনি চেনেন ?"

"খুব। গোপাল শেঠ ওকে নিজের বাগানবাড়িতে নিয়ে রাখতে চেয়েছিল, ও যায় নি। বলেছিল আমি আমার মালিকের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না।"

মৌনির খবর শুনিয়া ধূর্জটিমঙ্গল হৃষ্ট হইলেন। তিনি চাপা প্রকৃতির লোক। তিনিই যে মৌনিকে বাড়িটি কিনিয়া দিয়াছেন একথা প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সহিত যে ঘনিষ্ঠতা আছে সে কথাও বলিলেন না।

কেবল বলিলেন—"আমিও ওঁর নাম শুনেছি। বড় বড় ওমরাহের অন্দরমহলে ওঁর যাতায়াত আছে না কি—"

"হ্যাঁ, তা আছে। চমৎকার গান গায় যে। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, গজল এমন কি হিন্দুদের কীর্তনও। সবাই ওকে ডেকে নিয়ে যায়। পয়সাও করেছে খুব। কিন্তু কারো ওখানে ও চাকরি নিতে চায় না। গোপাল শেঠ ওকে বাঁধা মাইনে দিয়ে নিজের বাগানবাড়িতে রাখতে চেয়েছিল, গেল না। আমি যদি ওকে বলে আসতে পারতুম, তাহলে গোপাল শেঠকে দিয়ে আমার ধারটা ও শোধ করে দিত। আমাকে খুব ভালবাসে মৌনি বিবি—"

"ভালবাসে ? তাই না কি ?"

ধূর্জটিমঙ্গলের গলার স্বরটা কেমন যেন রুক্ষ শুনাইল।

মীর মহম্মদ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভয় হইল তাঁহার কাহিনীটা যে বানানো ইহা ধূর্জটিমঙ্গল ধরিয়া ফেলিয়াছে নাকি!

প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন তিনি।

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"মুর্শিদাবাদ যাব। কলকাতায় যাওয়ারও ইচ্ছা আছে। সুতানুটিতে আমার বাড়ি ঘরদোর তো নবাবের সৈন্যরা পুড়িয়ে দিয়েছে। সেগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে—"

ধূর্জটিমঙ্গল ইহার বেশী আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু মীর মহম্মদ ইহার উত্তরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাহা বলিলেন তাহাতে উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন তিনি। এই সব খবরই তো তিনি চান। বস্তুতঃ এই সব খবর সংগ্রহ করাই তো তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

"যে লোকটার হুকুমে আপনাদের বাড়িঘর পুড়েছিল সেই আসফ আলীকে আমি চিনি। আসফ আলী নবাবের প্রিয়পাত্র।"

"তাকে আপনি চিনলেন কি করে? আত্মীয়তা আছে না কি?"

"না, আত্মীয়তা নেই। উমর বেগ জমাদার তিন হাজার ঘোড়সোওয়ার নিয়ে ইংরেজদের কাশিমবাজার আক্রমণ করেছিল এ খবর আপনি নিশ্চয়ই জানেন।"

"শুনেছি।"

"উমর বেগ চার দিন ওই বিরাট সৈন্য নিয়ে ইংরেজ কুঠির সামনে চুপ করে ছিলেন। আক্রমণ করেন নি। হয়তো নবাব আক্রমণ করতে বলেন নি। হয়তো ওদের ভয় দেখানই উদ্দেশ্য ছিল। এরা খুব ভয়ও পেয়েছিল। ওয়াটস্ সাহেব এসে একটা মুচলেকায় সই করেও মুক্তি পেলেন না। নবাব তাঁকে আর চেম্বার্সকে আটকে রেখেছিলেন। সেই সময় বিবি ওয়াটস্ বেগমদের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি জুড়লেন। সিরাজের মায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। মায়ের অনুরোধে সিরাজ শেষ পর্যন্ত ওদের ছেড়ে দিলেন, কিন্তু বললেন তাঁরা যে মুচলেকানামায় সই করেছেন সেই মুচলেকানামার তিনটি শর্তই পালন করতে হবে। নবাবের সেনা যখন কাশিমবাজারে, তখন ঘোড়ার খাবার সংগ্রহের একটা ঠিকা পেয়েছিলাম আমি। কিছু ঘুস খেয়ে আসফ আলী ঠিকাট দিয়েছিলেন আমাকে। সেই থেকেই তাঁর সঙ্গে আলাপ। মুচলেকানামায় শর্ত যখন ইংরেজরা মানলেন না, তখন নবাব কলকাতা আক্রমণ করেন। তখনও আমি নবাব ফৌজের সঙ্গে ছিলাম। তখনও ঘোড়ার দানা সংগ্রহ করবার ভার আমার উপর ছিল। সেইজন্য জানি আসফ আলীই আগুন লাগাবার হুকুম দিয়েছিল। কিন্তু তার আগে ইংরেজদের মিলিটারিও ব্ল্যাক টাউনে আগুন ধরিয়েছিল। সব বাঙালীরাই তো পালিয়েছিল। কিছু কিছু বাঙালী মেয়ে অবশ্য নবাবের সেনাদের কবলে পড়ে যায়। একটা খবর জানি—উজির আহম্মদ বলে একটা লোক একটি ব্রাহ্মণের মেয়েকে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু মেয়েটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।"

ধূর্জটিমঙ্গল সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—"উজির আহম্মদ থাকে কোথায়?"

"মুর্শিদাবাদেই আছে। মৈনি বিবি চেনে তাকে।"

ধূর্জটিমঙ্গল আর কিছু প্রশ্ন করলেন না। কিন্তু আসফ আলী ও উজির আহমদ

—এই নাম দুইটি তিনি বুকের ভিতর গাঁথিয়া রাখিলেন। একটু পরেই বাহিরে একটা শব্দ শোনা গেল। মিহি গলায় গানের শব্দ। গানও অদ্ভুত। তিনিনিনি, তিনিনিনি তিনাক্ তিনা তিন, মনরাঙলা গাছের ডালে ফুল ফুটেছে রে, ফুল লয় গো মন, তিনাক তিনা তিন। তাহার পর উচ্চ কলকণ্ঠের হাসি।

মীর মহম্মদ বলিলেন—"রোশনি আর খুসবু আসছে।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুইটি ছোট মশাল লইয়া তির্কি ও শাওনী প্রবেশ করিল।

ধূর্জটিমঙ্গলকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল তাহারা।

"আরে রাজা তুই এখানে কি করে এলি! তোর সাথে উ কে!"

ঝকমারিকে তাহারা প্রথমে চিনিতে পারে নাই।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন, "চেয়ে দেখ্ ভাল করে। চিনতে পারবি।"

দুজনেই ঝকমারির দিকে চাহিয়া রহিল সবিস্ময়ে। তাহার পর হঠাৎ শাওনী হাততালি দিয়া লাফাইয়া উঠিল।

"চিনেছি, চিনেছি। ঝকমকি। আমাদের ঝকমকি রে তির্কি। বেটা ছেলে সেজে আইছে। আমরা যেমন এসেছিলম সায়েবের সঙ্গে—"

দুইজনেই গিয়া জড়াইয়া ধরিল ঝকমারিকে।

তাহার পর দুইজনেই গান গাহিয়া উঠিল একসঙ্গে।

মনরঙোলি ডালে ফুল ফুটেছে রে
ফুল লয় রে—মন
তিনাক তিনা তিন্।
দেখ না চুপি চুপি
মেঘের আড়ে চন্দা বহুরূপী
তিনাক তিনা তিন।

মীর মহম্মদ প্রশ্ন করিল—"খাবার কিছু পেয়েছিস?"

"পেয়েছি। মুর্গি চুরি করেছি দুটো। আর ভিখ মেঙে একটা ডিংলা এনেছি। চালও এনেছি বিশ কাড়ির।"

"কই সে সব?"

"মুর্গি দুটোর টুঁটি ছিঁড়ে দিয়ে চাল আর ডিংলার সঙ্গে একটা পুঁটলিতে বেঁধেছিলাম। হঠাৎ রাস্তায় একটা মেয়ার সঙ্গে দেখা। সে চীৎকার করছিল আমি কংসকে খুন করব। আমাদের দেখে বলল—বড় খিদা লেগেছে, খেতে দিবি? বললাম আমাদের মোটটা বয়ে নিয়ে চল দেব। সেই মোটটা বয়ে আনছে। তাকে ওবেলার ভাত যে ক'টা আছে তাই দিব।"

মীর মহম্মদ বলিলেন, "অচেনা লোকের মাথায় জিনিসগুলো দিয়েছিস, পালাবে না তো জিনিসগুলো নিয়ে—"

"না গো না। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ভালো ঘরের মেয়ে। মাঝে মাঝে কেবল বলছে কংসকে খুন করব। কে জানে বাবা কোন কংসকে খুন করবে উ—ওই যে আসছে—"

দ্বারপ্রান্তে একটি ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল। মাথায় একটা বেশ বড় পুঁটলি

"ভিতরে আয়—"

মেয়েটি ভিতরে আসিয়া মাথার মোট নামাইল। তাহার পর ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া হঠাৎ সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"দাদা—দাদা—তুমি—"

তাহার পরই অজ্ঞান হইয়া গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহার ছোটবোন বারাহীকে চিনিতে পারিলেন। কিন্তু সে কথা খুলিয়া বলিলেন না।

বলিলেন—"ও যখন আমাকে দাদা বলেছে তখন আমিই ওকে আশ্রয় দেব।"

বারাহীর কোনও সন্তান হয় নাই। বয়সও মাত্র একুশ বৎসর। রূপসী ছিল সে। বাপের বড় আদরিণী ছিল। তাহার শীর্ণ দেহ, ছিন্ন বস্ত্র, রুক্ষ চুল দেখিয়া ধূর্জটিমঙ্গলের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে অশ্রু তিনি সংবরণ করিয়াছিলেন, গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতে দেন নাই।

তাঁহার রক্ষকদের আদেশ দিলেন—"একটা পালকি এনে একে নিয়ে যাও। এ আমাদের সঙ্গে যাবে।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল।

একজন অশ্বারোহী আসিয়া খবর দিল হাতীর দল অন্যদিকে সরিয়া গিয়াছে। পথে আর কোন বাধা নাই। ঝকমারিও বারাহীকে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গল যখন প্রকাশ্যে এ বিষয়ে কিছু বলিলেন না, তখন সে-ও চুপ করিয়া রহিল।

ধূর্জটিমঙ্গল উঠিয়া পড়িলেন—"মীর সাহেব, এখন আমি তাহলে উঠি। আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে। আপনি বড় দুরবস্থায় পড়েছেন দেখতে পাচ্ছি। আমি আপনাকে পঞ্চাশটি আসরফি দিচ্ছি। আপনি তাড়াতাড়ি উড়িষ্যায় চলে যান। আপনি যদি মুর্শিদাবাদে মৌন বিবিকে খবর দিতে পারেন তাহলে সে খবর আমি পাব। মুর্শিদাবাদে গিয়ে জন সায়েবকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করব আমি। এ মেয়ে দুটো আপনার সঙ্গে থাক।"

তিনি তির্কি আর শাওনীকেও পাঁচটি করিয়া আসরফি দিলেন। তাহারা আনন্দে গদগদ হইয়া পড়িল। ধূর্জটিমঙ্গলকে ঘিরিয়া তাহারা আনন্দের একটা বান বহাইয়া দিল যেন। তাহাকে বারবার জড়াইয়া ধরিল, হাত তুলিয়া নাচিল, দুই এক কলি গানও গাহিয়া দিল। ঝকমারিকে বারবার চুম্বন করিয়া বলিল—

"বেটাছেলের পোশাকে তুকে খুব ভালো দেখাচ্ছে। মন যাচ্ছে তুকে বিয়ে করি।"

একটা হাসির হুল্লোড় তুলিয়া তাহারা গড়াইয়া পড়িল।

মীর মহম্মদ বলিলেন—"আপনি আমার এত উপকার করলেন আপনার নামটা কিন্তু জানতে পারলাম না। আপনার এ উপকারের কিছু প্রত্যুপকার যদি করতে পারি—"

"একটি প্রত্যুপকার করতে পারেন। উড়িষ্যায় গিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করতে পারলেন কিনা, ফল কিছু হল কিনা সেটা আমাকে জানাবেন।"

"কিন্তু আপনার নাম ঠিকানা না জানলে কোথায় জানাব? যদি সুবিধে করতে পারি উড়িষ্যা থেকে কোন লোককে আমি মুর্শিদাবাদে পাঠাবার চেষ্টা করব—"

"মৌন বিবির কাছেই খবর পাঠাবেন। মৌন বিবির কাছেই থাকব আমি। ওখানে খবর গেলে আমি পেয়ে যাব—"

"আপনি হিন্দু কি মুসলমান তাতো বললেন না—"

"তা বলবার তো কোনও প্রয়োজন নেই। দেখুন, সব দেশে, সব সমাজে দুটি জাত থাকে—একটি সৎজাত আর একটি বজ্জাত। আমি সৎজাতের দলে। আমার দলে হিন্দু মুসলমান দুইই আছেন।"

বাহিরে তুর্যধ্বনি শোনা গেল।

"এবার আমি চলি। আপনার কথা বলব আমি মেনিকে।"

"তাহারা বাহিরে গিয়া অশ্বারোহণ করিল। ধূর্জটিমণ্ডলের রক্ষকেরা ডালপালা কাটিয়া ছোট একটি ডুলির মতো বানাইয়া ছিল। অজ্ঞান বারাহীকে তাহার উপর শোয়াইয়াই তাহারা লইয়া চলিল। এখানে পালকি আনা সম্ভব হয় নাই। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ধূর্জটিমণ্ডল হাত তুলিয়া আবার বলিল—"শাওনী তির্কি চললাম—"

উহারা গান গাহিয়া উঠিল

আবার কবে আসবি তুরা
সেই আশাতে থাকব
আকাশে চান থাকবে
বুকেতে প্রাণ থাকবে
পথের পানে চোখটি মেলে রাখব।
মনরঙোলীর রাঙন পাতায়
তুদের ছবি আঁকব।

গান শেষ করিয়া হাসিতে হাসিতে আবার তাহারা গুহায় ঢুকিয়া পড়িল। মীর মহম্মদের সহিত কেন তাহারা যাইতেছে সে কথাটা কিন্তু ধূর্জটিমণ্ডলকে তাহারাও বলিল না। বলা সম্ভব ছিল না বলিয়াই বোধহয় বলিল না।

॥ ছয় ॥

সেদিন ধূর্জটিমণ্ডল যখন চলিয়া গেলেন নীলু রায় তখনই ঘরের ভিতর গেলেন না। অন্ধকারে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার ক্ষতবিক্ষত অতীত জীবনের পটভূমিকায় নিজের জীবনটা আর একবার প্রত্যক্ষ করিলেন। হ্যাঁ, সত্যিই তিনি নিঃসঙ্গ, সত্যই তাঁহার আত্মীয় কেহ নাই। তাঁহার রক্ত-সম্পর্কিত সব আত্মীয়স্বজনই কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। দুইজন বন্ধু তাঁহার জীবনে আসিয়াছিল। একজন কেরামত খাঁ, আর একজন ধূর্জটিমণ্ডল। কেরামত খাঁ শুধু তাহার বন্ধুই ছিল না, গুরুও ছিল। তাহার কাছেই তিনি গানবাজনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অসামান্য শিল্পী ওই কেরামত খাঁ। শুধু সে সুর-শিল্পী নহে, জীবন-শিল্পীও। সংসারের কোনও বন্ধন নাই। অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো। কিন্তু তাহার আরাধ্য ভগবান নহেন, তাহার আরাধ্য সুর। সুরের আহ্বানে সে ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। আজ দিল্লী, কাল ঢাকা, পরশু বিষ্ণুপুর, তাহার পরদিন মুর্শিদাবাদ। সুরের টানে কেরামত সদা চঞ্চল। এখন কোথায় আছে কে জানে। সুতরাং তাহার বন্ধুত্ব নীলু রায়ের জীবনে এমন কোন প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই যাহার উপর

তিনি নির্ভর করিতে পারেন। তাঁহার সুখ দুঃখের সে অংশীদার নয়, সে কখন কোথায় থাকে ঠিক নাই। তবু কেরামত খাঁয়ের বন্ধুত্ব তাঁহার জীবনে পরম সম্পদ, একখণ্ড মাণিক্যের মতো তাহা তাঁহার আঁধার জীবনে যেন জ্বলিতেছে। যতক্ষণ সে কাছে থাকে ততক্ষণ সে পারিপার্শ্বিককে যেন আলোকিত করিয়া রাখে। শুধু গানবাজনা নয়, তাহার চরিত্রের মধ্যে এমন একটা অগাধ অথৈ ভাব আছে, এমন একটা প্রদীপ্তি আছে যে, তাহাকে ভালো না বাসিয়া থাকা যায় না। কেরামত সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে নিরাসক্তও। কোন ভালবাসার আকর্ষণে কোথাও সে বাঁধা পড়ে না। সে যদিও মুসলমান কিন্তু একটির বেশী বিবাহ করে নাই। অনেক তরফী, অনেক বাঈজী এমন কি ভদ্রঘরের অনেক কন্যাও তাহার প্রণয়াসক্ত। কিন্তু কেরামত আর কোথাও বাঁধা পড়ে নাই। তাহার বউ পুতলী বিবি নাকি অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু সে পর্দানশীন, যখন বাহিরে যায় তখন বোরখা পরে। নীলু রায় কখনও তাঁহাকে দেখেন নাই। লোকমুখে তাঁহার কথা শুনিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ির ঝি বলিয়াছিল—মেয়ে নয় তো পরী। রং দুধে-আলতা, একপিঠ কালো চুল, কুচকুচে কালো টানা টানা চোখ। দাঁতগুলো মুক্তোর মতো। বুড়ী ঝি তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। পুতলী বিবি কয়েকটি যন্ত্র নাকি খুব ভালো বাজাইতে পারেন। বিশেষ করিয়া বীণা। কিন্তু তিনি কেরামত ছাড়া আর কাহাকেও বাজনা শোনাইতে চান না। আমীরওমারহদের অন্তঃপুর হইতে নিমন্ত্রণ আসিলে অসুখের ভান করেন। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। লোকে বলে তাঁহার জন্যই নাকি কেরামতকে দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কেরামতের একটি পুত্র সরফুদ্দীন মুর্শিদাবাদে তাহার বৃদ্ধা পিসীর কাছে থাকে। ধূর্জটিমঙ্গলই তাহাদের তত্ত্বাবধান করেন। তাহাদের দেখাশোনা করিবার নিমিত্ত বক্তিয়ার নামক একটি লোককেই নিযুক্ত করিয়াছে সে। মাসে মাসে তাহাদের টাকাও দেয়। ধূর্জটিমঙ্গল অনেক সৎকাজে লিপ্ত, নীলু রায়ও তাঁহার দাক্ষিণ্য ভোগ করিতেছেন, তিনি তাঁহার বন্ধুস্থানীয় আত্মীয়ের মতো। কিন্তু তাঁহার আদি-অন্ত তিনি বুঝিতে পারেন না। অত্যন্ত গম্ভীর, অত্যন্ত স্বল্পবাক ধূর্জটিমঙ্গলকে বন্ধুরূপে লাভ করিয়াও নীলু রায় তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারেন না। তাহাকে বুঝিতেই পারেন না তিনি। এতদিন তাঁহার সঙ্গে আছেন, কিন্তু মনে হয় একটা বন্ধ বাক্সের সম্মুখেই সারাজীবন যেন বসিয়া আছেন। প্রকাণ্ড বাক্স। লম্বাচওড়া ভারিক্কী চেহারা, গায়ে অসীম শক্তি, মনে প্রচুর সাহস কিন্তু বন্ধ-বাক্স। কখন কি যে করিবে তাহা পূর্বাহ্নে কখনও জানাইবে না, এই তাহার স্বভাব। এই সিংভুমের জঙ্গলে সে যে সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইবে, একথা নীলু রায় আসিবার আগের দিন পর্যন্ত জানিতেন না। হঠাৎ লুৎফুন্নিসার চিঠিগুলি লইয়া সে যে মুর্শিদাবাদে যাইবে একথাও নীলু রায় কল্পনা করেন নাই, যাত্রা করিবার আগে সে যে হঠাৎ বাঘ শিকার করিতে যাইবে ইহাও একটা অদ্ভুত আকস্মিক কাণ্ড। না, ধূর্জটি-মঙ্গলকে নীলু রায় বুঝিতে পারেন না। তিনি যদি সঙ্গে যাইতে চাহিতেন তাহা হইলে সে আপত্তি করিত না, তিনি যাইতে চাহিলেন না তাহাতেও তাহার আপত্তি নাই। ঝকমারিকে সঙ্গে না লওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গল নিজের মতে নিজের পথে চলেন, কে তাঁহার সঙ্গী হইবে না হইবে সে সম্বন্ধে মাথাই ঘামান না। অদ্ভুত

একবগ্‌গা অন্যমনস্ক গোছের লোক। কেরামত ধূর্জটিমঙ্গল—দুইজনকেই ভালবাসেন নীলু রায়, কিন্তু দুইজনই তাঁহার নাগালের বাহিরে। এখন কি কর্তব্য? হঠাৎ তাঁহার হরিপালের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল খোঁড়া ছিরিকে, ছিরির বাবা কৈলাসকে, ময়রা সাধুচরণকে, ব্রাহ্মণী রাধীকে। ইহারা তো তাঁহার নাগালের বাহিরে নয়। হরিপালে তাঁহার বাড়িটাও পড়িয়া আছে। সেখানে গিয়া বাস করিলে কেমন হয়? কিন্তু মন সায় দিল না। ছিরি, কৈলাস, সাধুচরণদের গ্রাম্য ভালবাসায় মন ভরে না। সে ভালবাসা নিখাদ, সে ভালবাসা পবিত্র, কিন্তু তাহাতেও মন ভরে না। ভালবাসা ছাড়াও মন আরও কিছু চায়। সে বস্তুটা কি! নীলু রায় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু মনের মধ্যে কোনও সদুত্তর পাইলেন না। আমি কিন্তু উত্তরটা জানি। পশুরা যাহাতে সন্তুষ্ট হয় মানুষের তাহাতে সন্তোষ নাই। স্বাভাবিক আহার-বিহার স্নেহ-ভালবাসার বাহিরে সে এমন একটা জগতে বিচরণ করিতে চায় যে জগত মানুষের সৃষ্টি, যে জগতে মানুষের প্রতিভা আপন খামখেয়ালে অভিনব শোভা সৃষ্টি করিয়াছে, যে জগতে কেরামতরা সঙ্গীতসাধনা করে, ধূর্জটিমঙ্গলদের রহস্যময় গাম্ভীর্য, বিপুল সাহস, বিরাট দাক্ষিণ্য যে জগতের ভূষণ—সেই জগতে বিচরণ করিবার জন্য মানুষের মন উন্মুখ। সৃষ্টির নিত্যনূতন প্রকাশ দেখিয়া সে আত্মহারা হইতে চায়। স্বাভাবিক জীবনযাপন তাহার মনের এ ক্ষুধা মিটাইতে পারে না। নীলু রায়ের পক্ষে আর হরিপালে গিয়া বসবাস করা সম্ভবপর নহে। তিনি যে সংস্কৃতির স্বাদ পাইয়াছেন তাহা শহরেই সুলভ, একমাত্র সুশিক্ষিত লোকের সঙ্গলাভ করিলেই তাহা পাওয়া যায়। এ রকম লোকেরা পল্লীগ্রামে বড় একটা থাকেন না। তাঁহাদের বাস শহরে। পল্লীবাসীদের সারল্য, পল্লীবাসীদের স্নেহ ভালবাসার মধ্যে একটা মাধুর্য আছে বটে, কিন্তু সে মাধুর্য ধূর্জটিমঙ্গলের রহস্যময় আভিজাত্য বা কেরামতের অপরূপ গজলের সহিত তুলনীয় নয়। নীলু রায়কে আবার সুতানুটিতেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু ইহাই তিনি আবার অনুভব করিলেন যে তিনি নিঃসঙ্গ। কেরামত বা ধূর্জটিমঙ্গলকে তিনি যেমন করিয়া পাইতে চান তাহারা তেমন করিয়া ধরা দেয় না। তাহারা বন্ধু বটে, কিন্তু বড় সুদূরের। ঝকমারিকে বিবাহ করিতে পারিলে হয়তো তিনি এ পরিবারের আত্মীয় হইতে পারিতেন, কিন্তু আজ বুঝিলেন তাহা হইবার নয়। সুতানুটিতে এখন গিয়াই বা কি করিবেন? কাজকর্ম সব তো বন্ধ। ইংরেজদের এবং নবাবের অত্যাচারে মধ্যবিত্ত বাঙালী পল্লীগুলি তো শূন্য। অনেক বাড়ি পুড়িয়াছে। ইংরেজদের সহিত নবাবের কলহে সেখানকার আকাশবাতাস থমথম করিতেছে। যে কোন সময় ঝড় উঠিতে পারে। তাহা ছাড়া তিনি যাইবেনই বা কেমন করিয়া? স্বেচ্ছায় যে তিনি জগদ্ধাত্রী ও তাঁহার ছেলে দুইটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছেন।

নীলু রায় বাহির হইতে ধীরে ধীরে ভিতর গেলেন।

বাহির ঘর হইতে ধূর্জটিমঙ্গলের শয়নঘরটি দেখা যায়। অত রাত্রেও সে ঘরের কপাট খোলা দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন জগদ্ধাত্রী বোধহয় এতক্ষণ ঘরে খিল দিয়া ঘুমাইতেছে। তিনি খোলা দ্বারটার দিকে আগাইয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন—জগদ্ধাত্রী বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছে। ক্রন্দনাবেগে তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

নীলু রায় একবার গলা খাঁকারি দিলেন। ইহাতেই কাজ হইল। জগদ্ধাত্রী সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিল।

"কে—"

"আমি নীলু।"

"আপনি যান নি ?"

"না। সবাই চলে গেলে আপনাকে দেখবে কে বৌঠান !"

"কেন, দানিয়েল আছে, কস্তুরী আছে, লালী আছে, স্বয়ং ধলরাজাই আছেন—"

জগদ্ধাত্রীর কণ্ঠস্বরে যে সুর বাজিয়া উঠিল তাহা প্রায় অবর্ণনীয়। তাহা কোমল অথচ কঠিন, তাহা নিরুত্তাপ অথচ উত্তপ্ত, তাহা সরল অথচ বক্র, তাহাতে বিলাপের ভাষা নাই কিন্তু অশ্রুর আভাস আছে। নীলু রায় নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর প্রশ্ন করিলেন—"আপনার খাওয়া হ'য়ে গেছে তো ? এইবার শুয়ে পড়ুন—"

"আমি খেয়েছি। ভেবেছিলাম আপনিও আপনার বন্ধুর সঙ্গে চলে গেছেন। আপনি আছেন জানলে আপনাকে আগে খাইয়ে তবে খেতাম। বসুন, আপনার খাবার নিয়ে আসি।"

"আমার তেমন ক্ষিধে পায় নি। আমার জন্যে কিছু করতে হবে না। আমিও শুতে যাচ্ছি—"

"আপনার জন্যে আমার কিছুই করতে হবে না। আপনার বন্ধুর জন্যই রান্না করেছিলাম। কিন্তু তিনি দুধ মধু আর মহুয়া ছাড়া আর তো কিছুই খেলেন না। সব রান্না করা আছে, আপনি বসুন—"

জগদ্ধাত্রী উঠিয়া মেঝেতে একটি আসন বিছাইয়া দিলেন।

"বসুন আপনি। আমি খাবার আনছি।"

মাথায় আধঘোমটা টানিয়া জগদ্ধাত্রী ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। যে ওঁরাও বালিকাটি তাঁহার নিকট সদাসর্বদা থাকিত সে এক গ্লাস জল লইয়া প্রবেশ করিল। আগেকার গ্লাসে ঢাকনা দেওয়া থাকিত। এ গ্লাসটি রুপার এবং ইহার ঢাকনাটি বেশী কারুকার্যময় বলিয়া নীলু রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মনে হইল ঢাকনাটির উপর দামী পাথর বসানো রহিয়াছে। তিনি আসনে বসিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলেন।

জগদ্ধাত্রী খাবারের থালা লইয়া প্রবেশ করিলেন। বালিকাটি পিছু-পিছু আর একটি থালা আনিল। তাহাতে নানারকম ব্যঞ্জন সাজানো। তাহার পর আসিল আরও দুইটি ছোট থালা।

নীলু রায় বলিলেন—"এত খাবার তো আমি খেতে পারব না। এত খাবার আপনি রেঁধেছেন ?"

জগদ্ধাত্রী বলিলেন—"সব আমার রান্না নয়। ওই ছোট থালা দুটো দানিয়েলের বাড়ি থেকে এসেছে। ও আজ শিকারে বেরিয়েছিল সকালে। একটা বরা মেরেছে আর কয়েকটা বনমুরগী। উনি এসব ভালবাসেন তাই লালী রেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু উনি তো চলে গেলেন, আমি ওসব খাই না। ভাবছিলাম ফেরত দেব। আপনি তো ও সব খান—"

"খাই।"

"তাহলে তো ভালই হল।"

জগদ্ধাত্রী খাবার সব সাজাইয়া দিয়া, মাথার ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া একটি ছোট পাখা হাতে তাঁহার সম্মুখে বসিলেন। মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিলেন। নীলু রায়ের বিসদৃশ বোধ হইল না। ইহাই তখন রেওয়াজ ছিল। আতপ চালের চমৎকার ভাত, ভাজা মুগের ডাল, বড়ার ডালনা, ডুমুরের ঘণ্ট, দুধিয়া মাছের ঝাল, শোল মাছের অম্বল, এসব ছাড়া একটু ক্ষীর এবং মিষ্টান্ন। সেই বালিকাটি কিছু গরম লুচি ভাজিয়া আনিল।

"লুচি দিয়ে মাংস দিয়ে খান। উনি খুব ভালবাসেন। ওঁর জন্যে ময়দা মেখেই রেখেছিলাম, কিন্তু উনি তো কিছু না খেয়েই চলে গেলেন।"

একথাগুলির মধ্যেও নীলু রায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন দুঃখের আভাস পাইলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না, নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। প্রতিটি ব্যঞ্জন অপূর্ব। এমন ডুমুরের ডালনা এবং দুধিয়া মাছের ঝাল তিনি ইতিপূর্বে খাইয়াছেন বলিয়া মনে পড়িল না। বনমুরগী এবং বরাহের মাংসও চমৎকার। নীলু রায় নিঃশব্দে সমস্ত নিঃশেষ করিলেন। তিনি যে পরিমাণ আহার করিলেন তাহা আজকালকার হিসাবে ভূরিভোজন হিসাবে গণ্য হইবে। আজকাল আমরা একটুকরা পাঁউরুটি, একটা সন্দেশ, আধখানা ফ্রাই খাইয়া উদ্গার তুলিয়া বলি—উঃ খুব খেয়েছি, আর পারব না। কিন্তু সেকালে নীলু রায়রা ওই পরিমাণ ভোজাই দুইবেলা উদরস্থ করিয়া স্বচ্ছন্দে হজম করিতেন। বিস্ময়ের কিছু ছিল না ইহাতে।

জল খাইবার সময় নীলু রায় রুপার গ্লাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

"এমন গ্লাস কোথায় পেলেন বৌঠান। রুপোর ঢাকনিতে যে হীরে, মুক্তো, প্রবাল, চুনী বসানো সেগুলো আসল বলেই মনে হচ্ছে। এ গেলাস কি ধূর্জটি কিনেছিল, না ফরমাস দিয়ে তৈরি করিয়েছিল ?"

জগদ্ধাত্রী বলিলেন—"আমার বিয়ের সময় শেঠ উমিচাঁদ আমাকে ওটা উপহার-স্বরূপ দিয়েছিলেন—"

"উমিচাঁদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কিরকম ? আত্মীয় নয় নিশ্চয়, উনি তো বাঙালী নন, পশ্চিমদেশের লোক—"

"না। আত্মীয় নন। কিন্তু উনি আমার বাবার খুব বন্ধু ছিলেন। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই এসে দাবা খেলতেন। ওঁর একটি খুব সুন্দরী ভগিনী ছিল। নাম লাখপতিয়া। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল খুব—"

নীলু রায় মনে মনে চমকিত হইলেন। উমিচাঁদ বৌঠানের বাবার বন্ধু ? উমিচাদের খবর কি জানেন তিনি ?

"উমিচাঁদ আপনার বাবার বন্ধু ? তা জানতাম না তো। কতদিন তাঁর খবর পান নি ?"

"খবর অনেকদিন পাই নি। বিয়ের পর তো সুতানুটিতে বেশীদিন থাকা হয় নি। বেশীর ভাগ বারাসতেই ছিলাম। সেখানে ওই মুখপোড়া নবাবের কে একটা লোক বারবার আমাদের বাড়িতে আসতে লাগল। বাবা ভয় পেয়ে তাই আমাদের জন সায়েবের কাছে নিয়ে এলেন। সেই থেকে তো এখানেই আছি। আর কোন খবর পাইনি। লাখপতিয়ার এতদিন বিয়ে হয়ে গেছে নিশ্চয়। আপনি তাদের খবর জানেন ?"

"আমি যে খবর জানি তা তো ভয়ানক। ধূর্জটি আপনাকে কিছু বলে নি ?"

"না। তাকে তো চেনেন আপনি। কথাই বলে না মোটে। অন্যমনস্ক লোক। তরকারিতে যদি কোনদিন নুন দিতে ভুলে যাই, আলোনাই খেয়ে যাবে, বলবে না তরকারিতে নুন দাও নি। আপনি বলুন না, কি খবর ওদের। ভয়ানক খবর ?"

"ভয়ানক খবর।"

নীলু রায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

"জগন্নাথকে চিনতেন আপনি ?"

"খুব চিনতাম। জগন্নাথ তো ওদের বাড়ির জমাদার ছিল। খুব ভালো লোক—"

"হাজারিমলকে ?"

"হ্যাঁ। তিনি তো উমিচাঁদের আত্মীয়। ওদের বাড়ির সব তদ্বির-তদারক করতেন। আমাদের বাড়িতেও আসতেন মাঝে মাঝে। কি হয়েছে ওদের—"

"এখনি যদি বলি আপনার রাত্রে আর ঘুম হবে না।"

"তবু বলুন। না শুনলে আরও ঘুম হবে না।"

নীলু রায় বলিতে লাগিলেন।

"নবাববাহাদুর যে কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এ খবর নিশ্চয়ই জানেন আপনি।"

"আমি তো কিছুই জানি না। আপনার বন্ধু তো আমাকে কিছুই বলেন নি। আপনি সব খুলে বলুন—"

"ইংরেজদের উপর রেগে গিয়ে নবাব সাহেব কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন। কলকাতার নামটা পর্যন্ত বদলে দিয়ে আলিপুর নাম রেখেছিলেন। আমাদের দেশী লোকদের বড় কষ্ট হয়েছিল। ব্যবসাবাণিজ্য তো বন্ধ হয়েই গিয়েছিল, আমাদের বাড়িঘরও পুড়ে গিয়েছিল। নবাব কলকাতা আক্রমণ করবার কিছু আগে আমি চরাধিপতি রামরাম সিংহের বাড়িতে একটা গানের মজলিসে গিয়েছিলাম। তিনি শিকারেরও কিছু আয়োজন করেছিলেন। রামরাম সিংহের বাড়ি থেকে যেদিন ফিরছি সেদিন তিনি আমাকে বললেন—"নবাব কলকাতা আক্রমণ করবেন। যুদ্ধে সাধারণ লোকদের বড় মুশকিল হয়। তোমরা যতশীঘ্র পার কলকাতা থেকে অন্যত্র চলে যাও। আর উমিচাঁদকে এই চিঠিটা দিও। সে আমার বন্ধু, তাকেও আমি এই পরামর্শ দিয়েছি চিঠিতে। আমি চিঠিটা নিয়ে এলাম। এসে দেখি যুদ্ধ প্রায় বাধ-বাধ। নবাব সৈন্যের সঙ্গে ইংরেজদের টালায় ছোটখাটো একটা যুদ্ধ হয়েও গেছে। শুনলাম ঘসেটি বেগমের পেয়ারের লোক নবাবের চিরশত্রু রাজবল্লভের সঙ্গে না কি নবাবের সন্ধি হয়ে গেছে। রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণবল্লভ নবাবের ভয়ে অনেকদিন আগে পালিয়ে এসে ইংরেজদের আশ্রয় নিয়েছিল। ইংরেজরা যেই জানল যে রাজবল্লভের সঙ্গে নবাবের মিটমাট হয়ে গেছে, অমনি তারা কৃষ্ণবল্লভকে কয়েদ করে ফেলল। ঠিক এই সময়েই আমি রামরাম সিংহের চিঠি নিয়ে সুতানুটিতে হাজির হলাম। ধূর্জটিমঙ্গলের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির ভার আমার উপর ছিল। কয়েকটা সিন্দুকে অনেক নগদ টাকা, রুপোর বাসন আর গয়নাপত্তর ছিল। আমি সেগুলো তাড়াতাড়ি বারাসতে সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। উমিচাঁদের বাড়িতে আর যাওয়া হল না। উমিচাঁদের সঙ্গে আমার জানাশোনাও তেমন ছিল না, ওরা খুব বড়লোক তো, পাইক বরকন্দাজ পেরিয়ে তবে

মালিকের নাগাল পেতে হয়, তাই যাবার তেমন উৎসাহও পাচ্ছিলাম না। এমন সময় আমার দেখা হয়ে গেল মীর মহম্মদের সঙ্গে। সে ফৌজে চাকরি করত, কিন্তু কি কারণে জানি না, তার চাকরি আর ছিল না! আলাপ ছিল তার সঙ্গে। সে এসে আমার কাছে টাকা ধার চাইলে।"

জগদ্ধাত্রী বলিয়া উঠিলেন—"মীর মহম্মদ! তাকে চেনেন না কি আপনি—"

"আলাপ ছিল। কেন?"

"একজন মীর মহম্মদের ভয়েই তো বাবা আমাকে এই জঙ্গলে তাঁর বন্ধু জন সাহেবের আশ্রয়ে নিয়ে এসেছিলেন। মীর মহম্মদ একদিন আমাকে পুকুরে স্নান করতে দেখেছিল, তারপর থেকে ঘন ঘন আমাদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করল। সবাই বলতে লাগল উনি নবাব সিরাজের একজন দোস্ত। ফৌজে চাকরি আছে কিন্তু ওঁর আসল কাজ নবাবের রঙমহলের জন্য মেয়েমানুষ যোগাড় করা। এই কথা শুনবার পরদিনই বাবা আমাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। চলে এলেন জন সাহেবের আশ্রয়ে। আপনি যে মীর মহম্মদের কথা বলেছেন সে কেমন দেখতে বলুন তো—"

"দেখতে সুপুরুষ। লাল দাড়ি, টিয়াপাখীর ঠোঁটের মতো নাক।"

"এ তো তাহলে সেই লোক। তাকে আমি দেখেছি। একদিন আমাদের বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েছিল!"

"তাই না কি!"

"এর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল? লোকটাকে আপনি টাকা ধার দিলেন—?"

"না দিই নি। তখন আমার হাতে টাকা ছিল না। শুনে সে বলল তাহলে উমিচাঁদের কাছে যাই। উমিচাঁদ কৃপণ বটে, কিন্তু আমাকে 'না' করতে পারবে না। তখন আমি তাকে বললাম—চরাধিপতি রামরাম সিংহ উমিচাঁদকে দেবার জন্য একটা চিঠি দিয়েছিলেন আমাকে। আমি এখনও গিয়ে উঠতে পারি নি। আপনি যখন সেখানে যাচ্ছেন নিয়ে যান চিঠিখানা। চিঠিখানা দিলাম। কিন্তু লোকটা শয়তান। চিঠি সে উমিচাঁদকে দেয় নি। সে চিঠি বিক্রী করেছিল ফোর্ট উইলিয়মের সাহেবদের কাছে। সাহেবরা চিঠি পেয়েই সন্দেহ করল যে উমিচাঁদ নিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে নবাবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা উমিচাঁদকে বন্দী করে ফোর্ট উইলিয়মে পুরে ফেলল। হাজারিমল তখন ভয় পেয়ে বাড়ির মেয়েদের আর বাড়িতে টাকাকড়ি গয়নাপত্র যা ছিল সব নিয়ে অন্য জায়গায় পালাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কিন্তু এ-ও ইংরেজদের সহ্য হল না। তারা দলে দলে সেনা পাঠিয়ে ঘিরে ফেলল উমিচাঁদের বাড়ি। তারা যখন মেয়েদের মহলে ঢোকবার চেষ্টা করছে বুড়ো জগন্নাথ জাতে ছিল সে ক্ষত্রিয়, বাধা দিলে তাদের লোকলস্কর নিয়ে। রক্তারক্তি কাণ্ড হল একটা। জগন্নাথ শেষে দেখলে সাহেবগুলোকে আর রোখা যাচ্ছে না, তারা অন্দরে ঢুকবেই, তখন সে এক ভয়ানক কাণ্ড করে বসল। সে দৌড়ে ভিতরে ঢুকে গিয়ে অন্দরমহলের কপাটটা বন্ধ করে দিল। তারপর মেয়েদের বলল—আমি চিতা তৈরি করছি, তোমরা যদি আত্মসম্মান বাঁচাতে চাও এই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দাও। স্মরণ কর পদ্মিনীর কথা, জহরব্রতের কাহিনী। মেয়েরা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে ভয় পেতে লাগল। তখন ক্ষত্রিয় জগন্নাথ কি করল জানেন? তার হাতে শাণিত তলোয়ার ছিল, সে টপাটপ তেরজন মেয়ের মুণ্ডু কেটে জ্বলন্ত চিতায় ফেলে দিল একে একে। তারপর আত্মহত্যা করবার

জন্যে নিজের বুকে ছুরি বসাল। কিন্তু মরল না সে। ফিরিঙ্গীরা তাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এল। আহত অবস্থায় তাকে বাইরে রেখে আবার অন্তঃপুরে ঢোকবার চেষ্টা করল তারা। কিন্তু পারল না। তখন চারিদিকে আগুন লেগে গেছে। ফিরে এসে তারা জগন্নাথকে পায় নি। আহত অবস্থাতেই সে অন্তর্ধান করেছিল। শুধু অন্তর্ধান করে নি, প্রতিশোধও নিয়েছিল। নবাব সৈন্যের ছাউনিতে গিয়ে নবাব সৈন্যদের কলকাতায় ঢোকবার টালার রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছিল সে। সেই রাস্তায় ঢুকে নবাব ইংরেজদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল কলকাতা থেকে।"

নীলু রায় চুপ করিলেন।

"উমিচাঁদের বাড়ির মেয়েরা সব মরে গেছে তাহলে? লাখপতিয়া বেঁচে নেই?"

"ঠিক বলতে পারব না। তবে খুব সম্ভবতঃ নেই।"

জগদ্ধাত্রী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

তাহার পর প্রশ্ন করিলেন—"ঠাকুরপো আমার একটি উপকার করবেন?"

"কি বলুন—"

জগদ্ধাত্রী উঠিয়া ভিতরে গেলেন। তাহার পর প্রকাণ্ড একটি রামদা লইয়া প্রবেশ করিলেন।

"এই দা দিয়ে আমাকে হত্যা করুন আপনি। আমাকে মুক্তি দিন। এদেশে মেয়েমানুষ হয়ে বাঁচবার আর ইচ্ছে নেই আমার। এদেশে একদিকে মুসলমান, অন্যদিকে ইংরেজ। যে সমাজে বাস করি সে সমাজের পুরুষরা নিষ্ঠুর ভীতু, অমানুষ। তারা গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করে কিন্তু স্ত্রীদের রক্ষা করতে পারে না। স্ত্রীদের দিকে ফিরেও চায় না। তারা নিজেদের নিয়েই মত্ত।"

নীলু রায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কয়েক মুহূর্ত তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথাই সরিল না।

তাহার পর বলিলেন—"আমি আপনার ঘাতক হব? একথা ভাবলেন আপনি কেমন করে! স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে আপনি যা বললেন তা মিথ্যা নয়। এদেশে অধিকাংশ স্ত্রীলোকই বড় অসহায়। কিন্তু আপনি তো ওই অধিকাংশের দলে পড়েন না। আপনি মহেশমঙ্গলের পুত্রবধূ, ধূর্জটিমঙ্গলের স্ত্রী। কলকাতার দেশ, সমাজে ওঁরা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ধূর্জটিমঙ্গল আপনাকে রক্ষা করবার জন্যেই এখানে একটা গৃহস্থালী পত্তন করেছে। জন সাহেবের বিশাল সম্পত্তির অধীশ্বরী করে সে আপনাকে এখানে রেখেছে। জন সাহেবের কালাপল্টনের দল আপনাকে পাহারা দিচ্ছে। স্বয়ং ধলরাজা আপনার সহায়। আপনি নিজেকে অসহায় মনে করছেন কেন?"

"স্বামী কাছে না থাকলে স্ত্রীলোকমাত্রই নিজেকে অসহায় মনে করে। সুতানুটিতে আমাদের বাড়িতে লোকজনের অভাব ছিল না। তবু আমার দুই জাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে, আমার ননদ বারাহীকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে। অন্য ননদদের জগদম্বা, দুর্গা, জয়া, শ্যামাঙ্গিনীকে বেইজ্জত করে মেরে ফেলেছে ওরা। এখানেই বা কখন নবাবের ফৌজ বা ইংরেজের ফৌজ এসে পড়বে কে জানে। যদি আসে তখন আমাকে রক্ষা করবে কে?"

নীলু রায় বলিলেন, "আমি। ধূর্জটি আমাকে সেইজন্যই রেখে গেছে।"

"কিন্তু আপনি একা কি করবেন—"

"কেন দানিয়েল আর তার পল্টন আছে—"

"নবাবের ফৌজ কিংবা ইংরেজের গোরাদের সামনে কি ওরা দাঁড়াতে পারবে? পারবে না। সবাই পালাবে।"

"নবাবের ফৌজ কিংবা ইংরেজের গোরাদের এখানে আসার সম্ভাবনা দেখি না। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।"

"নিশ্চিন্তে থাকুন বললেই নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। উনি থাকলে পারতাম, কিন্তু বাংলাদেশের যে খবর আপনি বললেন তাতে মনে হয় না উনি তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবেন!"

"আমি থাকলে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না বলছেন, ধূর্জটি থাকলেই পারতেন--এটা কি রকম কথা হল বৌঠান?"

"একথা বলছি কারণ স্বামীর চেয়ে বড় ভরসা স্ত্রীলোকের আর কেউ নেই। কিন্তু আমার এমন কপাল যে আমার স্বামী প্রায়ই আমার কাছে থাকেন না। কখন কোথায় যান, কেন যান, তাও বলেন না। এখন হঠাৎ মুর্শিদাবাদ গেলেন কেন সেটার কারণ একটা বলেছেন কিন্তু বিশ্বাস হয় না।"

"না জরুরি দরকারে গেছে।"

"আপনি সব খুলে বলুন।"

নীলু রায় মিথ্যাভাষণ করিলেন।

বলিলেন--"আমি জানি না। একটি কথা বিশ্বাস করুন আপনাকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করব।"

"তাতে আপনার প্রাণটাও যাবে, আমিও রক্ষা পাব না। আমার বাঁচার আর তো দরকার নেই। বংশরক্ষা তো আমি করেছি। আমার দুটো ছেলে হয়েছে। বড় জা বাঁজা ছিলেন বলে উনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। সেজ জার সঙ্গে ও'র মনের মিল হয় নি। তাই আমাকে বিয়ে করলেন। আমি তো যমজ ছেলে দিয়েছি ও'কে। আর আমার বাঁচবার দরকার কি?"

"ওই ছেলে দুটির জন্যই আপনার বাঁচার দরকার।"

"ছেলেরা তো মানুষ হচ্ছে লালী আর কস্তুরীর কাছে। আমার দিকে তো ফিরেও চায় না। ওদের কাছেই খায় শোয়। ওদের সঙ্গেই খেলাধুলো করে। আমাকে তো কারুরই প্রয়োজন নেই। ঝকমারিটা এসেছিল, সে-ও চলে গেল।"

সহসা নীলু রায় যেন জগদ্ধাত্রীর মনের নিগূঢ় বেদনাটার আভাস পাইলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিলেন যে সে বেদনা উপশম করিবার সাধ্য তাঁহার নেই। ইহা লইয়া আলোচনা করিলে বেদনা কমিবে না, বাড়িবে। তাই তিনি প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন।

"এবার শুয়ে পড়ুন। আপনার যদি ভয় করে তাহলে আমি না হয় ধলরাজার সঙ্গে দেখা করে আরও লোকজন আনবার ব্যবস্থা করব। দিন, ওটা দিন আমাকে—"

রামদাখানা লইয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"আপাততঃ আমিই আপনাকে পাহারা দিই এইটে নিয়ে—"

দাখানা লইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

জগদ্ধাত্রী যেমন দাঁড়াইয়াছিলেন তেমনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। নীলু রায় বিছানায়

গিয়া শুইলেন বটে কিন্তু তাঁহার ঘুম আসিল না। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া তিনি অবশেষে উঠিয়া পড়িলেন এবং আবার অন্দরে আসিলেন। দেখিলেন জগদ্ধাত্রী নাই। আর একটু আগাইয়া গিয়া দেখিতে পাইলেন ঠাকুরঘরের কপাট খোলা। সেই খোলা কপাট দিয়া প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল তাঁহার। ঠাকুরঘরের দেওয়ালের গায়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রীর পট, মাটির উপর লক্ষ্মীজনার্দনের রৌপ্যনির্মিত আসন, আসনের চারিদিকে ছোটবড় নানারকম কড়ির ঝাঁপি, ছোটবড় নানারকম পাথরও, কোনটা সিঁদুর মাখানো, কোনটা চন্দনলিপ্ত। চারিদিকে ফুল বিল্বপত্র। ধুপাধারে ধুনো পুড়িতেছে। জগদ্ধাত্রী প্রতিমাবৎ করজোড়ে বসিয়া আছেন। নীলু রায় তাঁহার মুখটা দেখিতে পাইলেন না। পাইলে দেখিতেন মুদিত নয়ন দুইটি হইতে অবিরলধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। সহসা চতুর্দিকে পাখী ডাকিয়া উঠিল। নীলু রায় বুঝিলেন রাত পোহাইয়া গেল। সন্তর্পণে তিনি আবার বাহিরে ফিরিয়া গেলেন। দেখিলেন পূর্বাকাশে ঊষা হাসিতেছে।

নীলু রায় সরদার মাখনলালের বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। কাছাকাছি গিয়াই দেখিতে পাইলেন মাখনলাল একটা খোলা জায়গায় একটা খাটিয়ার উপর চাদর ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে। আর তাহার পাশের খাটিয়াতেই শুইয়া আছে একটা প্রায়-উলঙ্গিনী আদিবাসী রমণী।

নীলু রায় আর কাছে গেলেন না। দূর হইতেই ডাকিলেন—"মাখনলাল ওঠ—"

মাখনলাল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

তাহার পর নিজের গায়ের চাদরটা মেয়েটির গায়ে ফেলিয়া দিয়া তাহার আব্রু রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইল। মেয়েটি উঠিয়া চলিয়া গেল ঘরের ভিতরে।

"নীলুবাবু না কি! আসেন, আসেন—এত ভোরে কি মনে করে?"

"ধুর্জটি চলে যাওয়াতে বৌঠান বড় ভয় পেয়েছেন। তোমার কালা পলটন কত আছে এখানে?"

"এক শ।"

"ইংরেজের ফৌজ যদি আসে—"

"এতদূরে ইংরেজের ফৌজ আসবে না। ওরা এখন ওদেশেই ব্যস্ত।"

"নবাবের ফৌজ—"

"তারা আমাদের দলের লোক। ধলরাজা তাদের তোয়াজ করে রেখেছেন। তারা আমাদের কিছু বলবে না। এখানে নবাবের ফৌজ নেইও বেশী।"

"তাহলে কোনও ভয় নেই বলছ?"

"কিচ্ছু ভয় নেই। মাকে নির্ভয়ে থাকতে বলুন।"

জগদ্ধাত্রীর ভয় যে কি এবং অশান্তির কারণ যে কোথায় তাহার আভাস একটু আগেই তিনি পাইয়াছিলেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে পলটন মোতায়েন করিয়া সে ভয় বা অশান্তি দূর করা যাইবে না। তবু তিনি বলিলেন—"বৌঠানের বাড়ির সামনে তবু তুমি একটু পাহারার বন্দোবস্ত কর। ওদিকটা রাত্রে যেন খাঁ খাঁ করে। সিপাহীদের হাঁকডাক শুনলে বৌঠান নিশ্চিন্ত হবেন—"

"বেশ তার ব্যবস্থা আজ থেকেই করব। তবে কি জানেন কর্তা, ওরা বলবে হ"

জেগে পাহারা দিব। কিন্তু দেবে না। মহুয়ার মদ খেয়ে বেঁহুঁশ হয়ে ঘুমুবে। তবে ব্যবস্থা করব আমি—"

"আচ্ছা, আমি চলি তাহলে। আসব আবার। দাবা খেলবে আজ?"

"আজ একটা কিন্তু অন্য রকম মানস করেছি কর্তা। আপনিও যদি সঙ্গে আসেন তাহলে খুব ভাল হয়। আপনি তো বন্দুকে সিদ্ধহস্ত শুনেছি—"

"শিকারে যাবে না কি?"

"হ্যাঁ, কাছের জঙ্গলে কিছু বটের এসেছে শুনলাম। কিছু মেরে আনব ভেবেছি। খাসা মাংস। তবে জন পিছু দশ বারোটা না হলে পেট ভরবে না। বিশ ত্রিশটা মারতে হবে।"

"বৌঠানকে দিয়ে আর ওসব রাঁধাতে চাই না।"

"বুধু রাঁধবে। ও চমৎকার রাঁধে। জন সাহেব ওর হাতের রোস্ট খুব ভালবাসতেন।"

"বুধু? সে আবার কে!"

'আমার রাঁধুনী। ওই যে ছুঁড়ীটা শুয়েছিল এখানে।"

"বেশ, আসছি তাহলে একটু পরে—। আমিও অনেকদিন বটের খাই নি।"

নীলু রায় পাশেই একটা সরু পথ দিয়া কইলি নদীর দিকে চলিলেন। পথে একটা নিমগাছও চোখে পড়িল। একটা ডাল বেশ নীচু। নীলু রায় লাফাইয়া ডালটা ধরিলেন এবং একটা দাঁতন ভাঙিয়া লইলেন। উদ্দেশ্য কইলির তীরে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিবেন। পথে ঝামরির সহিত দেখা হইল। তাহার হাতে একটি ছোট কচ্ছপ। দড়িতে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার গায়ে একটা কোট।

"কি ঝামরি। কাছিম না কি ওটা? কি করবি?"

"আমি আর কি করব। রঙ্কিনী খাবেক। ভারি নোলা যে উয়ার। নিত্যি লতুন জিনিস খেতে চায়। ক'দিন থেকে রোজ আমাকে স্বপন দিচ্ছে—কাছিম আন, কাছিম আন, কাছিম আন। পায়রা ভাল লাগে না। আজ পেয়ে গেলাম একটা। রেঁধে দিব। বুধি রাঁধবে, আমি সামনে ধরে দিব।"

"এ কোট কে দিল তোকে?"

"ওই কালা পল্টনের এক মিনসে। আমার সঙ্গে পীরিত জমাতে চায়। কোটটা গায়ে দিয়ে তাকে বললাম—ওরে খালভরা মাগারেঁড়ে আমি যে রঙ্কণীর সেবাদাসী, বনের বাঘ সিংহ কাড়া আমার নাগর—তুই আমাকে ছুঁলে তোর সর্বনাশ হয়ে যাবে—বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার বুদ্ধি কে দিলেক তোকে?"

ঝামরি হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার পর সে হঠাৎ কাছিমটা মাটিতে নামাইয়া দুই হাত তুলিয়া প্রণাম করিল কাহাকে। নীলু রায় দেখিলেন একটা গাছের মগডালে একটা বাদামী রঙের গ্যাট্টাগোট্টা পাখী বসিয়া রহিয়াছে। ল্যাজে বাদামী রঙের চওড়া ডোরা। দেখিলেই হিংস্র বলিয়া মনে হয়।

জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি পাখী ওটা?"

"সাপমার বাজ। সাপ খায়। রঙ্কিণীও সাপের শত্রু। মনে হয় রঙ্কিণীর সঙ্গে ওর পীরিত আছে। তাই ওকে দেখলেই গড় করি। আরে এই ফাঁকে, কাছিমটো পালাবার তালে আছে—"

কাছিমটা সত্যই কিছুদূর চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার গায়ে দড়ি বাঁধা ছিল, ঝামরি আবার তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পর গাছের একটা ডাল ভাঙিয়া শপাশপ মারিতে লাগিল তাহাকে।

"পালাচ্ছেন! তোর ভাগ্যি কত যে রক্তকণীর ভোগে লাগবি তুই।"

নীলু রায় এই পাগলীর নিকট বেশীক্ষণ আর দাঁড়াইলেন না। আগাইয়া গেলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরিলেন, দেখিলেন জগদ্ধাত্রী তাঁহার অপেক্ষায় চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন, "এত ভোরে কোথা গিয়েছিলেন ঠাকুরপো?"

"এই একটু বেড়িয়ে এলাম।"

"আমি খাবার নিয়ে কতক্ষণ থেকে বসে আছি। ওরে রুলা দুধটা আবার গরম কর। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আসুন ভিতরে আসুন—"

॥ সাত ॥

এইবার মীর মহম্মদের খোঁজ লওয়া যাক।

এই মীর মহম্মদই জগদ্ধাত্রীকে দেখিয়া মুগ্ধ এবং প্রলুব্ধ হইয়াছিল। এই মীর মহম্মদই জগদ্ধাত্রীর পিতৃগৃহে বারবার যাতায়াত শুধু করিয়াছিল বলিয়া জগদ্ধাত্রীর পিতা রামলোচন একদিন গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া সিংভুমের জঙ্গলে আসিয়া জন সাহেবের আশ্রয়প্রার্থী হন। এই মীর মহম্মদের সঙ্গে নীলু রায়েরও আলাপ ছিল, কারণ নীলু রায় সকলের সহিতই, বিশেষ করিয়া নবাবের কর্মচারীদের সহিত হৃদ্যতা রক্ষা করা পছন্দ করিতেন। তাঁহার মনে হইত নিজের এবং ধূর্জটির বিষয়আশয় তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, রাজকর্মচারীদের সহিত ভাব করিয়া রাখাই ভালো। ধূর্জটিমঙ্গলের সহিত মীর মহম্মদের আলাপ ছিল না, তাহাকে তিনি চিনিতেনও না। মীর মহম্মদ খবর লইবারও প্রয়োজন বোধ করেন নাই যে তাঁহার হৃদয়হারিণীর কোনও স্বামী আছে কি না। রামলোচন যখন জগদ্ধাত্রীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন তখন মীর মহম্মদের মাথাতেও বজ্র পড়িয়াছিল। সিরাজ জানিতে পারিয়াছিলেন যে মীর মহম্মদের সহিত ইংরেজ বণিকদের দহরম মহরম আছে। সেই সময় ঢাকায় ঘসেটি বেগমের আশ্রয় না পাইলে মীর মহম্মদ মহা বিপদে পড়িতেন। ইংরেজেরই অনুরোধে ঘসেটি বেগমের দক্ষিণ হস্ত রাজা রাজবল্লভ মীর মহম্মদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বেশীদিন এ সৌভাগ্য রহিল না। কিছুদিন পরেই ঘসেটি বেগম মুর্শিদাবাদে আসিয়া মতিঝিলে বসবাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় মীর মহম্মদকেও মুর্শিদাবাদ আসিতে হইল। আসিবামাত্র তিনি কয়েদ হইলেন। ইংরেজদের 'দস্তুক' লইয়া তিনি ব্যবসায় করিতেন এ কথা কাজী সাহেবের নিকট প্রমাণিত হইয়া গেল। মীর মহম্মদ প্রেমিক লোক। রূপসী রমণী দেখিলেই তিনি প্রেমে পড়িয়া যাইতেন। কারাগারে বিগত জীবনের প্রেমাস্পদাদের স্মৃতিচারণই তাঁহার অবসর বিনোদনের একমাত্র উপায় ছিল। যাহাদের তিনি ভোগ করিয়াছিলেন তাহাদের মুখ তাঁহার মনে তেমন একটা জাগিত না, কিন্তু যাহাদের তিনি ভোগ করিতে পারেন নাই, যাহারা

আলেয়ার মতো তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া অন্ধকারে আবার মিলাইয়া গিয়াছে তাহাদের কথাই বারবার মনে পড়িত তাঁহার। বিশেষ করিয়া মনে পড়িত নাচওয়ালী ফৈজু বাঈয়ের মুখটা। তাহাকে মীর মহম্মদই আবিষ্কার করিয়াছিল দিল্লীতে। কিন্তু তাহাকে গ্রাস করিলেন সিরাজ। দুই লক্ষ টাকা দিয়া তাহাকে কিনিয়া লইলেন। কিন্তু অমন রূপসী বাঈজী কি রূপার শিকলে চিরকাল বাঁধা থাকিতে পারে? কিছুদিন পরেই সিরাজের এক আত্মীয়ের সহিতই ফৈজু ধরা পড়িল। সিরাজ তাহাকে যে শাস্তি দিলেন তাহা ভয়ানক। তিনি একটা শূন্য কক্ষে ফৈজুকে পুরিয়া তাহার জানালা দরজা বন্ধ করিয়া চারিদিক ইঁট আর পাথর দিয়া গাঁথিয়া দিলেন। ফৈজুর জীবন্ত সমাধি হইয়া গেল। ফৈজুর মুখখানা মীর মহম্মদের মনে বারবার ভাসিয়া উঠিত। আর ভাসিয়া উঠিত জগদ্ধাত্রীর মুখটা। সে তো মরে নাই—সে নিশ্চয়ই কোথাও বাঁচিয়া আছে। খোঁজ করিলেই আবার হয়তো তাহার নাগাল পাইতে পারিত। রামলোচনকে চাপ দিলেই কাজ হইত এবং সে চাপ তিনি মনসবদার সাহেবকে দিয়াই দেওয়াইতে পারিতেন। কিন্তু সিরাজের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া কারাগারে আসিতে হইল, সমস্ত বরবাদ হইয়া গেল। এখন চিন্তাতেই সুখ, সিরাজের কারাগার তাঁহার মনকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। কিন্তু একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বিধি প্রসন্ন হইলেন। নিরাশার অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোর রেখা দেখা গেল। বন্দী হইয়া জন সাহেব রোশনী, শাওনী এবং তির্কিকে লইয়া ঠিক তাঁহার পাশের ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেয়ে তিনটি কালো, কিন্তু যৌবনরসে পরিপূর্ণ, স্বাস্থ্যবতী, হাসিখুশি। আনন্দের ফোয়ারা যেন তিনটি। শুধু মীর মহম্মদই নয়, স্বয়ং কারাধ্যক্ষ পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কারাধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত মীর মহম্মদের আলাপ ছিল। তিনি যদি ভীতু লোক না হইতেন তাহা হইলে মীর মহম্মদকে হয়তো ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহার ভয় ছিল মীর মহম্মদকে ছাড়িয়া দিলে তাঁহার চাকরি তো যাইবেই, গর্দানও যাইতে পারে। খামখেয়ালী সিরাজের অসাধ্য কাজ কিছু নাই। কিন্তু তিনি মীর মহম্মদকে একটি পরামর্শ দিলেন। মীরজাফরের পাষণ্ড পুত্র এবং সিরাজের শত্রু মীরণের সহিত এককালে মীর মহম্মদের না কি পরিচয় ছিল। কারাধ্যক্ষ বলিলেন, এই পরিচয় সূত্র ধরিয়া আপনি মীরণকে অনুনয়-বিনয় করিয়া একটি পত্র লিখুন যাহাতে তিনি আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করেন। মীরণ চেষ্টা করিলেই মীরজাফরকে দিয়া অনায়াসে আপনার খালাসের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। তুর্কি খাঁ তখন বাধা দিতে পারিবেন না। আপনি ফৌজে চাকুরি করিতেন, মীরজাফরই এখন সেনাপতি। তাঁহার হুকুম-নামা পাইলেই আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিব। সেকালে বিনা অর্থে কোন কিছু হইবার উপায় ছিল না। কারাধ্যক্ষ বলিলেন—আপনি এক হাজার এক আসরফি যোগাড় করুন। আমি আপনার পত্রের সহিত মীরণ সাহেবকে ওই আসরফিগুলি পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিব। মনে হয় ইহাতে কাজ হইবে। কিন্তু কারাগারে বসিয়া এক হাজার এক আসরফি যোগাড় করিতে তাঁহার বিলম্ব হইয়া গেল। তিনি তাঁহার অন্দরমহলে খবর পাঠাইলেন। তাঁহার অনেকগুলি বিবি ছিল, তাঁহারাই নিজ নিজ 'জেবর' (গহনা) বন্ধক দিয়া বা বিক্রয় করিয়া অর্থটা সংগ্রহ করিলেন। যে ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে অপহরণ করিয়া তিনি হারামে পুরিয়াছিলেন সে-ই না কি সর্বাপেক্ষা বেশী দিয়াছিল। তিনি

তাহার নামে যে গল্পটা বানাইয়া ধূর্জটিমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন, তাহা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি পতিব্রতা রমণী, গুণ্ডা লাগাইয়া স্বামীকে খুন করিবেন ইহা তাঁহার কল্পনাতীত। গুপ্তঘাতকের ভয়ে নয়, অন্য কারণে মীর মহম্মদ সিংভুমের জঙ্গলে ঢুকিয়াছিলেন। জন সাহেব তাঁহার সঙ্গিনী তিনজনকে লইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। আগেই বলিয়াছি রোমনি, শাওনি ও তির্কি কারাধ্যক্ষ এবং মীর মহম্মদকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ইহাদেরই সহায়তায় জন সাহেবের সহিত মীর মহম্মদের যোগাযোগ ঘটিল। অবশ্য বে-আইনী-ভাবে। যেখানে তিন তিনটি প্রস্ফুটিত-যৌবনা রমণী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সেখানে পুরুষ আইন রক্ষক কতক্ষণ আইনের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন ? পারিলেন না। জন সাহেবের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে সহসা জন সাহেবের নিকট মীর মহম্মদ জানিতে পারিলেন যে কমলপুরের রামলোচনের কন্যা 'জ্যাগাট্রিকে' তিনি আশ্রয় দিয়াছেন। কথাটা বলিয়াই জন সাহেব বুঝিতে পারিলেন ভুল করিয়াছেন। মুসলমানদের ভয়েই তো জর্জেটি জাগাট্রিকে তাঁহার আশ্রয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সে খবরটা তিনি একজন মুসলমানকে বলিতে গেলেন কেন। খবরটা শুনিবামাত্র মীর মহম্মদ সাগ্রহে বলিলেন—"তাই না কি। রামলোচনের মেয়ে আপনার আশ্রয়ে আছে ? রামলোচন যে আমার বন্ধু। জগদ্ধাত্রীর সঙ্গেও আমার ভাব হয়েছিল। যদি ছাড়া পাই তার সঙ্গে দেখা করে আসব। কোন কোন পথ দিয়ে আপনার মুলুকে পেঁছিতে হয় তা আমাকে বলুন না।" জন সাহেব বলিলেন, "মুখে বললে আপনি ঠিক যেতে পারবেন না। আমার সঙ্গে যে মেয়েগুলি আছে তাদের সঙ্গে যদি যান তাহলে তারা দেখিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবে। আর আমাকে যদি কয়েদ থেকে খালাস করতে পারেন তাহলে তো আমিই সব ব্যবস্থা করব।" মীর মহম্মদ বলিলেন—"বেশ বেশ, আমি সে চেষ্টা করব।" মীরণ সাহেবকে টাকা খাওয়াইয়া ফল হইয়াছিল। মীরজাফরের আদেশে মীর মহম্মদ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। জন সাহেব সাহেব বলিয়া মুক্তি পান নাই। মীর মহম্মদ মীরণকে কুর্নিশ করিয়া নিবেদন করিলেন—খোদাবন্দ অন্ততঃপক্ষে ওই তিনটি সিংভুমী আওরতকে যদি ছাড়িয়া দেন ভালো হয়। সিংভুম হইতে আপনার জন্য একটি খুপসুরৎ হিন্দু বিবি আনিয়া দিব মনস্থ করিয়াছি, সে বিবি যেখানে আছে তাহার ঠিকানা উহারা জানে। উহাদের ছাড়িয়া দিলে আমাকে উহারা পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে বলিয়াছে। বিবিটি অপরূপ, ফৈজু নাচওয়ালীর চেয়েও দেখিতে ভালো। পবিত্র হিন্দুবংশের মেয়ে বলিয়া তাহার একটা খুশবাই আছে। মীরণ পাষণ্ড ছিলেন, কিন্তু বেরসিক ছিলেন না। তিনি বুঝিলেন বেতমিজটা ওই মেয়ে তিনটির প্রতি আসক্ত হইয়াছে। তাহাদেরও ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন তিনি। রোমনী জন সাহেবকে ছাড়িয়া গেল না। পথপ্রদর্শক হইয়া শাওনী ও তির্কি মীর মহম্মদের সঙ্গী হইল। যাত্রা করিবার পূর্বে জন সাহেবের সঙ্গে শাওনী ও তির্কির গোপন পরামর্শ হইয়াছিল একটা। জন সাহেব তাহাদের একটি আঙটি দিয়া বিশেষ করিয়া দুইটি নাম মনে করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন ধুমশা আর টনটা। দুইজনেই গভীর অরণ্যানিবাসী। মীর মহম্মদ শাওনী ও তির্কিকে লইয়া কিছুদূর অশ্বারোহণে গিয়াছিলেন। কিন্তু সিংভুমের জঙ্গল আরম্ভ হইতেই শাওনী এবং তির্কি বলিল—"আর ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়া যাইবে না। এবার জঙ্গলের পথে হাঁটিয়া যাইতে হইবে।

এখন ঘোড়া তিনটিকে বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।" মীর মহম্মদ তাহাই করিলেন এবং তাহাদের সহিত হাঁটিয়া যাইতে লাগিলেন। পদব্রজে ভ্রমণ করা তাঁহার তেমন অভ্যাস ছিল না। পাহাড়ে ওঠা-নামা বিস্তর, তাছাড়া জঙ্গলের পথও ক্রমশঃ দুর্গম হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু মীর মহম্মদের অন্তরে জগদ্ধাত্রীর মুখখানি ভাসিয়া উঠিতেছিল, যে বহ্নি এতদিন ভস্মাচ্ছন্ন ছিল তাহা ক্রমশঃ শিখাময়ী হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। পদব্রজেই তিনি পাহাড়ের চড়াই ওতরাই ভাঙিয়া প্রস্তরাকীর্ণ অরণ্যপথে ক্ষতবিক্ষত চরণ হইতে লাগিলেন। প্রেমের জন্য এতদপেক্ষা অনেক কষ্ট অনেকে ভোগ করিয়াছেন শুনিয়াছি। কিন্তু মীর মহম্মদকে যাহা দুর্নিবার টানে টানিতেছিল তাহা প্রেম নয় রিরংসা। কিন্তু তিনি সুখী মানুষ, ঘোড়ায় তাঞ্জামে চড়িয়া ভ্রমণ করাই তাঁহার অভ্যাস, তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছিল। মাঝে মাঝে তিনি পথে বসিয়া পড়িতেছিলেন। শাওনী আর তির্কি'র কিন্তু শ্রান্তি নাই। তাহারা বন্য হরিণীর মতো ক্ষিপ্র চপল-গতিতে হাসিতে হাসিতে গান গাহিতে গাহিতে কিছুদূর আগাইয়া যাইতেছিল, মীর মহম্মদ বসিয়া পড়িলে আবার ফিরিয়া আসিতেছিল, ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর জঙ্গলে প্রবেশ করিতেছিল তাহারা। অবশেষে ঠিক হইয়াছিল একদিন বিশ্রাম করিয়া একদিন পথ চলিবেন মীর মহম্মদ। এ দুরূহ পথে একটানা হাঁটা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতেছিলেন তিনি।

এইরূপ একটি বিশ্রামস্থানে পর্বতগুহায় তাঁহার সহিত ধূর্জটিমঙ্গলের যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার বিবরণ পাঠক-পাঠিকা ইতিপূর্বেই পাঠ করিয়াছেন।

...বন ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। শাল, পিয়াল, শিশু, শিমুল, দেবদারু, শিরিষ—বহু রকম গাছ। মহুয়া গাছও প্রচুর। মাঝে মাঝে গাছগুলি এত ঘন এবং তাহাদের ঘিরিয়া বন্য লতাসমূহের এমন ঘনবিতান যে দিনের বেলাতেও পথ দেখা যায় না। একটা অস্পষ্ট সরু পায়ে চলার পথ আছে কিন্তু মীর মহম্মদ তাহা ঠিক মতো অনুসরণ করিতে পারিতেছিলেন না। মাঝে মাঝে বন্য জন্তুর চীৎকার শোনা যাইতেছিল, হরিণ খরগোশ তাহাদের সাড়া পাইয়া গহন বনে আত্মগোপন করিতেছিল, তীক্ষ্নকণ্ঠ পক্ষীর চীৎকার বন্য স্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করিয়া আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছিল মীর মহম্মদকে। শাওনী ও তির্কি তাঁহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। সত্যই তিনি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশাল মহীরুহ পরিবৃত রৌদ্রকরশূন্য, লতাআচ্ছাদিত বনস্থলীকে বিরাট রহস্যময় একটা প্রেতপুরী বলিয়া মনে হইতেছিল। বড়ই আতঙ্কিত হইয়াছিলেন তিনি। যদিও খুব পরিশ্রান্ত, তবু এখানে বিশ্রাম করিবার সাহস হইতেছিল না তাঁহার। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। হঠাৎ শাওনী ও তির্কি তাঁহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে গিয়া আত্মগোপন করিল! ক্ষণপরেই তিনি দেখিলেন বিরাট একটা ভালুক হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল।

"আর চলতে পারছি না আমি খুসবু।"

"তাহলে ওই ছোট গাছটায় ওঠ। আমরাও আর একটা গাছে উঠি।"

"বড় ক্ষিধে পেয়েছে।"

"কলা খাও।"

দুইজনেই কোঁচড়ে করিয়া অনেক পাকা কলা আনিয়াছিল। একটি ছোট গাছে মীর মহম্মদকে তাহারা উঠাইয়া দিল। পাশের গাছটিতে তাহারাও চড়িল।

এইভাবেই পথ চলিতে লাগিল তাহারা।

সাতদিন এইভাবে চলিবার পর সহসা তাহারা জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া একটা খোলা-মেলা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জায়গাটা পর্বতের একটা সানুদেশ। ঠিক তাহার নীচেই প্রকাণ্ড একটা লম্বা গভীর গর্ত, চওড়াও কম নয়। পাহাড়ী নদীর শুষ্ক খাত। বর্ষার সময় এই খাত দিয়া প্রবল বেগে জলধারা প্রবাহিত হয়। এখন শুষ্ক। খাতের ওপারেও অনেকখানি জায়গা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রকাণ্ড আটচালার মতো একটা বাড়িও রহিয়াছে। বাহিরে কয়েকটা হরিণের চামড়া শুকাইতেছে।

তির্কি বলিল—"এবার আমরা এস্যা গেছি।"

শাওনী বলিল—"এ খাতটা কিন্তু পার হতে হবেক।"

খাদের দিকে চাহিয়া মীর মহম্মদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। বলিলেন—"ও খাত আমি পার হতে পারব না—"

"আচ্ছা আমরা লোক আনছি তাহলে—"

তরতর করিয়া তাহারা দুইজন খাতের মধ্যে নামিয়া গেল। মীর মহম্মদ বসিয়া রহিলেন। দেখিলেন দূরে আরও গভীর জঙ্গল। বড় বড় গগনস্পর্শী গাছ ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিতে পাইলেন—ওই জঙ্গলের ধারে প্রকাণ্ড আর একটা ঘর রহিয়াছে। ঘরের দেওয়াল ছাদ সব বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়া তৈরী। প্রকাণ্ড উঁচু উঁচু দেওয়াল। দেওয়াল বাহিয়া অনেক বন্য লতা উঠিয়াছে। মীর মহম্মদ ভাবিতে লাগিলেন—ইহাই কি জন সাহেবের আস্তানা? এইখানেই কি জগদ্ধাত্রী আছে? আকুল উৎসুক নয়নে তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এ স্থানটা জন সাহেবেরই জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে এই আস্তানার হর্তাকর্তাবিধাতা ধুমসা এবং টণ্টা। তাহারা এইখানে বাস করিয়া বন্য পশুপক্ষী ধরে, কখনও তাহাদের মারিয়া চামড়া ছাড়াইয়া লয়, কখনও বা জীবন্ত অবস্থায় তাহাদের খাঁচায় পুরিয়া রাখে। উদ্দেশ্য—বিদেশে চালান দিয়া অর্থোপার্জন করা। ধুমসা এবং টণ্টা দুইজনেই ভীষণাকৃতি, দুইজনেই শালপ্রাংশুমহাভুজ ব্যূঢ়োরস্ক তালজঙ্ঘা গজস্কন্ধ দানব। দুইজনেরই মুখে প্রচুর শ্মশ্রুগুম্ফ মাথায় জটা, দুইজনেরই হাতে বড় বড় নখ, দুজনেরই চোখে তীক্ষ্ণ ধূর্ত দৃষ্টি, দুইজনেই বৃকোদর, দুইজনেরই সর্বাঙ্গে বহু ক্ষত চিহ্ন। টণ্টার নাকের খানিকটা নাই, বৃহৎ একটা ভালুকের সহিত মল্লযুদ্ধ করিবার সময় ভালুকে নাকে থাবা মারিয়াছিল। ইহারা সাধারণতঃ ফাঁদ পাতিয়া বন্য পশুপক্ষী ধরে, প্রয়োজন হইলে সম্মুখ যুদ্ধেও পশ্চাৎপদ হয় না। ধুমসা সম্মুখ যুদ্ধে গদাঘাতে যে বাইসনটাকে মারিয়াছিল তাহার মুণ্ডটা সে বিক্রয় করে নাই, রাখিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে সেটাকে নমস্কার করে আর বলে—হুঁ, বীর ছিলে তুমি। তোমাকে গড় করি। ইহাদের দুইজনের ভাষাও খিচুড়ি ভাষা। আদিবাসী রমণীর গর্ভে এবং বিদেশী জলদস্যুদের ঔরসে দুইজনেরই জন্ম। পূর্বে ইহারাও ডাকাতি করিত। আদিবাসীদের

ভাষা, বাংলা ভাষা, উড়িয়া ভাষা, ইংরিজির বুকুনি, ওলন্দাজ পর্তুগীজদের ভাষায় টুকরো সব মিলাইয়া ইহাদের ভাষা। ইহারা ডাকাত ছিল। জন সাহেব ইহাদের চাকরি দিয়াছেন। ইহাদের সব ভার বহন করেন, সব আবদার সহ্য করেন, এই অঞ্চলটায় মালিকই করিয়া দিয়াছেন ইহাদের। ইহারা কেবল তাঁহাকে পশু ধরিয়া দেয়, কিংবা পশু মারিয়া, পাখী মারিয়া তাহাদের চামড়া ছাড়াইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দেয়। পশু এবং পক্ষীর চর্ম বিক্রয় জন সাহেবের লাভজনক ব্যবসায়। ধুমসা এবং টণ্টা জন সাহেবকে দেবতার মতো ভক্তি করে। জন সাহেব শাওনীকে তাঁহার আঙটিটি খুলিয়া দিয়াছিলেন। এই আঙটিই তাঁহার ফরমান। এইরূপ আঙটি তাঁহার অনেক আছে। যখনই যেখানে দূত পাঠান এবং যেখানে দূতের হাতে চিঠি পাঠানো সম্ভব নয়, সেখানে তিনি এই আঙটি পাঠান। আঙটিতে বিশেষত্ব তেমন নাই। লোহার আংটি, তাহার সহিত একটা লোহার মোহরও যুক্ত। মোহরের উপর একটি ক্রশ চিহ্ন। ক্রশের লম্বা দাঁড়িটা ইংরেজি J অক্ষর। এই আংটি যে নীরব বার্তা বহন করে সে বার্তাটি এই—আংটির বাহক বা বাহিকা আমার বিশ্বাসভাজন। তুমিও ইহাকে বিশ্বাস করিও এবং এ যাহা বলে তদনুসারে কাজ করিও।

শাওনী বলিল—"খালের উ পারে লোকটি বসে আছে সে সাহেবের স্যাঙাতের পরিবারের সংগে পীরিত করতে চায়। আমরা উয়াকে ভুলিয়ে এখানে লিয়ে এসেছি তুদের কাছে। তুরা উয়ার ব্যবস্থা কর।"

ধুমসা গর্জন করিয়া উঠিল—"লিশ্চয় করব। ফট্।"

প্রতি কথার শেষে 'ফট্' উচ্চারণ করা ধুমসার একটা মুদ্রাদোষ।

তির্কি বলিল—"সায়েব বলেছে উয়াকে নিকাশ করে দাও একেবারে। আপদ চুকিয়ে দাও।"

টণ্টা বলিল –"তাই দেব। একটা আছাড় মারলেই দফা শেষ হয়ে যাবে বাছাধনের—"

ধুমসা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল—"লাগরকে আছাড় মারবি কি রে? ফট্। লাগরকে লাগরীর কাছে পাঠাতে হবেক। ফট্।"

তির্কি শাওনী দুইজনেই হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

"এখানে লাগরী কোথা পাবি তুরা?"

"কাল একটা বাঘিনী ধরেছি। ওই ঘরটায় আটকানো আছে। তারই মুখে ফেলে দিব উকে। ফট্।"

মীর মহম্মদ দূর হইতে কাঠের গুঁড়িনির্মিত যে ঘরটা দেখিতে পাইয়াছিলেন ধুমসা হাত তুলিয়া সেই ঘরটা দেখাইল তির্কিকে।

"উটাকে এখানে আনা করা তাহলে। উ বলছে খাল পেরাতে লারবেক।"

"এখুনি আনা করাচ্ছি। ফট্। তালতা, ও তালতা—শুনে যা—"

ঘরের পিছন হইতে দীর্ঘ বলিষ্ঠ এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল।

"তাল্তা তুই মুর্গাকে নিয়ে খালের ওপারে যা। ফট্। সেখানে একটা লোক আছে। তাকে বেঁধে টানতে টানতে লিয়ে আয় এখানে। ফট্। মজবুত কাতা দড়ি নিয়ে যা—"

তালতা ও মুর্গা চলিয়া গেল।

শাওনী বলিল—"সাহেব কয়েদ হয়ে আছে মুকস্দাবাদে। আমরা সেখানেই ফিরে যাই এবার। সাহেবকে কয়েদ থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবেক। চল রে তির্কি—"

"আজ আর গিয়ে কাজ নাই। ফট্। কাল যাবি—"

ধুমসা হঠাৎ শাওনীকে দুই হাত দিয়া শূন্যে তুলিয়া ধরিল। শাওনী খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "নামায়ে দাও, নামায়ে দাও, এসব কি কাণ্ড তোমার!"

"আচ্ছা তাহলে আমার কাঁধের উপর বস্। তোকে কাঁধে করে নাচি একটু। ফট্। বেশ ডাগর মেয়ে বটিস তুই। ফট্—"

ধুমসা শাওনীকে কাঁধে করিয়া নাচিতে লাগিল।

টম্টা তির্কিকে ধরিতে গেল। তির্কি ধরা দিল না, ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু টম্টার সহিত পারা শক্ত। অবশেষে সেও ধরা পড়িয়া গেল।

তাল্তো আর মুর্গা খাল পার হইয়া দেখিল কেহ নাই। মীর মহম্মদ অন্তর্ধান করিয়াছেন।

শাওনী ও তির্কি চলিয়া যাইবার পর মীর মহম্মদের অন্তর্যামীই সম্ভবতঃ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন গতিক সুবিধার নহে, অবিলম্বে সরিয়া পড়। এরকম নির্জন গভীর অরণ্যে রামলোচনের কন্যা বাস করিতেছেন একথা বিশ্বাস করা শক্ত। তাহার পর তিনি এপারে বসিয়াই ধুমসা ও টম্টাকে দেখিতে পাইলেন। মানুষ নয় যেন পাহাড়। তিনি আর কালবিলম্ব করিলেন না। পুনরায় অরণ্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রান্ত ছিলেন বলিয়া ছুটিতে পারিলেন না, কিন্তু যতটা সম্ভব দ্রুতবেগেই গেলেন তিনি। তাল্তো ও মুর্গা আসিবার পূর্বেই তিনি অরণ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। জগদ্ধাত্রীকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মনে যে লালসা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, এই দুর্গম পথে চলিতে চলিতে তাহাও যেন অনেকটা নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে একটি রমণীর জন্য এতটা পরিশ্রম করা পণ্ডশ্রম মাত্র। শেষ পর্যন্ত তাহাকে পাইবেন কিনা তাহারও স্থিরতা নাই। তাছাড়া ধূর্জটিমঙ্গলকে দেখিবার পর হইতে তাঁহার মনে আর একটা কাণ্ড ঘটিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন যে লোকটা এত ভদ্র, যে লোকটা এত ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী, যাহার সঙ্গে অশ্বারোহী সেনাদল রক্ষীস্বরূপ মোতায়েন থাকে—সেরূপ লোকের সহিত শত্রুতা করিয়া লাভ কি। বন্ধুত্ব করিলেই বরং লাভ বেশী। যিনি অযাচিতভাবে তাঁহাকে পঞ্চাশ আসরফি দিয়া যাইতে পারেন তিনি শুধু ধনী নন, উদারও। ইঁহার পত্নীকে নষ্ট করিবার চেষ্টা খুবই অন্যায়। ইঁহার শত্রুতা কাম্য নয়, বন্ধুত্বই কাম্য। এসব কথা তাঁহার আগে হইতেই মনে হইতেছিল। এখানে আসিয়া এবং ওই দুটি মনুষ্যপর্বতকে দেখিয়া তিনি স্থির করিয়া ফেলিলেন পলাইতে হইবে। মুর্শিদাবাদেই ফিরিতে হইবে আবার। সম্ভব হইলে ধূর্জটিমঙ্গলকে আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইবে।

॥ আট ॥

ধূর্জটিমঙ্গল নির্বিঘ্নেই মুর্শিদাবাদে পেঁৗছিলেন। দেখিলেন মুর্শিদাবাদের সকলেই বেশ চঞ্চল। কিছুদিন আগেই ইংরেজরা না কি হুগলী আক্রমণ করিয়া

শহরটিকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। অনেক বাড়ি পুড়িয়াছে, অনেক প্রাচীন কীর্তি ধ্বংস হইয়াছে, বহুলোকের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, বণিকবেশী ইংরেজ দস্যুরা হুগলিকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। নররূপী পশু গোরাদের হস্তে পুরস্ত্রীরাও লাঞ্ছিত হইয়াছেন। আপামরভদ্র সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। অনেকে মুর্শিদাবাদে পলাইয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা তাহা পারেন নাই তাঁহারা অনেকে হুগলী ছাড়িয়া দুর্গম পল্লীগ্রামে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। ধূর্জটিমঙ্গলের পিতৃবন্ধু পাণ্ডব-প্রধান খান মহাশয়ের মুর্শিদাবাদে বাড়ি ছিল। তিনি যদিও ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত কিন্তু আলীবর্দী খাঁর অনুগ্রহভাজন ছিলেন বলিয়া খান উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন! ধূর্জটিমঙ্গল মুর্শিদাবাদে আসিলে তাঁহার বাড়িতে ওঠেন। এবারও উঠিয়াছেন। খান মহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। বয়স সত্তর পার হইয়াছে। মাথায় একমাথা পাকা বাবরি চুল। শৌখিন গোঁফ দাড়িও পাকা। এ বয়সে লোকে সাধারণতঃ ধর্ম চর্চা করেন, কিন্তু খান মহাশয়ের ধর্মে মতি নাই, মতি রাজনীতিতে। তিনি ধূর্জটিমঙ্গলকে বলিলেন, "দেখ ধূর্জ, তুমি এসময় এসেছ, বড় ভাল হয়েছে। আমি অকূলপাথারে পড়ে গেছি ঃ মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা হয় এ দেশ ত্যাগ করে জঙ্গলমহলে চলে যাই। এখানে ভদ্রলোকেরা আর ভদ্রস্থ নেই। তুমি শুনলাম সিংভুমে পরিবারকে নিয়ে গেছ, খুব উত্তম কাজ করেছ। আমাকেও নিয়ে চল সেখানে। যাবে ?"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"যাব। কিন্তু আপনি কি সেই জংলী দেশে থাকতে পারবেন ?"

"পারা উচিত। কিন্তু পারব না। মুশকিল হয়েছে কি জান ? ঘুগনি খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে, সেখানে ঘুগনি তো পাওয়া যাবে না।"

"ঘুগনি ? তা যাবে না কেন ?"

"আই দেখ, তুমি কি বুঝতে কি বুঝলে। ছোলার ঘুগনি নয়, খবরের ঘুগনি। নবাব পক্ষের খবর, নবাবের আমীরওমরাহদের খবর, ইংরেজদের খবর, ফরাসীদের খবর, এইসব পাঁচরকম খবর মিলিয়ে যে ঘুগনি-খবর তৈরী হয় তা তো জংলী দেশে পাওয়া যাবে না। এই ঘুগনি খাওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আমি আপিং খাই। কিন্তু ওই খবরের ঘুগনি না হলে আপিঙের মৌতাতও জমে না। কি করি বল তো। অথচ এদিকে ভয়ে প্রাণ ধুকপুক করছে কখন কি হয় !"

"আপনার ছেলেরা কোথায় ?"

"তাদের কেউ নবাব পক্ষে, কেউ ইংরেজ ওয়াটসের মোকামে, কেউ মীরজাফরের মোসাহেবদের দলে, মোহনলালের বাড়িতেও যাতায়াত করছে একজন। ওরাই ঘুগনির মালমসলা যোগাড় করে আনে। ঘুগনি মজাদার, কিন্তু ধুকপুকুনি যায় না। ছিলাম পাণ্ডব দেবশর্মা, হয়েছি পাণ্ডব খাঁ। অদৃষ্টে আরও কি আছে জানি না !"

ধূর্জটিমঙ্গল সসম্ভ্রমে বলিলেন—"ভয় করবেন না। আমি আপনার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করব। আমার সঙ্গে কিছু সিপাহী সান্ত্রী আছে ! তারা—"

"আই দেখ, তুমি কি বুঝতে কি বুঝলে। সিপাই সান্ত্রী আমারও আছে। কিন্তু আপৎকালে কেউ থাকবে না, সবাই চোঁ চোঁ দৌড় দেবে। আমিও যাতে দৌড় দিতে পারি তার একটা ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। আমার ঘোড়াটা মারা গেছে, খুব ভালো ঘোড়া ছিল, একটানা বিশক্রোশ ছুটতে পারত। আমার ছেলেদের বারবার বলছি,

আমাকে একটা ভালো ঘোড়া কিনে দাও, বেগতিক দেখলে তার পিঠে চড়ে চম্পট দেব। কিন্তু ওরা গড়িমসি করছে, কিনে দিচ্ছে না। ভাল ঘোড়া পাওয়াও শক্ত, এ অঞ্চলে কাছাকাছি যত ভাল ঘোড়া ছিল নবাবের ফৌজ নিয়ে নিয়েছে সব—"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমি আজই একটা ভালো ঘোড়া আপনাকে দেব। আমার সঙ্গে খুব ভালো একটা ঘোড়া আছে—"

"তোমার কথা শুনে ভরসা পেলাম বাবা। মহেশের ছেলে তুমি, তুমি তো একথা বলবেই। মহেশ দিকপাল ছিল একটা।"

পান্ডব খাঁ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। মহেশমঙ্গলের স্মৃতিই বোধহয় তাঁহাকে নির্বাক করিয়া রাখিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তাহার পর তিনি প্রশ্ন করিলেন—"এই হট্টগোলের সময় তুমি এসে পড়লে কেন?"

"আমি একটু বিশেষ বৈষয়িক কাজে এসেছি—"

"কলকাতায় তোমাদের সম্পত্তি ছিল। কলকাতা তো পুড়ে গেছে শুনেছি। তোমাদের বাড়িও পুড়েছে নিশ্চয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"নবাব সাহেব শুনছি ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করেছেন একটা। তাতে একটা শর্ত না কি আছে যে তাঁর সৈন্যরা যে সব বাড়িঘর কলকাতায় পুড়িয়েছে তার খেসারত দেবেন তিনি। খাজাঞ্চি বিভাগের আলাউদ্দিন মিঞাকে একটু তোয়াজ কর গিয়ে। মবলগ কিছু পেয়ে যাবে। তোয়াজ মানে বুঝেছ তো? এই--"

তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে তিনি টাকা বাজাইবার মুদ্রাটি প্রদর্শন করিলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলিলেন না।

বলিলেন -"আমি একটু বেরুচ্ছি। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরব।"

"খাওয়া দাওয়া করেছ তো?"

"করেছি। মা আমাকে অনেক খাইয়ে দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ। বুড়ীর তো আর কোন কাজ নেই। লোক পেলেই ধরে ধরে খাইয়ে দেয়।"

"আমি চললাম তাহলে—"

যাইবার পূর্বে ধূর্জটিমঙ্গল হেঁট হইয়া প্রণাম করিলেন তাঁহাকে।

"জয়োস্তু। তুমি আলাউদ্দিনকে আমার নাম করে বোলো তাহলে ঠিক ব্যবস্থা করে দেবে। আমার সঙ্গে খাতির আছে ওর।"

ধূর্জটিমঙ্গল আলাউদ্দিনের কাছে গেলেন না, গেলেন মৈনি বিবির কাছে। আসিয়াই তাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন তিনি। চিঠিগুলিও দিয়া আসিয়াছিলেন। মৈনির আগ্রহাতিশয্য সত্ত্বেও কিন্তু তাহার বাড়িতে তিনি থাকিতে সম্মত হন নাই। ইহাতে ক্ষুন্ন হইয়াছিল মৈনি। বলিয়াছিল—"এ বাড়ি তো আপনার। আপনি কিন্তু একদিনও এখানে থাকেননি।"

মৃদু হাসিয়া ধূর্জটিমঙ্গল উত্তর দিয়াছিলেন—"তুমি তো আছ। ওসব কথা থাক, আমার কাজের কতদূর কি হল?"

"চিঠি সব ঠিক ঠিক জায়গায় পেঁাছে দিয়েছি। কি আছে চিঠিতে?"

"তা বলব না, সেটা গোপনীয়। একটা কথা বল তো—তুমি তো সব জায়গায়

ঘোর, হালচাল কি রকম বুঝছ ? নবাবের আশপাশে যারা আছেন তাঁদের ভাবগতিক কি রকম ?"

মৈনি জবাব না দিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"যদি বলি ওসব খবরও গোপনীয়, আমিও বলব না।"

"বেশ, তাহলে চললাম। বিভীষণ 'সিন্দুকী'র কাছে গেলেই সব খবর পাব।"

মৈনি বিভীষণ সিন্দুকীর নাম শুনিয়া ভয় পাইয়া গেল। সেকালে এদেশে 'সিন্দুকী' বলিয়া এক প্রকার জীব ছিল। তাহারা নবাব এবং নবাবের সহচরদের খবর সরবরাহ করিত কোন বাড়িতে সুন্দরী নারী আছে, কোন বাড়িতে স্বর্ণপ্রতিমা বা রৌপ্যপ্রতিমা প্রস্তুত হয়। খবর পাইলেই নবাবরা সেগুলি আত্মসাৎ করিতেন। আজকালকার চলিত বাংলায় যাহাদের আমরা 'টিকটিকি' বলি, ইংরেজীতে যাহাদের বলি 'স্পাই' সেকালে সিন্দুকীরা ছিল তাহাদেরই সমগোত্র।

"না, না, আপনি বিভীষণের কাছে যাবেন না। সে জাতে চণ্ডাল, স্বভাবে ও চণ্ডাল। টাকা পেলে সে আপনাকে হয়তো কিছু খবর দেবে, কিন্তু আপনি যে এসব খবর সংগ্রহ করছেন এ সংবাদটিও নবাব সরকারে বিক্রয় করবে। তখন বিপদে পড়ে যাবেন। কারণ এসব খবর চালাচালি করা আজকাল বিপজ্জনক।"

"কিন্তু খবরগুলো আমার চাই।"

"আমি তাহলে ইঙ্গিতে বলে দিচ্ছি। আসুন আমার সঙ্গে।"

মৈনির সঙ্গে ধূর্জটিমঙ্গল পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে মৈনির সবরকম বাদ্যযন্ত্র সাজানো ছিল।

"বসুন।"

ধূর্জটিমঙ্গল একটি আসনে উপবেশন করিলেন।

তখন মৈনি বীণাটা তুলিয়া একবার ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজাইয়া দিল। পরমুহূর্তেই ডুগিতবলায় চাপড় দিয়া বিকট আওয়াজ করিল একটা। সারেঙ্গীতেও অনুরূপ বেসুরা শব্দ বাহির করিল একটা এবং খচমচ করিয়া বাজাইয়া দিল খঞ্জনিটা। তাহার পর কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল সে।

"এর মানে কিছু বুঝলেন ?"

"বুঝলাম সব বেসুরো। একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই।"

"এইটেই তো আপনি জানতে চাইছিলেন ?"

তাহার চোখের তারা দুইটি তখন হাসিতে লাগিল। মৈনির এই একটি বৈশিষ্ট্য, মুখে যখন হাসির লেশমাত্র নাই, চোখ দুইটি তখন হাসিতে থাকে। মৈনির রং কালো, মুখে বসন্তের দাগ, পরিপূর্ণ যৌবনের প্রাবল্য তাহার অঙ্গে প্রকটিত নয়, মৈনি রোগা। কিন্তু তবু তাহাকে ঘিরিয়া এমন একটা কি যেন আছে যে তাহাকে দেখিলেই ভালো লাগে। তাহার এ রূপ দৈহিক মাংসল রূপ নয়, ইহা তাহার মানসিক উৎকর্ষের সূক্ষ্ম প্রকাশ। হীরক হইতে যেমন আলোক বিচ্ছুরিত হয়, মৈনির মনের লুকানো হীরকটিও তেমনি অপরূপ প্রভায় তাহাকে সর্বদা ঘেরিয়া রাখিয়াছে। তাহা স্পর্শ করা যায় না, অনুভব করা যায়।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমি আরও বিশদ করে জানতে চাই।"

"বিশদ করে বলার একটু বিপদ আছে। প্রকাশ পেলে গর্দানা যেতে পারে।"

"প্রকাশ পাবে কেন ?"

"পাবে না ? বেশ বলছি। থামুন আগে দেখে আসি, কাছে-পিঠে কেউ আছে কি না। সিঁড়ির দরজাটা খিল দিয়ে আসি।"

মৈনি বাহিরে গেল। ধূর্জটিমঙ্গল খিল বন্ধ করার শব্দ পাইলেন। একটু পরে সে ফিরিয়া আসিল, তাহার পর আবার কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।—"একটি শর্তে বলতে পারি—আপনি যদি আমাকে শাস্তি দেন তাহলেই বলব—"

"শাস্তি দেব কেন ?"

"অপরাধ করেছি। আপনি যে আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারেন একথা একবারের জন্যও আমার মনে হয়েছিল।"

"কিন্তু আমি শাস্তি দেবার কে! শাস্তি দেন কাজি সাহেব। আমি তো কাজি নই।"

"আপনি আমার মালিক।"

"আমি তোমার মালিক নই, তোমার বন্ধু।"

মৈনি হঠাৎ আবদারমাখা সুরে বলিল, "না আপনাকে শাস্তি দিতে হবে।"

ধূর্জটিমঙ্গলের গম্ভীর মুখমণ্ডলে একটা চাপা হাসি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নীরবে তিনি তাঁহার গুম্ফপ্রান্তে তা দিতে লাগিলেন, তাহার পর বলিলেন, "বেশ শাস্তি দেব। কিন্তু আগে নয়, পরে। যা জান আগে সব বল—"

মৈনি বিবির চোখ দুইটি হাসিতে লাগিল।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন, "চেয়ে আছ কেন ? বল—"

মৈনি বিবি তবু হাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়াই রহিল।

"কি দেখছ ?"

"দেখছি নির্বিকার মহাদেবকে।"

"তোমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি চেগেছে দেখছি। আমি উঠলাম—"

"না, না বসুন বসুন, বলছি। একটা জিনিস মাথায় ঢুকছে না, সামান্য একটা নবাবকে নিয়ে মহাদেব মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ?"

"কেন তা তিনি বলবেন না। তবে এটা জেনে রেখ তাঁর ভাবনার জালে তোমাকেও জড়াতে চান তিনি। তোমার যদি আপত্তি থাকে উঠছি আমি—"

"না, না, বসুন -"

তাহার পর হঠাৎ সে গান গাহিয়া উঠিল

দিলো মে শাওনিয়া আ গয়ী
কৈসে দেখুঁ, কৈসে চলুঁ
মন মে বরখা ছা গয়ী
মন কা বাতেঁ কৈসে বোলুঁ

তাহার পর হঠাৎ গান থামাইয়া বলিল—"এইবার বলছি শুনুন। প্রথমেই বলছি ওরা পাপ, ওদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। কিন্তু আপনি তো আমার কথা শুনবেন না, কোনদিনই আমার কোনও মানা আপনি শোনেন নি, কোনও অনুরোধও রাখেন নি, জানি এটাও রাখবেন না। শুনুন তবে। সমস্ত বাংলাদেশে নবাব সিরাজের একটি মাত্র হিতৈষী বন্ধু আছে, তার নাম বেগম লুৎফুন্নিসা বাকী সবাই তার শত্রু।

মীরজাফর নিজে বাংলার মসনদে বসতে চান, তিনি বুঝেছেন ইংরেজদের যদি তোয়াজ করা যায় তাহলে ইংরেজরা হয়তো তাঁকে সিংহাসনে চড়িয়ে দেবেন। জগৎ শেঠকে সিরাজ অপমান করেছিলেন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন সিরাজকে যেন-তেন-প্রকারেণ সিংহাসন থেকে সরাবেন। তাঁর আশা ছিল ঘসেটি বেগমের স্বামী নওয়াজেস বা পূর্ণিয়ার শওকৎজংগ এসে সিংহাসন দখল করবেন, তাঁদের তিনি গোপনে সাহায্যও করেছিলেন কিন্তু তা হল না, তাই তিনি এখন ইংরেজদের সহায় হয়েছেন। রাজা রাজবল্লভ ঘসেটি বেগমের লোক। ঘসেটি বেগম আর সিরাজের সম্পর্ক আদায় কাঁচ-কলায়। তিনি প্রথমে সিরাজেরই ছোটভাই আক্রামউদ্দৌলাকে বাংলার সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ তিনি নিঃসন্তান। আক্রমকে পুষ্যি নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আক্রাম বসন্ত-রোগে মারা গেল। তারপর তিনি চেষ্টা করলেন তাঁর আর এক বোনের ছেলে পূর্ণিয়ার নবাব শওকৎজংগকে সিংহাসনে বসাতে। মনিহারির বলদিয়াবাড়িতে শওকৎজংগের সংগে সিরাজের যুদ্ধ হল। শওকৎজংগ মারা গেলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ঘসেটি বেগম ঢাকা থেকে চলে এসে মুর্শিদাবাদে মতিঝিলে বাস করতে লাগলেন। ধনরত্নপূর্ণ মতিঝিলের মতো অমন চমৎকার প্রাসাদ মুর্শিদাবাদে খুব বেশী নেই। আপনি দেখেছেন মতিঝিল? আমি একবার গান গাইতে গিয়েছিলাম সেখানে। মনে হচ্ছিল স্বর্ণপুরীতে বসে আছি। সেই মতিঝিল সিরাজ লুঠ করেছেন এবং ঘসেটি বেগমকে বন্দী করে রেখেছেন নিজের অন্তঃপুরে। রাজা রাজবল্লভ ছিলেন ঘসেটি বেগমের দেওয়ান। তিনি নিজের যা কিছু টাকাকড়ি ধনরত্ন গয়নাগাঁটি ছিল সব ছেলের মারফত পাচার করে দিয়েছেন কলকাতায় ইংরেজদের কাছে। তাঁর ছেলে কৃষ্ণদাস ইংরেজদের আশ্রয়ে এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলেন। এখন শুনছি রাজবল্লভের সংগে নবাবের মিটমাট হয়ে গেছে। সিরাজ না কি রাজবল্লভকে অভয় দিয়েছেন। কিন্তু রাজবল্লভ বদ্যির ছেলে, খুব চতুর, খুব ধূর্ত। তিনি বাইরে বাইরে নবাবের সংগে একটা বন্ধুত্বের ভাব রাখছেন, কিন্তু মনে মনে সিরাজের ঘোর শত্রু। ভিতরে ভিতরে তিনি ইংরেজের পক্ষে। দুর্লভরামও সিরাজের উপর চটা। সিরাজ মসনদে উঠেই যে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল। মানী লোককে অপমান করে উঁচু রাজকর্মচারীদের মাথার উপরে নীচু কর্মচারীদের বসিয়ে, উচ্ছৃংখল মোসায়েব আর গুণ্ডার দল দিয়ে সিরাজের রাজত্ব চলছে। ফৈজু বিবিকে জীয়ন্তে গোর দিয়ে দিলে। দানেশ ফকিরের নাক কেটে দিলে। রানী ভবানীর বিধবা মেয়ে তারার প্রতি কুনজর দিলে। কেউ ওর উপর সন্তুষ্ট নয়।"

"উমিচাঁদ?"

"উমিচাঁদ একটা বেহায়া আত্মসম্মানহীন লোক। ইংরেজরা ওকে ধরে কয়েদ করেছিল, ইংরেজের গোরা সৈন্যরা ওর অন্দর-মহলে ঢুকে মেয়েদের বেইজ্জত করতে গিয়েছিল। ওদের জমাদার জগন্নাথ নাকি চিতা জেবলে মেয়েদের খুন করে ফেলে দিয়েছিল চিতায়, এই খবর না কি রটেছে। জগন্নাথ কিন্তু কিছু বলে না।"

"জগন্নাথকে তুমি চেন না কি?"

"চিনি। উমিচাঁদের বাড়িতে একবার মুজরা করতে গিয়েছিলাম, জগন্নাথই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতায়। কি চমৎকার বজরা যে এনেছিল আমার জন্যে। সেখানে লাখপতিয়া বলে একটি সুন্দরী মেয়ের সংগে আলাপ হয়েছিল। কিন্তু

এখন তারা কেউ নাকি বেঁচে নেই। এত কাণ্ডের পরও ওই উমিচাঁদ না কি ইংরেজদের দলে যোগ দিয়ে ক্লাইভ আর ওয়াটসনকে সেলাম করছে।"

"জগন্নাথ কোথায় এখন ?"

"মুর্শিদাবাদেই আছে। সে উমিচাঁদের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। এখানে তার এক ভাইপো নবাবের ফৌজে কাজ করে। সেইখানেই সে থাকে, কোথাও কাজ করে না। কি রকম যেন পাগলাটে গোছের হয়ে গেছে। আসে আমার কাছে মাঝে মাঝে। আমাকে এসে বলে রাম নাম শুনা বেটি। ঠুমক চলত রামচন্দ্র বাজতো পাঁয়জানিয়া—এই ভজনটা ওর ভারী প্রিয়।"

"আমিও ওর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।"

"বেশ তো। ওকে খবর পাঠাব। আমি যতটুকু জানি সব বললাম, আর কিছু জানতে চান ?"

"তুমি আসফ আলী আর উজির আহমদকে চেন ?"

"আসফ আলী ফৌজে বড় কাজ করেন। একদিন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আমার এখানে গান শুনতে এসেছিলেন। উজির আহমদকে চিনি না।"

"আচ্ছা, আমি এবার উঠি !"

"সে কি এখনই ? কিছু খাবেন না ?"

"এখনও ক্ষিধে পায় নি। আচ্ছা, এক গ্লাস নিরামিষ শরবত আনো।"

"নিরামিষ মানে ?"

"মদটদ মিশিয়ো না। অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে আমাকে—সরফুদ্দিন কেমন আছে জান ?"

"কেরামতের ছেলে সরফুদ্দিন ? সে তো প্রায়ই আমার কাছে আসে। চমৎকার বাজনা শিখেছে। সেদিন এখানে দিলরুবা এমন বাজালে যে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কত বয়স হবে ? পনেরো ষোলো, কিন্তু এই বয়সেই চমৎকার শিখেছে। দেখতেও অতি চমৎকার। যেন রাজপুত্র। কিন্তু শুনছি এই বয়সেই ও বদ সঙ্গে মিশছে। ওর বাবা কোথায় কখন থাকেন তাতো কেউ জানে না—অমন ছেলে বখে না যায়।"

"আমি যাব ওর কাছে। তুমি শরবতটা তাড়াতাড়ি নিয়ে এস—"

"শরবত খেয়েই কিন্তু আপনার যাওয়া হবে না।"

"কেন ?"

"আপনি বলেছেন সব শোনবার পর আমাকে শাস্তি দেবেন। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন—"

"ও হ্যাঁ। আচ্ছা ভাবি দাঁড়াও কি শাস্তি দেব। তুমি শরবতটা আন।"

মেনি শরবত আনিতে গেল।

একটু পরেই সে স্ফটিকের গ্লাসে শরবত, আর সোনার রেকাবীতে এক গোছা আঙুর লইয়া আসিল।

ধূর্জটিমঙ্গল গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বড়লোক হয়েছ দেখছি।"

মেনি বিবির চোখ দুইটি হাসিতে লাগিল। ধূর্জটিমঙ্গল একটি একটি আঙুর মুখে দিতে দিতে বলিলেন—"তোমার শাস্তি ঠিক করেছি। একটা দরবারি কানাড়ার আলাপ শোনাও আমাকে সেতারে।"

"কিন্তু এটা কি দরবারি কানাড়া বাজাবার সময় ?"

"সেইটিই তো তোমার শাস্তি। অসময়ে দরবারি কানাড়া বাজাতে হবে।"

মৈনি মুচকি হাসিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল—"বেশ। কিন্তু দরবারি কানাড়া বাজাবার আগে আমাকে দরবার সাজাবার অনুমতি দিন—"

"এখানে দরবার সাজাবে কি করে ?"

"দেখুন না। এখানে নবাবের দরবার হবে না, আপনার দরবার হবে।"

মৈনি আবার উঠিয়া চলিয়া গেল। একটু পরে সে ফিরিল একটি দামী সোনার বুটি দেওয়া লাল রঙের জমকালো বেনারসী শাড়ি লইয়া। ঘরের এক কোণে একটা উঁচু কেদারা ছিল। তাহার উপর সে শাড়িটি নিপুণ করিয়া পাতিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দুইটি দাসী একটি পারস্যের গালিচা বহিয়া আনিল এবং সেটিও কেদারার সামনে পাতিয়া দিল।

ধূর্জটিমঙ্গল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি ?"

"আপনি ওই উঁচু আসনটায় গিয়ে বসুন। আমি গালচের ওপর বসে বাজাব। একটু অপেক্ষা করুন ফুল আনতে পাঠিয়েছি।"

তাহার পর সে আবার বাহিরে চলিয়া গেল। একটু পরে ফিরিল একটি চমৎকার মুর্শিদাবাদী গরদের শাড়ি পরিয়া। হাতে গোলাপপাশ আতরদান। ধূর্জটিমঙ্গলকে তুলা করিয়া আতর দিল, গোলাপপাশ ঝাড়িয়া গোলাপজল ছিটাইল চতুর্দিকে। গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া গেল।

"তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ মৈনি। আমি উঠি, আমার কাজ আছে—"

"আমারও কাজ আছে। লুৎফা বেগমের মহল থেকে আমার ডাক এসেছে। তিনি নাকি দিনরাত কাঁদছেন। গান-বাজনা দিয়ে তাঁকে ভোলাতে হবে।"

"তাহলে এসব কাণ্ড করছ কেন ? সেইখানেই যাও তুমি, আমিও উঠি। বাজনা আর এক দিন শুনব—"

"না, লক্ষ্মীটি একটু বসুন। আপনি একবার চলে গেলে যে আসবেন না তা আমি জানি। কত দিন পরে এলেন বলুন তো"

মৈনি বিবির কণ্ঠস্বরে বেদনার একটু আভাস পাওয়া গেল। মুখে কিন্তু হাসি। মৈনি আবার বাহিরে চলিয়া গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল নীরবে আঙুরগুলি শেষ করিয়া বেদানার রসাপ্লুত বাদামের সুগন্ধি শরবত পান করিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মের দুইটি প্রকাণ্ড তোড়া লইয়া মৈনি প্রবেশ করিল। তাহার সহিত সোনা-রুপার উপর মীনার কারুকার্যখচিত দুইটি ফুলদানী লইয়া প্রবেশ করিল দুইজন দাসী। ফুলদানীতে পদ্ম সাজাইয়া কেদারার দুই পার্শ্বে তাহা রাখিয়া মৈনি বলিল—"এইবার আপনি ওখানে বসুন।"

দাসীরা চলিয়া গেল। ধূর্জটিমঙ্গল তবু ওঠেন না।

"বসুন, দেরী করছেন কেন—"

"আমাকে কি মনে কর তুমি মৈনী ? আমি কি তোমার হাতের পুতুল ? যেখানে বসাবে, সেইখানেই বসব ?"

"না আপনি আমার রাজা। আপনার উপযুক্ত এ দরবার নয়। কিন্তু আপনি

দরবারি কানাড়া শুনতে চেয়েছেন তাই যা হোক তা হোক করে একটা দরবার খাড়া করেছি। আপনি বসবেন না? আমি আপনার কাছে কি দোষ করেছি যে আপনি আমাকে এত বড় অপমান করবেন?"

ধূর্জটিমঙ্গল দেখিলেন যে চোখ দুটি একটু আগে হাসিতে ঝলমল করিতেছিল তাহাতেই এখন অশ্রু টলমল করিতেছে।

তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, উচ্চাসনে উঠিয়া বসিলেন।

মৈনির মুখে আবার হাসি ফুটিল। সে সেতার আনিয়া গালিচার উপর বসিল। হাসিমুখে নীরবে সেতারের সুর বাঁধিতে লাগিল। একটু পরেই সুরু হইয়া গেল দরবাড়ি কানাড়া। ধূর্জটিমঙ্গল নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কখন যে তাঁহার চক্ষু দুইটি মুদিত হইয়াছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই, কতটা সময় যে কাটিয়া গিয়াছে তাহাও তাঁহার খেয়াল ছিল না। সেতার থামিতে তিনি চোখ খুলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি দাসী আসিয়া খবর দিল, "মহম্মদী বেগ আপনার জন্য বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছেন।"

"তাকে ডেকে নিয়ে এস।"

একটি বলিষ্ঠগঠন ব্যক্তি প্রবেশ করিল। মৈনি বিবিকে সেলাম করিয়া উর্দুতে যাহা বলিল তাহার বাংলা মর্ম এই—"আমি লুৎফা বেগমের রঙমহল হইতে আপনাকে লইতে আসিয়াছি। অনেকক্ষণ হইতে আপনার 'এনতেজার' করিতেছি। আপনি আপনার তশরিফ লইয়া কখন যাইবেন?"

মৈনি উত্তর দিলে—"একটু পরেই যাচ্ছি। আপনার অপেক্ষা করার দরকার নেই।"

মহম্মদী বেগ তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

বলিল, "রঙমহলের পালকি এসেছে। সেটা তাহলে অপেক্ষা করুক।"

মৈনি ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনি এখন কি করবেন?"

"আমি সরফুর কাছে যাব। তারপর উজির আহমদের খোঁজ করব। কেউ যদি তার সন্ধান দিতে পারে ইনাম দেব তাকে।"

তসলিম করিয়া মহম্মদী বেগ বলিল—"আমি পারি হুজুর—"

"ও তুমি পার, ভালই হ'ল। তুমি আমার বাসায় আসতে পারবে?"

"হুজুরের দৌলতখানা কোথায়?"

"জাফরাগঞ্জে ঢুকতেই যে একটা লাল রংয়ের কুঠি আছে, সেইখানেই আমার বাসা—"

"ওটা ইদমত্‌উল্লা সাহেবের খালি বাগান বাড়ি কি?"

"হ্যাঁ। ওইটেই আমি ভাড়া নিয়েছি।"

"বেশ, আমি আজ সন্ধ্যাবেলাই সেখানে যাব।"

"বেশ।"

॥ নয় ॥

নীলু রায় এবং জগদ্ধাত্রী উভয়েই স্ব স্ব কর্মে নিজেদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নীলু রায় ভাবিয়াছিলেন এ অঞ্চলে জন সাহেবের যত সম্পত্তি আছে তাহা কার্যতঃ

এখন ধূর্জটিমঙ্গলেরই সম্পত্তি। সুতরাং সে সম্পত্তি কত, তাহার একটা প্রকৃত ধারণা করা তাহার কর্তব্য। ধূর্জটিমঙ্গলের সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনা করার ভার তো তাঁহার উপর। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া মহালে মহালে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কোথায় কি আছে তাহার হিসাব রাখিতেন, জন সাহেবের কর্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, কত টাকা আদায় হইয়াছে, খাজনার টাকা দেওয়া হইয়াছে কি না তাহারও খোঁজ লইতেন। একটি পাহাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন তিনি। যে সব খবর সংগ্রহ করিতেন তাহা একটি খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। মাঝে মাঝে মাখনলালের সহিত শিকারে বাহির হইয়া বনমুর্গি, তিতির, লীখ, নওরং, হরিয়াল প্রভৃতি মারিয়া আনিতেন। মাখনলালের বুধু সেগুলি পরিপাটিরূপে রন্ধন করিত। রন্ধনের সময় মাখনলালও রান্নাঘরে বসিয়া থাকিত। একদিন নীলু রায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি রান্নাঘরে বসে থাক কেন?"

"আজ্ঞে পাহারা দি। পাহারা না দিলে রাঁধতে রাঁধতেই ও অর্ধেক খেয়ে ফেলবে। ভারী পেটুক যে—"

"বল কি।"

"ঠিকই বলছি। একদিন একটা বেশ বড় পতীলু মেরে এনেছিলাম। আমাকে বাইরে একটা কাজে যেতে হয়েছিল, বাড়ি ফিরে দেখি বুধু সবটা খেয়ে বসে আছে। খেতে বসে বললাম—কই মাংস আন। হেসে বললে পতীলুটাকে বিলারে নিয়ে গেছে। চুলের ঝুঁটি ধরে যখন ঠ্যাঙালাম তখন বলল 'বড় লোভ লাগছিল, একটু একটু করে খেতে খেতে সব ফুরিয়ে গেল যে! একটাই তো মোটে এনেছিলে, কাল বেশী করে এনো রেঁধে দিব।' কাণ্ড দেখুন। তারপর থেকে পাহারা দি। কতবার দূর করে দিয়েছি, কিন্তু যেতে চায় না, মার খেয়েও ঘুরে আসে। তাছাড়া রাঁধেও ভালো।"

মাখনলাল হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাখনলালের ওপর রাগ করা শক্ত। ভালো দাবা খেলে, লোকও বেশ ভালো। তাহার নির্দেশে কয়েকজন সিপাহী রাত্রে হাঁকডাক দিয়া পাহারাও দেয়। নীলু রায়ের জন্য জগদ্ধাত্রী দুইবেলা নানারকম রন্ধন করেন। নিরামিষ বহুরকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে জানেন তিনি। নীলু রায়কে উপর্যুপরি এক তরকারি দুইদিন খাইতে হয় নাই। খোসাচচ্চড়িও তাঁহার হাতে অপূর্ব হইয়া ওঠে। জগদ্ধাত্রী কিন্তু বড় গম্ভীর। প্রতিদিন নিজ হস্তে পরিবেশন করিয়া তাঁহাকে খাইতে দেন, পাখা হাতে সামনে বসেন, কিন্তু বড় গম্ভীর। প্রয়োজনীয় আলাপ ছাড়া অন্য কথা বলেন না। রান্নাবান্না, ঠাকুরঘর ছাড়া, তাঁহার আর একটি অবলম্বন চরখা। রোজই অনেকক্ষণ ধরিয়া চরখা কাটেন। চরখার সুতায় গামছা চাদর এবং মোটা গোড়ে কাপড় প্রস্তুত হয়। অদূরে একটি তাঁতীর ঘর আছে। ছোট তাঁতও আছে একটি তাহার। এ অঞ্চলের অনেকের কাপড় গামছা সে-ই বুনিয়া দেয়। সে সদা ব্যস্ত। তবু সে জগদ্ধাত্রীর সুতা পাইলে সর্বাগ্রে তাঁহার কাজই করে। সে জানে এসব কাপড়, গামছা, চাদর এই অঞ্চলের গরীব দুঃখীরাই পাইবে। বিতরণের ভারও জগদ্ধাত্রী তাহার উপরই দিয়াছেন। কারণ, তিনি এদেশের কাহাকেও চেনেন না, কে গরীব কে ধনী তাহা জানেন না। কে ধনী কে গরীব তাহা বাহির হইতে দেখিয়া চিনিবারও উপায় নাই। সকলেরই বেশবাস অনাড়ম্বর। স্বয়ং ধলরাজাই

বাড়িতে যে পোশাক পরিয়া থাকেন তাহা সাধারণ আদিবাসীর পোশাক। এই সব লইয়াই জগদ্ধাত্রী নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। তাঁহার ছেলে দুটি তাঁহার নিকট থাকিতে চায় না। লালী এবং কস্তুরীর কাছেই থাকিতে ভালবাসে তাহারা। দিনের বেলায় একবার মায়ের কাছে আসে অবশ্য, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নহে। কিছু মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া আবার চলিয়া যায় তাহারা। লালী আর কস্তুরী কখনও তাহাদের পিঠে করিয়া কখনও কাঁধে লইয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়। জঙ্গলে জঙ্গলে নিত্য নূতন পরিবেশে ভ্রমণ করা তাহাদের এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা বাড়িতে থাকিতেই চায় না। বন্য খরগোশের বাচ্চা, কয়েকটা দেশী কুকুর, আর লালীর পোষা ময়নাটার সঙ্গে তাহাদের খুব ভাব। জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক বড়ই কম। নীলু রায় জগদ্ধাত্রীর দুঃখ বোঝেন, কিন্তু ইহাও বোঝেন, এ দুঃখ মোচন করিবার সাধ্য তাঁহার নাই। তবু তিনি জগদ্ধাত্রীকে অন্যমনস্ক রাখিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার ঘরের সামনে বসিয়া মাঝে মাঝে দিলরুবা বাজান। কিন্তু জগদ্ধাত্রীর দিক হইতে কোনও সাড়া আসে না। নীলু রায়ের মাঝে মাঝে ভয় হয় হয়তো তাঁহার বিরক্তি উৎপাদনই করিতেছেন তিনি। একদিন তিনি ধলরাজার নিকটে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলিলেন বৌঠান একা একা বড় চুপচাপ থাকেন। তাঁর বেড়াবার জন্য যদি একটা ভালো পালকি আর কয়েকজন বাহক দেন তাহলে তিনি একটু আধটু বেড়াতে পারেন। ধলরাজা দিলদরিয়া লোক। একটি রৌপ্যখচিত ভালো পালকি এবং আটজন বাহক পাঠাইয়া দিলেন তাহার পরদিনই। পালকি কিন্তু বাহিরেই পড়িয়া রহিল এবং আটজন বাহক বসিয়া বসিয়া অন্ন ধ্বংস করিতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী বেড়াইতে যাইবার কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। কয়েকদিন পরে ধলরাজা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। কি একটি পরবে তাঁহার বাড়িতে আদিবাসীদের নৃত্যোৎসব ছিল, সেই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য তিনি জগদ্ধাত্রীকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। মধু সামন্ত তাঁহার অনুরোধটি বহন করিয়া আনিলেন। নীলু রায়কে বলিলেন, "রাজার নিমন্ত্রণ রাখতেই হবে। না রাখলে তিনি অপমানিত বোধ করবেন। আপনার বৌঠানকে বুঝিয়ে বলুন, নাচ তাঁর ভালো লাগবে। ধলরাজা আমাকে বলেছেন মিতিনকে খুব খাতির করে এনো।"

নীলু রায় জগদ্ধাত্রীকে এ সংবাদ দিলে প্রথমে তিনি রাজী হন নাই। বলিলেন—"আমার অবসর কই। রান্নাবাড়া আছে, পুজো আছে, খুঁটি আর খাম্ব আসবে, তাছাড়া তাঁতীকে কিছু সুতো দিতে হবে, মাখনলালের রাঁধুনীর জন্যে একটা কাপড় বুনতে দিয়েছি, সুতোয় কম পড়ে গেছে—"

নীলু রায় বলিলেন—"বৌঠান, অবসর আপনাকে করতেই হবে। আপনি পুজো সেরে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়বেন—খাওয়াদাওয়া ওখানেই হবে।"

"আমি অন্য কোথাও খেতে পারব না। তাছাড়া দেখুন একা কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। উনি থাকলে উনি যদি যেতেন আমি সঙ্গে যেতাম, একা একা কোথাও যেতে ভাল লাগে না।"

"এখানে কিন্তু যেতেই হবে বৌঠান। রাজারাজড়ার ব্যাপার, না গেলে অপমানিত বোধ করবেন। ওঁকে চটিয়ে এখানে থাকাও নিরাপদ নয়! যাবেন, একটু নাচ দেখে ঘুরে আসবেন। বেশীক্ষণ থাকব না আমরা।"

জগদ্ধাত্রীকে অবশেষে রাজী হইতে হইল।

ঠিক হইল, তিনি পূজা করিয়া দুধ, চিঁড়া আর কলা দিয়া ফলাহার করিয়া লইবেন। তাহার পর একটু বিশ্রাম করিয়া ধলরাজার বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবেন। রুলার কাছে খাব্বা-খুটির জন্য খাবার থাকিবে। জগদ্ধাত্রী পাল্কিতে গেলেন। নীলু রায় বন্দুকটি পৃষ্ঠে বাঁধিয়া অশ্বারোহণে তাঁহার অনুগমন করিলেন।

ধলরাজা সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন জগদ্ধাত্রীকে। তিনি যাইবামাত্র একসঙ্গে অনেক মাদল বাজিয়া উঠিল, তূর্যধ্বনি হইল। একদল মেয়ে নাচিতে নাচিতে আসিয়া অভিবাদন করিল তাঁহাকে। মেয়েগুলি ফুলের সাজে সাজিয়াছিল। মাথায় কোমরে কৃষ্ণচূড়া পলাশ আর জবা ফুল। কটিদেশের বন্ধনীতে মহুয়া আর জারুল ফুলের গুচ্ছ, হস্তের বাজুবন্দে কর্নিকার। তাহাদের বক্ষে কোন আবরণ নাই, তাহাদের রাঙিন ছোট কাপড় আঁটসাঁট করিয়া পরা। তাহাদের সর্বাঙ্গ এরণ্ড-তৈলের মর্দনে কোমল, হরিদ্রার অবলেপে স্বর্ণাভ। তাহাদের অনাবৃত বক্ষের দিকে চাহিয়া জগদ্ধাত্রী বিব্রত হইলেন. তাহাদের কিন্তু কোনও লজ্জা নাই। জন সাহেবের কুঠিতে যেসব মেয়েরা কাজ করে জন সাহেবই তাহাদের জামা পরিতে, বুকে কাপড় দিতে শিখাইয়াছেন। ধলরাজার নর্তকীরা প্রায় উলঙ্গিনী। জগদ্ধাত্রী মনে মনে বিব্রত হইলেন বটে, কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ করিলেন না। ধলরাজার রানী এবং সহচরীগণ জগদ্ধাত্রীকে সমাদরে একটি পুষ্পপত্রসজ্জিত বিতানে লইয়া গেলেন। সেখানে কয়েকটি অলঙ্কৃত আসন ছিল, তাহারই একটিতে জগদ্ধাত্রীকে বসাইলেন তাঁহারা, নিজেরাও তাঁহার আশেপাশে বসিলেন। তাহার পর আসিল প্রকাণ্ড একটি স্বর্ণরৌপ্যখচিত পরাত, তাহাতে পান সুপারী এলাচ লবঙ্গ এবং আতরদানী। জগদ্ধাত্রী একটি এলাচ তুলিয়া লইলেন। তাহার পর নাচ শুরু হইল। নানারকমের নাচ, নানারকমের গান। নর্তক-নর্তকীদের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ সুরে গানে লাস্যলীলায় সকলকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। স্বয়ং ধলরাজা উঠিয়া কাঁধে মাদল ঝুলাইয়া মাদল বাজাইতে বাজাইতে সকলের সহিত নাচিতে লাগিলেন। জগদ্ধাত্রী কিন্তু পাষাণপ্রতিমার মতো বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া নাচ হইল। জগদ্ধাত্রী স্থির নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। নাচ শেষ হইবার পর খাওয়ার আয়োজন হইল। জগদ্ধাত্রীকে অন্দরমহলে লইয়া গেলেন রানী। পোলাও, রুটি পরোটা কচুরি, মাছ মাংস, নিরামিষ নানারকম তরকারী, ফল নানাবিধ। কেঁদ হইতে শুরু করিয়া পেঁপে, আনারস, আম, জাম, আপেল, আঙুর, কিসমিস পেস্তা বাদাম। তাছাড়া পর্যাপ্ত মিষ্টান্ন, দু তিন রকম পরমান্ন। শূল্যপক্ক কয়েকরকম পাখী। আরও কত কি। কিন্তু জগদ্ধাত্রী কিছুই স্পর্শ করিলেন না। অনেক অনুরোধের পর একটি আঙুর মুখে দিলেন। ভূরি-ভোজন করিলেন নীলু রায়।

সব শেষ হইতে বেশ রাত হইয়া গেল। ধলরাজা তাঁহাকে বলিলেন, মিতেন কিছু খাইলেন না। বলিতেছেন তাঁহার কি একটা ব্রত আছে। তাই তিনি তাঁহার সঙ্গে সামান্য কিছু ভেট পাঠাইয়া দিতে চান। নীলু রায় ইহাতে আপত্তি করিতে পারিলেন না। যাইবার সময় দেখা গেল সামান্য ভেট মোটেই সামান্য নয়—দুই গাড়ি বোঝাই জিনিসপত্র। মূল্যবান শাড়ি, এক চুপড়ি সিঁদুর এবং একজোড়া স্বর্ণবলয়ের সহিত

প্রচুর খাদ্যদ্রব্য। চাল, ডাল, মাড়োয়া, মকাই, বাজরা, অনেক ফল, দুই হাঁড়ি দই এবং কয়েকরকম মিষ্টান্ন। তাছাড়া দুইটি পাঠা এবং একটি নধর ভেড়া।

নীলু রায় অশ্বারোহণে গাড়িগুলির পিছনে পিছনে আসিতে লাগিলেন। জগদ্ধাত্রীর পালকিটা আগাইয়া গেল।

অন্ধকার রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষ। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সেটাকে একটা প্রেতের মুখ বলিয়া মনে হইতেছে। জগদ্ধাত্রী পালকিতে বসিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এক টুকরা মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া দিল, একটু পরেই আবার চাঁদ মেঘের ফাঁক হইতে উঁকি দিল। জগদ্ধাত্রীর মনে হইল একটা প্রেতমূর্তি পরদার আড়াল হইতে তাঁহাকে দেখিতেছে। আবার শিহরিয়া উঠিলেন তিনি। পালকির সামনে ও পিছনে মশালধারীরা আসিতেছিল। মহিষের গাড়ি দুইটি পিছাইয়া পড়িয়াছিল, নীলু রায়ও গাড়ি দুইটির পিছনে ছিলেন। অন্ধকারে পাহাড়ী সংকীর্ণ পথে তিনি জোরে ঘোড়া চালাইতে পারিতেছিলেন না। জগদ্ধাত্রীর পালকিটা বনজঙ্গল ভেদ করিয়া দ্রুতবেগে আগাইয়া চলিয়াছিল। সহসা জগদ্ধাত্রী পালকি বাহকদের থামাইয়া দিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন বনের ভিতর কে যেন—মা মা মা বলিয়া চীৎকার করিতেছে। শিশুর কণ্ঠ। তাঁহার মনে হইল তাঁহার খাম্বার গলা। পালকি থামিতেই আবার বনের ভিতর হইতে সেই শিশুকণ্ঠ শোনা গেল—মা—মা—মা—।

"ও কিসের শব্দ, কে ডাকছে?"

একজন বাহক বলিল, "হরিণরা অনেক সময় ওইরকম শব্দ করে।"

"হরিণ নয়। এ আমার খাম্বার গলা। তোমরা কেউ জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে দেখ দিকি—"

বাহকেরা ইতস্তত করিতে লাগিল! অন্ধকার রাত্রে কেহই বনের ভিতর প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক নয়।

"যাবি না কেন, গিয়ে দেখ, তোদের টাকা দেব।"

বাহকেরা তবু যাইতে রাজী নয়।

একজন মশালধারী বলিল—"এই বনের মধ্যে মোলা গাঁ আছে। সেখানে আছেন অষ্টভুজা রুক্মিণী। কৃষ্ণপক্ষে তাঁর পুজো হচ্ছে হয়তো। ওখানে এখন যাওয়া ঠিক নয়।"

জগদ্ধাত্রী পালকি হইতে নামিয়া পড়িলেন।

"তোমরা কেউ না যাও তো, আমি একাই যাব।"

"না, না মা যাবেন না।"

বাহক এবং মশালধারীরা তাঁহাকে বারণ করিতে লাগিল।

"তোরা কেউ না যাস তো আমাকে যেতেই হবে। আমার ছেলের গলা শুনেছি আমি। আমার ভুল হয় নি, আমি যাব। আমাকে একটা মশাল দাও।"

হঠাৎ একজন মশালধারী মত বদলাইয়া ফেলিল।

"চলুন মা যা থাকে কপালে আমি আপনার সঙ্গে যাই। আপনি যখন যাবেনই তখন আপনাকে একা যেতে দিব না—"

"তাই চল।"

একজন বাহক বলিল—"ওই যে গাড়ি দুটাও পেঁছে গেছে। বাবুও আইছেন—"

নীলু রায় গাড়ি দুইটিকে পাশ কাটাইয়া আগাইয়া আসিলেন।

"ব্যাপার কি! আপনি বৌঠান এখানে নাবলেন কেন?"

"আমার কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। আমি যেন খাম্বার গলা পেলাম জঙ্গলের মধ্যে, মা মা বলে ডাকছে।"

"সে কি! খাম্বার গলা?"

একজন বাহক বলিল—"হরিণটরিণ অনেক সময় হরেকরকম ডাকে। বনবিড়ালের ডাকও ওই রকম হয়।"

জগদ্ধাত্রী বলিলেন—"আমি বনের মধ্যে ঢুকব। নিজের কানে আমি খাম্বার গলা শুনেছি। আমার বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে ঠাকুরপো।"

"আপনি বৌঠান ওই জঙ্গলে তো ঢুকতে পারবেন না। পথ নেই. তাছাড়া এই জঙ্গলের ভিতর ছোট ছোট পাহাড়, টিলা অনেক আছে, কোনদিকে যাবেন আপনি—"

"কিন্তু একটু খোঁজ না নিয়ে আমি যাব না। আমি তার কান্না শুনেছি, আমার ভুল হয়নি।"

নীলু রায় জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলেন তিনি সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

একজন বাহক বলিল—"এই জঙ্গলের ভিতর পাহাড়ঘেরা মোলা গাঁ আছে। সেখানে অষ্টভুজা রঙ্কিণীর মূর্তি আছে, সেখানে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর দিন পুজা হয় মায়ের, বলি হয়। ঝামরি আসে সেখানে—কাপালিক আসে, খণ্ডোবাবা।"

নীলু রায় বলিলেন, "ঝামরি যে রঙ্কিণীর পুজো করে সেটা তো একটা পাথর শুধু। আমাদের বাড়ির কাছেই সেটা—"

"আসল রঙ্কিণী নয় সেটা। আসল রঙ্কিণী বনদেবী। বনের মধ্যে থাকেন তিনি। প্রতি কৃষ্ণপক্ষে তার পুজা করে ঝামরি আর খণ্ডোবাবা।"

নীলু রায় তখন জগদ্ধাত্রীকে বলিলেন—"আপনি তাহলে এই পালকিতে বসে থাকুন। আমি কয়েকজন লোক নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে খোঁজ করি। আপনার কাছে সবাই থাকুক, আমি একজন মশালধারী আর একজন গাড়োয়ানকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকি—ভাগ্যে বন্দুকটা সঙ্গে এনেছিলাম।"

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, "বেশ, কিন্তু আপনার ফিরতে দেরি হলে আমি স্থির থাকতে পারব না। আমিও জঙ্গলে ঢুকে পড়ব।"

জঙ্গল শুধু জঙ্গলই নহে, প্রস্তরসমাকীর্ণ। প্রতিপদে ছোট বড় নানারকম বৃক্ষ পাথর গতিরোধ করে। তবু নীলু রায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যদিও মশাল ছিল, তবু অরণ্যের পুঞ্জীভূত অন্ধকার আলোকিত হইতেছিল না। তাহাতে সম্মুখের পথটুকুমাত্র দেখা যাইতেছিল। তবু নীলু রায় চলিতেছিলেন। কিছুদূর গিয়াই কিন্তু তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, একটু বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সামনেই একটি প্রকাণ্ড গাছের বাঁকানো গুঁড়ি ছিল, গাছটি বেশ খানিকটা বাঁকিয়া তবে ঊর্ধ্বমুখী হইয়াছে। সেই বাঁকানো গুঁড়ির উপর পা দোলাইয়া তিনি বসিলেন। লক্ষ্য করিলেন। গাছটি প্রকাণ্ড শাখাপ্রশাখাময় মহীরুহ একটি। বাঁকিয়া যেখান হইতে সে ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে সেখানে গুঁড়ির উপর প্রকাণ্ড একটি

গর্তও রহিয়াছে। নীলু রায়ের মনে হইল বৃক্ষটি যেন একচক্ষু দানবের মতো নির্নিমেষে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। সহসা সেই গর্তের ভিতর হইতে ফোঁস করিয়া একটা শব্দ হইল। নীলু রায় চমকিয়া উঠিলেন। সাপ নাকি? কিন্তু পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড একটা পাখী সবেগে গর্তটার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং তাঁহার মুখে প্রচণ্ড ডানার ঝাপটা দিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। তাঁহার সহচরটি বলিল—জংলী প্যাঁচা একটা। একটু পরেই প্যাঁচাটার কর্কশ চীৎকারে সমস্ত বনস্থলী কাঁপিয়া উঠিল। বুউউউ বোওওও—এই শব্দ বারবার শোনা যাইতে লাগিল। নীলু রায়ের মনে হইল কে যেন বলিতেছে দূ—য়ো, দূ—য়ো। নীলু রায় আবার চলিতে শুরু করিলেন। কিছুক্ষণ পরে দূরে হায়নার হাহা শব্দ রাত্রির অন্ধকারকে মথিত করিয়া যেন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। নীলু রায় তবু চলিতে লাগিলেন। একটু পরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল তিনি যেন ক্রমশঃ একটা পর্বতের উপর আরোহণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আর একটা অপ্রত্যাশিত শব্দে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। সহসা কোথায় যেন ঢোল কাঁসর ঝাঁজর একযোগে বাজিয়া উঠিল। স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন নীলু রায়। কোথাও পুজো হইতেছে নাকি? তাঁহার সহচরটি বলিল, "রুক্মিণী মায়ের মন্দিরের কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। আর একটু উঠতে হবে। পাহাড়ের উপরে উঠলে তখন দেখা যাবে সব।" নীলু রায় পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। পাহাড়ের শীর্ষে উঠিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন পর্বতবেষ্টিত একটা সমতল স্থানে অনেক মশাল জ্বলিতেছে, অনেক লোক বাজনা বাজাইতে বাজাইতে উন্মাদের মতো নৃত্য করিতেছে। একটা মন্দিরের মতো কি রহিয়াছে যেন। নীলু রায় আর অপেক্ষা করিলেন না, পাহাড়ের ঢালু গা বাহিয়া নামিতে লাগিলেন। নামাও সহজ ছিল না। চারিদিকে ছোট বড় পাথর, কাঁটা-গাছ এবং মাঝে মাঝে গর্ত। নীলু রায় হামাগুড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন। একবার বসেন, সম্মুখের দিকে পা বাড়াইয়া দেন, তাহার পর আর একটু অগ্রসর হন।

"ঠাকুরপো আমিও এসে গেছি। আমি আর থাকতে পারলাম না।"

নীলু রায় সবিস্ময়ে দেখিলেন জগদ্ধাত্রীও তাঁহার পিছনে হামাগুড়ি দিয়া নামিতেছেন। তাঁহার অবগুণ্ঠন খসিয়া গিয়াছে, গাছকোমর করিয়া কাপড় পরিয়াছেন, শাড়ির স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা প্রখরতা যাহা নীলু রায় বাঘের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি ভয় পাইয়া গেলেন। নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন তাঁহার দিকে।

"বসে আছেন কেন, চলুন চলুন, একটা লোককে কাটছে ওরা—"

নীলু রায় সভয়ে দেখিলেন একটা লোককে ধরিয়া বাঁধিয়া একটা হাড়কাঠের মধ্যে ফেলিল তাহারা। সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক প্রকাণ্ড একটা খড়্গ দিয়া তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিল। একজন অনুচর বলিল—"নরবলি হচ্ছে। এবছর ফসল ভালো হয় নাই তো। খণ্ডোবাবা নিজে হাতে কাটছে—"

নীলু রায় দেখিলেন নৃত্যে মাতিয়া উঠিয়াছে সবাই। মৃত ব্যক্তিটার রক্ত গায়ে মুখে মাখিয়া উন্মাদ নৃত্য জুড়িয়াছে। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িল তাঁহার পিঠে বন্দুক বাঁধা আছে। তিনি তাড়াতাড়ি বন্দুকটি

খুলিয়া দুম দুম করিয়া দুইবার আওয়াজ করিলেন। ইহাতে ফল হইল। যে যেদিকে পারিল ছুটিতে লাগিল।

"চলুন, চলুন, বসে আছেন কেন ?"

জগদ্ধাত্রীর তাড়ায় নীলু রায় আবার অবরোহণ শুরু করিলেন। জগদ্ধাত্রী তাঁহার পিছনে পিছনে আসিতে লাগিলেন।

বার বার উঠিয়া পড়িয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া অবশেষে তাহারা কোনক্রমে নীচে নামিলেন। নীচে নামিয়াই জগদ্ধাত্রী উন্মাদিনীর মতো ছুটিতে লাগিলেন। মন্দিরের কাছাকাছি গিয়া রুক্মিণীর ভীষণা মূর্তির দিকে চাহিয়া তিনি ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেলেন। ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত দুই হস্তে দুইটি তরবারি। পদতলে একটি শবমূর্তি। কিন্তু সে স্তব্ধতা মুহূর্তের জন্য। তাহার পরই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। খান্বার মুণ্ডটা মায়ের পায়ের কাছে রহিয়াছে। আর একটা কার মুণ্ড ? হ্যাঁ ওটাকেও তো তিনি চেনেন। লাল-দাড়ি টিয়াপাখীর ঠোঁটের মতো নাক। মীর মহম্মদকেও তিনি চিনিতে পারিলেন এবং পরমুহূর্তেই মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। মন্দিরের পিছনে ঝামরি ছিল সে ছুটিয়া আসিল। মূর্ছিতা জগদ্ধাত্রীর দিকে চাহিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল সে। উলঙ্গিনীর সর্বাঙ্গে রক্তমাখা। হঠাৎ বসিয়া মূর্ছিতা জগদ্ধাত্রীর মাথাটা কোলে তুলিয়া লইল। বলিতে লাগিল—"তুর ব্যাটার কত পুণ্য, মায়ের ভোগে লাগল সে। তোর দুঃখু কিসের, একটা ব্যাটা তো রইল। মায়ার বিষ আর কত খাবি ? বিষ বিষ, বিষ আর খাস না—কিন্তু ও কি শুনবেক ? বিষ খাবেকই।"

আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল সে। তাহার পর হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। খণ্ডোবাবা ধমক দিলেন—চুপ কর, চুপ কর।

বন্দুকের শব্দে অনেকেই পালাইয়াছিল, কিন্তু খণ্ডোবাবা পালান নাই। তিনি রুক্মিণীর সম্মুখে করজোড়ে বসিয়াছিলেন। কাপালিকের মতো চেহারা। মাথায় জটা, কপালে সিঁদুর। রং কালো নয়, গৌরবর্ণ। চোখ দুটি টানাটানা। একমুখ গোঁফদাড়ি। বলিষ্ঠগঠন পুরুষ। পরনে কাপড় নাই, চিতাবাঘের চামড়া দিয়া তৈরি একটি কৌপীন লাল ডোরায় কটিসংলগ্ন রহিয়াছে। নীলু রায় হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নিজের চক্ষুকেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না তিনি। কিন্তু কয়েকমুহূর্ত পরেই তাঁহার জড়ভাব কাটিয়া গেল। তিনি বন্দুকটা তুলিয়া খণ্ডোবাবাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুমি খুনী। তোমাকে আমি শাস্তি দেব।"

খণ্ডোবাবা নির্বিকারভাবে নীলু রায়ের দিকে চাহিলেন। তিনি যে বিন্দুমাত্র ভয় পাইয়াছেন তাহা মনে হইল না। একটু হাসিয়া পরিষ্কার বাংলায় বলিলেন—"তোর বন্দুকেতে তো গুলি নেই। থাকলেও মারতে পারতিস না।" কেউ কাউকে মারতে পারে না। মারবার বাঁচাবার মালিক মা। এ পুজো ধলরাজার পুজো। প্রতিবার পুজোতেই নরবলি হয়। এবার শিশুবলিও হল। এ অঞ্চলে মাঠে এবার সব ফসল কাঁচ কাঁচ অবস্থাতেই শুকিয়ে যাচ্ছে, তাই মা ঝামরিকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছিলেন এবার কাঁচ শিশু বলি চাই। ঝামরি শিশুটিকে যোগাড় করে এনেছে। তুই যদি আমাকে গুলি করিস সে গুলি লাগবে ধলরাজার বুকে। তখন তুই আর নিস্তার পাবি না। খবরদার এ কাজ করিসনি !"

নীলু রায় জানিতেন তাঁহার বন্দুকে আর গুলি নাই। সঙ্গেও আর গুলি ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন এ অবস্থায় কি করিবেন, কি করা উচিত।

কাপালিক আবার বলিলেন—"তোর মনে যদি আমার উপর আক্রোশ হয়ে থাকে গুলি করে আমাকে মারতে পারবি না। তবে একটা কাজ করতে পারিস। মায়ের কাছে আমাকে বলি দিতে পারিস। এই খাঁড়া নে। হাড়কাঠে গলা ঢুকিয়ে দিচ্ছি, মায়ের কাছে আমাকে বলি দিয়ে দে, আমার মুক্তি হয়ে যাক—শুনলে ধলরাজাও খুশী হবে।"

প্রকাণ্ড রক্তাক্ত খাঁড়াটা লইয়া তিনি নীলু রায়ের কাছে আগাইয়া আসিলেন।

নীলু রায় পিছাইয়া আসিলেন। বলিলেন, "না, আমি পুজার নামে মানুষ খুন করি না। তোমরা কাকে খুন করেছ জান?"

"ওই দাড়িওলা লোকটাকে তো আমিই এনেছি। জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছিল, আমাকে দেখে বলল—আমি বিদেশী লোক, পথ হারিয়েছি, আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। সঙ্গে করে নিয়ে এলাম, দুনিয়ার সেরা পথটা দেখিয়ে দিলাম। হা হা হা হা—"

কাপালিকের অট্টহাস্যে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল।

"কিন্তু এই ছেলেটা কার জান? ধলরাজার বন্ধু ধূর্জটিমঙ্গলের। ধলরাজার অনুরোধেই তিনি মুর্শিদাবাদে গেলেন, আর তোমরা তাঁর ছেলেটাকে এনে -"

হঠাৎ একটা আর্তচীৎকার শুনিয়া নীলু রায় থামিয়া গেলেন। দেখিলেন মূর্ছিতা জগদ্ধাত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার চুল আলুলায়িত, বেশবাশ বিস্রস্ত। তিনি দুই হাত রুক্মিণীর দিকে বিস্তার করিয়া চীৎকার করিতেছেন—সে চীৎকার হৃদয়ভেদী, সে চীৎকার মর্মন্তুদ। নিপীড়িত নারীত্বের যে চীৎকার যুগ যুগ ধরিয়া মহাকাশকে প্রতিধ্বনিত করিয়া অবশেষে শূন্যে হারাইয়া গিয়াছে সেই চীৎকার সহসা যেন জগদ্ধাত্রীর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভার ঊর্ধ্বমুখী উৎক্ষেপে অন্ধকার আকাশে উচ্ছ্রিত হইয়া পড়িল। সে চীৎকারে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, হয় নাই কেবল ঝামরি। সেও চীৎকার করিতেছিল—"শুধা শুধা ওই রক্তখাগীকে, শুধা কেন ও তোর ছেলেটা কেড়ে লিলেক, কেন আমাকে স্বপ্ন দিলেক—শুধা তুই, চীৎকার করে শুধা—শুধা—রক্তখাগী আর কত রক্ত খাবেক—"

ঝামরি দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া অনেকটা নাচের ভঙ্গিতে রুক্মিণী মূর্তির দিকে আগাইয়া গেল। তাহার পর কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল আবার।

"ও জবাব দেবেক নাই। লুকুর লুকুর করে ভালবে খালি। ওর খ্যামতা আছে, কিন্তু বড্ড নোলা—"

"তুই চুপ করবি? চুপ কর শীগ্‌গির—"

খুড়োবাবা ধমক দিলেন আবার। ঝামরি মুচকি হাসিয়া গা দোলাইতে দোলাইতে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। জগদ্ধাত্রীও বসিয়া পড়িলেন এবং দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মনে মনে তিনি বলিতেছিলেন—"মা রুক্মিণী, তোমাকে আমি চিনতাম না। অনেক দেবদেবীর পুজা করেছি, কিন্তু তোমার পুজা কখনও করিনি। তাই তুমি কি আমাকে শাস্তি দিলে? তাই কি আমার খাম্বাকে কেড়ে নিলে তুমি? কিন্তু শুধু খাম্বাকেই তো নাও নি, আমার শত্রুটাকেও তো নিয়েছ। তোমার মহিমা তোমার লীলা বোঝবার মতো বুদ্ধি নেই আমার। কিন্তু আমার বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে মা। আমি কি করি—আমি কি করি—"

হঠাৎ নীলু রায় লক্ষ্য করিলেন কাপালিকটি অন্ধকারে অন্তর্ধান করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে যে লোকজন আসিয়াছিল তাহারাও কেহ নাই। মশালের শিখাগুলিও নিবিয়া আসিতেছে। পর্বতবেষ্টিত রুক্মিণীর মন্দির ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া যাইতেছে।

নীলু রায় ভয় পাইয়া গেলেন। জগদ্ধাত্রীকে লইয়া কি করিবেন এখন? জগদ্ধাত্রী পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, তিনি দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়াই চলিয়াছিলেন। নীলু রায় ভাবিলেন এখন ওই পাহাড়ী জঙ্গলে ঢোকা তো অসম্ভব। হঠাৎ তিনি ডাক দিলেন – ঝামরি, এই ঝামরি, কোথা গেলি তুই? আমাদের ফেরবার ব্যবস্থা করে দে— ।

কাহারও কোন সাড়াশব্দ নাই। বিব্রত হইয়া পড়িলেন নীলু রায়। তাহার পর অদ্ভুত কাণ্ড হইল একটা। অন্ধকার ভেদ করিয়া পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো দুইটি পালকি আসিয়া হাজির হইল। বাহকেরা দীর্ঘাকৃতি, ইহার বেশী আর কিছু দেখা যায় না।

"চলেন আপনারা—"

"কোথা থেকে এলে তোমরা?"

কোন জবাব নাই।

"আমাদের পালকি আর ঘোড় কোথায় আছে জান?"

"জানি।"

"সঙ্গে মশাল তো নেই। অন্ধকারে যেতে পারবে?"

"পারব।"

নীলু রায় তখন জগদ্ধাত্রীর নিকট গিয়া বলিলেন—"বৌঠান, চলুন যাই। পালকি যখন পাওয়া গেছে—"

জগদ্ধাত্রী যন্ত্রচালিতবৎ একটি পালকিতে গিয়া উঠিয়া বসিলেন। নীলু রায় বসিলেন আর একটিতে। বাহকেরা পালকি দুইটি সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়া লইল এবং নিঃশব্দে দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। বনজঙ্গল ভেদ করিয়া অবলীলাক্রমে ছুটিতে লাগিল তাহারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা বড় রাস্তায় উপস্থিত হইল। সেখানে নীলু রায়ের পালকি, ঘোড়া, লোকজন সবাই তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁহাদের নামাইয়াই পালকিবাহকগণ পালকি লইয়া দ্রুতপদে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। নীলু রায় তাহাদের পারিশ্রমিক দিবেন ঠিক করিয়া তাহাদের ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা আর ফিরিল না।

নীলু রায় জগদ্ধাত্রীকে লইয়া যখন জন সাহেবের কুঠিতে পৌঁছিলেন, তখন ভোর হইতেছে।

জগদ্ধাত্রী পালকি হইতে নামিয়াই বলিলেন—"এখানে আমি আর একদণ্ড থাকব না। আজই কলকাতায় ফিরে যাব। মরতে হয় সেইখানেই মরব। আপনি যাবার সব ব্যবস্থা করুন।"

নীলু রায় বুঝিলেন এ কথার প্রতিবাদ করা চলিবে না।

॥ দশ ॥

জাফরাগঞ্জের লাল কুঠিতে ধূর্জটিমঙ্গল ঝকমারি আর বারাহীর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেখানে দাসদাসী যানবাহন সিপাহীসান্ত্রী কিছুরই অভাব ছিল না। তিনি সেদিন বাড়ি ফিরিয়াই প্রথমে একটি ভালো ঘোড়া পাণ্ডবপ্রধানকে পাঠাইয়া দিলেন। ঝকমারিই সে ঘোড়াটি চড়িয়া গেল। ঝকমারি পুরুষের পোশাক পরিত্যাগ করে নাই। বারাহীকে হাসিয়া বলিয়াছিল—"আমি যুদ্ধে যাব তাই পুরুষ সেজেছি। শত্রু নিপাত করব—"

বারাহীর পাগলামী কমিয়া গিয়াছিল। শরীরও সারিয়া গিয়াছিল অনেক। এ পরিবর্তন কোন ঔষধ প্রভাবে হয় নাই। ধূর্জটিমঙ্গল যে-ই তাহাকে আশ্বাস দিলেন যে কংসকে তাহার কাছে ধরিয়া আনিবেন অমনই তাহার রোগ সারিয়া গেল। ধূর্জটিমঙ্গলকে সে বলিল—"দাদা, আমি কিন্তু ওকে খুন করব।"

"বেশ, তাই করিস।"

বারাহীর স্বামী হংসেশ্বর বৃদ্ধ। বারাহীর সহিত তাঁহার বয়সের তফাৎ বিয়াল্লিশ বৎসর। বারাহী ছাড়া আরও কয়েকটি পত্নী ছিল তাঁহার। বারাহী স্বামীগৃহে কখনও যায় নাই। পিতৃগৃহে ধূর্জটিমঙ্গলের নিকটই সে থাকিত। হংসেশ্বরই মাঝে মাঝে বারাহীর নিকট আসিতেন। একদিন খবর আসিল হংসেশ্বর অত্যন্ত অসুস্থ, বারাহীকে দেখিতে চান। তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা কংসেশ্বরকে তিনি পাঠাইলেন বারাহীকে লইবার জন্য। বারাহী পিতৃগৃহে থাকিত বলিয়া কংসেশ্বর তাঁহাকে ভালো করিয়া দেখেন নাই। নবোদ্ভিন্নযৌবনা রূপসী বারাহীকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বারাহী দেবরের সহিত স্বামীগৃহে গেলেন এবং শয্যাগত বৃদ্ধ স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রথমা সতীন মৃতবৎসা, অতিসারে ভুগিতেছিলেন। তিনি রোগে শোকে এমন জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহাকেও সেবা করিতে হইত বারাহীর। অন্যান্য সতীনগুলি নিজেদের ছেলেমেয়ে লইয়া বিব্রত। তাহারাও অনেকেই অসুস্থ এবং সংসারজ্বালায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ। রোগীর সেবা করিবার সময় তাহাদের ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। চতুর্দিকেই চ্যাঁ ভ্যাঁ, চতুর্দিকেই অশান্তি, চতুর্দিকেই কলহ কচকচি। বারাহীর মনে হইল যেন একটা নরকে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু সে অভিজাত বংশের মেয়ে। এই নরকেও সে স্বামী ও সতীনদের সেবা করিতেছিল। কিন্তু তাহার জীবন দুঃসহ করিয়া তুলিল ওই কংস। সে ফাঁক পাইলেই আসিয়া প্রণয় নিবেদন করিত। যেদিন সে তাহার হাত ধরিয়া টানিল সেদিন বারাহীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। ঠাস করিয়া তাহার গালে এক চড় মারিয়া সে পতিগৃহ ত্যাগ করিল। বেহালা অঞ্চলে শ্বশুরবাড়ি ছিল তাহার। তাহার স্বামী হংসেশ্বর সাবর্ণচৌধুরীদের কিরকম আত্মীয় ছিলেন। বারাহী বেহালা হইতে সোজা হাঁটিয়া বাপের বাড়ি সুতানুটিতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। অনুনয় করিতে করিতে কংস কিছুদূর তাহার অনুসরণও করিয়াছিল। কিন্তু বারাহীকে ফিরাইতে পারে নাই। বারাহী বলিয়াছিল, বেশী যদি বাড়াবাড়ি কর ডেকে লোক জড় করব। কংস আর অগ্রসর হইতে সাহস পায় নাই। সেকালে পথঘাট ভালো ছিল না, অনেক জায়গায় বনজঙ্গল ছিল, যানবাহন সুলভ ছিল না। বারাহী

পদব্রজেই সুতানুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই শুনিল চারিদিকে পালা পালা রব উঠিয়াছে। টালা দিয়া নবাবের ফৌজ নাকি আগাইয়া আসিতেছে। ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন এখন বাড়িতে থাকা ঠিক নয়, চল আমরা জঙ্গলে ঢুকে আত্মরক্ষা করি। দূরে ফৌজদের চীৎকার শোনা গেল। ধূর্জটিমঙ্গল ও ঝকমারি দ্রুতপদে জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। বারাহী ছুটিয়া ছাতে উঠিয়া পড়িল। চিলেকোঠার একটা ঘরে বিছানা গাদা করা ছিল। ঘরে খিল দিয়া সেই বিছানার মধ্যে লুকাইয়া রহিল বারাহী। সমস্তদিন লুকাইয়া রহিল। নবাবের সৈন্য বাড়িতে ঢুকিয়া ধূর্জটিমঙ্গলের দুই পত্নী আর আর ভগ্নীগণকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। চিলে-কোঠার ঘরে বসিয়া তাহাদের আর্ত হাহাকার শুনিল বারাহী। কিছু করিতে পারিল না, দুরু দুরু হৃদয়ে বসিয়া রহিল কেবল। সমস্ত দিন কাটিল, সমস্ত রাত কাটিল। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া অবশেষে সে চিলেকোঠার দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দেখিল লুণ্ঠনের চিহ্ন চারিদিকে। কেহ নাই। দাসী চাকররাও পালাইয়া গিয়াছে। উঠানে কূপ ছিল, কূপের ধারে দড়ি বাঁধা একটা ছোট বালতি ছিল। বারাহী উঠানে নামিয়া বালতি কূয়ায় নামাইয়া জল তুলিতেছিল। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল তাহার।

"এ কি, তুমি এখনও এখানে আছ?"

বারাহী চমকাইয়া উঠিল। দেখিল খিড়কি দরজায় কংস দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সর্বাঙ্গ যেন জমিয়া গেল। প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল সে। কংস হাসিয়া বলিল --"ভয় কি, আমি যখন এসে গেছি, তখন তোমাকে ভালো জায়গায় নিয়ে যাব। সেখানে আর কোন ভয় থাকবে না। দাঁড়াও একটা পালকি নিয়ে আসি।"

কংস চলিয়া গেল। বারাহী জল তুলিয়া বালতিতে মুখ লাগাইয়াই খানিকটা জল খাইয়া ফেলিল। তাহার পর আবার চিলেকোঠায় উঠিয়া খিল দিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। কাহারও কোন সাড়াশব্দ নাই। অনেকক্ষণ পরে শব্দ পাওয়া গেল। একাধিক পদশব্দ। সিঁড়ি দিয়া শব্দ ছাদে উঠিল। তাহার পর চিলেকোঠার দরজায় ঘা পড়িল।

"কপাট খোল। আমি এসে গেছি—"

বারাহী কপাট খুলিল না। তাহার পর পদাঘাতের পর পদাঘাত পড়িতে লাগিল কপাটের উপর। জীর্ণ কপাট সে প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। ভাঙিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিল দুইজন মুসলমান ফৌজি সিপাহী। দুইজনেরই কষকষে কালো দাড়ি, কাঁধে বন্দুক। তাহাদের পিছনে কংস, মুখে অদ্ভুত একটা কুটিল হাসি।

সিপাহী দুইটি ঘরে ঢুকিয়াই কোন ভূমিকা না করিয়া বারাহীকে ধরিয়া ফেলিল এবং টানিতে টানিতে নীচে লইয়া গেল।

কংস বলিল—"যে চড়টা মেরেছিলে সেটা সুদশুদ্ধ শোধ করে দিলাম।"

তাহার পর সিপাহীদের দিকে চাহিয়া বলিল—"আরও দুই একটা বাড়িতে খুবসুরৎ লেড়কী আছে তাহাদের সন্ধানও আপনাদের দিব। আমার সঙ্গে আসুন।"

সংক্ষেপে ইহাই কংসের ইতিহাস।

ধূর্জটিমঙ্গল কংসের খোঁজে উমিচাঁদের জমাদার জগন্নাথকে কলিকাতায়

পাঠাইয়াছিলেন। মৌনি বিবির মাধ্যমে জগন্নাথের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। মহম্মদী বেগও তাঁহার নিকট আসা যাওয়া করিতেছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল ধূর্জটিমঙ্গল মালদার লোক, ভালো করিয়া খিদমত করিতে পারিলে তাহার কিসমত ফিরিয়া যাইবে। সে যুগে সকলেই নিজের নিজের কিসমত ফিরাইতে ব্যগ্র থাকিত। অর্থের বিনিময়ে হীনকর্ম করিতেও কেহ পশ্চাৎপদ হইত না। স্বয়ং নবাব সিরাজউদ্দৌলাই অর্থের জন্য তাঁহার আপন মাসী ঘসেটি বেগমের মতিঝিল লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, রাজবল্লভকে পীড়ন করিয়াছিলেন, জগৎশেঠকে অপমান করিয়াছিলেন, বিদেশী বণিকদের নিকট হইতে নানাছলে নজরানা ও জরিমানা আদায় করিয়াছিলেন। সেকালে টাকার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন এমন লোকের সংখ্যা বড় বেশী ছিল না। ইতর-ভদ্র হিন্দু-মুসলমান সকলেই টাকার গন্ধ পাইলে নীতি-ধর্ম বিসর্জন দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। টাকা, মেয়েমানুষ এবং নবাব সরকারের দাক্ষিণ্যলাভ এই তিনটিকে কেন্দ্র করিয়াই নাগরিক জীবন আবর্তিত হইত, রাজনীতিও এই তিনটি চক্রে চক্রায়িত হইত। অধিকাংশ ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল এই তিনটি জিনিসই।

মহম্মদী বেগ আসিয়া ধূর্জটিমঙ্গলকে জানাইলেন—"আসফ আলী এখন মুর্শিদাবাদেই আছেন। তিনি ফৌজে কাজ করেন।"

"তাঁর বাড়ি কি এখানেই ?"

"না। তিনি এলাহাবাদের লোক। এখানে নোকরি করেন।"

"কোথায় থাকেন ?"

"থাকেন নাজমা বিবির বাড়িতে।"

"তাঁর পরিবার এখানে নেই ?"

"না। তারা সব এলাহাবাদে।"

এই খবরটি সরবরাহ করার জন্য ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহাকে অনেক 'শুক্রিয়া' দিলেন। তাহার পর আর একটি প্রশ্ন করিলেন।

"উজির আহমদের কোনও খবর পেলেন না ?"

"তিনি এখানে নেই। খবর পেলাম রাজমহলে ফৌজি দরবারে গেছেন! কিছুদিন এখন ওইখানেই থাকবেন। জনাব মীরজাফর সাহেবের ভাই জনাব মীরদাউদ ওখানে ফৌজদার এখন।"

ধূর্জটিমঙ্গল আবার তাঁহাকে 'শুক্রিয়া' দিয়া ছোট একটি রেশমের থলি উপহার দিলেন। থলির ভিতর পঞ্চাশটি মোহর ছিল।

মহম্মদী বেগ সেলাম করিলেন।

"আসফ আলীর সঙ্গে দেখা করবেন কি ? যদি যান আমি নিয়ে যেতে পারি।"

"যদি যাই খবর পাঠাব আপনাকে।"

অভিবাদন করিয়া মহম্মদী বেগ চলিয়া গেলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। আসফ আলীর আদেশে তাঁহার কলিকাতার ঘরবাড়ি পুড়িয়াছে এ খবর যেদিন তিনি মীর মহম্মদের নিকট পাইয়াছিলেন সেইদিনই তিনি স্থির করিয়াছিলেন আসফ আলীকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণ দিয়া করিতে হইবে। কিন্তু হত্যাটা তিনি নিজে করিতে চান না, কোন গুণ্ডাকে দিয়া করাইতে চান। খবর লইয়া তিনি জানিয়াছেন যে, মহম্মদী বেগ

একজন নামী গুন্ডা। নবাবের আশ্রয়ে বাস করে। অর্থের বিনিময়ে খুন রাহাজানি করাই নাকি তাহার পেশা। কিন্তু এই পেশাদার গুন্ডাকে হঠাৎ বিশ্বাস করা উচিত কি? ধূর্জটিমঙ্গল স্থির করিলেন বন্ধু মাণিক্যপ্রধানের সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিবেন। পান্ডব প্রধানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাণিক্যপ্রধানের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব আছে। সে বিশ্বাসযোগ্য লোকও বটে। তাঁহাকে প্রত্যহ তো তাহাদের বাড়ি যাইতেই হয়। কিন্তু মাণিক্যের সহিত তাঁহার বড় একটা দেখা হয় না। সে বাহিরে বাহিরেই বেশীর ভাগ সময় থাকে। নবাব সরকারে ইংরেজদের প্রতিনিধি ওয়াট সের সহিত তাহার নাকি বড়ই হৃদ্যতা। সেদিন ভাগ্যক্রমে তাহার সহিত দেখা হইয়া গেল। মাণিক্য রূপবান লোক। ছিপছিপে লম্বা, গৌরবর্ণ, মাথায় বাবারি চুল, চক্ষু দুইটি স্বপ্নময়, সরু গোঁফজোড়া কে যেন ঠোঁটের উপর আঁকিয়া দিয়াছে। পরিধানে জরিদার ঘুন্টি দেওয়া সাদা পাঞ্জাবি, ঢিলা পায়জামা। পায়ে মখমলের আগ্রাই নাগরা, বাঁ হাতে তর্জনীর উপর একটা পোষা হরবোলা পাখী। পাখীর একটি পা কালো রেশমের ডোরা দিয়া বাঁধা, ডোরাটি তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধের উপর নিবন্ধ। মাণিক্যপ্রধানের নিজের একটি তাঞ্জাম আছে, সেই তাঞ্জামেই তিনি সর্বত্র যাতায়াত করেন। ধূর্জটিমঙ্গল যখন গেলেন তখন মাণিক্যের তাঞ্জামটি রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিল। ধূর্জটিমঙ্গল অনুমান করিলেন মাণিক্য বাড়িতেই আছে। বৈঠকখানায় কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। বৈঠকখানার বিস্তৃত ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়া পান্ডব প্রধান বসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে সোচ্ছ্বাসে সংবর্ধনা করিলেন।

"এস, এস, এস। আজ মাণিক নতুন ঘুগনি এনেছে, তাতেই তর হয়ে আছি —"

"কি রকম ঘুগনি?"

"ফরাসী ঘুগনি। ইয়োরোপে ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ বেধেছে। এদেশের ইংরেজরাও ফরাসীদের এদেশ থেকে উৎখাত করতে চায়। ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের সন্ধি হয়েছে। ইংরেজরা নবাবকে বলছে তুমি আমাদের মিত্র, সুতরাং আমাদের শত্রু তোমারও শত্রু। তুমি তোমার রাজত্ব থেকে ফরাসীদের তাড়িয়ে দাও। কিন্তু নবাব মনঃস্থির করতে পারছেন না, দু'নৌকোয় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মনে মনে বুঝতে পারছেন সবাই তাঁর উপর চটা। মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, ইয়ারলতিফ, দুর্লভরাম এমন কি হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার রায় সবাই দুমুখো সাপ হয়ে বসে আছেন। রাজা মাণিকচাঁদও একটি অগ্নিগর্ভ পর্বত হয়ে আছেন। নবাব তাঁকে কয়েদ করেছিলেন, দশলাখ টাকা জরিমানা দিয়ে সে মুক্তি পেয়েছে। সে এখন তলে তলে নবাবের বিরুদ্ধে ইন্ধন যোগাচ্ছে ক্লাইভের দরবারে গিয়ে। নবাব ভাবছেন ফরাসীরা আমার সহায় আছে—কাশিমবাজার কুঠির লা সাহেব আমার বন্ধুলোক। যুদ্ধেও তারা ইংরেজদের চেয়ে কম পটু নয়—তাদের চটানো কি উচিত? এদিকে মাণিক আজ খবর এনেছে কলকাতা থেকে অ্যাডমিরল ওয়াট্‌সন অ্যায়সা কড়া এক চিঠি লিখেছে নবাবকে যে তাঁর চক্ষু নাকি চড়কগাছ হয়ে গেছে। ওয়াট্‌সন হেঁজিপেঁজি লোক নয়, কোম্পানির চাকরও নয়, সে কুইনের প্রতিনিধি, ক্লাইভকেও দাবড়ি দেয়। ইংরেজদের যুদ্ধ জাহাজের মালিক সে। সে নবাবকে লিখেছে—আপনি যদি ফরাসীর বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য না করেন তাহলে আপনার রাজত্বে এমন আগুন জ্বালিয়ে দেব যে সমস্ত গঙ্গার জল ঢেলেও সে আগুন নেভাতে পারবেন না।

নবাবের আর একটা আতঙ্ক আহমদ শা আবদালী। সে দিল্লী লুঠ করেছে কিছুদিন আগে। গুজব ছড়িয়েছিল সে বাংলাও নাকি লুঠ করবে। ভয়ে তটস্থ হয়েছিলেন সিরাজ। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে সে দিল্লী থেকে দেশে ফিরে যাচ্ছে। এখানে আর আসবে না। তাই নবাবের আতঙ্ক কমেছে একটু। আর একটা খবরও এনেছে মাণিক। ক্লাইভ নাকি স্থলপথে সসৈন্যে যাত্রা করেছেন চন্দননগর আক্রমণ করবেন বলে। তিনি বরানগরের কাছ বরাবর গঙ্গা পার হয়ে চন্দননগরের পাশে গোরিটির বাগানে তাঁবু গেড়েছেন। নন্দকুমার ওখানকার ফৌজদার। তার বাধা দেওয়া উচিত ছিল ক্লাইভকে। কিন্তু তিনি চুপটি করে বসে আছেন। সব তলে তলে সড়, বুঝলে? ঘুগনি কিন্তু মজাদার। হ্যাঁ, তুমি কাল চন্দ্রপুলি খেয়ে যাওনি বলে বুড়ী রেগে টং হয়ে গেছে, আজ খেয়ে যেও। তোমার জন্যে রাখা আছে।"

"মাণিক কোথা?"

"ভিতরে আছে। 'টি' নিয়ে ব্যস্ত আছে বোধহয়—"

"সে আবার কি!"

"ওয়াটস্ সাহেব ওকে কালো কালো শুকনো পাতা দিয়েছে কিছু। গরম জলে ভিজিয়ে তারপর ছেঁকে দুধ আর চিনি মিশিয়ে খেতে হয়। মাণিকবাবু শৌখিন মানুষ তো, ওইসব নিয়ে থাকতে ভালবাসেন।"

ধূর্জটিমঙ্গল সোজা অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন। বিরাট অন্দরমহল। প্রত্যেক ছেলের জন্যই একটা করিয়া মহল। ধূর্জটিমঙ্গল মাণিক্যপ্রধানের মহলে গিয়া ঢুকিলেন।

"আরে, আরে ধূজু যে। তুমি এসেছ শুনেছি, কিন্তু তোমার দেখাই পাইনি। অথচ তুমি রোজ আস—"

"বহু ভাগ্য না হলে মাণিক্যের নাগাল পাওয়া যায় না।"

ধূর্জটির নাগাল পাওয়া তো আরও ভাগ্যের কথা—"

জড়াইয়া ধরিলেন তিনি ধূর্জটিমঙ্গলকে।

তাঁহার হরবোলা পাখীটা নিকটেই একটা দাঁড়ে ছিল, সে সুমিষ্ট একটা শিষ দিল।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"শুনলাম তুমি 'টি' নিয়ে ব্যস্ত আছ।"

"হ্যাঁ, একটা নতুন জিনিস দিয়েছে ওয়াটস্ সাহেব। খাবে?"

"না এখন থাক। মা আমার জন্যে চন্দ্রপুলি রেখেছেন শুনলাম, সেটা খেতেই হবে। টি পরে খাব। তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন পরামর্শ আছে। শুধু গোপন নয় জরুরিও। কখন তোমার সময় হবে?"

"সময়ের অভাব কি, আমি তো কারো চাকরি করি না।"

হরবোলা পাখী করুণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ফটি—ক জল', 'ফটি—ক জল'। তাহার পরই বুলবুলের স্বরে বলিল—'কৃষ্ট প্রিয়' তাহার পরই আবার ফিঙের মতো—মৌক কি, মৌক কি।

"চুপ কর ফক্কোড় কোথাকার!"

পাখীকে ধমক দিলেন মাণিক্যপ্রধান। পাখীটা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় হইতে উড়িয়া আসিয়া তাঁহার কাঁধে বসিয়া বলিল—'বউ কথা কও'।

"কি দুষ্টু দেখেছ—"

"চমৎকার হরবোলাটি, সাধারণতঃ লোকে বুলবুল পোষে, তুমি এ হরবোলা পেলে কোথায় ?"

মাণিক্য এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর নিম্ন কণ্ঠে বলিলেন, "নাজমা উপহার দিয়েছে।"

"নাজমা ? যার কাছে আসফ আলী থাকে ?"

মাণিক্য আরও নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"আসফ আলী ওর ভরণপোষণ করে, আমি করি চরণতোষণ। চুপ, এ আলোচনা এখানে নয়। এখানে গোপন কথা বলা যায় না। কি গোপন পরামর্শ করবে বলছিলে ? তুমিও জুটিয়েছ নাকি কাউকে—"

"আমার তো মৈনি আছেই। না সে সব কথা নয়, অন্য কথা।"

"খুব গোপনীয় ?"

"খুব গোপনীয়।"

"তাহলে এখানে নয়। তোমার বাসায় চল। জাফরাগঞ্জে লাল কুঠিটাতে আছো ত ?"

"হ্যাঁ।"

"কে আছে সেখানে ?"

"ঝকমারি আর বারাহী। মনে আছে ওদের ?"

"মনে আছে বোধহয়। মন তো ভাই এইটুকু, আর মনে রাখবার মতো জিনিস রাশি রাশি। সব আঁটে না তাই। তারা কি যুবতী হয়েছে ?"

"বারাহীর তো বিয়েই হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। আর ঝকমারি বিয়ে করেনি। পুরুষের পোষাক পরে থাকে, বলে লড়াই করব। আমার ঠাকুর্দার ডাকাত বন্ধু ভোজপুরী ঝঙ্কার সিংয়ের দৌহিত্রী।"

"তোমার বাসায় ফাঁকা ঘর নিশ্চয় পাওয়া যাবে একটা ?"

"তা যাবে।"

"তাহলে তোমার বাসাতেই যাওয়া যাক চল।"

"বেশ। আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি তাহলে।"

মায়ের মহল একেবারে আলাদা। সেখানে উঠানেই শ্বেত-প্রস্তর নির্মিত একটি শিবমন্দির। সেই মন্দিরটিকে ঘিরিয়া একটি চকমিলানো ছোট বাড়ি। নীচে প্রশস্ত দালানে নাতি-নাতনী পৌত্র-পৌত্রীর দল খাইতে বসিয়াছে। কনিষ্ঠ বধূটি পরিবেশন করিতেছেন। দালানের মাঝখানে একটি উচ্চাসনে বসিয়া আছেন মা। তিনি খাওয়ার তদারক করিতেছেন। ধূর্জটিমঙ্গল গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি ভর্ৎসনার সুরে বলিয়া উঠিলেন—"তুই কাল না খেয়ে পালিয়ে গেলি যে বড়। তুই চন্দ্রপুলি ভালোবাসিস বলে কাল তোর জন্যেই চন্দ্রপুলি করেছিলাম, আর তুই না খেয়েই চলে গেলি ?"

"দিন, এখন খাব।"

"বৌমা, ধুজুকে এই খানেই একটা ঠাঁই করে দাও।"

ধূর্জটিমঙ্গলকে দেখিয়াই বধূটি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। শাশুড়ীর আদেশে সে একটি কার্পেটের আসন বিছাইয়া দিল।

"রুপোর থালায় ওর জন্যে পাঁচগণ্ডা চন্দ্রপুলি আলাদা রেখে দিয়েছি। বারকোস

ঢাকা আছে। সেইটে নিয়ে এস। পায়েসও দাও একবাটি। আর বাগান থেকে যে কোহিতুর আম এসেছে তাই দাও গোটাকতক। ভালো বেগমপসন্দ যদি থাকে তাও এনো—”

ধূর্জটিমঙ্গল একটু প্রতিবাদ করিতে গেলেন—“মা এখন অত—”

ধমকাইয়া উঠিলেন মা।

“কথাটি বলতে পাবে না। এমন কিছু বেশী দিচ্ছি না।”

ধূর্জটিমঙ্গল আর প্রতিবাদ করিলেন না।

একটু পরে বধূটি কুড়িটি চন্দ্রপুলি, এক জামবাটি পায়েস, পাঁচটি কোহিতুর এবং পাঁচটি বেগমপসন্দ আম তাঁহার সামনে সাজাইয়া দিল। ধূর্জটি নীরবে খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেগুলি শেষ করিয়া ফেলিলেন।

“চন্দ্রপুলি কেমন লাগল ?”

ধূর্জটিমঙ্গল সংক্ষেপে বলিলেন—“অমৃত।”

মাণিক্যপ্রধান এবং ধূর্জটিমঙ্গল জাফরাগঞ্জের বাসায় একটি নির্জন ঘরে বসিয়াই আলাপ করিতেছিলেন। সমস্ত শুনিয়া মাণিক্যপ্রধান বলিলেন—“তুমি আসফ আলীকে হত্যা করবেই ঠিক করেছ ?”

“কেন, তোমার আপত্তি আছে ?”

“আমার আপত্তি থাকবে কেন! কি আশ্চর্য, সৎকার্যে আমি আপত্তি করেছি কখনও ?”

হরবোলাটা তাঁহার হাতের উপর বসিয়াছিল। মাণিক্য তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—“আমি সৎকাজে কখনও আপত্তি করি ?”

হরবোলা উত্তর দিল—“রামঃ রামঃ রামঃ।”

মাণিক্যপ্রধান বলিলেন—“পাপীকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে। আমি ভাবছি ছুরি দিয়ে হত্যা করবে, না পুড়িয়ে মারবে—”

“পুড়িয়ে মারার অনেক ঝঞ্চাট। আমি লোক লাগিয়ে হত্যা করতে চাই এবং হত্যা করবার আগে তাকে জানিয়ে দিতে চাই কেন তাকে হত্যা করা হল। মহম্মদী বেগ লোকটাকে কাজে লাগাব কিনা সেইটেই জানতে চাই।”

গুণ্ডা হিসাবে ভাল। কাজ ঠিক হাসিল করে দেবে। কিন্তু খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর কারো কাছে টাকা খেয়ে তোমার নামটা প্রকাশ করে দেবে হয়তো। তার চেয়ে এক কাজ কর—”

“কি—”

ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ বেধেছে চন্দননগরে। ফরাসীদের সাহায্য করবার জন্য নবাব কিছু সৈন্য মোতায়েন রাখতে বলেছেন নন্দকুমারকে। আসফ আলী সেই সৈন্যদলে থাকবে। ইংরেজদের দলেও দেশী সিপাহী অনেক আছে। সেই সিপাহীদের মধ্যে আছে চক্রধর কপাট। যেমনি জোয়ান তেমনি নিষ্ঠুর। তাকে আমি হাত করতে পারি। পঞ্চাশটা কিংবা বড়জোর একশ'টা মোহর কবলালে সে সোজা গিয়ে আসফ আলীকে খুন করে আসবে। সবাই জানবে আসফ আলী যুদ্ধে মারা গেছে।”

"কিন্তু আমি তাকে জানাতে চাই যে আমি তাকে তার পাপের জন্য মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছি।"

"তাহলে একটা চিঠি লিখে ফেল। লেখ—জনাব আসফ আলী খাঁ তুমি আমাদের ঘর পুড়িয়ে যে পাপ করেছ, তার জন্যে আমি তোমাকে শাস্তি দেব। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাক। নীচে কোন নাম দেবার দরকার নেই। এ চিঠি আমি আসফ আলীর কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি।"

"আমি এক্ষুণি লিখে দিচ্ছি।"

"কিন্তু তোমার না লেখাই ভালো। আর কাউকে দিয়ে লেখাও।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"এ বাড়িতে আমি ছাড়া ফার্সি কেউ জানে না। নীলু জানত। কিন্তু সে তো এখানে নেই।"

"উর্দুতে লিখলেও চলবে—"

"ঝকমারি উর্দু জানে। বাবা ছেলেবেলায় ওকে উর্দু শিখিয়েছিলেন।"

"কিন্তু ঝকমারি মেয়েছেলে, তাকে বিশ্বাস করবে?"

"আপনার যাতে অনিষ্ট হয়, সে এমন কিছু কখনও করবে না।"

"কুর্‌র্‌র্‌র্‌—।"

একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ম শব্দ করিয়া হরবোলা মাণিক্যপ্রধানের স্কন্ধে আরোহণ করিল।

মাণিক্যপ্রধান হাসিয়া বলিলেন—"এর মানে ওর ক্ষিধে পেয়েছে, আমাকে বাড়ি যেতে হবে—"

"কি খায় ও? এখানেই ওর খাবার দিচ্ছি—"

"ওর খাবার তুমি দিতে পারবে না। ও খায় মাকড়শা, উচ্চিংড়ে, মধু আর পেস্তা কিসমিস। ওর চাকর ভেড়ুয়া ওর খানা তৈরী করে। তুমি ডাক না ঝকমারিকে। তাকে দিয়ে আমি চিঠিটা লিখিয়ে নিয়ে চলে যাই।"

ডাকিতেই ঝকমারি আসিল। সে পাশের ঘরেই ছিল। পুরুষের বেশেই ছিল সে। পাঞ্জাবি ও চুস্ত পাজামা পরিয়া চমৎকার দেখাইতেছিল তাহাকে।

মাণিক্য হাসিয়া বলিলেন—"পুরুষ বেশে চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে। ধূজু বলছিল তুমি নাকি লড়াইয়ে যেতে চাও?"

ঝকমারি সাগ্রহে বলিল—"হ্যাঁ চাই। আমি নবাবদের বিরুদ্ধে লড়ব। ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?"

"তা পারি। আমার দূর সম্পর্কের ভাই বলে পরিচয় দিলে ওয়াট্‌স তোমাকে সুপারিশ করে কালা ফৌজে ভরতি করিয়ে দিতে পারে। বলব তাকে?"

"হ্যাঁ, বলুন বলুন।"

ধূর্জটিমঙ্গল মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

"উর্দু লিখতে জান?"

"জানি—"

"তাহলে এই চিঠিটা নকল করে আন দেখি। ধূজু চিঠিটা লিখে ফেল তুমি।"

ধূর্জটিমঙ্গল উঠিয়া পাশের ঘরে গেলেন এবং চিঠিটা লিখিয়া লইয়া আসিলেন।

"এইটে নকল করে আন তুমি—"

ঝকমারি একটু অবাক হইয়া গেল। কিন্তু কোন প্রশ্ন করিল না। চিঠিটা লইয়া পাশের ঘরে গেল এবং নকল করিয়া আনিল।

হরবোলা আবার বলিল—কুর্‌র্‌র্‌র্‌—।

"এর ক্ষিধে পেয়েছে। আমি এখন উঠি। পরে আসব—"

"আমাকে ফৌজে ঢুকিয়ে দেবেন ?"

ঝকমারি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল আবার।

"ধুর্জ্জ যদি রাজী হয়, চেষ্টা করতে পারি !"

ধুর্জ'টিমঙ্গল হাসিয়া উত্তর দিলেন—"পাগল নাকি !"

মাণিক্যপ্রধান বলিলেন—"আচ্ছা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাও তাহলে। আমি তোমাকে একটা ফৌজি পোশাক পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেইটে পরে বাড়িতেই ঘোরাফেরা কর। পোশাক আমার বাড়িতেই আছে, এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

হরবোলা আমার বলিল—কুর্‌র্‌র্‌র্‌।

"যাচ্ছি যাচ্ছি, চল। ক্ষিধে পেলে একদণ্ড তিষ্ঠুতে দেবে না কোথাও।"

মাণিক্যপ্রধান চলিয়া গেলেন।

ঝকমারি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল—"আসফ আলী নামটা যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ আসবার সময় জঙ্গলে মীর মহম্মদের কাছে শুনেছিলাম এ লোকটা আমাদের ঘরবাড়িতে আগুন দিয়েছিল। একে শাস্তি দেব।"

"আমাকে যুদ্ধে যেতে দাও, আমিই ওকে শাস্তি দেব।"

"এই তুচ্ছ কাজের জন্য তোমাকে এত বড় সর্বনাশের ভিতর পাঠাতে পারি না।"

"আমিও তো তুচ্ছ। আমি তোমার জীবনে বাধা একটা। আমি তো তোমাদের কোনও কাজেই লাগিনি। এই কাজটি করতে দাও আমাকে—"

"না, তুমি পবিত্র, মহিমময়ী তোমাকে দিয়ে আমি নরহত্যা করাতে পারি না।"

"মা কালীও তো নারী, তিনি তো—"

"তিনি দেবতা, তুমি মানুষ। তফাৎ অনেক। আসফ খাঁ মরবে, কিন্তু তার সঙ্গে তোমাকেও মরতে দিতে পারি না।"

"আসফ খাঁকে মারবার অধিকার আমারই আছে। প্রথম যেদিন সেই অন্ধকার গুহায় ওই নামটা শুনেছিলাম সেইদিনই যেন আমার মনের অন্ধকার গুহায় একটা সাড়া জেগেছিল। তখন বুঝতে পারিনি এখন পাচ্ছি। এখন সেই যুদ্ধক্ষেত্রটা দেখতে পাচ্ছি আমি—"

ঝকমারি সামনের আসনটায় বসিয়া বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর দুলিতে লাগিল ধীরে ধীরে।

"আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি দেখতে পাচ্ছি রানী দুর্গাবতীকে। রাজপুত চন্দেল বংশের উজ্জ্বল মহিমা, মাহোবারাজের বীর কন্যা, গড়মণ্ডলাধিপতির মহারানী দুর্গাবতীকে দেখতে পাচ্ছি আমি। আমিই দুর্গাবতী। আমি বিধবা হয়েছি। স্বামী চারবছর আগে মারা গেছেন। আমার রাজ্য আক্রমণ করেছেন সম্রাট আকবর। অনেক সৈন্য নিয়ে এসেছে সেনাপতি আসফ খাঁ। আমি হাতীর পিঠে চড়ে সেনা পরিচালনা

করছি তার বিরুদ্ধে। হঠাৎ দুটো তীর লাগল আমার মুখে। একটা তীর আমার চোখে বিঁধল। এই দেখে আমার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগল। আমি বার বার ডাক দিলাম সবাইকে ফেরো, ফেরো, ফেরো তোমরা। কেউ ফিরল না। নিরুপায় হ'য়ে মাহুতের হাত থেকে ছোরা নিয়ে আত্মহত্যা করলাম তখন। আসফ খাঁর সৈন্য গড়মণ্ডল অধিকার করল, কিন্তু আমাকে অধিকার করতে পারল না। সেই আসফ খাঁ আবার আমাদের ঘর পুড়িয়েছে, এবার তাকে আমিই শাস্তি দেব। আমিই শাস্তি দেব—"

ঝকমারি অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে তুলিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিলেন।

ঝকমারি সমস্ত দিন অজ্ঞান হইয়াই রহিল। অজ্ঞান অবস্থায় বিড়বিড় করিয়া কি যে বলিতে লাগিল তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। কারণ যে ভাষায় সে বলিতেছিল সে ভাষা বাংলা ভাষা নয়। ইহা দেখিয়া বারাহীরও কেমন যেন মাথা খারাপ হইয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—মর মর মর,-মরে শান্তি পা। এদেশে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালে আর নিস্তার নেই। মরতেই হবে। আমি মরব। কিন্তু কংসকে মেরে তারপর মরব।"

ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে আলাদা একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। বিপদের সময় ধূর্জটিমঙ্গল বিচলিত হন না। তিনি ঝকমারির মাথার শিয়রে বসিয়া বার বার তাহার চোখে মুখে, চুলে গোলাপের আসব সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ঝকমারিকে সেবা করিতে পারে এরকম দাসী বাড়িতে ছিল, কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গল কোনও দাসী নিয়োগ করিলেন না, নিজেই তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ মৌনিবিবি আসিয়া হাজির। তাহার সর্বাঙ্গে সাদা মসলিনের অপরূপ ওড়না, পিছনে জরির ফিতা জড়ানো বেণী, চোখে সুরমা। মুখে মৃদু হাসি। ছিপছিপে কালো দেহটি ঘিরিয়া যে স্নিগ্ধতা বিচ্ছুরিত হইতেছে তাহা স্থূল নহে সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম।

ধূর্জটিমঙ্গলের কাছে আসিয়া সে বলিল—"রাজা, কি হয়েছে? একবারও যাননি কেন আমার কাছে?"

"বড় ব্যস্ত আছি—"

"এ কে?"

"আমাদের পরিবারেরই একজন। বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

ধূর্জটিমঙ্গল খসখসের হাতপাখা দিয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। মৌন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। নীরবে কি যেন হৃদয়ঙ্গম করিল। তাহার পর বলিল, "আমি তাহলে যাই। ওস্তাদ কেরামত ফিরে এসেছেন, সেই খবরটা দিতে এসেছিলাম। আমি চললাম।"

"যাচ্ছ কেন, বস না।"

"না এখন বসা ঠিক হবে না।"

মৌন চলিয়া গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল ঝকমারির শয্যাপার্শ্বে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে ঝকমারির জ্ঞান হইল, ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল সে। তাহার পর পাশ ফিরিয়া শুইল।

একটু পরেই মাণিক্যপ্রধানের একটি দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হাতে একপ্রস্থ ফৌজি পোশাক এবং একটি পত্র। মাণিক্যপ্রধান উর্দুতে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম—চন্দননগরে যুদ্ধ লাগিয়া গিয়াছে। নবাব সাহেব ফরাসী লা সাহেবকে কাশিমবাজার কুঠি ছাড়িয়া পাটনায় চলিয়া যাইতে বলিয়াছেন। আসফ আলি খাঁকে পত্র পাঠাইয়াছি। উজির আহম্মদ এখানে নাই। রাজমহলে আছে। ওস্তাদ কেরামত আসিয়া তাহার সেই পুরাতন পোড়ো বাড়িটাতে উঠিয়াছে। আমি সন্ধ্যায় সেখানে যাইব। তুমি আসিলে কেরামত খুশী হইবে। ঝকমারির পোশাক পাঠাইলাম। পত্র পাঠ শেষ করিয়া ধূর্জটিমঙ্গল ঝকমারিকে বলিলেন—মাণিক তোমার জন্যে ফৌজি পোশাক পাঠিয়েছে।

ঝকমারি সোৎসাহে উঠিয়া বসিল।

"তাই নাকি! কই দেখি—"

পোশাক লইয়া সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। ধূর্জটিমঙ্গল মাণিক্যের পত্রটি আর একবার পাঠ করিলেন। তাহার পর উঠিয়া সন্তর্পণে বারাহীর ঘরের শিকলটি খুলিয়া দেখিলেন পাগলী অঘোরে ঘুমাইতেছে। সন্তর্পণে শিকলটি আবার তুলিয়া দিলেন তিনি। ফৌজিসাজে সাজিয়া পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল ঝকমারী। তাহার একমুখ হাসি, চক্ষু দুইটি উদ্ভাসিত।

"গায়ে ঠিক হয়েছে?"

"খুব ঠিক হয়নি। একটু ঢিলে হয়েছে। কিন্তু এতেই চলে যাবে।"

"সিপাহীজি, তুমি তাহলে বারাহীকে পাহারা দাও। আমি কেরামতের সঙ্গে একটু দেখা করে আসি।"

"বেশ।"

মুর্শিদাবাদ শহরের বাহিরে একটি বাগানের মধ্যে ছোট একটি বাড়ি। তাহাতে শামাদানে ছোট একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। প্রদীপের সামনে একটি শতরঞ্চি পাতা। সেই শতরঞ্চির উপর গেরুয়া রঙের একটি আলখাল্লা পরিয়া কেরামত সারেঙ্গী বাজাইতেছিল। কেরামত কন্দর্পকান্তি, কিন্তু তাহার রূপের মধ্যে লালসার কোন আভাস নাই। তাহা যেন অতি পবিত্র, দেখিলেই সম্ভ্রম জাগে। যদিও তাহার পোশাক অতি সাধারণ, যদিও তাহার অঙ্গে কোন অলংকার নাই, যদিও তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত গোঁফদাড়িতে আতর বা অন্য কোন সুগন্ধের চিহ্ন মাত্র নাই, তবু তাহাকে ঘিরিয়া এমন একটি আভিজাত্য বিরাজ করিতেছিল যাহা দুর্লভ। মনে হইতেছিল অদৃশ্য এক সিংহাসনে একজন সম্রাট যেন বসিয়া আছেন। সামনে আর একটি ছোট আসনে পুতলিবিবি পুতুলের মতোই বসিয়া ছিল। তন্ময় হইয়া বাজনা শুনিতেছিল সে। তাহার যেন বাহ্যজ্ঞান ছিল না। বাজনা শেষ করিয়া কেরামত তাহার দিকে চাহিতেই সে ঝুঁকিয়া সেলাম করিল। কেরামতের বাজনা শোনার পর পুতলি বরাবরই সেলাম করে। বলে—সুরের যে হুরী আসিয়া এতক্ষণ আনন্দ বিতরণ করিয়া গেল তাহাকেই কুর্ণিশ করিলাম। পুতলি নিজেও একটি মূর্তিমতী সুর। অপরূপ রূপসী তো বটেই তাহার ধরনধারণও অনন্য। কথা খুব কম বলে। কিন্তু তাহার কম্পমান অধর, তাহার চকিত দৃষ্টি, কপালের উপর ক্রীড়াশীল তাহার চূর্ণ অলকদাম, তাহার সমগ্র মুখমণ্ডলের সদা-উন্মুখ ভাব, তাহার ঈষৎ বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র তাহাকে যে অবর্ণনীয় শ্রী-শোভায় মণ্ডিত করিয়াছে, একমাত্র সুরের সহিতই তাহা উপমেয়।

কেরামত বলিলেন—"এইবার তুমি তোমার বীণা শোনাও।"

ইহাদের কথাবার্তা উর্দুতেই হয়, আমি বাংলা অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"আপনার সারেঙ্গীর পর আমার বীণা জমবে না।"

কেরামত হাসিয়া বলিলেন—"পুতলি এ কথাটা তুমি বিশ্বাস কর না কেন যে, তুমি আমার চেয়ে অনেক বড় বাজিয়ে?"

পুতলি আবার অভিবাদন করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"শুক্রিয়া। খোদাতালা কিন্তু আমার উপর একটি মেহেরবানি করেছেন, আমার আসল 'কিমৎ' কি তা বোঝবার বুদ্ধিটুকু আমায় দিয়েছেন।"

"আচ্ছা, তবে ওকথা যাক। সরফুদ্দিনকে দেখতে যাবে কি? খবর পেয়েছি ধুজু তাকে খুব আরামেই রেখেছে। এখানকার মাদ্রাসায় সে পড়াশোনা করছে। একজন ভালো মৌলভীসাহেব তার দেখাশোনা করেন। ধুজু সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে।"

পুতলি নতমুখে নীরবে রহিল খানিকক্ষণ।

তাহার পর বলিল—"হুজুর যা করতে বলবেন, তাই করব।"

কেরামত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন—"দেখ আমার মতে ওর সঙ্গে আর দেখা না করাই ভালো। আমরা দুজনেই দেওয়ানা, আমরা যা খুঁজছি তা হয়তো ইহজীবনে পাব না। কিন্তু খুঁজতে হবে তবু। আমরণ খুঁজতে হবে। সুরের সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়েছি। চিরকাল ভেসেই যেতে চাই। কোন পিছটান থাকলে ভাসা যাবে না। আমরা ঢোলখণ্ডে সেই চাষার বাড়িতে খুব আনন্দে ছিলাম। এখানে ফিরে এসেছি সরফুদ্দিনের একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে। ধুজু ওর সব ব্যবস্থা করেছে। ধুজু আমাকে বলেছিল—ওর ভার আমি নিলাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। লালবাগের কাছে আমার কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি আছে। ভাবছি ধুজুর নামেই সেটা লেখাপড়া করে দিয়ে যাব। সেইজন্যেই এখানে এসেছি। কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে, তুমি ওর মা, তুমি কি ওকে ছেড়ে যেতে পারবে?"

পুতুলি বলিল—"আপনি যদি পারেন, আমিও নিশ্চয় পারব। আপনিই সরফুদ্দিনকে আমাকে দিয়েছিলেন, সরফুর চেয়ে আপনি আমার কাছে বড়। আপনি যদি সরফুকে ছেড়ে থাকতে পারেন, আমিও পারব।"

"একবারও দেখা করবে না?"

"দেখা করলে হয়তো দুর্বল হয়ে পড়ব। আপনি ঠিকই বলেছেন, দেখা না করাই ভালো। আমার কিন্তু একটা ছবি প্রায়ই মনে পড়ে। ঢোলখণ্ডের রাস্তার ধারে সেই যে ছোট্ট নদীটা ছিল। নদীর ধারে সামান্য জঙ্গল ছিল একটু। আমরা শিকারপুর থেকে ফিরছিলাম, রাস্তায় সন্ধ্যা হয়ে গেল, আকাশে চাঁদ উঠল। হঠাৎ দেখি নদীর ধারে একটা বাঘিনী তার তিনটে বাচ্চাকে নিয়ে খেলা করছে। আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম গাছের ছায়ায়। দেখতে লাগলাম সেই বাঘিনী আর তার বাচ্চা তিনটেকে, কি সুন্দর যে লাগছিল! এ ছবিটা আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। তোমার পড়ে না?"

"পড়ে বইকি। তার চেয়ে আরও সুন্দর একটা ছবির কথাও মনে পড়ে। বড়লোকের মেয়ে পুতলিবিবি গরীবের 'কুটিয়া'য় বসে বীণা বাজাচ্ছে। ভুলে গেছে তার ঐশ্বর্যের কথা, ছেলের কথা, সুর ছাড়া আর সবকিছুর কথা।"

পুতোলিবাবির চোখ দুইটিতে অশ্রু টলমল করিতে লাগিল। কোন কথা না বলিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল সে। কিন্তু বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না, বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল সে।

মাণিক্য ও ধূর্জটি প্রবেশ করিলেন।

"আরে আরে এস এস, আমিই যে তোমাদের ওখানে যাব ভাবছিলাম। আমি যে এখানে এসেছি সে খবর কি করে পেলে?"

"মৌনি খবর দিয়েছে। তুমি কি মৌনির বাড়িতে গিয়েছিলে?"

"গিয়েছিলাম। সে আমার প্রিয় ছাত্রী। এখানে এসে তার সঙ্গে দেখা না করলে সে বড় অভিমান করে। তার কাছেই গিয়েছিলাম খালি, আর কোথাও যাইনি।"

ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া বলিল—"তোমার কাছে যাব মৌনিকে বলেছিলাম। মৌনি বললে তুমি কোথায় কখন থাক ঠিক নেই। মাণিকেরও পাত্তা পাওয়া নাকি শক্ত। শুনলাম ইংরেজদের গোলা পড়ছে চন্দননগরে, নবাবের সৈন্য যাচ্ছে চন্দননগরের দিকে। সাজ সাজ রব পড়ে গেছে চতুর্দিকে। আমি বিব্রত হয়ে পড়েছি। ভাবছি কালই চলে যাব এখান থেকে।"

"সরফুর সঙ্গে দেখা করবে না?"

"না। তুমি তো ওকে সুখে রেখেছ শুনলাম। আমরা দেখা করে হয়তো মায়ার ফাঁদে আটকে যাব। সে ইচ্ছে নেই।"

"কোথায় যাবে তোমরা?"

"জঙ্গলে। টনকপুরে এক বুড়ো চাষীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ভালো গান গায়। তার সঙ্গে দোস্তি হয়ে গেছে। তারও কেউ নেই। বুড়ো হয়ে গেছে বেচারা। নিজে রান্নাবান্না করতে পারে না। ঠিক হয়েছে পুতলি তার রান্না করে দেবে, আর আমি তার ক্ষেত পাহারা দেব। আর সময় পেলেই তিনজনে মিলে পাড়ি দেব সুরের সমুদ্রে। এখানে এসেছি তোমাকে একটা জিনিস দেব বলে।"

কেরামত উঠিয়া গেল এবং ভিতর হইতে লাল কাপড়ে জড়ানো ছোট একটি কাগজের পুলিন্দা লইয়া আসিল।

"এই নাও।"

ধূর্জটিমঙ্গলের হাতে পুলিন্দাটি দিল সে।

"কি এটা—"

"আমার ঠাকুর্দাকে নবাব সুজাউদ্দিন লালবাগের কাছে ছোটখাটো একটা জায়গীর দিয়েছিলেন। সেখানে আমাদের প্রায় তিনশ বিঘে জমি আছে, একটা বাড়ি আছে, বাগান আছে, পুকুরও আছে একটা। বাবা ওই বাড়িতেই ছিলেন, আমারও ছেলেবেলা ওখানে কেটেছে। এখন ওটা প্রায় বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে আছে। তোমাকেই ওটা দিয়ে যাচ্ছি। ওর কোবালা, কাগজপত্তর, সুজাউদ্দিনের হুকুমনামা, সব এর মধ্যেই আছে। আমিও লিখে দিয়েছি আমি সমস্ত তোমাকে দান করলাম। এখন তুমি ওটা নিয়ে যা খুশী কর। আমি এসব ভার বইতে পাচ্ছি না।"

"আমি নিয়ে কি করব। নিজের বিষয়ই আমি সামলাতে পারি না। নীলু সব দেখে—"

"নীলু কোথা এখন?"

"সে জঙ্গলমহালে ধলরাজার রাজ্যে আছে। তুমিই গিয়ে নিজের বাড়িতে বাস কর—"

"না, এদেশে বড় গোলমাল। এদেশের আবহাওয়ায় সুর নেই, আছে খালি হাল্লা। আমার ভালো লাগছে না। তুমি আমার ছেলে সরফুকে নিয়েছ, আমার বিষয়টাও নাও। আমরা টনকপুর চলে যাই।"

"টনকপুর কোথা ?"

"হিমালয়ের নীচে। চমৎকার জায়গা। আর সেই বুড়ো আবিদ মিঞা বড় ভালো গান গায়। শুনবে তার একটা গান ?"

কেরামত সারেঙ্গী তুলিয়া সারেঙ্গী বাজাইতে বাজাইতে গাহিতে লাগিল।

ময় দেওয়ানা হুঁ
    ময় একই খবর লায়া হুঁ
খুদা কি মেহেরবানি
    ফুল হোকর খিলতি হায়
বাহি ফুল দো মুঝকো
    ফুল চুননে আয়া হুঁ
ময় একই খবর লায়া হুঁ
    ময় দেওয়ানা হুঁ।

মাণিক্যের হরবোলা গান শেষ হইবামাত্র সুমিষ্টকণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'দেওয়ানা হুঁ'।

কেরামত সহাস্যদৃষ্টিতে পাখীটির দিকে চাহিয়া বলিল - "বাঃ দোস্ত। তোমার গলা আমার চেয়েও মিষ্টি।"

ধূর্জটি গম্ভীর হইয়া গিয়াছিলেন।

মাণিক্য বলিলেন—"দেখ, ভাই কেরামত, তোমার মতো বন্ধু যে আমাদের ছেড়ে বিরাগী হয়ে যাবে এ আমরা সহ্য করব না। তুমি শহরে না থাকতে চাও পাড়াগাঁয়ে চল। কেঁকালাতে আমার যে জমিদারি আছে সেখানে কোন গোলমাল নেই। চল সেখানেই তোমার ব্যবস্থা করে দিই।"

"আমি ভাই এদেশে থাকতে পারব না। তাছাড়া আবিদ মিঞা আমার পথ চেয়ে থাকবেন! আমি তাকে কথা দিয়ে এসেছি ফিরে যাব। আমাকে যেতেই হবে।"

"কিন্তু তোমাকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তোমার সঙ্গে টাকাকড়ি আছে ?"

"আছে কিছু। খুব বেশী নয় অবশ্য—"

"কম টাকা নিয়ে অতদূর যাবে কি করে ? হেঁটে যাবে ?"

কেরামত কিছু বলিল না, হাসিল কেবল।

মাণিক্য বলিল—"বেশ, যাবে যাও। কিন্তু একটি শর্তে তোমাকে যেতে দেব। তোমার সঙ্গে আমরা কিছু টাকা দিয়ে দেব। দুজন হাতিয়াবন্দ লোকও সঙ্গে থাকবে আর একটা বড় পালকি—"

ধূর্জটিমঙ্গল গম্ভীর হইয়াই রহিলেন, কিছু বলিলেন না।

"ধূর্জু তুমি কিছু বলছ না যে ?"

"বলবার তো কিছু নেই। আমি নিজে চিরকাল নিজের মতে নিজের পথে চলেছি। কেরামতও যদি তাই চলতে চায় আমি বাধা দেব কেন। তবে তুমি যা বলেছ সেটা

ঠিক। ওকে নিঃসহায়ভাবে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। ওর সঙ্গে দুজন রক্ষী, একটি বড় পালকি আর কিছু টাকা অবশ্যই দিতে হবে। সব খরচ আমাদের। কেরামত তুমি কি কালই যাবে ?"

"কালই যাব। কিন্তু ভাই আমার জন্যে এতসব করছ কেন—"

ধূর্জটিমঙ্গল উত্তর দিলেন—"এর জবাব দেব না। যা ঠিক করেছি তা করবই। তোমাকে আমরা বাধা দিইনি, তুমিও আমাদের বাধা দিও না। তবে ইচ্ছে করলে তুমি আমার একটি উপকার করতে পার। শুনেছি কারাধ্যক্ষ তুর্ক আলি তোমাকে খুব খাতির করেন। আমার এক বন্ধু জন সাহেব বিনা দোষে কয়েদ হয়ে আছেন। তাকে আমি উদ্ধার করতে চাই। তুমি তুর্ক আলিকে একটা চিঠি লিখে দেবে ? সেই চিঠি নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

"আমি চিঠি লিখে তোমাকে আমার বন্ধু বলে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। কিন্তু কাজ হাসিল করতে হলে শুধু আমার চিঠিতে হবে না। ঘুষ দিতে হবে।"

"দেব।"

"বেশ, চিঠি নিয়ে যেও তাহলে।"

মাণিক্য বলিলেন—"এবার একটু গানবাজনা হোক। আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে।"

"সারেঙ্গী ছাড়া আমি কিছু আনিনি।"

"সারেঙ্গীই বাজাও।"

কেরামত সারেঙ্গী বাজাইতে শুরু করিল।

দেখিতে দেখিতে স্বরের এমন এক মায়ালোক চতুর্দিকে মূর্ত হইয়া উঠিল যে, ধূর্জটি ও মাণিক্য উভয়ে ভুলিয়া গেলেন তাঁহারা মুর্শিদাবাদ শহরে সামান্য একটা শতরঞ্জিতে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মনে হইল তাঁহারা গন্ধর্বলোকে স্বপ্নবিহার করিতেছেন। মুখর হরবোলা পাখীটাও মাণিক্যের স্কন্ধে নীরবে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া ধূর্জটিমঙ্গল দেখিলেন ঝকমারি বারাহী কেহ নাই। চাকর একটি চিঠি দিল। ঝকমারির চিঠি। ঝকমারি লিখিয়াছে—"আমি যুদ্ধে চললাম। জগন্নাথ কলকাতা থেকে এসেছিল। বারাহীর স্বামী মৃত্যুশয্যায়। তিনি তাকে দেখতে চান, জগন্নাথ একটা ছিপ নিয়ে এসেছিল। সেই ছিপে চড়ে বারাহীও চলে গেছে। আমি ফিরব কিনা জানি না। যদি না ফিরি দুঃখ কোরো না। তোমাকে দেবতা বলে জানি। দেবতার কাজে যদি আত্মবলি দিতে পারি তাহলে কৃতার্থ হব। আমার প্রণাম জেনো। বৌদিকেও অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছি। তিনি সতীলক্ষ্মী, তিনি দেবী। জানি না আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কিনা।"

ধূর্জটিমঙ্গল নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

॥ এগারো ॥

উমিচাঁদের জমাদার জগন্নাথ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সাবর্ণচৌধুরীরা নামী লোক ছিলেন। উমিচাঁদের জমাদার হিসাবে সে তাহাদের বাড়িতে কয়েকবার গিয়াছিল। কিন্তু

তাহাদের এই আত্মীয় হংসেশ্বরের পরিবারকে সে চিনিত না। ধূর্জটিমঙ্গলের নিকটই ইহাদের সব বৃত্তান্ত সে শুনিল। ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে বলিলেন—ওই বংশের কুলাঙ্গার কংসকে ধ্বংস করিতে হইবে। সে আমার বোনের সম্ভ্রমই শুধু নষ্ট করে নাই সে তাহাকে মুসলমান ফৌজরূপী নেকড়েগুলোর হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। বারাহী ফিরিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সে এখন উন্মাদিনী। তাহার মুখে এক বুলি—"কংসকে খুন করব।" তাহাকে আমি আশ্বাস দিয়াছি তাহার বাসনা আমি পূর্ণ করিব। কিন্তু সে মেয়েমানুষ, কংসকে হত্যা করা তাহার সামর্থ্যে কুলাইবে না। তাহার সহিত কংসের যোগাযোগ করাও সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। তুমি ইহার একটা ব্যবস্থা কর। টাকা যাহা লাগে আমি দিব। বেশ কিছু টাকা লইয়া জগন্নাথ কলিকাতা গিয়াছিল। কলিকাতায় গিয়া দেখিল কলিকাতায় বেশ একটা উত্তেজনা। লালমুখ গোরা পলটনরা সর্বত্র সদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেছে। তাহাদের দেখিলেই দেশী কালো আদমীরা যে যেখানে পারিতেছে আত্মগোপন করিতেছে। জগন্নাথ আসিয়া বেহালায় হংসেশ্বরদের বাড়িতেও গিয়াছিল, সাবর্ণ-চৌধুরীদের পরিচয়ের সুবাদেই গিয়াছিল সেখানে। বলিয়াছিল চৌধুরীবাবুরা আপনাদের খবর লইতে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু গিয়া চাকরবাকরদের মুখে যাহা সে শুনিল তাহা প্রায় অবিশ্বাস্য। হংসেশ্বর সত্যই মৃত্যুশয্যায় শায়িত। পাছে সহমৃতা হইতে হয় এই ভয়ে তাঁহার পত্নীরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ছেলেমেয়ে লইয়া কে কোথায় যে সরিয়া পড়িয়াছেন তাহা বোঝা যাইতেছে না। হংসেশ্বরকে সেবা করিবার লোক নাই। দিবারাত্রি তিনি বারাহীকে স্মরণ করিতেছেন। জগন্নাথ আর একটি সংবাদও সংগ্রহ করিল। কংস নবাবপক্ষ ত্যাগ করিয়া এখন নাকি ইংরেজপক্ষে ভিড়িয়াছেন। একজন ইংরেজ ব্যবসায়ীর সহিত তাহার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। কংস এখন তাহার ব্যবসার অংশীদার। একটি ইংরেজ পাদ্রীর সহিতও মাখামাখি করিয়াছে কংস। অনেকের ধারণা কংস এবার হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইলে ইংরেজ দরবারে বড় চাকরি হইবে তাহার। কংস একটা কেষ্টবিষ্টু হইয়া যাইবে। একদিন সুযোগ বুঝিয়া জগন্নাথ কংসের সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ করিল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল তাহাকে। তাহার পর হাতজোড় করিয়া বলিল—"আপনাকে গোপনে একটা কথা নিবেদন করিতে চাই।"

"কে তুমি—"

"আমি উমিচাঁদের বাড়ির চাকর। মালিক এখন মুর্শিদাবাদে আছেন বলে আমি সেখানেই থাকি। একটা জরুরি দরকারে কলকাতায় এসেছি। আমি যখন কলকাতায় আসছিলাম তখন আপনার বৌদিদি বারাহী ঠাকরুনের সঙ্গে দেখা হল আমার। তিনি বললেন—আমিও তোমার সঙ্গে কলকাতায় যাব। আমার শ্বশুরবাড়ি বেহালায় যেতে চাই, ঠাকুরপোর জন্যে বড় মন কেমন করছে। আমি রাগারাগি করে চলে এসেছি। আবার ফিরে যেতে চাই। তুমি আমাকে নিয়ে চল। কিন্তু আমি বেহালায় যেতে পারব না, চিৎপুরেশ্বরী কালীমন্দিরের পাশের গলিতে আমার দাদার একটা বাড়ি আছে। সেখানেই আমি উঠব। তুমি ঠাকুরপোকে সেইখানেই ডেকে নিয়ে এস।"

কংস যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

"এসেছেন তিনি ?"

"এসেছেন।"

"তাহলে আমাকে নিয়ে চল সেখানে।"

"নিয়ে যাব। তাঁকে জিগ্যেস করে এসে সন্ধ্যার পর নিয়ে যাব আপনাকে।"

জগন্নাথ একটি ছিপ ভাড়া করিয়াছিল, কারণ ছিপ দ্রুতগামী। দশজন মাঝি দাঁড় বাহিবে, একজন হালে থাকিবে। ছোট একটি ঘরও ছিল ছিপটিতে। ত্রিবেণীর জমিদারবাবুদের নিকট ছিপটি সংগ্রহ করিয়াছিল জগন্নাথ। ফরাসীদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধের খবর চতুর্দিকে চাউর হইয়া গিয়াছিল। দুইদিন পূর্বেই ওয়াটসনের রণতরী ভাগীরথী বাহিয়া চন্দননগরের দিকে আগাইয়া গিয়াছে। মাঝিরা মুর্শিদাবাদের দিকে যাইতে চাহে নাই। জমিদারবাবুরাও ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু টাকার জোরে মাঝিদের বশ করিয়া ফেলিল জগন্নাথ। ত্রিবেণীর জমিদারবাবুরা উমিচাঁদের নিকট টাকা ধার করিয়াছিলেন। জগন্নাথ বলিল—মালিকের একটা জরুরি দরকারেই ছিপটা আমার চাই। জমিদারবাবুরা আর আপত্তি করিলেন না। কেবল একটা কড়ার করাইয়া লইলেন—ছিপটা মুর্শিদাবাদে গিয়াই যেন ফিরিয়া আসে। ফরাসীদের সহিত সাহেবদের জলযুদ্ধ লাগিয়াছে, তাহাদের কোন পক্ষ যদি ছিপখানাকে আটকাইয়া ফেলে তাহা হইলে বড়ই মুশকিলে পড়িতে হইবে। জগন্নাথ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল ছিপ যেদিন যাইবে সেইদিনই ফিরিয়া আসিবে। মুর্শিদাবাদে গিয়া জগন্নাথ যখন পৌঁছিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার চতুর্দিকে ঘনাইয়া আসিয়াছে। জাফরাগঞ্জে ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়ি গিয়া দেখিল ধূর্জটিমঙ্গল নাই। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিল সে। তবু ধূর্জটিমঙ্গল ফিরিল না। ছিপের মাঝিরা আসিয়া বলিল—রাস্তা দিয়ে একদল ফৌজ কুচকাওয়াজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুনেছি এখানেও নাকি যুদ্ধ বাধবে। তুমি যদি এখনি আমাদের সঙ্গে না আসতে পার, আমরা আর অপেক্ষা করতে পারব না। জগন্নাথ বাধ্য হইয়া শেষে বারাহীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। প্রণাম করিয়া বলিল—"মাঠাকরুন আপনার স্বামী মৃত্যুশয্যায়। আপনাকে দেখতে চান। ছিপ পাঠিয়েছেন। কিন্তু ছিপটা থাকতে চাইছে না। এক্ষুণি চলে যেতে চায়।" তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিল—"কংসকে কায়দা করেছি।"

বারাহীর মনে হইল—তাহার স্বামী মৃত্যুশয্যায়? তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন? অসহায় রুগ্‌ণ হংসেশ্বরের মুখটা তাহার মনের উপর ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু কথাটা তেমন বিশ্বাস হইল না। বহুপত্নীক হংসেশ্বর তো তাহাকে কোনদিন স্ত্রীর মর্যাদা দিয়া পার্শ্বে স্থান দেন নাই। তবু সেই রোগা লোকটার চেহারা বারবার তাহার মনে জাগিতে লাগিল। নিজে হাতে খাইতে পর্যন্ত পারেন না, খাওয়াইয়া দিতে হয়। বিছানায় উঠিয়া বসিবার সামর্থ্য নাই, উঠাইয়া বসাইয়া দিতে হয়। বারাহীর মনে পড়িল যে দৃষ্টিতে তিনি তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন সে দৃষ্টি যেন আতুরের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি যেন কৃপাভিখারী, সে দৃষ্টি যেন তাহার কাছে নীরব ভাষায় বারবার বলিতেছিল—আমায় ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর। হঠাৎ পাগলীর মনে হইল—আমি যাইব, এখনই যাইব, নিশ্চয় যাইব, হাজার হোক স্বামী তো! কেউ তো তাহার সেবা করে না, হয়তো তেষ্টার সময় জল পাইতেছেন না, হয়তো খলে মাড়িয়া কবিরাজী ঔষধ কেহ সময়মতো দিতেছে না, হয়তো গুয়েমুতে মাখামাখি হইয়া পড়িয়া আছেন—

নানা চিত্র পরপর তাহার মনে ফুটিয়া উঠিল। সে ঠিক করিল যাইবে, দাদার জন্য আর অপেক্ষা করিবে না। কংসের কথা হঠাৎ তাহার মনে পড়িল। সে কি ওখানে আছে? সে যদি ওখানে থাকে তাহা হইলে তো—

জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করিল "কংস কি ও বাড়িতে আছে?"

জগন্নাথ বলিল—"না—"

"সে কোথায় আছে?"

"গেলেই বুঝতে পাববেন। এখন এর বেশী আর কিছু বলব না। যদি যান তাহলে বেশী দেরি করবেন না, কারণ ছিপের মাঝিরা এখনই চলে যেতে চাইছে।"

বারাহী জগন্নাথের সহিত বাহির হইয়া পড়িল।

ছিপ যখন ছাড়িল, তখন চারিদিকে অন্ধকার। বারাহী সমস্ত রাত ঘুমাইল না। অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মাঝে মাঝে নৌকা দেখা গেল, ঘাটের পাশে-পাশে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরবাড়িও দেখা গেল। মাঝে মাঝে আলো জ্বলিতেছে। আবার অন্ধকার। নদীর ধারে ধারে অনেক ঝোপ-জঙ্গল, জোনাকিরা সেখানে দীপালী উৎসব করিতেছে যেন। বারাহী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যখন সকাল হইল তখন ঘাটে ঘাটে স্নানার্থীর ভীড়, নৌকাও অনেকরকম। কোনটা মালবাহী বড়, কোনটা বড়লোকের বজরা, কোনটা পারাপারের খেয়া নৌকা, কোনটা ডিঙি। গঙ্গার তীরে মাঝে মাঝে মন্দির, সেখানে পুজোর ঘণ্টা বাজিতেছে। এক জায়গায় প্রকাণ্ড একটা বটগাছ। তাহাতে অনেক পাখী। তাহার একটা ডাল গঙ্গার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সে ডালে উঠিয়া ছেলেমেয়েরা জলে ঝাঁপ দিতেছে। একটা ঘাটে উলু উলু শব্দ শোনা গেল। একদল মেয়ে ঘড়া লইয়া আসিয়াছে। বোধহয় কোথাও বিবাহ হইতেছে, জল 'সইতে' আসিয়াছে মেয়েরা। চারিদিকে জীবনেরই উৎসব। আসন্ন যুদ্ধের ভয় কাহারও মুখে নাই। বারাহী মাঝে মাঝে ঢুলিতেছিল। সমস্ত রাত সে ঘুমায় নাই।

"মা ঘরে গিয়ে একটু ঘুমোন না"—জগন্নাথ বলিল।

"না আমি ঘুমুব না।"

শ্রীরামপুরের ঘাটে ছিপ ভিড়াইল জগন্নাথ। ঘাটের উপরই একটি খাবারের দোকান ছিল। কিছু খাবার কিনিয়া আনিল সে। গরম সন্দেশ, গরম লুচি, এক হাঁড়ি ভাল দই।

"মা, কিছু খেয়ে নিন।"

"তোমরা খাও, আমি কিছু খাব না।"

মাঝি মাল্লারা স্নান করিয়া লইল। আহারও করিল তাহারা।

জগন্নাথ বলিল—"মা কিছু মুখে না দিলে, আমি খাব না।"

অগত্যা বারাহী সামান্য সন্দেশ লইয়া মুখে দিল। কিন্তু সে একেবারে চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল সর্বক্ষণ। মাথায় ঘোমটা টানিয়া নদীর জলের দিকেই চাহিয়া রহিল। কিন্তু তাহার মন চুপ করিয়া ছিল না। মন তাহার ফিরিয়া গিয়াছিল সুদূর অতীতে, যখন তাহার বাবা মহেশমঙ্গল বাঁচিয়া ছিলেন। যখন তিনি তাহাকে নয় বৎসর বয়সে গৌরীদান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যখন তাহাকে প্রৌঢ় হংসেশ্বর মাঝে মাঝে আসিয়া আদর করিয়া যাইতেন, যখন তাহার বড়বৌঠান ভানুমতী তাহাকে নানাসাজে সাজাইয়া দিতেন, কপালের উপর চন্দনের আলপনা দিতেন, দুই ভ্রূর

মাঝখানে কাঁচপোকার টিপ পরাইয়া দিতেন, চুলে সুগন্ধী তেল দিয়া চমৎকার খোঁপা বাঁধিয়া দিতেন। নিত্য নূতন রকমের খোঁপা, বোঠান কতরকমের খোঁপা বাঁধিতেই যে জানিতেন, ঢাকাই মসলিনের হালকা শাড়ী পরাইতেন তাহাকে, পায়ে পাঁয়জোর পরাইয়া দিতেন, মলের উপর চুটকি ছিল, হাত ভরতি সোনার চুড়ি ছিল, মকরমুখো বালা ছিল, তাগা ছিল। হংসেশ্বর আসিলে সেগুলি পরিতে হইত। কোথাও নিমন্ত্রণে গেলেও সেগুলি পরিতে হইত কিন্তু সেগুলি তখন মসলিনের কাপড় দিয়া ঢাকা থাকিত—হঠাৎ তাহার দিদিদের কথা মনে পড়িল। বড়দিদি জগদম্বা শ্বশুর বাড়ি হইতে পুরীতে তীর্থ করিতে গিয়াছিল। আর ফেরে নাই। জলদস্যু বোম্বেটেরা তাহাকে নাকি লুটিয়া লইয়া গিয়াছিল। মনে পড়িল ভালো আমসত্ত্ব দিতে পারিত সে। নতুন কাপড়ের উপর ছোট ছোট পাথরের থালায় ভালো ভালো আমের আমসত্ত্ব দিত, রোদে বসিয়া পাহারা দিত সর্বক্ষণ। মেজদি শ্যামাঙ্গিনীকেও মনে পড়িল তাহার। পাড়ার একটা ছেলের সহিত ভাব হইয়াছিল তাহার। বাবা তাহাকে জোর করিয়া শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন মগরায়। সেখানে জ্বরে ভুগিয়া মরিয়া গেল সে। আর এক বোন জয়া—ভারী দস্যালিনী ছিল সে। ঝকমারির সহিত খুব ভাব ছিল। আমের সময় দুইজনেই বাগানে ঘুরিত। বর্ষায় সময় গঙ্গার জলে সাঁতার দিত। একবার একটা মুসলমান ছোঁড়া নাকি তাহাদের পিছু লইয়াছিল। সে শিশ দিতেই ঝকমারি একটা থান ইঁট ছুঁড়িয়া তাহার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। অনেক হাঙ্গামা হইয়াছিল ইহা লইয়া। বাবা গোবিন্দ মিত্তিরের সহায়তায় অনেক টাকা খরচ করিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই হইতে তাহারা আর বাড়ির বাহির হইত না। কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল তাহার। হংসেশ্বর একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন—তোমার জন্য সোনার কেয়ূর গড়াতে দিয়েছি। বারাহী বুঝিতে পারে নাই কেয়ূর আবার কি। গহনা যখন আসিল তখন হাসি পাইল তাহার—ওমা এ তো বাজু! এর নাম কেয়ূর নাকি। এমনি সব কত অসংলগ্ন স্মৃতি, কত তুচ্ছ ঘটনা মনে পড়িল তাহার। গঙ্গার জলে দেখিল একটা ফুলের মালা ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে। বারাহীর মনে হইল তাহার জীবনেও কত ফুল ফুটিয়াছিল, সে সব ফুল লইয়া মালাও গাঁথিয়াছিল সে, সে মালাও ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ একটা ঘাটের কাছে দেখিল অনেক লোকের ভীড়। ঘণ্টা বাজিতেছে, শাঁখ বাজিতেছে, কীর্তন হইতেছে। বারাহী দেখিল একটি মুমূর্ষু বৃদ্ধকে গলা পর্যন্ত গঙ্গাজলে ডুবাইয়া তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া কয়েকজন লোক তারস্বরে চীৎকার করিতেছে—হরে কৃষ্ণ হরে রাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম। বারাহী বুঝিতে পারিল অন্তর্জলী হইতেছে। তাহার ঠাকুরদাদারও হইয়াছিল। আর একটা কথাও মনে পড়িল—তাহার ঠাকুরমা 'সতী' হইয়াছিলেন। ঠাকুরদাদার সহিত এক চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছিলেন। তাঁহার সব দুঃখের অবসান হইয়াছিল। জীবনে অনেক শোক পাইয়াছিলেন তিনি, দুরারোগ্য পেটের ব্যথায় ছটফট করিতেন, চিতায় পুড়িয়া শান্তি পাইয়াছিলেন।

আর একটা ঘাটে দেখিল দুইটি কালো পাঁঠাকে স্নান করাইতেছে। ঘাটের উপরই একটি খড়ের মণ্ডপে কালীমূর্তিও দেখা গেল। বারাহীর মনে পড়িল খুব ছেলেবেলায় সে-ও একটি ছাগলছানা পুষিয়াছিল। তাহার নাম ছিল মটরু। মটরু একদিন হারাইয়া গেল। শোনা গেল তাহাকে নাকি কালীঘাটে বলি দেওয়া হইয়াছে।

বারাহীর মনটা কেমন যেন উদাস হইয়া গেল। নদীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল সে। তাহার মনে হইতে লাগিল জীবনে সাধ-আহ্লাদ তো ফুরাইয়া গিয়াছে, নিজের আত্মীয়-স্বজন-মরিয়া গিয়াছে, হারাইয়া গিয়াছে, পলাইয়া গিয়াছে। জীবনের যে ছবিটা সে আঁকিয়াছিল তাহার রং শুকাইতে না শুকাইতে কে যেন তাহার উপর এক ঘটি জল ঢালিয়া দিল, সব রং উঠিয়া গেল, ছবি অবলুপ্ত হইল। রং-ন্যাবড়ানো কাগজটার দিকে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল সে। হঠাৎ তাহার চমক ভাঙিল, ছিপ কলিকাতার বাগবাজারের ঘাটে ভিড়িয়াছে।

জগন্নাথ আসিয়া বলিল—"মা এবার নামতে হবে, আমরা বাগবাজারে এসে গেছি। আমি একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আসছি—"

"এখান থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে বেয়ালায় যাব ?"

"বেয়ালায় যাবার আগে চিৎপুর হয়ে যাব একবার।"

"চিৎপুর ? কেন ?"

"সেখানে আপনাদের একটা ছোট বাড়ি আছে। একটা জিনিস আছে সেখানে। ধূর্জবাবু বলেছিলেন সেটা আপনাকে দিতে—"

"কি জিনিস ?"

"একটা বাক্স।"

"কিসের বাক্স ?"

"দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

একটি গলির সামনে চিৎপুরের উপরই ঘোড়ার গাড়িটা দাঁড়াইয়া রহিল। জগন্নাথ তাহাকে আর গলির ভিতর ঢুকিতে দিল না।

"মা নামুন। গলির ভিতর কিছুদূর যেতে হবে।"

বারাহী নামিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল আবার। এই অপরিচ্ছন্ন সরু গলিটাতে একা জগন্নাথের সঙ্গে যাইতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না তাহার। গলির মুখেই একটা মরা ইঁদুর পড়িয়া আছে। তাহার পাশে খানিকটা গাদা-করা ছাই। রাস্তার দুই ধারে সারি সারি বিষ্ঠা, পাড়ার ছেলেমেয়েরা রাস্তার দুইধারে মলত্যাগ করে। গলির দুই পাশে পচা নালী। অধিকাংশ বাড়িরই দেওয়াল মাটির, চাল খড়ের। মাঝে মাঝে দুই একটা পাকা ছোট বাড়ি আছে। কিন্তু সেগুলিও বড় পুরাতন, ইঁটগুলি নোনা লাগিয়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"এ কোথায় আনলে আমাকে জগন্নাথ। এখানে আমাদের বাড়ি আছে জানতুম না তো।"

জগন্নাথ সে তর্কে না গিয়া বলিল—"আসুন না আমার সঙ্গে। বেশীদূর নয়, কাছেই। ঘরে গিয়ে কুলুপটি খুলে জিনিসটি আপনার হাতে দিয়ে দেব। ধূর্জবাবুর হুকুম এটা। অমান্য করতে পারব না।"

"বেশ তো, আমি গাড়িতেই বসছি। তুমি গিয়ে নিয়ে এস সেটা।"

"না, সে জিনিস আনা যাবে না। আপনি চলুন।"

নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে অবশেষে বারাহী জগন্নাথের পিছু পিছু গেল। কিছুক্ষণ পরে একটি পাকা বাড়ির সম্মুখে জগন্নাথ দাঁড়াইল। বাহিরের দরজায়

প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলিতেছিল। সেটা খুলিবার পর ভিতরে ঢুকিতেই বারাহী দেখিল প্রকাণ্ড উঠান একটা। উঠানে এক হাঁটু ঘাস। একধারে একটা আকন্দগাছে ফুল ফুটিয়াছে, আর একধারে ভাঙা তুলসীহীন তুলসীমঞ্চ একটা। আর একধারে ঘেঁটু ও কচুর বন। বাড়ি জনশূন্য!

"কোথা নিয়ে এলে জগন্নাথ—"

জগন্নাথ কোন উত্তর না দিয়া সোজা দালানে গিয়া ঢুকিল এবং আর একটা ঘরের তালা খুলিতে লাগিল।

"কোন ভয় নেই। চলে আসুন সোজা।"

বারাহী দালানে গিয়া দেখিল জগন্নাথ একটি ঘরে ঢুকিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া সে একটি তালাবন্ধ বড় সিন্দুকের তালা খুলিতেছে। বারাহী সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। সিন্দুকের ভিতর হইতে কাঁসার একটি বড় হাঁড়ি বাহির করিল জগন্নাথ। হাঁড়ির মুখে একটি পেতলের সরা, ময়দা দিয়া সরাটি হাঁড়ির মুখে আটকানো। জগন্নাথ ময়দার প্রলেপ তুলিয়া সরাটি খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর হাঁড়ির ভিতর হইতে বাহির করিল একটি ছিন্নমুণ্ড।

"এই নিন। কংসের মুণ্ডু। আপনি তাকে খুন করতে চেয়েছিলেন, আপনার আদেশ আমরা প্রতিপালন করেছি। মুণ্ডুটি কেটে তাকে ভালো বিলিতি মদে ভিজিয়ে রেখে আপনাকে আনতে গিয়েছিলাম।"

বারাহী ব্যায়ত আননে মুণ্ডটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পা দুইটা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল সে। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার পর নিজেকে সামলাইয়া প্রশ্ন করিল—"একে খুন করলে কে—"

"গুণ্ডারা করেছে। পাঁচশ আসরফি খরচ হয়েছে এ জন্য। পয়সা ফেললে এদেশে ঘাতকের অভাব হয় না। তবে আমি করিনি। ওই পাষণ্ডকে ছুঁতে আমার প্রবৃত্তি হয়নি। আমি যাদের খুন করেছি তারা দেবী ছিল। তাদের রক্ষা করবার জন্যেই তাদের খুন করতে হয়েছিল—"

বারাহী নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

"চলুন এবার। আপনাকে শ্বশুরবাড়ি পেঁছে দি। আপনার স্বামীর অবস্থা খুবই খারাপ দেখে এসেছিলাম।"

কয়েকদিন পরে জগন্নাথ মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া মৈনি বিবিকে খবর দিল বারাহীর স্বামী মারা গিয়াছেন। বারাহী ফেরে নাই, কারণ সে স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছে। ধূর্জটিমঙ্গল মুর্শিদাবাদে ছিলেন না। মৈনি বলিতে পারিল না তিনি কোথায় গিয়েছেন।

॥ বারো ॥

কংস ও আসফ আলি খাঁকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়া ধূর্জটিমঙ্গল ঠিক করিয়াছিলেন এবার উজির আহম্মদের পশ্চাদ্ধাবন করিবেন। তাঁহার পত্নীর ধর্ষণকারী

তাঁহার হাত হইতে নিস্তার পাইবে না। নানাদিক হইতে খবর লইয়া তিনি জানিয়াছিলেন উজির আহম্মদ রাজমহলে আছেন। রাজমহলে গিয়াই ওই পাষণ্ডকে বিনাশ করিতে হইবে এই সংকল্প করিয়া তিনি বাছা বাছা কয়েকটি গুণ্ডা লইয়া রাজমহলে যাইবেন ঠিক করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার বুকের ভিতরটা পুড়িয়া যাইতেছিল অপমান অবিচার প্রতিহিংসার ত্রিশূলে, যদিও তাঁহার মর্ম ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, কিন্তু বাহিরে তাহার কিছু মাত্র প্রকাশ ছিল না। বাহিরে তিনি মোনিবিবির অসংগত আবদার রক্ষা করিতেছিলেন, বন্ধু কেরামতের গান শুনিতেছিলেন, পিতৃবন্ধু পাণ্ডবপ্রধানের সহিত সরস রাজনীতি আলোচনা করিতেছিলেন, মাণিক্যের মায়ের মহলে গিয়া প্রত্যহ কিছু খাইয়া আসিতেছিলেন, মাণিক্যপ্রধানের নূতন পাখী হরবোলা এবং নূতন প্রণয়িনী নাজমাকে লইয়া লঘু হাস্য-পরিহাস করিতেছিলেন, মাঝে মাঝে জগদ্ধাত্রীর মুখখানাও তাঁহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল কিন্তু মনে মনে একটি লক্ষ্যেই তিনি দৃষ্টি স্থির রাখিয়াছিলেন, পাপীদের দণ্ড দিতে হইবেই। পাপীতে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সব পাপীদের দণ্ড দিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, কিন্তু যাহারা তাঁহার বংশকে কলঙ্কিত করিয়াছে, তাঁহার মর্যাদার মূলে আঘাত করিয়াছে, তাঁহার বংশের পুরনারীদের সতীত্ব হরণ করিয়াছে—তাহাদের তিনি প্রাণদণ্ড দিবেন। যে দেশে রাজাই লম্পট স্বেচ্ছাচারী, পশুবল এবং অর্থবলই যে দেশে ন্যায়বিচারের সিংহাসন জবর দখল করিয়া বসিয়া আছে, সে দেশে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে নিজেই পাপীদের দণ্ড দিতে হইবে। পশুবল এবং অর্থবলের সহায়তা লইয়াও সে দণ্ড দিতে হইবে। ধূর্জটিমঙ্গল অনুভব করিতেছিলেন এ দণ্ড দিতে তিনি যদি অপারগ হন তাঁহার সমূহ সর্বনাশ হইয়া যাইবে, তিনি আর ভদ্রসমাজে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন না, যে পৌরুষ তাঁহার বংশমর্যাদার ভিত্তি সেই পৌরুষ চিরতরে অবলুপ্ত হইবে, তাঁহার আত্মসম্মানের, তাহার বংশগৌরবের হর্ম্য ভাঙিয়া পড়িবে। তাই তিনি স্থির করিয়াছিলেন এ দণ্ড দিবেনই। কংস এবং আসফ আলির ব্যবস্থা হইয়াছে এবার উজির আহম্মদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাণিক্য এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে তাঁহাকে। দুইজন পর্তুগীজ, দুইজন রাজপুত এবং তিনজন সাহেব গুণ্ডা যোগাড় করিয়া দিয়াছে সে। সকলেই অস্ত্রবিশারদ, সকলেই অর্থপিশাচ। এমন কাজ নাই যাহা তাহারা টাকার জন্য না করিতে পারে।

মাণিক্যপ্রধান বলিল—"খবর নিয়ে জানলুম, উজির আহম্মদ সম্প্রতি মফঃস্বল থেকে একটি গেরস্তর বউকে ভাগিয়ে নিয়ে এসে জোর করে নিকে করেছেন। তোমাকে সেই বধূটির স্বামী সাজতে হবে। ওদের কাছে তোমার আসল নাম বলিনি, সেই মেয়েটির স্বামী বটুকলালের নাম বলেছি। তুমি বটুকলাল সেজে যেন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে যাচ্ছ। ওদের প্রত্যেককে দুশো আসরফি দিয়েছি। কার্যসিদ্ধি হলে আরও একশো করে দিতে হবে। তুমি টাকাটা সঙ্গে নিয়ে যেও এবং উজির সাহেবের মরামুখ দর্শন করে টাকাটা ওদের দিয়ে দিও। ওরা রাজমহলের দিকে বেরিয়ে গেছে, ঘাটের কাছে যে আফগান সরাইখানা আছে সেইখানেই ওরা আড্ডা গাড়বে। তুমিও কাল সকালেই বেরিয়ে পড়। শুভস্য শীঘ্রম্। কি বলিস রে হরবোলা ?"

হরবোলা হলদে পাখির ডাকের নকল করিয়া বলিল—'টিউ'।

সেদিন কেরামতের বাড়িতে যখন গানের আসর শেষ হইল, গন্ধর্বলোক হইতে

সকলে যখন মর্ত্যলোকে অবতরণ করিলেন তখন কেরামত বলিল—"আমি কাল চলে যাব। মৈনিকে এই খবরটা দিও। আর তার সঙ্গে দেখা করতে পারব না।"

মাণিক্য বলিল, "ধূর্জটি তুমিই তাহলে খবরটা দিয়ে দিও। আমি কেরামতের যাওয়ার ব্যবস্থা করি।"

কেরামত একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

"কেন ভাই ওসব হাঙ্গামা করতে যাচ্ছ। আমরা দেওয়ানা, আমাদের দেওয়ানার মতোই থাকতে দাও।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমরা যা করছি তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন। তুমি দেওয়ানা আছ, দেওয়ানার মতোই থাক।"

মাণিক্য বলিল—"আলবৎ।"

সেইদিন রাত্রেই ধূর্জটিমঙ্গল মৈনি বিবির কাছে গেলেন।

মৈনি অবাক হইয়া গেল।

"এত রাত্রে এত কৃপা।"

তাহার চোখ দুটিতে হাসি নাচিতে লাগিল।

"খবর দিতে এলাম কেরামত কাল চলে যাচ্ছে। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না তার।"

"একথা সকালে এসে বললেই পারতেন। কত রাত হয়েছে জানেন? তোপখানা থেকে রাত দুপুরের তোপ অনেকক্ষণ আগে পড়ে গেছে।"

"কাল সকালে আমি বাইরে যাব।"

"কোথায় যাবেন?"

"সব কথা না-ই জানলে।"

"তবু বলুন।"

"না, বলব না। একটা কথা কিন্তু বলব—তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।"

মৈনির চোখ দুইটির আলো যেন নিভিয়া গেল সহসা।

বলিল—"ঘাস দেখে সবাই বলে আহা কি সবুজ, আহা কি চমৎকার। কিন্তু ঘাসের কি দুঃখ জানেন? ঘাসকে মানুষ দু'পায়ে মাড়িয়ে যায়, আর গরুতে ছিঁড়ে খায়। কিন্তু আমি জানি আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি যাচ্ছেন রাজমহল।"

"কে বলল!"

"তা বলব কেন?"

মুচকি হাসিয়া মৈনি আদাব করিল। তাহার পর হঠাৎ পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

ধূর্জটিমঙ্গলও আর অপেক্ষা করিলেন না, বাড়ি চলিয়া গেলেন।

বাড়ি ফিরিয়া তিনি ঝকমারির চিঠি পাইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। চাকর হীরালাল বলিল ঝকমারি ফৌজি বেশ পরিধান করিয়া একটি তাঞ্জামে চড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে তাহা সে জানে না। বারাহী জগন্নাথের সঙ্গে গিয়াছে। এখন কি করা উচিত? ধূর্জটিমঙ্গল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন উহাদের অনুসন্ধানে তিনি বৃথা কালক্ষয় করিবেন না। করিলেও উহাদের ধরিতে পারিবেন না। যাহা হইবার হউক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি হীরালালকে বলিলেন—"খাবার দাও—"

পাচক জানকী ঠাকুর প্রচুর রান্না করিয়া রাখিয়াছিল। নিরামিষ ব্যঞ্জনই বেশী। রোহিত মৎস্যের কালিয়া এবং রোহিতের মুড়া দিয়া মুগের ডালও ছিল। হীরালাল বলিল—"মাণিকবাবুর মা আপনার জন্যে কিছু বেলের মোরব্বা আর মধু পাঠিয়েছেন।" ধূর্জটিমঙ্গল ভাত খাইলেন না। খাইলেন রোহিত মৎস্যের কালিয়াটা এবং ডালটা। তাহার পর দুইটি আম এবং আমের পর বেলের মোরব্বা কয়েকটা। পরিশেষে খানিকটা মধু। হীরালালকে বলিলেন—"কাল সকালে আমি বেরিয়ে যাব। রাত্রে তাই বেশী কিছু খেলাম না। খুব ভোরে ঘোড়া যেন ঠিক থাকে। আমার সঙ্গে দু'জন যাবে—রামশরণ মিশির আর যোগী সিং। বাকী সবাই এখানে থাকবে। আমি কবে ফিরব তার ঠিক নেই। এখানকার সব ভার তোমার উপর থাকল। খরচের টাকা তোমাকেই দিয়ে যাব।"

ধূর্জটিমঙ্গল শুইতে গেলেন।

কিন্তু সেদিন তাঁহার অদৃষ্টে নিদ্রা ছিল না। একটু পরেই হন্তদন্ত হইয়া মাণিক্য-প্রধান আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে পাখি নাই। যোদ্ধৃবেশ।

বলিলেন, "কীর্তন জমে উঠেছে। ওয়াটসের কাছে এখনি খবর পেলাম ইংরেজরা চন্দননগর দখল করেছে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই কেল্লা ফতে হয়ে গেছে। কিছু ফরাসী পালিয়ে এসেছে এখানে। নবাব তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। মনে হচ্ছে এই নিয়েই নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবে। ক্লাইভ নাকি বলেছে নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা চন্দননগর দখল করলাম। কিন্তু এইখানেই আমরা থামব না, আমরা নবাবকেও সিংহাসনচ্যুত করব।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"শুনেছিলাম ফরাসীরা বীর। এত শীগ্‌গির তারা হেরে গেল?"

"ওদের মধ্যেও মীরজাফর আছে যে। ফরাসীরা কেল্লার সামনে নদীর বুকে অনেক নৌকা উপুড় করে রেখেছিল। অ্যাডমিরল ওয়াটসনের যুদ্ধজাহাজ কাছে ভিড়তে পারছিল না। কিন্তু একটা গোপন পথ ছিল। ফরাসী ফৌজের টেরানু সাহেব সেই পথটি ইংরেজদের দেখিয়ে দিলেন। সেই পথে হুড়মুড় করে এসে পড়ল ওয়াটসনের যুদ্ধ-জাহাজ, দমাদ্দম গোলা পড়তে লাগল। দু'ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ। খবর শুনে বাবা খুব ঘাবড়ে গেছেন। তুমি তাঁকে যে ঘোড়াটা দিয়েছিলে সেইটে চড়েই তিনি রওনা হয়ে গেছেন কেঁকালার দিকে। আমিও ভাবছি বাড়ির সকলকে নিয়ে কাল ভোরে কেঁকালায় চলে যাব। কেরামতের জন্য পালকী, দু'জন সিপাহী আর পাঁচশ আসরফি পাঠিয়ে দিয়ে এলাম এখনি। চিঠিও দিলাম একটা। লিখলাম—অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ কর। নবাবের সঙ্গে ইংরেজের লেগে গেছে। কালই হয়তো ইংরেজের ফৌজ এসে পড়বে এখানে। তুমি আর এক দণ্ড থেকো না। টাকাটা সাবধানে রেখো। একটা হুণ্ডিও পাঠাচ্ছি। পাটনায় গোবিন্দ শেঠের রেশমের দোকানে এটা ভাঙাতে পারবে। আমরা কেঁকালা চললাম। আমাদের যা করবার তা তো করেছি। এখন কেরামত কি করে দেখ। আমি তোমাকে খবরটা দিতে এলাম আর জানতে এলাম তুমি কি করবে—তুমি যদি কেঁকালা যেতে চাও—"

"আমি রাজমহল যাব—"

"আর তোমার বাড়ির মেয়েরা কোথা থাকবে?"

"তারা কেউ নেই। এই দেখ—"

ঝকমারির চিঠিটা তিনি মাণিক্যের হাতে দিলেন।

"ঝকমারি যুদ্ধে গেছে ? তার মানে ? কোথা গেছে সে, চন্দননগর ?"

"কি করে বলব বল। তুমি যে ফৌজি পোশাক পাঠিয়েছিলে সেই পোশাক পরেই বেরিয়ে গেছে—"

"সেটা তো ইংরেজ ফৌজের পোশাক। তাহলে কি ইংরেজ ফৌজে গিয়ে মিশেছে ?"

ধূর্জটিমঙ্গল কোন জবাব দিলেন না।

বাতায়ন-পথে দৃষ্টি মেলিয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মাণিক্য বলিলেন—"দেখ ধুর্জু আমার একটা পরামর্শ শুনবে ? এখন রাজমহল যেও না। আমি যে গুণ্ডাগুলো পাঠিয়েছি তারাই উজির আহম্মদকে খতম করতে পারবে। তুমি ও বিপদের মধ্যে যাচ্ছ কেন—"

ধূর্জটিমঙ্গল অন্ধকার হইতে চোখ ফিরাইয়া মাণিক্যপ্রধানের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। মাণিক্যপ্রধান দেখিলেন তাঁহার চোখের দৃষ্টি বাঘের চোখের দৃষ্টির মতো জ্বলজ্বল করিতেছে।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"যাচ্ছি, কারণ ছেলেবেলায় বাবার কাছ থেকে একটি মন্ত্র শিখেছিলাম—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। উজির আহম্মদকে আমি শুধু খুন করতে চাই না, আমি বিচার করে তার মৃত্যুদণ্ড দিতে চাই। মৃত্যুর পূর্বে সে যেন জেনে যায় কেন তার মৃত্যু হল। আমি বিচারক, সুতরাং আমায় যেতেই হবে সেখানে।"

"তাহলে যাও। আমি উঠলাম। হ্যাঁ, আর একটা কথা। ওয়াট্‌স্ সাহেবের বাড়িতে জনাব তুর্ক মিঞার সঙ্গে দেখা হল। দেখলাম তিনিও বেশ ভয় পেয়েছেন। ওয়াট্‌স্ সাহেব তাঁকে বললেন সাহেব কয়েদীদের ছেড়ে দিন। ক্লাইভ যদি এসে দেখেন সাহেবকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে, তাহলে তিনি প্রথমে আপনাকেই গুলি করবেন। আমার মনে হয় এখন একটু চেষ্টা করলে তোমার বন্ধু জন সাহেব ছাড়া পেয়ে যেতেন। কিন্তু চেষ্টা করবে কে, আমি চললাম কেঁকালায়, তুমি চললে রাজমহল। যা হবার তাই হবে। বেঁচে থাকি তো দেখা হবে আবার। চললাম।"

ধূর্জটিমঙ্গল আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দ্বারে আবার করাঘাত পড়িল ধূর্জটিমঙ্গল উঠিয়া বসিলেন। হীরালাল আসিয়া খবর দিল দুইটি মেয়ে আসিয়াছে। অবিলম্বে তাঁহার সাক্ষাৎ চায়।

"মেয়ে ? কি রকম মেয়ে ?"

"মাথায় জবাফুল-গোঁজা কালো মেয়ে দুটো। নাম বললে তির্কি আর শাওনি। বোধ হয় সাঁওতাল।"

"ডেকে নিয়ে এস এখানে।"

তির্কি ও শাওনি আসিয়া প্রবেশ করিল। দুইজনের মুখেই আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি। শাওনি বলিল—"রাজা, তোকে দেখে ভরসা পেলাম। সেই সন্দি থেকে তুকে খুঁজছি। বাবা বাবা কত পথ যে হাঁটলাম। শহরটা মস্ত বড়।"

তির্কি বলিল—"যাকে পাই তাকেই শুধাই আমাদের মঙ্গলরাজা থাকে কোথা। কেউ বলতে পারে না। শেষে একটা সহিস বললে—তোদের রাজার কি ঘোড়া আছে? আমরা বললাম—হুঁ আছে। মস্ত ঘোড়া। সে আবার শুধালেক—তোদের রাজা কি জোয়ান মরদ? আমরা বললাম—হুঁ মরদের মতো মরদ। তখন সে বললেক জাফরগঞ্জের লালকুঠিতে একজন রাজা আইছে, তার অনেক ঘোড়া, অনেক লোকজন। আমরা তখন তাকে বললাম—বাপধন, বাড়িটা আমাদের দেখায়ে দে। তুকে পয়সা দিব। সে-ই আমাদের এখানে দিয়ে গেল। তুকে দেখে আমরা বাঁচলম্।"

ধূর্জটিমঙ্গল ইহাদের আবির্ভাবে বিস্মিত হইয়া গেলেন।

প্রশ্ন করিলেন—"তোদের সঙ্গী সেই মীর মহম্মদ সাহেব কোথা গেল?"

"তাকে ঠিকানায় পেঁছে দিয়ি ফিরে এলম আমরা।"

"উড়িষ্যা থেকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি কি করে?"

রাস্তায় ঘোড়া কিনলম। তুই যে টাকা দিয়েছিলি সেই টাকায় ঘোড়া পেলম। পথে ধলরাজার ফৌজের সঙ্গে দেখা হল। তারা সব লাঠি শড়কি বল্লম তীর ধনুক বন্দুক নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। শুনলম তারা নবাবের ফৌজকে মদত দিতে আসছে। আমরাও তাদের সঙ্গে জুটে গেলম। তাদের সঙ্গেই আইছি আমরা।"

শাওনি বলিল—"বড় ক্ষিধে লেগেছে রাজা। কিছু খাবার আছে?"

"আছে।"

ধূর্জটিমঙ্গল হীরালালকে খাবার আনিতে আদেশ দিলেন। ভাত ডাল তরকারী, ফল মিষ্টান্ন প্রচুর ছিল। মহানন্দে দুইজনে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। ভোজনশেষে শাওনি বলিল—"মহুয়া নাই?"

"এখানে মহুয়া পাওয়া যায় না। সিরাজী পাওয়া যায়।"

"তাই দে তাহলে।"

উভয়ে সিরাজীও পান করিল। তাহার পর তাহারা বিবৃত করিল কেন তাহারা ধূর্জটিমঙ্গলের সন্ধানে এত রাত্রে আসিয়াছে। তাহারা মুর্শিদাবাদে আসিয়া প্রথমেই গিয়াছিল তাহাদের প্রেমিক কারারক্ষী রমজান আলীর কাছে। রমজান আলী অনেক আগেই জন সাহেবকে ছাড়িয়া দিত, কিন্তু কারাধ্যক্ষ তুর্বক আলীর ভয়ে পারে নাই। শোনা যাইতেছে তুর্বক আলী কাল নাকি পাটনায় চলিয়া যাইবেন। নবাবের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষে তিনি নাকি খুব ভয় পাইয়াছেন। পাটনায় তাঁহার শ্বশুর আছেন, একজন ফরাসী সেনাপতির সহিত তাঁহার দোস্তিও আছে। সুতরাং তিনি পাটনা যাইতেছেন। রমজান বলিতেছে—এই সুযোগে জন সাহেবকে ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সে নিজে তাহার ঘরের তালা খুলিয়া দিতে ভয় পাইতেছে। বলিতেছে তোমরা উহার ঘরের জানলায় একটা মই লাগাইয়া উহাকে নামাইয়া লও। আমি চোখ বুজিয়া থাকিব। উহারা একটা মই কিনিয়াছে। কাল রাত্রে সেটার সাহায্যে জন সাহেবকে তাহারা উদ্ধার করিবে। কিন্তু তাহার পর? জন সাহেবকে লইয়া কি করিবে তাহারা? আবার যদি নবাবের কোন লোক তাহাকে কয়েদ করে? কয়েদখানা হইতে বাহির হইয়া রাত্রের অন্ধকারেই কোন গোপন জায়গায় লুকাইয়া না থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা। কি করা উচিত এই পরামর্শের জন্যই তাহারা এত রাত্রে ধূর্জটিমঙ্গলের কাছে আসিয়াছে।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমি ভোরেই রাজমহল চলে যাচ্ছি। তোমরা সাহেবকে এই বাড়িতে রাখো। এখানে আমার লোকজন সবাই থাকবে। খাওয়াদাওয়ারও কোন অসুবিধে হবে না। রোমনিও আসবে তো?"

"হ্যাঁ, আসবেক বইকি। সে সাহেবকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে লারে।"

খুব ভোরে উঠিয়াই ধূর্জটিমঙ্গল বাহির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিবার পূর্বে মৈনি বিবির মুখটা সহসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। মনে হইল কাল রাত্রে তাহার সহিত আচরণটা একটু রূঢ় হইয়া গিয়াছে! মনের ভিতরটা খচখচ করিতে লাগিল। তিনি মৈনি বিবির বাড়ির দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরাইলেন। মৈনি বিবির বাড়িতে অত ভোরে সাধারণতঃ কেহ যান না, গেলেও মৈনি তাঁহার সহিত দেখা করে না। কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গলের কথা স্বতন্ত্র। তিনি যাইবামাত্র চাকর তাঁহাকে সসম্ভ্রমে উপর লইয়া গেল এবং মৈনি বিবিকে 'এত্তেলা' দিল। মৈনিও যেন ধূর্জটিমঙ্গলের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। গায়ে একটা ওড়না জড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধূর্জটিমঙ্গল দেখিলেন মৈনির চোখ দুইটি ফোলা ফোলা। কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়াছে নাকি? এ সম্বন্ধে কিন্তু তিনি কিছু উচ্চবাচ্য করিলেন না। কেবল বলিলেন, "মৈনি, আমি রাজমহল যাচ্ছি। আমার উপর রাগ করে থেকো না।"

মৈনি কিছু বলিল না, নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

"চুপ করে আছ কেন?"

"কি আর বলব।"

"তবু কিছু বল।"

"কাল রাত্রে একটা খবর শুনেছি সেইটে বলছি তাহলে। নবাব দরবারে ইংরেজদের যে উকিল ছিল তাকে নবাব সাহেব তাড়িয়ে দিয়েছেন। দুর্লভরামের সঙ্গে একদল সেনাও পলাশীতে পাঠিয়েছেন তিনি। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ লাগবে নিশ্চয়। আপনি এ সময়—"

মৈনি কথা শেষ করিল না। মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে ধূর্জটিমঙ্গলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল কেবল।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমাকে যেতেই হবে। তুমি একটু হাস দেখি।"

মৈনির চোখ দুইটি সহসা হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মনে হইল চোখের ভিতর কে যেন আলো জ্বালিয়া দিল।

"চললুম। আবার ফিরে আসব। ফিরে এসে গান শুনব তোমার। ভেবো না।"

ধূর্জটিমঙ্গল নীচে নামিয়া আসিলেন।

তাঁহার দুইজন অশ্বারোহী সঙ্গী রামশরণ মিশির ও যোগী সিং রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিল।

জন সাহেব ছাড়া পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতে লুকাইয়া থাকেন নাই। তিনি সোজা কালনায় গিয়া ইংরেজদের ফৌজে যোগদান করিয়াছিলেন।

॥ তেরো ॥

ইতিহাসে এই ঘটনাটির উল্লেখ নাই। কিন্তু ইহা ঘটিয়াছিল। ফরাসীদের সহিত ইংরেজদের যখন যুদ্ধ বাধিল তখন কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ ল সাহেবের অনুরোধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ফরাসীদের সৈন্য সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। দুর্লভরাম, মাণিকচাঁদ, মোহনলাল সকলকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছিলেন। হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার রায়ের অধীনে যে দুই সহস্র মোগল সৈন্য ছিল নবাবের হুকুমে তাহারা চন্দননগরে গিয়াছিল। সে সৈন্যদলে আসফ আলি খাঁ ছিলেন। এ সৈন্যদল গিয়াছিল কিন্তু যুদ্ধ করে নাই। নন্দকুমার রায়ের সহিত ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ছিল, তিনি যুদ্ধ করিয়া ইংরেজদের বিব্রত করিতে চাহেন নাই, নবাবের হুকুম রক্ষা করিবার জন্য লোক-দেখানো অভিনয় করিয়া ওই দুই সহস্র সেনাকে চন্দননগরে তিনি পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা গিয়াই প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হইয়া সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিল। এসব কথা ইতিহাসে লেখা আছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে ক্ষুদ্র একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে কথা ইতিহাসে লেখা নাই। এই যুদ্ধে আসফ আলি খাঁ নিহত হইয়াছিলেন। ইংরেজ-ফৌজের পোশাকপরা একটি যুবক সহসা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বুকে ছুরি বসাইয়া দেন। তাহার পরই প্রকাণ্ড একটি গোলা পড়ে। উভয়েরই দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। ঝকমারির আসল নাম ছিল ঝংকারিণী। মহাকালের তম্বুরায় দীপক রাগে যে ঝংকারটা সে বাজাইয়া গেল তাহা কেহ শুনিল না। শুনিবে এ প্রত্যাশাও সে করে নাই।

॥ চোদ্দো ॥

পলাশীর প্রান্তর।

মাটির দেওয়াল-ঘেরা দেড় হাজার বিঘার বিরাট আমবাগান। আমবাগানে এক লক্ষ আম গাছ। আমবাগানের পাশেই পাঁচিলঘেরা একটি ছোট পাকাবাড়ি। নবাব শিকার করিতে আসিলে এই বাড়িতে বিশ্রাম করিতেন বলিয়া নাম শিকারবাড়ি। এই বাড়িতেই সসৈন্যে ক্লাইভ, আয়ার কুট এবং অন্যান্য ইংরেজ সেনাধ্যক্ষরা আশ্রয় লইয়াছেন। চন্দননগরের ফৌজরা কলিকাতার ফৌজের সহিত মিলিত হইয়া পলাশী প্রান্তরে সমবেত হইয়াছে। গোরা সৈন্য আসিয়াছে দুইশত নৌকা চড়িয়া, কালা সৈন্য আসিয়াছে পায়ে হাঁটিয়া। পথে হুগলী, কাটোয়া, অগ্রদ্বীপে এবং পলাশীর ছাউনিতে নবাবের অনেক সিপাহী সেনা মজুত ছিল, কিন্তু কেহ তাহাদের গতিরোধ করে নাই। গতিরোধ করিলে পথেই ইংরেজ সৈন্য বিনষ্ট হইত, পলাশী পর্যন্ত পেঁৗছিতে পারিত না। কিন্তু তাহা হয় নাই, ইংরেজ বাহিনী বিনা বাধায় পলাশীর আমবাগানে আসিয়া পেঁৗছিয়াছে।

প্রভাত হইতেই যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিল।

ক্লাইভ শিকারবাড়ির ছাতে উঠিয়া দূরবীণ দিয়া নবাববাহিনী দেখিলেন। বিশাল জনসমুদ্র। বাগানের দক্ষিণ দিকে এই বিরাট বাহিনী অর্ধচন্দ্রাকারে তাহাদের ঘিরিয়া

ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। ফরাসী সেনানায়ক সাঁফ্রে অল্প দূরেই পঁয়তাল্লিশ জন গোলন্দাজ এবং চারিটি কামান লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাঁফ্রে নবাবের পক্ষে। সাঁফ্রের পিছনে মীরমদন। মীরমদনের বামদিকে একটা প্রকাণ্ড জায়গা ঘিরিয়া কাশ্মীরি সেনাপতি মোহনলাল। সেখানে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার, সাত হাজার পদাতিক সৈন্য। নবাবের বাকি সৈন্যরা একটা উঁচু ঢিপির উপর। ইংরেজদের বাম দিকে রহিয়াছেন রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ খাঁ আর মীরজাফর।

ইংরেজদের সর্বসাকুল্যে নয়শ' পঞ্চাশ জন গোরা, একুশ শ' কালা সিপাহী, আটটি ছোট কামান এইং দুইটি বড় তোপ। নবাবপক্ষের ফৌজে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, পঞ্চাশটা বড় কামান।

সাঁফ্রে কামান দাগিয়া প্রথমেই যুদ্ধ শুরু করিয়া দিলেন। ইংরেজ সৈন্য কয়েকজন মারা পড়িতেই ইংরেজরা পিছু হটিয়া বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমবাগানে ঢুকিয়া তাঁহারা গর্ত খুঁড়িয়া গর্তের ভিতর কামান স্থাপন করিলেন। নবাবের কামানগুলি উঁচু উঁচু। সে সব কামান হইতে যে সব গোলা বাহির হইল সেগুলি ইংরেজদের গায়ে লাগিল না, সেগুলি তাহাদের মাথার উপর দিয়া গিয়া আমগাছগুলিকে জখম করিতে লাগিল। হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। সমস্ত মাঠ কাদায় জলে ভরিয়া গেল। নবাবের বারুদগাড়ির উপর কোন ঢাকা ছিল না। সমস্ত বারুদ জলে ভিজিয়া গেল।

ঐতিহাসিকেরা বলেন এক পশলা বৃষ্টি ওয়াটার্লু যুদ্ধের সময়ও হইয়াছিল এবং সেই বৃষ্টির ফলেই নেপোলিয়নের বীরবাহিনী নাকি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন ওই এক পশলা বৃষ্টি না হইলে নেপোলিয়ন হয়তো ওয়াটালু যুদ্ধে জয়লাভ করিতেন। এক পশলা বৃষ্টি নবাবকেও পলাশী যুদ্ধক্ষেত্রে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। মীরমদন ও সাঁফ্রের কামান নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

ইংরেজদের কামানের বারুদ সুরক্ষিত এবং শুষ্ক ছিল। তাহারা গর্তের ভিতর বসিয়া জোরে জোরে ঘন ঘন তোপ দাগিতে লাগিল। মীরমদন এবং আরও অনেক সেনাপতি আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। নবাবসেনা পিছু হটিতে লাগিল। মীরজাফর, ইয়ারলতিফ, রায়দুর্লভ পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহারা যদি এই সময় বীরবিক্রমে আগাইয়া আসিতেন, পলাশীর যুদ্ধে নবাব হারিতেন না। ইংরেজদের ঘন ঘন তোপ-গর্জন শুনিয়া নবাবের বিপুল সৈন্যবাহিনী কেমন যেন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। মীরমদনের মৃত্যুতেও সকলে বিহ্বল ভীত হইয়া যে যেদিকে পারিলেন পালাইতে লাগিলেন। নবাব নিজের শিবিরে পিছন দিকে দুইহাত রাখিয়া উত্তেজিতভাবে পরিক্রমণ করিতেছিলেন। মীরমদনের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া নবাব মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং মীরজাফরের পায়ের কাছে নিজের পাগড়িটা রাখিয়া মিনতি করিলেন—এখন সব তোমার হাতে, আমাকে বাঁচাও। মীরজাফর কোরাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি নবাবকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, কিন্তু এখন যুদ্ধ বন্ধ করা হোক। রায়দুর্লভও সেই পরামর্শ দিলেন। মোহনলাল কিন্তু ইহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য আগাইয়া গেলেন। ফরাসীরাও লড়িতে লাগিল। কিন্তু নবাবের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল, কোথাও কোন শৃঙ্খলা আর ছিল না। ঘোড়া গরুর গাড়ি সৈন্য সব বিশৃঙ্খল হইয়া ছুটোছুটি

করিতেছিল। ক্লাইভের সৈন্য সুশিক্ষিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাহারা সংখ্যায় অল্প কিন্তু তাহাদের রণকৌশল অদ্ভুত। তাহারা কিছুক্ষণের মধ্যেই নবাবের ছাউনী দখল করিয়া ফেলিল। ছাউনীতে ঢুকিয়া দেখিল সিরাজদ্দৌলা নাই। তিনি পলাতক। শোনা গেল তিনি একটা উটের পিঠে চড়িয়া মুর্শিদাবাদের দিকে চলিয়া গিয়াছেন।

এই যুদ্ধে জন সাহেবও যোগ দিয়াছিলেন।

একটি গুলি তাঁহার উরুদেশ ভেদ করিয়াছিল। তিনি মারা যান নাই, হাসপাতালে ছিলেন।

॥ পনেরো ॥

ধূর্জটিমঙ্গল রাজমহল হইতে ফিরিতেছিলেন। সেকালে রাজমহলের নিকট পাহাড়ের উপর যে জঙ্গল ছিল সেই জঙ্গলেই তিনি তাঁহার বিচারালয় বসাইয়াছিলেন। তাঁহার নিয়োজিত গুণ্ডারা উজীর আহম্মদকে অপহরণ করিয়া সেই জঙ্গলে টানিয়া আনিয়াছিল। ব্যাপারটা মোটেই দুঃসাধ্য হয় নাই। উজীর আহম্মদের অনুচরেরাই টাকা খাইয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিয়াছিলেন—"তুমি বহু সতী রমণীর সতীত্ব অপহরণ করেছ। সেজন্য তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছি। পা থেকে শুরু করে তোমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে পারতাম। তুমি যা করেছ তাই হয়তো তোমার উচিত শাস্তি হ'ত। কিন্তু অত নিষ্ঠুর আমি হব না। এক কোপেই তোমার শিরশ্ছেদ করব।"

উজীর আহম্মদের মৃতদেহটাকে তিনি জঙ্গলে শকুন শেয়ালদের মুখে ফেলিয়া দেন নাই। গর্ত খুঁড়িয়া তাঁহার একটা কবরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি সহচরবৃন্দসহ অশ্বারোহণে ফিরিতেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের খবর তিনি তখনও শোনেন নাই। তিনি জানিতেন না যে স্বয়ং নবাব পলায়ন করিয়া মহানন্দা নদী ধরিয়া পাটনার দিকে গিয়াছেন। উদ্দেশ্য বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা রামনারায়ণের সহিত মিলিত হওয়া, উদ্দেশ্য ফরাসী জাঁ লর সহায়তায় আবার বাহিনী সংগঠন করিয়া ক্লাইভকে আক্রমণ করা। ধূর্জটিমঙ্গল এসব ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না। ইহা জানিতে পারিলেন না যে রাজমহলের কিছুদূরে কালিন্দী নদীতে তাঁহার নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই, জানিতে পারিলেন না যে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া বাংলার নবাব সেই ফকির দান শার দারস্থ হইয়াছেন কিছু দিন আগে তিনি যাহার নাক কান কাটিয়া দিয়াছিলেন। জানিতে পারিলেন না যে ফকির দান শা তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছেন, জানিতে পারিলেন না যে মীরজাফরের ভাই দাউদ এবং মীরজাফরের জামাই মীরকাশিম তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে, জানিতে পারিলেন না সিরাজউদ্দৌলা অর্থ দিয়া মীরকাশিমকে বশীভূত করিবার প্রয়াসে লুৎফুন্নিসার বহুমূল্য জহরত এবং অলঙ্কার তাঁহাকে দিয়াছিলেন, জানিতে পারিলেন না যে গহনাগুলি মীরকাশিম আত্মসাৎ করিয়াও তাঁহার মুক্তির কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। এসব কিছুই জানিতে পারিলেন না ধূর্জটিমঙ্গল। তিনি অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতেছিলেন। এক জায়গায় কিন্তু

তাঁহাকে ঘোড়ার রাশ টানিয়া ধরিতে হইল। দেখিলেন একটি বহুমূল্য পর্দা-ঢাকাগাড়ি রাস্তার কাদায় আটকাইয়া পড়িয়াছে। রাস্তার গর্তটি বেশ গভীর এবং কাদাও প্রচুর। ঘোড়া দুইটির পেট পর্যন্ত কাদা উঠিয়াছে। তাহারা গাড়িটিকে টানিয়া তুলিতে পারিতেছে না। গাড়ির সহিস ও কোচোয়ানও মহার্ঘ পোশাকে সজ্জিত দুইজন মুসলমান। তাহারা এ অবস্থায় কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

ধূর্জটিমঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন—"কার গাড়ি ?"

কোচোয়ানটি খানিকক্ষণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল! তাহার পর উর্দুতে জিজ্ঞাসা করিল--"আপনি কোথাকার লোক ? কোথায় যাচ্ছেন ?"

"আমি মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি। সেখানেই আমার বাড়ি।"

"আপনি লড়াইয়ের খবর শোনেন নি ? হালত খুবই বুরা। নবাব সাহেব ফতে হয়ে গেছেন ! মুর্শিদাবাদ থেকে তিনি বেগমসাহেবাকে নিয়ে পালাচ্ছিলেন ! বেগমসাহেবার গাড়ি কাদায় আটকে গেছে। তিনি কিন্তু দাঁড়াতে পারলেন না, চলে গেলেন।"

গাড়ির ভিতর হইতে একটা বুকফাটা আর্ত ক্রন্দন শোনা গেল।

"কোন্ বেগমসাহেবা গাড়িতে আছেন ?"

"বেগম লুৎফুন্নিসা।"

"বেশ আমি গাড়িটা তুলে দেবার ব্যবস্থা করছি। আমার সঙ্গে লোক আছে।"

ধূর্জটিমঙ্গলের সহচরবৃন্দ টানাটানি করিয়া গাড়িটাকে কাদা হইতে তুলিয়া রাস্তায় দাঁড় করাইয়া দিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহাদের ছুটিয়া পলাইতে হইল। কারণ দাউদ খাঁর সৈন্যরা বেগমদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা আসিলেই বেগম লুৎফুন্নিসা তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

ধূর্জটিমঙ্গলের একবার মনে হইয়াছিল এই পাষণ্ডদের হস্ত হইতে বেগম লুৎফুন্নিসাকে রক্ষা করেন। যে কয়জন সৈন্য আসিয়াছিল তাহাদের হারাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না তাঁহার পক্ষে। সৈন্য ছিল মাত্র চার। ধূর্জটিমঙ্গলেরা ছিলেন দশজন। কিন্তু ভাবিলেন সাপের মাথার মণি উদ্ধার করিয়া তিনি তাহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিবেন ? মহাকালের মহাবিচারালয়ে যে শাস্তির রায় বাহির হইয়া গিয়াছে সে রায়ের প্রতিবাদ করিবার স্পর্ধাই বা তাঁহার কেন হইবে ? তবু দুঃখিনী লুৎফুন্নিসার জন্য তাঁহার কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন অভাগিনী পূর্বজন্মে নিশ্চয় কোন মহাপাপ করিয়াছিল, তাই এ জন্মে ওই লম্পট পাষণ্ডের সহধর্মিণী হইতে হইয়াছে। তবু তাহার জন্য কষ্ট হইতে লাগিল।

একজন সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিল—"এখন তো মুর্শিদাবাদে খুব গোলমাল। সেখানে যাওয়া কি ঠিক হবে এখন ?"

"তোমরা যদি অন্য জায়গায় যেতে চাও যাও, আমাকে কিন্তু সেখানে যেতেই হবে।"

মৌনিবিবি এবং সরফুর কথা তিনি ভোলেন নাই।

তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে কিন্তু ত্যাগ করিল না। সকলেই তাঁহার সঙ্গে গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়াই শুনিলেন ক্লাইভ সামান্য কয়েকজন সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদ আসিয়াছেন। মুরাদবাগে নবাবেরই এক প্রাসাদে আছেন

তিনি। ধূর্জটিমঙ্গল একটা অসমসাহসিক কাজ করিয়া বসিলেন। প্রথমেই সোজা তিনি মুরাদবাগে চলিয়া গিয়া ক্লাইভের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। সঙ্গে একজন দোভাষী লইয়া গিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন সাহেবদের যেমন কায়দা হয়তো দেখা করিবার একটা সময় বলিয়া দিবেন। ক্লাইভ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা করিলেন তাঁহার সঙ্গে। কুর্ণিশ করিয়া দোভাষী মারফত জানাইলেন যুদ্ধজয়ের জন্য তিনি তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতে আসিয়াছেন। আরও বলিলেন যে তিনি কলিকাতায় তাঁহাদের জমিদারি সুতানুটিতে বসবাস করিতেন। কিন্তু নবাবের সৈন্যরা তাঁহার ঘরবাড়ি পুড়াইয়া দিয়াছে। এখানেও তাঁহারা বড় ভয়ে ভয়ে আছেন। ক্লাইভ সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—ভয়ের কোন কারণ নাই। কলিকাতায় যাহাদের বাড়ি পুড়িয়াছে তাহাদের বাড়ি আবার তৈয়ারি করাইয়া দেওয়া হইবে। আপনি আপনার নাম ঠিকানা এখানে রাখিয়া যান আমি সুতানুটির মুনশী নবকৃষ্ণকে বলিয়া দিব তিনি যেন আপনার থাকিবার সমস্ত সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। এখানেও যত দিন ইচ্ছে নির্ভয়ে থাকিতে পারেন। আপনি যদি দুইজন গোরা সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত থাকেন দুইজন গোরাকে আপনার বাড়ি পাহারা দিবার জন্য মোতায়েন করিয়া দিতে পারি। ধূর্জটিমঙ্গল আর একবার কুর্ণিশ করিয়া একমুঠা আসরফি তাঁহাকে নজরানা দিলেন। ক্লাইভ মহা খুশী। বলিলেন, কোন ভয় নাই, আমরা আপনার সহায় থাকিব। ধূর্জটিমঙ্গল যখন ফিরিতেছেন তখন দেখিলেন দুইজন গোরা ঘোড়সওয়ার তাঁহার পিছু পিছু আসিতেছে। মৌনিবিবির বাড়ির সম্মুখে ধূর্জটিমঙ্গল অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। গোরা দুইটিও সেখানে ঘোড়া থামাইল। ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন —এখন পাহারার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন হইলে তিনি খবর দিবেন। তাহাদের একটা করিয়া আসরফিও দিলেন। তাহারা চলিয়া গেল। বাড়ির সামনে গোরা সৈন্য মোতায়েন রাখা তিনি সুবুদ্ধির কাজ মনে করিলেন না। পাড়ার লোকেরা হয়ত অন্যরকম ভাবিবে।

ভিতরে গিয়াই তিনি মৌনিকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। পেশোয়াজ পরিয়া ওড়না গায়ে দিয়া চোখে সুর্মা লাগাইয়া দোদুল্যমান বেণীতে জরির ফিতা বাঁধিয়া মৌনি যেন অন্যরকম হইয়া গিয়াছে।

"আপনি এসে গেছেন। বাঁচলুম—"

"তোমার একি বেশ—"

"আমি জনাব মীরজাফর সাহেবের বাড়ি যাচ্ছি। সেখান থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে। খুব ধুম সেখানে আজ। অনেক তইফি, বাইজী, গাইয়ে বাজিয়েরা আসবে সেখানে। দরবার বসবে। শুনেছি সেই দরবারে নাকি স্বয়ং ক্লাইভ সাহেব মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসিয়ে দেবেন। নবাবের বাড়ির সামনের মাঠে প্রচুর তাঁবু পড়েছে—"

"তাই নাকি। তুমি ফিরবে কখন ?"

"তা তো জানি না। ছুটি হলেই ফিরব। বহুলোক আসবে দরবারে, আপনিও চলুন না।"

"বিনা নিমন্ত্রণে আমি কোথাও যাই না।"

মৌনির চোখ দুইটির ভিতর হাসির আলো জ্বলিয়া উঠিল, সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"নিমন্ত্রণ আসবে।"

"সরফুর খবর কি ?"

"ভাল আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে খবর আসিল মৈনির জন্য তাঞ্জাম আসিয়া গিয়াছে।

"তুমি তাহলে যাও এখন। আমি সরফুর কাছে চললাম।"

ধূর্জটিমঙ্গল সরফুর কাছে গিয়া দেখিলেন সরফু ঘরে খিল লাগাইয়া বসিয়া আছে। ধূর্জটিমঙ্গলকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, শুনিলাম নাকি বাবা মা এখানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার সহিত দেখা না করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি আর এখানে থাকিব না, আমাকেও বাবা মার কাছে পাঠাইয়া দিন। আমি আর এখানে থাকিতে পারিব না। ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন তাহার বাবা মা কোথায় গিয়াছেন তাহা তিনিও জানেন না। তবে তিনি তাহাকে মুর্শিদাবাদে আর রাখিবেন না। লালবাগের কাছে তাহাদের যে বাড়ি এবং জায়গীর আছে সেইখানেই পাঠাইয়া দিবেন তাহাকে। তাহার সঙ্গে একজন মৌলভী একজন সঙ্গীত শিক্ষক এবং একজন কুস্তিগীর থাকিবে। ভালো চাকরও বহাল করিয়া দিবেন তিনি। কোন কষ্ট হইবে না। তাহার পর বাবার ঠিক ঠিকানা পাইলে তাহাকে সেখানে পাঠাইয়া দিবেন। আপাততঃ লালবাগে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। রাজধানীতে না থাকাই ভালো। ধূর্জটিমঙ্গল বেশীক্ষণ সেখানে বসিলেন না।

"আমি আজই সব ব্যবস্থা করছি। কালই তুমি লালবাগে চলে যাবে। কিছু ভয় নেই।"

ধূর্জটিমঙ্গল একজন ভালো মৌলভী, ভালো সঙ্গীত শিক্ষক এবং একজন ভালো কুস্তিগীরের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন। সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর মুর্শিদাবাদের অনেক নাগরিক ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যদিও জগৎশেঠের লোকেরা এবং মীরজাফরের অনুচরগণ পুরবাসীদের শান্ত থাকিবার পরামর্শ দিতে-ছিলেন, যদিও তাঁহারা বলিতেছিলেন—পাপটা বিদায় হইয়াছে এইবার সকলে সুশাসনে সুখে থাকিবে—তবু অনেকেই মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং কিছুক্ষণ ঘুরিয়াই ধূর্জটিমঙ্গল একজন মৌলভী, একজন ওস্তাদ এবং একজন পালোয়ান যোগাড় করিতে সমর্থ হইলেন। অগ্রিম বেতন দিয়া তাহাদের নিযুক্ত করিলেন এবং বলিলেন কাল সকালেই গাড়ি আসিয়া তাহাদের লইয়া যাইবে। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার অপেক্ষায় কেতাদুরস্ত পোশাক-পরা একজন দৌবারিক বসিয়া আছে। দৌবারিক তাঁহাকে একটা পত্র দিল। পত্রটি নবাবসাহেবের দফতরখানা হইতে আসিয়াছে। ফার্সিতে লেখা আছে—আজ বৈকালে নবাবের প্রাসাদের সম্মুখে দরবার বসিবে। সেই দরবারে আপনি যদি আপনার তশরিফ লইয়া আসেন, আমরা সকলেই সুখী হইব। নীচে মীরজাফরের নামাঙ্কিত একটা সীলমোহর। ধূর্জটিমঙ্গল বুঝিলেন মৈনিই কোন কৌশল করিয়া নিমন্ত্রণটি পাঠাইয়াছে।

ধূর্জটিমঙ্গল গেলেন। দেখিলেন বিরাট আয়োজন, রাজকীয় পরিবেশ। দূরে বৃটিশদের ব্যাণ্ড বাজিতেছে। চতুর্দিকে বিচিত্র পটমণ্ডপ। পাত্রমিত্র সামন্তবর্গের জন্য, নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য সারি সারি অলঙ্কৃত পট্টাবাস। নানা অলঙ্কারে সুশোভিত,

কোনটাতে কিংখাব, কোনটাতে জরি ঝলমল করিতেছে। চারিদিকে চক্রাকারে সহস্র সহস্র বস্ত্রগৃহ। তাহার চারিপাশে অসংখ্য দোকান, কোনটা পানের দোকান, কোনটা মদের দোকান, কোনটা অলংকারের দোকান, কোনটা মিষ্টান্নের দোকান, কোনটা রেশমের কাপড়ের দোকান, কোনটা খেলনার দোকান, কোনটা ফুলের দোকান, আরও কত রকমের দোকান। দোকানীরাও নানা রকমের নানা বেশভূষায় সজ্জিত। লাল দাড়ি আরমানী, ভ্রমরকৃষ্ণ বাবরি দাড়ি-সমন্বিত মোগল, ফিরিঙ্গিবেশে সজ্জিত পর্তুগীজ বণিক, চুস্ত পায়জামা শেরওয়ানি পরিহিত বাঙালী ব্যবসায়ী, অর্ধেক মাথা কামানো পিরানকাপড় পরা উড়িয়া দোকানী, ভেলভেটের জামা-কাপড় পরা আফগান—এসব তো আছেই, এ ছাড়া মাঝে মাঝে আছে রূপসী মেয়েরা। তাহারা পানের এবং ফুলের দোকানগুলি অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়া আছে। ইহাদের সকলকে ঘিরিয়া বিপুল জনতা। সকলে দাঁড়াইয়া আছে। দূরে দূরে গাছের উপরও লোক কম নাই। কেন্দ্রস্থলে বিরাট একটি মণ্ডপের উপর বিরাট একটি মখমলের চন্দ্রাতপ, তাহাতে অপরূপ কারুকার্যময় স্বর্ণনির্মিত কনকপদ্ম। এই মণ্ডপের নিচেই সেই মসনদ, যে মসনদে আজিমউস্‌শান, মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্দিন মুহম্মদ খাঁ, সরফরাজ খাঁ, আলিবর্দী খাঁ, সিরাজউদ্দৌলা উপবেশন করিয়াছিলেন, যে মসনদে বসিবার জন্য কত নবাব কত রক্তে বাংলাদেশের মাটিকে সিক্ত করিয়াছেন। সেই মসনদে আজ মীরজাফর উপবেশন করিবেন। দরবারকে ঘিরিয়া যে সুসজ্জিত পট্টবস্ত্রগুলি সম্ভ্রান্ত অতিথি ও বন্ধুবর্গের জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেই পট্টবস্ত্রগুলির ভিতর হইতে গান বাজনার আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছিল। হয়তো মৈনি উহারই একটার মধ্যে বসিয়া কোনও বিশিষ্ট অতিথির মনোরঞ্জন করিতেছে। ধূর্জটিমঙ্গল যে নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছিলেন তাহা দেখাইলে হয়তো তাঁহাকেও কোথাও একটা আসন দেওয়া হইত, কিন্তু তাহা দেখাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি দূরে একধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হঠাৎ একটা তোপধ্বনি শোনা গেল। জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য জাগিল। পট্টবাস হইতে নানাবেশে সুসজ্জিত আমীর ওমরাহেরা বাহির হইলেন। তাহার পর কুচকাওয়াজ করিতে করিতে একদল গোরা সৈন্য আসিয়া মণ্ডপের একধারে দাঁড়াইল। আর একধারে দাঁড়াইল নবাবের সৈন্যরা। দূরে দেখা গেল ক্লাইভের সহিত মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ এবং কয়েকজন হোমরা চোমরা সাহেব আসিতেছেন। তাঁহাদের আগে আগে একজন নকীব তাঁহাদের আগমনবার্তা ঘোষণা করিতেছে। তাঁহারা যখন মসনদের নিকটবর্তী হইলেন স্বয়ং ক্লাইভ মীরজাফরকে হাত ধরিয়া মসনদের উপর বসাইয়া তাঁহার মাথায় উষ্ণীয় পরাইয়া দিলেন। সভার সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহার পর গর্জন করিয়া উঠিল আরও কয়েকটা তোপ। ধূর্জটিমঙ্গল একদৃষ্টে মীরজাফরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ একটা। গালের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। গাঁজা মদ আপিঙ ভাঙের করাল প্রভাব চোখে মুখে পরিস্ফুট। মুখের ভাবটা বড় ভয়ংকর, মনে হয় যেন কোন কুষ্ঠরোগী। এই লোক বঙ্গদেশ শাসন করিবে! নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন ধূর্জটিমঙ্গল।

দরবার হইতে বাহির হইয়া ধূর্জটিমঙ্গল মুর্শিদাবাদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইলেন অনেকক্ষণ। যে গাড়িটা সরফু এবং তাঁহার শিক্ষকগণকে লইয়া যাইবে তাহার সহিত আর একবার যোগাযোগ করিলেন। মৈনির বাড়িতে যখন উপস্থিত

হইলেন তখন অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। শুনিলেন মৈনি তখনও ফেরে নাই। চাকরকে বলিয়া গেলেন মৈনিকে বলিও আমি আসিয়াছিলাম। আমি জাফরাগঞ্জের বাড়িতে ফিরিয়া যাইতেছি।

ধূর্জটিমঙ্গল পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। খাওয়া শেষ করিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। অনেক রাত্রে মৈনি আসিয়া হাজির হইল।

"খবর শুনেছেন?"

"কি খবর?"

"এই জাফরাগঞ্জের এক বাড়িতে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে খুন করেছে আজ। কাল তাঁর দেহটাকে নিয়ে হাতী বেরুবে নাকি।"

"কে খুন করেছে?"

"মহম্মদী বেগ। আপনি তো তাকে চেনেন। আলীবর্দী খাঁ ওকে মানুষ করেছিলেন, সিরাজের দিদিমা ওর বিয়ে দিয়েছিলেন, সিরাজের মা আমিনা বেগম ওকে স্নেহ করতেন—সেই মহম্মদী বেগ।"

"তা তুমি এত রাত্রে এখানে চলে এলে কেন?"

"মনে হল আপনি এখানে আছেন—এই প্রেতপুরীতে, আমার ভয় হল। চলুন আমার বাড়ি। শুনেছিলাম ঝকমারি এখানে আছে কিন্তু দেখছি কেউ নেই—ঝকমারি কোথায়?"

"জানি না কোথায়। এখান থেকে চলে গেছে সে। বারাহীরও কোনও খবর পেলাম না। জগন্নাথ ফেরেনি এখনও।"

মৈনি বারাহীর খবর জানিত। কিন্তু কথাটা সে প্রকাশ করিল না। বলিল—"ফেরেনি বোধহয়। আপনি চলুন আমার বাড়িতে।"

"আমি কোথাও যাব না। এইখানেই থাকব। কাল ভোরে উঠে সরফুকে নিয়ে লালবাগে চলে যাব।"

"যেখানে এত বড় একটা খুন হয়ে গেছে, সেখানে আপনার ভয় করবে না? পাড়া নির্জন, কোথাও কেউ নাই।"

"আমার কিচ্ছু ভয় করবে না। তুমি ফিরে যাও।"

"আমি একা ফিরে যেতে পারব না। আপনিও চলুন। আমার বড় ভয় করছে।"

ধূর্জটিমঙ্গল ধমক দিয়া উঠিলেন।

"এ কি অসঙ্গত আবদার তোমার। আমি সঙ্গে দুজন লোক দিচ্ছি, তুমি ফিরে যাও।"

মৈনি হঠাৎ ধূর্জটিমঙ্গলের পা দুইটি ধরিয়া বলিল, "দোহাই আপনার আমাকে সেখানে ফিরে যেতে বলবেন না। আমি সেখানে এখন কিছুতেই ফিরে যেতে পারব না।"

"কেন?"

মৈনি ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। "দরবার থেকে ফিরে এসে দেখি আমার বাড়িতে মহম্মদী বেগ বসে আছে। সে মাঝে মাঝে আমার কাছে প্রণয় নিবেদন করত কিন্তু আমি তাকে আমোল দিইনি। আজ সে দুথলি সোনার মোহর আমার পায়ের কাছে রেখে বলল—বিবিসাহেব, আমি তোমার কেনা গোলাম, মেহেরবানি করুন। আমি

তাকে ঘরে বসিয়ে পালিয়ে এসেছি, সেখানে আর একা ফিরতে পারব না এখন। আপনি আমার সঙ্গে চলুন—

ধূর্জটিমঙ্গল কয়েকটি মুহূর্ত নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন—"বেশ, চল।"

দুইজন রক্ষী সঙ্গে লইয়া ধূর্জটিমঙ্গল বাহির হইয়া পড়িলেন।

মৈনিবিবির তাঞ্জাম বাহককে বলিলেন—"মোরাদবাগে চল"। বলিয়াই তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া আগাইয়া গেলেন।

মৈনি একটু অবাক হইয়া গেল—"মোরাদবাগে কেন—?"

তাঞ্জামবাহক প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাব তাহলে—"

"আচ্ছা, মোরাদবাগেই চল—"

অনেকক্ষণ পরে মোরাদবাগে পৌঁছিয়া ধূর্জটিমঙ্গল ক্লাইভের খোঁজ করিলেন।

প্রহরী বলিল—"তিনি এখন নবাব সাহেবের বাড়িতে আছেন।"

ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে একটি আসরফি দিয়া বলিলেন, এখানে কোনও সাহেব নেই? কারো সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও! তোমাকে আরও বখশিস দেব। জরুরি দরকার।"

প্রহরী বলিল—"ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব আছেন এখানে।"

"বেশ তাঁর কাছেই আমাকে নিয়ে চল।"

ধূর্জটিমঙ্গল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে ওয়ারেন হেস্টিংস নামক যুবক ইংরেজটি চমৎকার উর্দু বলিতে পারেন। শুধু তাহাই নয়, তিনি অতি ভদ্রলোক।

ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে বলিলেন—"একটি বদমায়েশ লোক একজন বাইজিকে বিরক্ত করছে, আপনি তাঁকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করে দিন। মেয়েটি আমার সঙ্গে এসেছে—"

ওয়ারেন হেস্টিংস সোৎসাহে বলিলেন, "নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করব। দু'জন গোরা পাহারার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

মৈনির তাঞ্জাম আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

মৈনি তাঞ্জাম হইতে নামিয়া সেলাম করিয়া বলিল—"বহুত শুক্রিয়া। কিন্তু আমি গোরা পাহারা চাই না। আমি নবাব সাহেবের অন্দরমহলে গান করি। সেখানেই চললাম। আদাব।"

মৈনি তাঞ্জামে উঠিয়া সোজা নবাববাড়ির দিকেই চলিয়া গেল। ধূর্জটিমঙ্গল তাহার পিছু পিছু কিছুদূরে গেলেন। কিন্তু মৈনি তাঁহার দিকে আর ফিরিয়া চাহিল না। ফিরিয়া চাহিলে তিনি হয়তো দেখিতে পাইতেন মৈনি কাঁদিতেছে। ধূর্জটিমঙ্গল ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া আবার জাফরাগঞ্জে নিজের বাসায় ফিরিয়া গেলেন। মৈনির জন্য তাঁহার কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার সঙ্গে আর গেলেন না। বাসায় গিয়া পুনরায় বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

॥ ষোলো ॥

জগদ্ধাত্রী পরদিনই চলিয়া আসিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। নীলু রায় বলিলেন, "ধলরাজাকে খবর না দিয়ে হঠাৎ চলে যাওয়া উচিত নয়।"

দানিয়েলও বলিল—"জন সাহেব আমার উপর আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছেন, তাঁর হুকুম না পেলে কি করে আপনাদের যেতে দি। লালী খাম্বার দেখাশোনা করত, তার উপর ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলাম আমি। কিন্তু সে দেখছি তার কাজ ঠিকমতো করেনি। এর জন্যে ফৌজি শাস্তি পাবে সে—"

লালীকে সে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল। এই দেখিয়া ঝামরি কোথায় যে অন্তর্ধান করিল তাহা কেহ বলিতে পারিল না। দানিয়েল বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—ওই ডাইনীকে ধরিতে পারিলে তাহাকেও গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিব। জগদ্ধাত্রীর কাছে আসিয়া তাহার পায়ের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল সে, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বন্দুকটা তাঁহার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—শুট মি। আমিই দোষ করেছি।

জগদ্ধাত্রী পাথরের মতো হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, ব্যক্তিগত অনুভূতি, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত সাধ আহ্লাদ সব যেন জমিয়া বিরাট একটা নৈবেদ্যে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল, সে নৈবেদ্য তিনি ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন বলিয়াছিলেন—নাও আমার সব নাও। তুমি তৃপ্ত হও, তাতেই আমার তৃপ্তি। বিধাতার অমোঘ বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তিনি। ভাবিয়াছিলেন হয়তো সত্যই তিনি সৌভাগ্যবতী, তাই রুক্মিণী তাঁহার শিশুপুত্রটিকে নিজের চরণে স্থান দিয়াছেন। জগদ্ধাত্রীর চোখে মুখে অদ্ভুত অপূর্ব একটা সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহা অবর্ণনীয়, যাহা অননুকরণীয়। এমন সুষমা শিল্পীরা প্রতিমায় বা চিত্রে ফুটাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। এ সুষমার মূল সুর করুণা, মূল ব্যঞ্জনা আত্মসমর্পণ, মূল উদ্দেশ্য পূজা। প্রায় সব সময়ই তিনি নিজের ঠাকুরঘরটিতে থাকিতেন। কস্তুরী একদিন খুঁটিকে আনিয়া বলিল—মা, একে তুর কাছে রাখ। আমি সদাই একে বুকে ধরে রাখি, বনের হুঁড়ার একে লিতে লারবে আমার বুক থেকে, কিন্তু মানুষ-হুঁড়ারকে বড় ডরাই। তোর ধন তোর কাছেই থাক। জগদ্ধাত্রী প্রসন্ন হাসি হাসিলেন। বলিলেন, মায়ের যা ইচ্ছা তাই হবে। ও তোর কাছেই থাক। ও আমাকে চেনে না, তোকে চেনে। দানিয়েলের কাছে থাকতে যদি তোর ভয় করে আমার কাছে এসে থাক। কস্তুরী বলিল—উকে আমার কিছু ভয় নাই। উ-ই বরং আমাকে ডরায়। জগদ্ধাত্রী বুঝিলেন কস্তুরী দানিয়েলকে ছাড়িয়া আসিবে না। বলিলেন, তবে ওইখানেই থাক তুই। খুঁটি তোর কাছেই থাক। আমার সব ভয় ভেঙে গেছে, আমার সব আমার দেবতাকে আমি দিয়েছি, ভয় ভাবনা সব। তিনি যা করবেন তাই হবে, আমাদের কিছু করবার ক্ষমতা নেই। এসব শুনিয়া কস্তুরী অবাক হইয়া গেল।

এইভাবে জগদ্ধাত্রীর দিন কাটিতেছিল।

নীলু রায় একদিন মাখনলালকে সঙ্গে করিয়া ধলরাজার বাড়িতে গেলেন। তাঁহার মনে হইল রাজাকে সব জানানো দরকার। রুক্মিণীর নিকট তাঁহার মিতেনের পুত্রকেই যে বলি দেওয়া হইয়াছে এবং সেইজন্যই যে তিনি চলিয়া যাইতে চাহিতেছেন এ কথাটা জানাইলে চলিয়া যাইবার ব্যবস্থাই তিনি করিবেন। তাঁহারও আর এখানে ভালো লাগিতেছিল না। বাংলাদেশের কোনও খবর এখানে পেঁছে নাই। মধু সামন্ত কিছুকাল পূর্বে কিছু সৈন্যসামন্ত লইয়া নবাবকে সাহায্য করিবার জন্য গিয়াছেন,

কিন্তু তাঁহারও আর কোনও খবর নাই। শেষপর্যন্ত নবাবের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষ বাধিল কি না এবং তাহার ফলাফল কি হইল তাহা জানিবার জন্যে তিনি উৎসুক হইয়া উঠিতেছিলেন। তাছাড়া দানিয়েল লোকটাকেও কেমন যেন একটা খাপছাড়া ধরনের লোক বলিয়া মনে হইতেছিল। সে লালীকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল, জগদ্ধাত্রীর পায়ের নিকট মাথা কুটিল কিন্তু এমন একটা ভাব করিয়া বেড়াইতেছে যেন সে-ই এই অঞ্চলের হর্তাকর্তাবিধাতা। লোকটা যখন রাগে, তখন তাহার জ্ঞান থাকে না, ক্ষ্যাপা গোছের গোঁয়ার লোক। জগদ্ধাত্রীকে সে অবশ্য দেবীর মতো ভক্তি করে, কিন্তু নীলু রায়ের ধারণা এরকম একটা খামখেয়ালী লোকের নিকট বাস করা নিরাপদ নহে।

ধলরাজা সব শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলেন। মিতেনের ছেলেকে রংকিণীর কাছে বলি দেওয়া হইয়াছে, এ নিশ্চয় ওই ডাইনী ঝামরির কারসাজি। ইহার একটা প্রতিবিধান করিতেই হইবে। নীলু রায়কে তিনি বলিলেন ক্ষতিপূরণ না করিলে তাঁহার পাপ হইবে। যেমন করিয়া হোক ইহার ক্ষতিপূরণ করিবেনই। এখন মিতেনের যাওয়া হইবে না, তিনি যথাসময়ে সসম্মানে মিতেনকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবেন। নীলু রায় একটু অবাক হইলেন। ক্ষতিপূরণ করিবেন? টাকা দিবেন নাকি! তাই যদি দেন তাহা হইলে সেটা তো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো হইবে। কিন্তু ধলরাজা যেরূপ উত্তেজিত হইয়াছেন তাহাতে একথা বলিবার সাহস তাঁহার হইল না। তিনি বার বার নিজের দুই বাহু দুই দিকে প্রসারিত করিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা দুই উরুর উপর সশব্দে চাপড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া গেল, চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল। তিনি আদিবাসীদের ভাষায় উচ্চকণ্ঠে যাহা বলিতে লাগিলেন তাহা রণহুংকার বলিয়া বোধ হইল। নীলু রায় আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। মাখনলালও চোখের ইঙ্গিতে বারণ করিল। নীলু রায় এবং মাখনলালকে ধলরাজা রাজকীয় সম্মানে আপ্যায়িত করিলেন। তাঁহাদের ভুরিভোজন তো করিতে হইলই, আদিবাসী মেয়েদের বোনা কাপড় চাদর এবং আরও নানারূপ উপহার গ্রহণ করিতে হইল। ধলরাজা নীলু রায়কে একটি প্রকাণ্ড ভল্ল উপহার দিলেন।

কয়েকদিন পরেই একটি নাটকীয় কাণ্ড ঘটিল। ধলরাজার সৈন্যসামন্তরা ঝামরিকে বাঁধিয়া টানিতে টানিতে লইয়া হাজির করিল নীলু রায়ের সম্মুখে। সৈন্যদের সহিত ধলরাজার একটি উচ্চপদস্থ কর্মচারীও আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন ধলরাজা আদেশ দিয়াছেন তাঁহার মিতেন ইহাকে যে শাস্তি দিতে বলিবেন সেই শাস্তিই তাহারা ইহাকে দিবে। ফাঁসি দেওয়া যাইতে পারে, কিংবা পুড়াইয়া ফেলা যাইতে পারে। আজ অমাবস্যা, জগদ্ধাত্রী দেবী যদি ইচ্ছা করেন ইহাকে রংকিণী দেবীর নিকট বলিও দিতে পারেন। ঝামরি চীৎকার করিতেছিল—আমি জানি রংকিণী আমাকে বাঁচাবেক। ওই রক্তখাগিই আমাকে স্বপন দিয়েছিল, আমি যা করেছি তার উসকানিতেই করেছি। সে আমাকে বাঁচাবেক। সত্যই সে বাঁচিয়া গেল শেষকালে। জগদ্ধাত্রী তাহাকে কোন শাস্তি দিলেন না, ক্ষমা করিলেন। সৈন্যরা তাহার বন্ধন খুলিয়া দিতেই সে হাসিতে হাসিতে বনের ভিতর চলিয়া গেল। বৈকালে যাহা ঘটিল তাহাও অপ্রত্যাশিত। স্বয়ং ধলরাজা অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক লোকজন এবং একটি সুসজ্জিত ছোট পালকি। পালকির ভিতর একটি আদিবাসী রমণী একটি শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। ধলরাজা বলিলেন ছেলেটি তাঁহারই ছেলে।

বয়স এক বছর। উহার মা উহাকে প্রসব করিয়াই মারা গিয়াছিল। একটি ধাত্রী তাহাকে লালন পালন করিতেছে। ধলরাজা ধাত্রী সমেত ছেলেকে মিতেনকে দান করিবেন বলিয়া আসিয়াছেন। ছেলেটির ভরণ-পোষণের জন্য কিছু জমিও তিনি মিতেনকে দান করিবেন। মিতেন যদি দয়া করিয়া তাঁহার এই উপহার গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহার মনের ক্ষোভ মিটিবে। মিতেনের যে ক্ষতি হইয়াছে সে ক্ষতি পূরণ করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, কিন্তু যতটুকু তাঁহার সাধ্যে কুলাইল ততটুকুই তিনি করিলেন। মিতেন যেন অপ্রসন্ন হইয়া না থাকেন ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। অতিথি অপ্রসন্ন হইলে রাজ্যের অমঙ্গল হয়। তিনি আরও বলিলেন বঙ্গদেশের খবর না পাওয়া পর্যন্ত তিনি মিতেনকে যাইতে দিবেন না। বঙ্গদেশে এখন রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতেছে। ধূর্জটিমঙ্গল এখন কোথায় আছেন সবই অনিশ্চিত। এ অবস্থায় তিনি মিতেনকে সেখানে পাঠাইবেন না। মধু সামন্ত খবর লইতে গিয়াছে। সে ফিরিয়া আসিলে যে ব্যবস্থা করা দরকার তাহা তিনি করিবেন। কোন বিপদের আশংকা যদি না থাকে মিতেনকে অবশ্যই তিনি পাঠাইয়া দিবেন।

পরদার আড়ালে বসিয়া জগদ্ধাত্রী সব শুনিলেন। নীলু রায় দো-ভাষীর কাজ করিলেন। ধলরাজা অবশেষে সেই পরদার সম্মুখেই হাঁটু গাড়িয়া অভিবাদন করিলেন জগদ্ধাত্রীকে। জগদ্ধাত্রী তখন পরদা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ধলরাজাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"আপনার দান আমি মাথা পেতে নিলাম। আপনার ছেলেকে আমি আমার সাধ্যমত মানুষ করব। আপনার আরও ছেলে আছে তো ?"

ধলরাজা বলিলেন তাঁহার ছেলেমেয়ের অভাব নাই। কুড়িটি ছেলে এবং দশটি মেয়ে ভগবান তাঁহাকে দিয়াছেন। "এ ছেলেটির মা মরিয়া গিয়াছে, আপনিই ইহাকে মানুষ করুন।"

জগদ্ধাত্রী পুনরায় তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পরদার অন্তরালে চলিয়া গেলেন।

মাস ছয়েক পরে ধলরাজা জগদ্ধাত্রীকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। মধু সামন্ত যখন ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে যুদ্ধের ঝড় ঝাপটা থামিয়া গিয়াছে, ধূর্জটিমঙ্গল সুতানুটিতে নিজের নূতন বাড়ি নির্মাণ করিতেছেন, তখন ধলরাজা জগদ্ধাত্রীকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সঙ্গে যদিও লোকজন ছিল তবু যাত্রা খুব নির্বিঘ্ন হয় নাই। পথে এক জায়গায় বাঘের গর্জন শুনিয়া থামিয়া যাইতে হইয়াছিল। বাঘের নিদারুণ গর্জনে দিগদিগন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। সকলে স্থির করিলেন আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়, নিকটবর্তী একটি প্রান্তরে মশাল জ্বালাইয়া সকলে একত্রে রাত্রিবাস করিলেন। প্রভাতে যাত্রা শুরু হইল। কিছুদূর গিয়াই দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড মৃত বন্য বরাহ পথের ধারে পড়িয়া আছে। সম্ভবতঃ বরাহটার সহিত কোনও বাঘের যুদ্ধ হইয়াছিল। আর একটা বাধা উপস্থিত হইয়াছিল বাংলাদেশের কাছাকাছি আসিয়া প্রকাণ্ড একটা মাঠের উপর। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক পরিপ্লাবিত। একটা চটিতে আশ্রয় পাইবার জন্য জগদ্ধাত্রীর পালকি দ্রুতবেগে মাঠটা অতিক্রম করিতেছিল। জগদ্ধাত্রীর অশ্বারোহী সঙ্গীরা নিকটবর্তী একটা জঙ্গলে শিকার করিতেছিলেন বলিয়া একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। সহসা একটা পালকি-বাহকের পায়ে একটা লাঠি আসিয়া লাগিল। সে খোঁড়া হইয়া বসিয়া পড়িল। পালকি নামাইতে হইল। ওই অঞ্চলটায় তখন

ঠ্যাঙাড়েদের খুব উপদ্রব। বাকি পালকিবাহকরা তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। দেখা গেল দূরে একদল ঠ্যাঙাড়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। একজন পালকিবাহক তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল অশ্বারোহীদের খবর দিতে। বাকী যাহারা রহিল তাহাদের দুইজন ঠ্যাঙাড়েদের দিকেই আগাইয়া গেল। উদ্দেশ্য তাহাদের সহিত দরদস্তুর করিয়া কিছু কালহরণ করা। এই কৌশলে ফল হইল। তাহারা ঠ্যাঙাড়েদের সর্দারকে বলিল, "তোমরা আমাদের পথ আটক কোরো না। রাণী মা বিশেষ দরকারে মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছেন। তোমরা দু'শ টাকা নিয়ে আমাদের ছেড়ে দাও।"

সর্দার বলিল—"রানী মা যখন তখন আরও বেশী কিছু দিতে হবে। অন্তত শ' পাঁচেক চাই।"

"তাহলে রানী মাকে জিগ্যেস করে আসি। তোমরা একটু অপেক্ষা কর।"

লোকটি পালকির কাছে ফিরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে আবার গেল।

"রানী মা তিন শ' দিতে চাচ্ছেন।"

"তিন শ'তে হবে না। অন্ততঃ শ' চারেক চাই।"

"আচ্ছা জিগ্যেস করি তাহলে—"

ইতিমধ্যে অশ্বারোহীরা খবর পাইয়া গেলেন। বন্দুক আওয়াজ করিতে করিতে সদলবলে ছুটিয়া আসিলেন তাঁহারা। ঠ্যাঙাড়েরা পলায়ন করিল। নীলু রায়ই অশ্বারোহীদের অগ্রবর্তী ছিলেন। দেখা গেল তাঁহার ঘোড়ার পিছন দিকে বেশ বড় একটা হরিণ ঝুলিতেছে।

আরও দুইটি পালকি ছিল। একটিতে ছিল খুঁটি এবং কস্তুরী আর একটিতে ছিল ধলরাজার পুত্র ও তাহার ধাত্রী শাবরি। জগদ্ধাত্রী ধলরাজার পুত্রটির জটামঙ্গল নামকরণ করিয়াছিলেন।

এই পালকি দুটি দ্বিপ্রহরে আগাইয়া গিয়া চটিতে আশ্রয় লইয়াছিল। জগদ্ধাত্রীও তাহাদের সহিত যাইতেছিলেন কিন্তু পথে একটি পর্বতবেষ্টিত নদী দেখিয়া তিনি স্নান করিবার জন্য নামিয়াছিলেন। স্নানান্তে পূজাও অনেকক্ষণ ধরিয়া করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। নীলু রায় ভাবিয়াছিলেন তিনটি পালকিই দিনের আলোয় চটিতে পেঁাছিয়া গিয়াছে। তাই তিনি শিকার করিয়া কিছু মাংস সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় নিকটবর্তী অরণ্যে ঢুকিয়াছিলেন।

আর এক জায়গায় একদিন থামিতে হইয়াছিল।

পালকিবাহক কম পড়িয়া গিয়াছিল। একজনের পায়ে লাঠি লাগিয়াছিল, পায়ের হাড় ভাঙিয়া গিয়াছিল। একটা ঘোড়ার পিছনে তুলিয়া তাহাকে আনিতে হইতেছিল। আরও দুইজন বাহকও অসুস্থ হইয়া পড়িল। একজনের ভেদবমি এবং আর একজনের জ্বর হইল। তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া নূতন বাহক যোগাড় করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল।

জগদ্ধাত্রী সমস্ত পথটা স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের অলৌকিক সৌন্দর্যে যেন আর একটা নূতন শোভার সৃষ্টি হইল। অনেকদিন পরে স্বামী সন্দর্শনে চলিয়াছেন। স্বামীকে কেমন দেখিবেন, কি ভাবে তিনি অভ্যর্থনা করিবেন, তাঁহার হৃদয়মন্দিরে স্বামীর জন্য যে আসনটি তিনি পাতিয়া রাখিয়াছেন, সেখানে

তিনি বসিবেন কি না—এই সব চিন্তা তাঁহার মুখভাবে যে প্রত্যাশা, যে উন্মুখতা, যে অনিশ্চয়তার আভাস ফুটাইয়া তুলিল তাহা যেন আলো-ছায়া-খচিত আর একটা অপূর্ব শ্রী।

॥ সতেরো ॥

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহার পিতৃপিতামহের বাস্তুভিটায় বিরাট বাড়ি নির্মাণ করিয়াছেন। তিন মহলা বাড়ি। প্রকাণ্ড বাগানের পাশে অতিথিদের থাকিবার জন্যও একটি আলাদা দোতলা বাড়ি। যে শিবলিঙ্গের মাথায় কোনও আচ্ছাদন ছিল না সেই শিবলিঙ্গকে ঘিরিয়া বিশাল একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের সংলগ্ন খুব বড় একটি পূজার দালান। দালানের পাশে আর একটি ঘর। জগদ্ধাত্রীর ঠাকুরঘর। বাড়ির পিছনে পুকুর। পুকুরের পাশে ফলের বাগান। বাড়ির সম্মুখে ফুলের বাগানে বহু রকম ফুল। বাগানের পাশেও কয়েকটা ঘর।

ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতে দুর্গাপূজা হইতেছে। শিবমন্দিরসংলগ্ন দালানে লাবণ্যময়ী দুর্গাপ্রতিমা। মা যেন হাসিতেছেন। অষ্টমী পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। দালানের সম্মুখে যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহাতে চাঁদোয়া টাঙানো হইয়াছে। বিরাট চাঁদোয়া, বিরাট এবং অলঙ্কৃত। চাঁদোয়ার নীচে নিমন্ত্রিত অতিথিগণ সমবেত হইয়াছেন। হিন্দু মুসলমান সাহেব সব রকম অতিথিই আছেন। একজন সাহেব চেয়ারে বসিয়া আলবোলায় ধূমপান করিতেছেন। ক্রাচের উপর ভর দিয়া জন সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধে একটি পা তিনি হারাইয়াছেন। কিন্তু কিছুমাত্র দমেন নাই।

"হ্যালো, জর্জটি, মে আই হ্যাভ এ হুইস্কি।"

"নিশ্চয়।"

ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহাকে আলাদা একটি ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে টেবিলের উপর সারি সারি বিলাতী মদ। সেখানে দুইজন পোশাকপরা আরদালীও ছিল। ইঙ্গিত করিতেই তাহারা জন সাহেবকে গ্লাসে করিয়া হুইস্কি দিল। একটু পরেই সেই ঘরে দুইজন সারেঙ্গীওলা এবং দুইজন তবলাবাদক আসিয়া বসিল। একটু পরেই বাইনাচ আরম্ভ হইবে। তাহার সংলগ্ন আর একটি ঘরে শুধু গানের আসর। মৌনি বিবি, কেরামত আলী এবং পুতলি বিবি সেখানে আসর জমাইয়া তুলিয়াছেন। দ্বারের কাছে বসিয়া আছে রোমনি, শাওনি আর তিকি। ধূর্জটিমঙ্গল তাহাদের ঝকমকে নূতন পোশাক কিনিয়া দিয়াছেন, তাহারা ভারি খুশী। দন্তগুলি সর্বদা বিকশিত হইয়া আছে। মৌনি এবং কেরামতের গান শুনিয়া তাহারা অবাক হইয়া গিয়াছে। ধূর্জটিমঙ্গল ঠিক করিয়াছেন মৌনি, কেরামত এবং পুতলি এখন কলিকাতাতেই থাকিবে। বাগানের পাশের ছোট বাড়িটি তাহাদের জন্যই প্রস্তুত করাইয়াছেন তিনি। সরফুদ্দিনও কলিকাতায় ইংরেজ সরকারে একটি ভালো চাকুরি পাইয়াছে। ধূর্জটিমঙ্গল যদিও বাড়ির মালিক, কিন্তু বাড়ির আসল কর্তা নীলু রায়। তিনি চারিদিকে

ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। ভারে ভারে খাবার আসিতেছে। দলে দলে লোক আসিতেছে, চেয়ার টেবিল আসবাবপত্র জাজিম, কার্পেট, বালিশ, খাট,—কত রকম জিনিস আসিতেছে। সকলেরই ব্যবস্থা করিতেছেন নীলু রায়। তাঁহার মুহূর্তমাত্র সময় নাই।

হঠাৎ পুরোহিত মহাশয় ঘণ্টা নাড়িয়া ঘোষণা করিলেন—এইবার সন্ধিপূজা হবে।

ধূর্জটিমঙ্গল করজোড়ে অতিথিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা যাঁরা সন্ধিপূজা দেখতে চান তাঁরা মায়ের সামনে এসে দাঁড়ান।"

সকলেই গিয়া দালানের সম্মুখে সমবেত হইলেন। সাহেবরা এবং মুসলমানরাও গেলেন। আহূত অনাহূত রবাহূত, ধনী দরিদ্র, বালক যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ—বিরাট ভিড়। সকলেই জোড়হস্তে দাঁড়াইয়াছেন।

সহসা নীলু রায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এই সন্ধিপূজার সময় মায়ের কাছে বর প্রার্থনা করুন আমরা যেন বিজয়ী হই। আজ আমরা যুগ-সন্ধিক্ষণেও উপস্থিত হয়েছি। মুসলমানের রাজত্ব শেষ হয়েছে, ইংরেজদের রাজত্ব শুরু হল। এই সন্ধিপূজাও আমাদের করতে হবে। এ পূজার মন্ত্র পাঠ করবেন আমাদের বিবেক। এ পূজায় আমরা শপথ নেব যে আমরা চিরকাল সত্যের দিকে, ন্যায়ের দিকে, ধর্মের দিকে থাকব। অসত্য অন্যায় অধর্ম আমরা কিছুতে সহ্য করব না। মা আমাদের আশীর্বাদ করুন।"

প্রতিমার একধারে জগদ্ধাত্রী তাঁহার ছোট ছেলে দুইটি ও আত্মীয়-স্বজনদের লইয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঢাক, ঝাঁজর, শঙ্খ, ঘণ্টা একযোগে বাজিয়া উঠিল।

সন্ধিপূজা শুরু হইয়া গেল।

সে সন্ধিপূজায় আর একটি পবিত্র আলোও জ্বলিয়াছিল। কলিকাতায় ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতে নহে, মুর্শিদাবাদ খুশবাগে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সমাধিমন্দিরে আলোটি জ্বালাইয়াছিলেন বেগম লুৎফুন্নিসা।

সিরাজের মৃত্যুর পর মীরণ তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন, আমাকে নিকা কর। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, সারাজীবন হাতির পিঠে চড়িয়া বেড়াইয়াছি, এখন গাধার পিঠে চড়িতে পারিব না।

সবাই জানে হাতিটি ছিল মত্ত মাতঙ্গ। কিন্তু এই মত্ত মাতঙ্গের স্মৃতি-পূজাই মহীয়সী লুৎফুন্নিসা আমরণ করিয়া গিয়াছেন। যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন প্রতি সন্ধ্যায় সিরাজের কবরে একটি বাতি তিনি জ্বালিয়া দিতেন। সেই যুগসন্ধিক্ষণের মহাপূজায় এই ক্ষুদ্র বর্তিকার কোনও সার্থকতা ছিল কিনা জানি না, শুধু জানি তাহার পুণ্য-প্রভা ইতিহাসে আজও অম্লান হইয়া আছে।

গল্প ও কাহিনী

প্রয়োজন

দুটি মাস ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগলাম। পেটজোড়া পিলে-লিভার—জরাজীর্ণ দেহ। শুনলাম নাকি ডাক্তারবাবু বলে গেছেন যে, যে-কোন মুহূর্তে একটা শক্ত ব্যারাম হয়ে আমার জীবনসংশয় হতে পারে। পিলে কিছুতেই সারবে না!

অসুখের আগে 'ম্যাট্রিকুলেশন' পরীক্ষা দিয়েছিলাম—ভাল হয়ে শুনলাম, 'ফেল' করেছি। গোপনে গোপনে পাড়ার একটি মেয়েকে ভালবাসতাম। তারও সেদিন বিয়ে হয়ে গেল। তার স্বামী আমার চেয়ে ঢের বেশী সুস্থ ও বিদ্বান। সুতরাং জীবনটা চারিদিক থেকেই ব্যর্থ হয়ে গেল। এমন অবস্থায় আত্মহত্যা করা উচিত কি না—এ চিন্তাও মাঝে মাঝে মনে হতো। কিন্তু আমি বরাবরই ভীতু গোছের, তাই আত্মহত্যা করা আমার দ্বারা সম্ভব হয় নি।

শুনেছিলাম পৃথিবীতে অ-দরকারী বাজে জিনিস কিছু নেই। কিন্তু আমি? আমার কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু ছিল।

রোগা শরীর নিয়েই কোলকাতায় চাকরির সন্ধানে এসেছিলাম। কোন এক 'হিন্দু-হোটেলে' খাওয়া-দাওয়া চলছিল। সেদিন দুপুরে এক মার্চেন্ট আপিসের সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি—সেই সময় রাস্তায় মোটরচাপা পড়লাম। তারপর কি হয়েছিল, ভাল মনে নেই।

এখন দেখছি, আমার দেহ নিয়ে মেডিকেল কলেজের ছাত্রেরা দেহতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান অর্জন করছেন। আমার জীর্ণ দেহকে কেটে চিরে তন্ন তন্ন ক'রে দেখছেন কোথায় কি আছে। যাক—তবু একটা কাজে লাগতে পেরেছি। এতে আমার আনন্দ ধ'রছে না!

বলা বাহুল্য, আমি এখন পরলোকে।

কাঁচা রং খারাপ স্প্রিং

বেশ বৃষ্টি পড়িতেছিল। স্কুলের শিক্ষক প্রবীণ রামলোচনবাবু একটি ছাতা মাথায় দিয়া আমার বারান্দায় আসিয়া উঠিলেন। দেখিলাম তাঁহার শুভ্র জামার চারিদিকে কালো দাগ লাগিয়াছে।

বলিলাম—"এ কি, নতুন ছাতা না কি!"

"হ্যাঁ, একটু আগেই কিনেছি।"

"রং উঠে যাচ্ছে দেখছি।"

"তাই তো দেখছি—"

"কোথা থেকে কিনলেন—"

"ভুনিবাবুর দোকান থেকে।"

"তিনি আজকাল ছাতা বিক্রি করেন না কি। আগে তো লজেনচুষ বেচতেন।"

"শুধু ছাতা বিক্রি করেন না। ছাতা তৈরি করেন। ছোট ফ্যাক্টরি করেছেন একটা।"

"বাজারে এত ভাল ছাতা থাকতে আপনি ভুনিবাবুর ছাতা কিনতে গেলেন?"

"কারণ আছে। দাঁড়াও ছাতাটা মুড়ে একধারে রাখি। তোমার বারান্দার চারদিকটা না হলে কালিময় হয়ে যাবে।"

ছাতিটি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"ও বাবা, এ যে বন্ধও হচ্ছে না। না, এবারও পাস মার্ক দিতে পারলুম না। এবারেও ফেল—"

"আপনি ওই দিকে রেখে দিন না।"

"তাই রাখতে হবে।"

রামলোচনবাবু খোলা ছাতিটাই এক ধারে নামাইয়া রাখিলেন। তাহার পর হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দুর্বুদ্ধি হয়েছিল। মাস্টারদের কাণ্ডজ্ঞান তো চিরকালই কম।"

"হয়েছিল কি—"

"তাহলে বসি। সোফায় বসব না দাগ লেগে যাবে। এই কাঠের চেয়ারটায় বসছি।"

সসঙ্কোচে তিনি কাঠের চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন।

"কি ব্যাপার বলুন তো—"

"এবার পরীক্ষায়, বুঝলে, 'বর্ষা' বিষয়ে একটা রচনা লিখতে দিয়েছিলাম। নানারকম ছেলে নানারকম লিখেছে দেখলাম। কেউ বর্ষা নিয়ে কাব্য করেছে, কেউ মেঘদূত, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আলোচনা করেছে, কেউ বা বর্ষায় গ্রামের শোভা বর্ণনা করেছে, কেউ বা গ্রামের দুর্দশা বর্ণনা করেছে, কলকাতার মতো শহরে বর্ষাকালে কি কাণ্ড হয় তাও লিখেছে অনেকে। বড়লোকদের বর্ষা আর গরীবদের বর্ষার কথাও লিখেছে কেউ কেউ। কিন্তু একটা রচনা পড়ে আমার তাক্ লেগে গেল। সে একটি ছোট্ট কবিতা লিখেছে, আর কিছু লেখে নি। লিখেছে—

বর্ষাকালে যাহার মাথায় নাই ছাতি
তাহার মুখে মার দু'-তিন লাথি।

আর কিছু লেখেনি। ডাকলাম ছেলেটিকে। এল। বললাম—এ কি লিখেছ? সে বললে, বর্ষা সম্বন্ধে আসল কথাটাই তো লিখেছি সার। বর্ষাকালে জল পড়ে, কাদা, হয়, আকাশে মেঘ, বিদ্যুৎ হয়, ব্যাং ডাকে এ সব তো সবাই জানে। আমি ছাতির বিজ্ঞাপন দিয়েছি একটু। মুখ নীচু করে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। বললাম, ছাতির বিজ্ঞাপন দিয়ে তোমার লাভ। বলল, আমার বাবা যে ছাতি তৈরি করছেন আজকাল। মিত্র ছত্র কোম্পানি, দেখেন নি? খুব ভাল ছাতি হচ্ছে সার। জিজ্ঞেস করলাম, তা তো হচ্ছে। কিন্তু এতে তোমাকে তো পাস মার্ক দিতে পারছি না।

সে বলতে লাগল—দিয়ে দিন সার। ভাল ছাতা আপনাকে এনে দেব। বললাম, না ছাতা চাই না আমার। তোমার বাবার নাম কি? সে সগর্বে জবাব দিল—ডাক-

নাম ভুনিবাবু। ভালো নাম গন্ধরাজ মিত্র। ছেলেটিকে পাস মার্ক দিতে পারি নি। আজ রাস্তায় হঠাৎ বৃষ্টি নামল। তখন মনে পড়ল মিত্র-ছত্র কোম্পানির কথা। বৃষ্টির সময় একটা দোকানের বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। তাদেরই জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় দোকানটা। তারা বলে দিল। সেইখান থেকেই ছাতাটা কিনে নিয়ে আসছি। ভাবলাম বাঙালী ভদ্রলোক ব্যবসা করছেন, ব্যাক করা উচিত। কিন্তু নাঃ—এবারও পাস মার্ক দিতে পারলাম না। জামার এ রং উঠবে তো?"

বলিলাম—"কাঁচা রং একবার ধুলেই উঠে যাবে। কিন্তু ছাতাটা বন্ধ করতে পারবেন কি। স্প্রিংটা খারাপ। ওদের আমি চিনি। বলেন তো ফেরত দিয়ে দিতে পারি—"

"না, আর ফেরত দিতে হবে না। হাজার হোক বাঙালীর দোকান তো! ক্রমে ক্রমে কাঁচা রং পাকা হবে, খারাপ স্প্রিং ভালো হয়ে যাবে। না, ফেরত দিতে হবে না।"

তোয়ালে

কাল বিকেলে বাথরুমে গিয়ে হঠাৎ একটা খুব ছোট্ট গল্প পেয়ে গেলাম। ওখানে যে তোয়ালেটায় রোজ হাত মুছি সেটা কথা কয়ে উঠল।

"আপনি রোজ রোজ আমাকে এভাবে ময়লা করে দেন, লজ্জা করে না আপনার?"

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম।

তারপর বললাম, "গায়ের ময়লা মোছার জন্যেই তো তোমাকে কিনেছি। তোমাকে দিয়ে আর কি করব?"

"কিন্তু আমারও তো একটা সত্তা আছে, সেটাকে বার বার ময়লা করে দেওয়া কি আপনার উচিত?"

"মাঝে মাঝে তোমাকে তো ধোপার বাড়িতে কাচিয়ে পরিষ্কারও করাই।"

"ধোপার বাড়িতে গিয়ে তাদের ভাটিতে যে নরকযন্ত্রণা সহ্য করি তা কি আপনি জানেন না?"

"জানি। কিন্তু আমি নিরুপায়। আমাকে তোয়ালে একটা রাখতেই হবে। সেইজন্যেই তোমাকে আমি বাজার থেকে কিনে এনেছি—"

"আপনি আমার মনিব, আমি আপনার ক্রীতদাস তা জানি—সেইজন্যই আমার অন্তর্দাহ আরও বেশী—"

"তা এর জন্যে কি করছ তুমি?"

"শক্তি সংগ্রহ করছি, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি—"

"কি প্রার্থনা—"

"যাতে আমি আপনার মনিব হই, আর আপনি আমার তোয়ালে হয়ে যান—"

খোকনের প্রথম ছবি

খোকন এখন বড় হয়েছে। ক্লাস টেন-এ পড়ে। ছবি আঁকার দিকে খুব ঝোঁক হয়েছে তার। সে যখন খুব ছোট ছিল কাগজের উপর রঙীন পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি কাটত। তারপর ক্রমশ বড় হল, স্কুলে গেল। স্কুলে ড্রইং শেখানো হত। ড্রইং শিখতে লাগল খোকন। টুল, টেবিল, চেয়ার, কলসী, কাপ এমন কি একটা গরুও এঁকে ফেললে একদিন। তারপর ড্রইং বুক থেকে কপি করে করে অনেক ছবি আঁকল সে। নানারকম ছবি। যেখানেই সে ছবি দেখত, দেখে দেখে এঁকে ফেলত। একদিন তার ড্রইংয়ের মাস্টার মশাই বললেন—প্রকৃতি থেকে ছবি আঁকো।

খোকন জিজ্ঞেস করলে—"প্রকৃতি থেকে ?"

"হাঁ, তোমার চারপাশে তো অনেক ছবি ছড়িয়ে আছে। সেইগুলো দেখে দেখে আঁক না এবার। তোমার বাড়ির সামনেই তো চমৎকার গাছ আছে একটি। তার ছবিটা এঁকে ফেল একদিন—"

খোকন সত্যি সত্যি এঁকে ফেলল একদিন ইউক্যালিপটাস গাছটাকে। মাস্টার মশাই বললেন—"চমৎকার হয়েছে। আরো আঁকো। তোমাদের বাড়ির ছাদ থেকে যে পুলটা দেখা যায়, সেটা আঁকতে পারবে ?"

"পারব—"

পুলের ছবিটা দেখেও খুব প্রশংসা করলেন মাস্টার মশাই। বললেন, "চারপাশে যা দেখবে এঁকে ফেলবে। খুব বড় চিত্রকর হবে তুমি।"

খোকন মহা উৎসাহে আঁকতে লাগল ছবি। কিন্তু কিছুদিন পরে সে নিজেই বুঝতে পারল—ঠিক হচ্ছে না। সূর্যের যে ছবিটা এঁকেছে সেটা তো সূর্যের মতো নয়। সূর্যের দীপ্তি তো ছবিতে ফোটেনি। গোলাপ ফুলের ছবিতে কি গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য ফোটাতে পেরেছে সে ? পারেনি। প্রকৃতির ছবি ঠিক আঁকা যায় না। একদিন তো মেঘের ছবি আঁকতে গিয়ে বেকুব হয়ে গেল খোকন। একদিন সে দেখল আকাশে একটা মেঘ হাতীর মতো। ঠিক যেন একটা হাতী পিছনের দু পায়ে ভর করে শুঁড় তুলে আছে। খোকন তাড়াতাড়ি তার ড্রইং খাতায় ছবিটা আঁকতে লাগল। আঁকা শেষ হবার পর মিলিয়ে দেখতে গেল ঠিক হয়েছে কি না। গিয়ে দেখে—হাতী নেই, প্রকাণ্ড একটা কুমীর শুয়ে আছে। হাতী কুমীর হয়ে গেছে।

খোকনের বাবার একজন বন্ধু বিখ্যাত চিত্রকর। তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে থাকেন। একদিন তিনি খোকনদের বাড়িতে এলেন।

খোকনের বাবা তাঁকে বললেন—"খোকনও ছবি আঁকছে।"

"তাই নাকি। দেখি দেখি—"

খোকন সগর্বে ড্রইংখাতাগুলো নিয়ে এল।

"ওরে বাস, অনেক ছবি এঁকেছো দেখছি—" একে একে উল্টে উল্টে ছবিগুলো দেখতে লাগলেন তিনি। প্রশংসা করলেন, কিন্তু বললেন—"তোমার ছবি কই ? এ সবই তো কপি করেছ। তুমি বড় হয়ে ক্যামেরা নিয়ে যদি এদের ফোটো তোল তা

হলে এগুলো আরও নিখুঁত হবে। এগুলো সব নকল করা ছবি। তোমার নিজের আঁকা ছবি কই?"

খোকন অবাক হয়ে গেল।

"নিজের আঁকা ছবি? তা কি করে আঁকব?"

"চোখ বুজে বসে কল্পনা করো। কল্পনায় যা দেখবে সেটাই এঁকে ফেল।"

চিত্রকর চলে গেলেন।

খোকন একদিন নিজের ঘরে চোখ বুজে বসে রইল। অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না সে। খোকন ঠিক করল এই অন্ধকারেরই ছবি আঁকবে। কালো রং আর তুলি নিয়ে শুরু করে দিল আঁকতে। ড্রইং খাতার একটা পাতা কালো রংয়ে ভরে গেল।

তারপর সেটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খোকন। এটা কি রকম ছবি হোল? এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তবু।

তারপর হঠাৎ দেখতে পেল ওই কালোর ভিতরই একটা মুখ রয়েছে। চোখও আছে। অদ্ভুত হাসি সে চোখে।

নিজের প্রথম সৃষ্টির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল খোকন।

ফরেন মানি

গোবর্ধন ভালো ছেলে। প্রমথ তার বন্ধু। প্রমথর কপালটা একটু ভালো, খুঁটির জোর আছে। চাকরি পেয়েছে একটা। গোবর্ধন পায়নি। গোবর্ধনের আরও মুশকিল, সে বিবাহিত। বউটি সুন্দরী। স্বামীর কাছে নানারকম জিনিস চায়।

একদিন গোবর্ধন এসে প্রমথকে বলল, "আজ ভাই বউয়ের সামান্য একটা আবদার মেটাতে পারলাম না। সে আজ বললে অনেকদিন চিংড়ি মাছ খাইনি, আজ চিংড়ি মাছ কিনে এনো। যোগেনের কাছ থেকে দশটা টাকা ধার করে বাজারে গেলাম। চিংড়ি মাছ পেলাম না। শুনলাম সব চিংড়ি মাছ বিদেশে চলে যাচ্ছে 'ফরেন মানি' আর্ন করতে। এ দেশের সব ভালো জিনিসই বিদেশে গিয়ে 'ফরেন মানি' আর্ন করছে। ভালো কাপড়, ভালো চাল, ভালো ভালো ফল সব আজ বিদেশের বাজারে। আমাদের খনিগুলো তো খালি হয়ে গেল। এমন কি বড় বড় ব্যাং পর্যন্ত চালান হচ্ছে। এ দেশের ভালো ভালো ছেলে মেয়েরাও বিদেশে গিয়ে 'ফরেন মানি' রোজগার করছে। কিছু ছোট পোনা মাছ কিনে এনে বউকে 'ফরেন মানি'র রহস্য বোঝালাম। বউ বললে, 'অত ছোট মাছ আমি খেতে পারি না, গলায় কাঁটা বেঁধে—', কি মুশকিল বল তো—"

এর প্রায় মাসখানেক পরে গোবর্ধন হন্তদন্ত হয়ে প্রমথর কাছে এল একদিন। চুল উসকো-খুসকো, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

"কি রে কি হল—"

"আজ বাড়ি ফিরে দেখি—বউ নেই। এই চিঠিখানা লিখে রেখে গেছে।"

চিঠিতে লেখা আছে—আমিও 'ফরেন মানি' আর্ন করতে চললাম—

"কি করি বল্ তো ? থানায় যাব ? তোর মেসোর সঙ্গে হোম মিনিস্টারের আলাপ আছে—তুই একটু চেষ্টা করে দেখবি ?"

প্রমথ নির্বাক হয়ে রইল।

গল্প নয়

অতি সাধারণ ছেলে। পরনে আড়-ময়লা ছেঁড়া-ছেঁড়া হাফ শার্ট আর চোং প্যাণ্ট। পায়ের স্যান্ডালও ছেঁড়া। মুখে গোঁফ দাড়ি আর জুলফির জঙ্গল। মাথায় পিছন দিকে চুলের খোপনা। মুখটি কিন্তু শুকনো। চোখের দৃষ্টি চতুর, লোলুপ কিন্তু নিষ্প্রভ।

লেখা-পড়া তেমন শেখেনি। মোটামুটি বাংলা ইংরেজি জানে। কিন্তু নির্ভুল-ভাবে লিখতে পারে না, প্রায়ই বানান ভুল হয়। চাকরির চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনও পায় নি। বেকার।

রোজ বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। এসে দাঁড়ায় চৌমাথার একটা কোণে। রাস্তার জনতার দিকে চেয়ে থাকে, কল্লোলিনী কোলকাতাকে দু নয়ন ভরে দেখে। তার বুকে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত স্বপ্ন। একটাও সফল হয় নি। ভীড়ের মধ্যে মেয়েরাও যাচ্ছে দলে দলে, তাদের মধ্যে অনেকে সুন্দরী, অনেকে যুবতী। তাদের দিকেও হ্যাংলার মতো চেয়ে থাকে সে। মাঝে মাঝে ওদের নিয়ে কবিতাও লেখে। কাগজে পাঠায়, ছাপা হয় না।

একটি মনোহারি দোকানের সামনেই সে দাঁড়ায় রোজ। দোকানের সামনে একটু ফাঁকা জায়গা আছে, খরিদ্দারও অনেক, বিশেষ করে মেয়ে খরিদ্দার।

জায়গাটি তার বেশ পছন্দ।

হঠাৎ একদিন সেই দোকানের মালিক বললেন, "রোজ আপনি আমার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন বলুন তো মশাই ?"

"এমনি—"

"এমনি কি রোজ রোজ এক জায়গায় কেউ দাঁড়ায় ? নিশ্চয় কোনও মতলব আছে আপনার—"

"না, না—এখানে জায়গাটা একটু ফাঁকা কি না—"

"ফাঁকা জায়গা আরও অনেক আছে। দয়া করে অন্য জায়গায় সরে যান—"

তার বলতে ইচ্ছে করল—"ফুটপাথ কি আপনার বাবার ?"

সে কিন্তু তা বলতে পারল না। সসংকোচে সরে গেল।

এরাই কি দেশের ভবিষ্যৎ ?

কেন জানি না আমার চোখে জল এসে পড়ল। লেখা শেষ করে চোখ তুলে চাইলাম।

আমার ঘরের দেওয়ালে বিবেকানন্দ, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, শ্রীঅরবিন্দ, বংকিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ—সকলেরই ছবি টাঙানো আছে। দেখলাম সকলের চোখেই জল।

তৃষ্ণা

বৈশাখ মাস। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে চারিদিক ঝলসাইয়া যাইতেছে। প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠের উপর দিয়া আমি হাঁটিয়া চলিয়াছি। এই বিরাট মাঠের ওপারে কান্তিপুর গ্রামে আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব পেঁছাইতে হইবে। আমার নিকট আত্মীয় সেখানে খুব অসুস্থ। কিছুদূর 'বাস'-এ আসিয়া তাহার পর পদব্রজে এই বিশাল মাঠটা পার হইলে তবে কান্তিপুর পেঁছানো যায়। অন্য পথ নাই। খুব ভোরে উঠিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। তবু মাঠে পেঁছাইতে দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। আর একটা ভুল করিয়াছিলাম, ছাতা আনিবার কথা মনে ছিল না। প্রচণ্ড রৌদ্রে হনহন করিয়া পথ হাঁটিতেছি। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে।

কিছুক্ষণ হাঁটিবার পর দাঁড়াইয়া পড়িলাম। চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম, কাছাকাছি একটা গাছও কি নাই! সহসা কিছুদূরে ঝোপের মতো কি একটা দেখা গেল। গাছ কি? সেই দিকে অগ্রসর হইলাম।

গিয়া দেখি সত্যই একটি ঝাঁপড়ালো গাছ। নীচে সুশীতল ছায়া। শুধু তাই নয়, গাছের নীচে অনেকগুলি ডাব লইয়া একজন বৃদ্ধ বসিয়া আছে। পাশে কয়েকটি কাঁচের গ্লাসও রহিয়াছে। বিস্মিত হইলাম।

"এই মাঠের মাঝখানে ডাবের দোকান করেছ?"

বৃদ্ধ কোন জবাব দিল না।

"আমাকে একটা ডাব দাও—"

বৃদ্ধ ডাব কাটিয়া একটি গ্লাসে করিয়া আমাকে ডাব দিল।

ঢকঢক করিয়া এক নিশ্বাসে সেটা খাইয়া ফেলিলাম।

"আর এক গ্লাস দাও—"

মনে হইল বুকটা যেন জুড়াইয়া গেল। এই মাঠে এমন শীতল ডাব পাইব আশা করি নাই।

"কত দাম দেব?"

প্রশ্নটি করিবামাত্র অদ্ভুত জিনিস ঘটিল একটি। সমস্ত ব্যাপারটাই অন্তর্হিত হইয়া গেল। গাছ, ডাব, গ্লাস, সেই বৃদ্ধ—সব যেন শূন্যে মিলাইয়া গেল।

ভাবিলাম—"দিনদুপুরে ভূত দেখিলাম নাকি।"

কানের কাছে কে যেন বলিল—"না, ভূত নয়। তোমার কল্পনা। তোমার কল্পনাই মূর্ত হইয়াছিল এখানে।"

"তা হলে আমি ডাব খাই নি?"

"খেয়েছিলে। কাল্পনিক ডাব! তৃপ্তি হয় নি?"

রৌদ্রতপ্ত নির্জন মাঠে একা দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর আবার তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকাইয়া গেল। তৃষ্ণার অসহ্য যন্ত্রণা আবার ভোগ করিতে লাগিলাম।

ভিক্ষুক

হঠাৎ চেয়ে দেখলাম একটি গোঁফ-দাড়ি-ওয়ালা লোক আমার সামনে এসে হাঁটু-গেঁড়ে হাত জোড় ক'রে বসে পড়ল।

"কে তুমি ?" কোন উত্তর নেই।

আবার প্রশ্ন করলাম, "কে তুমি ?" এবারও কোন উত্তর নেই।

তারপর একটু ধমকের সুরেই প্রশ্ন করলাম —"কে তুমি ? কি চাই ?"

তখন সে ধীরে ধীরে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমার চোখের উপর চোখ রাখল।

এবার আমি চমকে উঠলাম। যে আমার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে সে আর কেউ নয়, আমিই। তার ছেড়া মলিন কাপড়, তার গোঁফ-দাড়ি ঢাকা মুখ, তাকে আড়াল করে রেখেছে। তাকে আমি এতক্ষণ চিনতে পারিনি। আমি নির্বাক, সবিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে আছি। সে তখন ধীরে ধীরে বলল—"তোমার কাছে একটি প্রার্থনা, তুমি এমনভাবে ভিক্ষে করে বেড়িও না।"

"আমি ভিক্ষে করছি ?"

"হ্যাঁ করছ, সর্বদা করছ, মনে মনে।" বলেই সে অন্তর্ধান করল।

মহারাজের দরবার

মহারাজের দরবারের কথা বেশী লোক জানে না। আমার বাবা তাঁর ঠাকুরদার কাছে এ দরবারের কথা শুনেছিলেন। আমি শুনেছি আমার বাবার কাছ থেকে। বাবা বলেছিলেন তাঁর ঠাকুরদা নাকি স্বচক্ষে এ দরবার দেখেছিলেন। ঘনা গ্রামে আগে আমাদের বাড়ি ছিল। তার পাশে প্রকাণ্ড মাঠ ছিল একটা। সেখানে মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে মহারাজের দরবার বসত। জমজমাট দরবার। বহু মশাল জ্বলত। মখমলের বিরাট গালিচা পাতা হোত। গালিচার উপর পাতা হোত মহারাজের সিংহাসন। স্বর্ণ-খচিত সিংহাসন। তার উপর থাকত বিরাট রাজছত্র। মহারাজের দাড়ি ছিল, গোঁফ তো ছিলই। মুখখানা সিংহের মতো। তিনি কিন্তু রাজার মতো পোশাক পরতেন না। একটা ধপধপে সাদা উড়ুনি গায় দিয়ে সিংহাসনে বসতেন। বাবার ঠাকুরদা বলেছিলেন উড়ুনিও হয়তো গায়ে দিতেন না তিনি, কিন্তু তাঁর সমস্ত বুকে ছিল লোমের জঙ্গল। বাবার ঠাকুরদা বলতেন সেইটে ঢাকবার জন্যে উড়ুনি গায়ে দিতেন তিনি। দামী কাপড়-চোপড়ের দিকে মোটেই ঝোঁক ছিল না। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন ও অঞ্চলে। সবাই তাঁর ভয়ে থরথর করে কাঁপত। দেখতেও যেমন সিংহের মতো, গলার স্বরও সিংহের মতো। এক দাবড়ানিতে কাঁপিয়ে দিতেন চারদিক। খুব রাশভারী লোক ছিলেন। কিন্তু যেদিন তিনি দরবার করতেন সেদিন তিনি দয়ার অবতার। যে যা চাইত তাই দিতেন তাকে। দরিদ্ররা টাকা পেত, প্রচুর খেতে পেত, কাপড়-জামা পেত। দরবারের পাশেই দরিদ্র ভোজনের বিরাট আয়োজন থাকত। গুণীরাও সম্মানিত হতেন। দরবারে বড় বড় ওস্তাদরা আসতেন, বাইজীরা

আসতেন, কবিরাও আসতেন। সকলকে পুরস্কৃত করতেন মহারাজা। বাবার ঠাকুরদা বড় সেতারী ছিলেন, তাঁর তবলচী ছিলেন তুফান আলী। দুজনেই মহারাজের দরবারে বাজিয়ে ছিলেন। বাজিয়ে দুজনেই দুটো দামী শাল আর একশো এক মোহর উপহার পেয়েছিলেন নাকি।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। মহারাজের অনেক দিন আগে মৃত্যু হয়েছে। আমরাও ঘনা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছি অনেকদিন আগে। আমি সেখানে যাই নি কখনও। আমাদের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় থাকতেন সেখানে। বাবা তাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন মাঝে মাঝে।

বাবা একটা আশ্চর্য কথা বলেছিলেন। এখনও নাকি মহারাজের দরবার বসে। একবার তিনি অন্ধকার রাতে ঘনা গ্রামে তাঁর আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। নৌকো থেকে নেমে পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে ঘনা গ্রামে পেঁছিতে হয়। বাবা অন্ধকারে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল গ্রামের একটি লোক। বাবা জিজ্ঞেস করলেন—"ওখানে কি হচ্ছে?"

"মহারাজের দরবার বসেছে। ওদিকে যাবেন না। ও দরবার মাঝে মাঝে বসে। তারপর আপনি মিলিয়ে যায়।"

বাবা বললেন—"চল না, একটু এগিয়ে দেখি—"

"ও ভুতুড়ে কাণ্ড মশাই। যাবেন না—"

"দেখিই না—"

"তবে আপনি যান, আমি চললাম।"

বাবা সেই আলোকিত দরবারের দিকে এগুতে লাগলেন। কিন্তু সরে সরে যেতে লাগল সেটা। কিছুতেই তার কাছে আর পেঁছিতে পারলেন না বাবা। শেষে মিলিয়ে গেল সেটা।

এ গল্প বাবার মুখ থেকে শুনেছিলাম। এও অনেকদিন আগেকার কথা। আমার বাবা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেছেন। আমি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের কথা বলছি। তখন আমার বয়স বত্রিশ বছর। এম. এ. পাস করে ভ্যারাণ্ডা ভেজে বেড়াচ্ছি। চারটি বোনের বিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি। কলকাতায় বাবা যে বাড়িটি করেছিলেন সেটি বিক্রি করতে হয়েছে। আমি নিঃস্ব অবস্থায় এক দূরসম্পর্কের পিসীর বাড়িতে আছি। তাঁর এক বোম্বেটে ছেলেকে পড়াই। আর দিনরাত চেষ্টা করি কি করে একটা চাকরি জোটে। কিছুতেই জুটছিল না। আমার মুরুব্বি আমার বাবার বন্ধু সনাতনবাবু। তিনি মাড়োয়ারি মহলে ফাটকা খেলে বেড়ান। মাড়োয়ারি বন্ধুও আছে অনেক। তিনি হঠাৎ একদিন বললেন—"তুই যদি পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় করতে পারিস তাহলে রামঅওতারবাবুর গদিতে তোকে কেশিয়ার করে দিতে পারি। পাঁচ হাজার টাকা জমা না দিলে ও চাকরি তাঁরা দেবেন না। তাঁদের কেশিয়ারটি মারা গেছেন। তাঁরা একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছেন। আমি বললে তোর চাকরিটি হয়ে যাবে। তুই পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় কর—। মাইনে দুশো টাকা। ভালো চাকরি। রামঅওতার সুতোর ব্যবসা করে। খুব ভালো লোক।"

আমার হাতে তখন পাঁচটি টাকাও নেই। পাঁচ হাজার টাকা কোথায় পাব। ধারের চেষ্টা করতে লাগলাম। আমাকে ধারই বা দেবে কে। অত টাকা ধার দেবার মতো

বন্ধুও আমার ছিল না। একজন ছিল। তাকে বললাম, মাসে একশ টাকা করে দিয়ে শোধ করে ফেলব। সে মিছে কথা বলল—এখন আমার হাতে অত টাকা নেই। একজন কুশীদজীবী বললেন, গহনা বন্ধক না রাখলে তিনি টাকা দেবেন না। বাবার বন্ধু সনাতনবাবুকে বললাম। তিনি বললেন—"মহারাজের দরবার থাকলে পেতিস টাকা। কিন্তু সেসব দরবার আর নেই। মহারাজের দরবারের গল্পটা জানিস তো?"

"জানি।"

সেদিন রাতে যখন শুলাম তখন মহারাজের দরবারের কথাই বারবার মনে পড়তে লাগল। বাবার কাছে যে সব গল্প শুনেছিলাম, তাই মনে পড়তে লাগল। মনে হোল সত্যি কি মহারাজের দরবার ছিল?

ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখলাম একটা—যেন আমি মহারাজের দরবারে গেছি। চারিদিকে মশালের আলো। কোথাও অন্ধকার নেই। রাজছত্রের তলায় বসে আছেন সিংহ-প্রতিম মহারাজ। তাঁর সামনে একজন ওস্তাদ দরবারী কানাড়া আলাপ করছেন। অনেক লোক নিস্তব্ধ হয়ে শুনছে। মাঠের একধারে ভুরিভোজন হচ্ছে। সারি সারি লোক খাচ্ছে। দীয়তাং ভুজ্যতাং কাণ্ড। আর একটু দূরে দুজন পালোয়ান কুস্তি লড়ছে। চারদিক কিন্তু নীরব নিস্তব্ধ। ওস্তাদজির ডানদিকে সারি সারি বসে আছে প্রার্থীর দল। তাদের মধ্যে আমিও আছি। ওস্তাদজির আলাপ যখন শেষ হল, তখন আমি এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করে বললাম—আমার পাঁচ হাজার টাকার নিতান্ত প্রয়োজন। টাকা জমা না দিলে চাকরি হবে না। মহারাজ ইঙ্গিত করলেন। তার নায়েব প্রকাণ্ড একটা খেরোর থলি আমার হাতে এনে দিলেন। খুব ভারী।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল সনাতনবাবুর ডাকে।

"উঠে পড়। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে গেছে। তোমার নামে একটা লটারির টিকিট কিনেছিলাম। পেয়ে গেছি পাঁচ হাজার টাকা। নিয়ে এসেছি টাকাটা। চল রামঅওতারের কাছে যাই।"

সবিস্ময়ে দেখলাম স্বপ্নে যে খেরোর থলি দেখেছিলাম ঠিক সেই রকম থলি সনাতনবাবুর হাতে। তিনি আমার বিমূঢ় দৃষ্টি দেখে বললেন, "পরশু দিন 'চেক' পেয়েছিলাম। কাল ক্যাশ করিয়ে নগদ টাকা এনেছি। রামঅওতার নগদ টাকাই পছন্দ করে। চল –"

আমার মনে হল এ টাকা মহারাজের দরবার থেকেই এসেছে।

নগেন

নগেন আমার বাল্যবন্ধু। বাবা-মা ছেলেবেলাতেই মারা গিয়েছে। এক বিধবা মাসীর কাছেই মানুষ। অর্থাভাবে লেখাপড়া বেশি দূর শিখতে পারে নি। পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে একটা খোলার ঘরে উঠে গিয়েছিল। তার বাড়ি বিক্রির টাকাটা আমিই একটা ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে টাকাও শেষ পর্যন্ত সব খরচ হয়ে গিয়েছিল। অতি কষ্টে দিন চলত নগেনের। আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত। আমি

যথাসাধ্য সাহায্য করতুম তাকে। মাঝে অনেকদিন আসে নি সে। হঠাৎ সেদিন এসে হাজির। মাথার চুল উসকো খুসকো। গায়ে ছেঁড়া জামা, পায়ে ছেঁড়া চপ্পল। মুখ হাস্যোদ্ভাসিত। এসেই বললে, "ওরে ভুতো, এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। আমি ভারতের সম্রাট হয়েছি—"

আমি তো অবাক।

সে আমার দিকে সহাস্য দৃষ্টি তুলে মুচকি হেসে বললে, "তোর দুঃখ আমি আগে দূর করব।"

পকেট থেকে একটা চেকবুক বের ক'রে বললে, "এই নে, তোকে পঞ্চাশ লাখ টাকা দিলাম এখন। পরে আরও দেব—"

আমি জানি তার ব্যাঙ্কে কিছু নেই। কিন্তু চেকবুকে একখানি মাত্র পাতা ছিল। দেখলাম তাতেই সে আমার নামে পঞ্চাশ লাখ টাকার একটা চেক লিখে এনেছে। চেকটা আমার হাতে দিয়ে সে আবার বলল, "তুই এবার বিয়ে কর, ভাল বাড়ি কর একটা। তোকে এ বাড়িতে মানায় না। তোর বিছানার চাদর এত ময়লা? তোকে মখমলের বিছানার চাদর কিনে দেব আমি। তোর ব্যবস্থা করে তারপর সারা ভারতের ব্যবস্থা করব। সব ঠিক করে দেব। একটা গরীব থাকবে না, সব্বাই চাকরি পাবে। বিছানার চাদরটা বিশ্রী দেখাচ্ছে, উঠিয়ে ফেল এটা।"

আমার বিছানার চাদরটা টেনে বিছানা থেকে তুলে ফেললে।

আমি পাশের ঘরে গিয়ে ডাক্তার সেনকে ফোন করলাম। ভাগ্যক্রমে তিনি বাড়িতে ছিলেন। আমার বাড়ির কাছেই তাঁর বাড়ি।

"আপনি এখুনি একবার আসুন। মহা বিপদে পড়েছি—"

তিনি বললেন, "যাচ্ছি। কী হয়েছে?"

"এলেই বুঝতে পারবেন।"

ফিরে এসে দেখি নগেন আরও উত্তেজিত হয়েছে। আমার ফুলদানীটা দেখিয়ে বলল, "এ ফুলদানী কি তোর ঘরে মানায়? আমি সোনার ফুলদানী করিয়ে দেব তোকে। সোনার—রিয়েল গোল্ডের—তুই ফোনে কথা কইছিলি কার সঙ্গে?"

"ডাক্তারবাবুকে ডাকলাম। তোর শরীরটা ভাল নয়। বস ওই চেয়ারটায়—"

"আমার শরীর খুব ভাল আছে। আমি সম্রাট। ভারতের সম্রাট, সব ঠিক করে দেব। সোনার ভারত গড়ব—"

"বস না একটু—"

"আমি সম্রাট, আমি সিংহাসনে বসব—"

ডাক্তারবাবু এসে পড়লেন। তিনি এসেই বুঝলেন নগেন পাগল হয়ে গেছে। বললেন, "ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।"

চীৎকার করে উঠল নগেন।

"হাসপাতালে? আমি দিল্লী যাব।"

"আপনার চাকরটাকে ডাকুন—"

ডাক্তারবাবু নিজের ড্রাইভারকে ডাকলেন। তারপর তাকে জোর করে ধরে কাপড় দিয়ে হাত-পা বেঁধে নিজের মোটরে করে নিয়ে চলে গেলেন হাসপাতালে।

নগেন ক্রমাগত চীৎকার করতে লাগল, "আমি যাব না—যাব না, কিছুতেই যাব না—"

পরদিন ডাক্তার সেনকে ফোন করলাম, "নগেন কেমন আছে ?"

"ভাল আছে ; ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে হয় ওটা টেম্পোরারি ইনস্যানিটি। মাসখানেকের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবে। চিন্তার কোন কারণ নেই—"

মাসখানেক পরে নগেন ফিরে এল একদিন। এসেই আমার পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে হু হু করে কাঁদতে লাগল।

"কেন আমায় সারিয়ে দিলি তুই। আমি সম্রাট হয়েছিলাম। ফের গরীব হয়ে গেলাম। কেন আমাকে সারিয়ে দিলি। কেন আমাকে সারিয়ে দিলি—"

রোদ-মেঘের খেলা

ভাদ্র মাস। রোদ আর বৃষ্টির খেলা চলছে। সকালবেলা চমৎকার রোদ উঠেছিল। আশা হয়েছিল মনে—তাহলে ও আসতে পারবে ঠিক। গড়িয়া থেকে আসা সহজ নয় তো। আমি শ্যামবাজারে তিনতলায় একটা ফ্ল্যাট নিয়ে একাই থাকি। একটা ঠিকে চাকর ছাড়া আমার আর কেউ নেই। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হয়েছি। মামারা মানুষ করেছিলেন। মাতুল বংশও ধ্বংস হয়েছেন। দুই মামা মারা গেছেন ব্রিটিশ আমলে পুলিসের গুলিতে। আন্দামান জেলে। আমি তখন সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছি এম. এ. পাস করে। মীনা তখন স্কুলে পড়ে। মীনার সঙ্গে আমার তখন আলাপ হয় নি। ও যখন বি. এ. তে ইংলিশ অনার্স নিলে তখনই আমি ওর প্রাইভেট টিউটার হয়ে নিযুক্ত হলাম। আমার মামারা টেরারিস্ট তাই আমি ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়েও চাকরি পাই নি। একটি টিকটিকি (স্পাই) সর্বদা আমার পিছু পিছু ঘুরত। শুনেছিলাম সেও মামাদের দলে ছিল, কিন্তু ধরা পড়ে রাজসাক্ষী হয়ে যায়। অনেক লোকের ফাঁসী এবং দ্বীপান্তর এর তদ্বিরেই হয়েছে। লোকটি আমার পিছনেও ঘোরে। নানা রকম বেশে দেখেছি ওকে। ছুঁচাল ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি। লম্বা গোঁফ-দাড়ি, কখনও মাথায় বাবরি, গলায় কণ্ঠী, কখনও ক্লীন সেভড। কিন্তু একটি জিনিস ও লুকোতে পারত না। ওর নাকের ডগাটি বাঁকা ছিল। বোধহয় কারো ঘুষি খেয়ে বেঁকে গিয়েছিল। ওর নাম কি জানতাম না। নিজেই নাম দিয়েছিলাম —বি. এন.—বক্রনাসা।

এ লোকটার কথা এসে পড়ল কেন ? ও, আমার মাতুল বংশের পরিচয় দিতে। হ্যাঁ, আমার তিনকূলে কেউ নেই। উঞ্ছবৃত্তি করে জীবনধারণ করি। অপরের নামে নোট বুক লিখে দি, কাগজে প্রবন্ধ লিখে মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাই। বাংলাদেশের বাইরের কাগজেই প্রায় আমার লেখা ছাপা হয়। বাংলাদেশে আমি কলকে পাই নি। কারণ কোন সম্পাদক মণ্ডলীর চামচে হতে পারি না। বিলেতের কাগজেও

মাঝে মাঝে লেখা ছাপা হয়েছে। ভাল টাকাও দিয়েছে তারা। এদেশে প্রাইভেট টিউশনি করি, নোট বুক লিখি। স্বপাকে রান্না করে খাই। মোটামুটি চলে যায় এক রকম। মীনাকে ভালবাসি। কিন্তু তাকে বিয়ে করবার কথা মনে হয় নি কখনও। আমার টানাটানির সংসারে ওকে আনলে কষ্ট দেওয়া হবে, এই কথাই মনে হয়েছে বার বার। মীনা গরীবের মেয়ে। মা-বাবার অবস্থা তেমন ভাল নয়। মীনার রূপেরও জৌলুষ নেই তেমন। বিদ্যার জৌলুষ কিন্তু আছে। এম. এ., পি. এইচ. ডি। ও যদি ফ্লাট গোছের মেয়ে হত তাহলে ওর পাত্র বহু আগেই জুটে যেত। কিন্তু মুখচোরা লাজুক মেয়ে। অকারণে পুরুষদের কাছে গিয়ে যৌবন হিল্লোলিত করে না। তাই বিয়ে হয় নি। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কলেজে চাকরি করে। ওর এক ভাই থাকে কাশীতে। ওর মা-বাবা কাশীতে গিয়েই থাকতে চান, কিন্তু মীনাকে কে দেখবে—ও একা কি ভাবে বাড়িতে থাকবে—এইসব সমস্যা তাদের কাশী যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। মীনা বলছে—আমি হস্টেলে থাকব তোমরা দাদার কাছে চলে যাও। কিন্তু তার বাবা-মা তাতেও রাজী নন। তাদের ইচ্ছা মেয়েকে একটি সৎপাত্রে দান করে তবে কাশী যাবেন, কিন্তু মনোমত পাত্র জুটছে না। কারণ এদেশে সৎপাত্র নেই। সবাই চায় রূপ, রূপিয়া, গাড়ি, বাড়ি। পাত্রটির খবর নিলেই দেখা যায় সে হয় মাতাল না হয় চরিত্রহীন। লেখাপড়ায় মীনার সমকক্ষ নয়। অধিকাংশই চালিয়াত গোছের।

ইস্ এ কি হল। চারদিক মেঘে ঢেকে এল যে আবার। মেঘ ডাকতে লাগল। তারপরই শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। বেশ জোর বৃষ্টি। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে এগারোটা বেজেছে। মীনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে কি? প্রতি রবিবার সে আমার এখানে খায়। আমি তার প্রিয় কোনও তরকারি রেঁধে রাখি, সেও আমার জন্যে আমার প্রিয় কোন তরকারি রেঁধে আনে। তারপর ও এলে ভাত চড়িয়ে দিই। দুজনে খাই এক সঙ্গে। এ-রকম অনেকদিন থেকেই চলছে। এ রবিবার সে আসবেই। কারণ একটা দরকারী কথার আলোচনা করতে হবে আজ। কিছুদিন আগে রাঁধতে গিয়ে আমার কাপড়ে আগুন ধরে যায়। কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়। বেশী কিছু হয় নি। তবু দিন সাতেক হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। মীনা রোজ আমাকে দেখতে যেত হাসপাতালে।

একদিন বলে বসল—"আর আমি আপনাকে একা থাকতে দেব না।"

"দোকা হব কি করে?"

"আমি থাকব আপনার কাছে—"

"সে কি।"

"হ্যাঁ, আমি ঠিক করে ফেলেছি। বাবা-মা কাশী চলে যান—"

তার কণ্ঠস্বরে সেদিন যে দৃঢ়তা লক্ষ্য করলাম তাতে অবাক হয়ে গেলাম আমি।

"আমার মত না নিয়েই তুমি ঠিক করে ফেললে—"

"আপনি যদি আপত্তি করেন তাহলে অবশ্য হবে না—"

মাথা হেঁট করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল সে। একটু পরে লক্ষ্য করলাম সে কাঁদছে। মীনাকে কখনও কাঁদতে দেখি নি।

বললাম—"আচ্ছা, কাল তো বাড়ি ফিরছি, তখন ভেবে দেখব। আসছে রবিবার তুমি এসো। সেই দিনই আমার উত্তর তোমায় জানাব।"

আজ সেই রবিবার। মীনা নিশ্চয় আসবে! কিন্তু এত বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে যাবে যে। একটু পরেই কিন্তু বৃষ্টিটা থেমে গেল। আর একটু পরে রোদও উঠল একটু।

তারপরই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আপাদমস্তক ভিজে মীনা এসে ঘরে ঢুকল। তার হাতে একটি বাটি খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া।

"আপনি এখনও খান নি?"

"তুমি না এলে কি করে খাব? ইস, একেবারে ভিজে গেছ। পাশের ঘরে গিয়ে কাপড়টা ছাড়। আমার শুকনো ধুতি আছে। ইনি কে?"

একটি ন্যুব্জ দেহ বৃদ্ধও কাশতে কাশতে তার সঙ্গে এসেছিল।

"ইনি আপনার বাড়ির নম্বর খুঁজছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করাতে আমি বললাম আমি সেইখানেই যাচ্ছি, চলুন। তখন উনি আমাকে ওর মোটরে তুলে নিলেন।" মীনা পাশের ঘরে কাপড় ছাড়বার জন্য চলে গেল।

ভদ্রলোক ভিতরে এসে বসতেই লক্ষ্য করলাম তাঁর নাকটা বাঁকা। বি. এন. কে মনে পড়ল। জরার প্রভাবে গাল টাল তুবড়ে গেছে। গলার চামড়া ঝুলছে।

"আপনি কে?"

"আমি একজন মহাপাপিষ্ট—"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার পরিচয় দিন—"

"ওই আমার সত্য পরিচয়।"

"আমার কাছে কি প্রয়োজন?"

"আপনার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে এসেছি—"

"কেন?"

"আমি এককালে অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলাম। শ্রীঅরবিন্দের সামনে বুকের রক্ত দিয়ে মা কালীর সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—যে স্বদেশ উদ্ধারের জন্য প্রাণ পণ করলাম। আপনার দুই মামাও আমাদের সঙ্গে ছিল। তারা দুজন পুলিস ইনস্পেকটারকে হত্যা করেছে। আদালতে কিন্তু সেটা প্রমাণ হয় নি। আমিও ছিলাম তাদের সঙ্গে। আমি প্রলোভনে পড়ে এবং মারের চোটে রাজসাক্ষী হয়ে গেলাম। আমার জন্যেই তারা আন্দামানে চালান হয়ে গেল। বীর ছিল তারা। সেখানেও তারা ব্রিটিশ পুলিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাদের সেখানে গুলি করে মারা হয়। আমি কিন্তু টেগার্ট সাহেবের খুব প্রিয় পাত্র হয়ে গেলাম। অনেক স্বদেশী ছেলেকে ধরিয়ে দিয়েছি। অনেক বাড়িতে হাহাকার তুলেছি। অনেক টাকা কামিয়েছি। টেরারিস্টরা আমাকে শাস্তি দিতে পারে নি। একজনের ঘুষিতে আমার নাকটা বেঁকে গেছে খালি। কে সে জানেন? আপনার বড় মামা। তবে ভগবান কিন্তু আমায় রেহাই দেন নি। আমার চারটি উপযুক্ত ছেলে একে একে মারা গেছে। আমার স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়েছে।" এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক খুব কাশতে লাগলেন।

"এত কাশছেন কেন?"

"লাংসে ক্যানসার হয়েছে। আমি অনেক কষ্টে আপনার ঠিকানাটা যোগাড় করেছি—"

শুনতে পেলাম পাশের ঘরে মীনা স্টোভ জেবলে ভাতের জল চড়াচ্ছে।

"আমি আপনার কি করতে পারি বলুন—"

"এই মহাপাপিষ্ঠকে ক্ষমা করুন। আপনার পা দুটো আমার মাথায় চাপিয়ে দিন। আর বুকে। বুকে বড় ব্যথা—"

ভদ্রলোক হঠাৎ আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

বিব্রত হয়ে পড়লাম খুব।

"ছি ছি, ও কি করছেন। বসুন, উঠে বসুন—"

ভদ্রলোক আমার পায়ে মাথা ঠুকতে লাগলেন। অনেক কষ্টে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে ভদ্রলোককে তাঁর গাড়িতে তুলে দিয়ে এলাম।

"আপনার নামটি তো বললেন না?"

"আমার নাম হওয়া উচিত ছিল কুলাঙ্গার। কিন্তু আমার বাবা নাম রেখেছিলেন কুলপ্রদীপ। গভর্ণমেণ্টের খাতায় কিন্তু আমার অনেক নাম। সত্যিই ক্ষমা করেছেন তো? বলুন, বলুন—"

ভদ্রলোক আমার দুহাত ধরে কাঁদতে লাগলেন।

বললাম, "করেছি। মানুষ অবস্থার বিপাকে পড়ে অনেক সময় অনেক কুকাজ করে—"

"না, না, আমি ইচ্ছে করে পয়সার লোভে করেছি। আমি মহাপাপিষ্ঠ।"

ঠাস ঠাস করে নিজের গালে চড় মারলেন। অতি কষ্টে তাকে মোটরে তুলে দিলাম। দেখলাম একজন বলিষ্ঠ পাঞ্জাবী ড্রাইভার তার গাড়ি চালাচ্ছে।

উপরে উঠে এলাম।

"আমার জন্যে কি তরকারি এনেছ আজ?"

"সুক্তো। আপনি তো সুক্তোই ভালবাসেন—"

"আমিও তোমার প্রিয় তরকারি রেঁধে রেখেছি।"

"কি?"

"পোস্ত।"

মীনার সঙ্গে বিয়ের একমাস পরে এটর্নির বাড়ি থেকে একটা চিঠি পেলাম। তিনি লিখছেন শ্রীযুক্ত কুলপ্রদীপ রায় পনেরো দিন আগে মারা গেছেন। তিনি আমাকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গেছেন। বালিগঞ্জের একখানা বাড়ি, ব্যাঙ্কের দশহাজার টাকা, আর লাইফ ইনসিওরেন্সের পঞ্চাশহাজার টাকা আমাকে উইল করে দিয়ে গেছেন তিনি।

তুমি ও আমি

তোমার চিঠি এসেছে। উত্তপ্ত চিঠি। "তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে—দেবেই, নিশ্চয় দেবে। এখনও পেলাম না। তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে ভাবতে পারি নি—।"

তুমি একটা ছোট গল্প চেয়েছিলে। ছোট গল্প কিন্তু মাথায় আসছে না। মহা

মুশকিলে পড়েছি। ভাবছিলাম বসে যদি একটা প্লট এসে যায় মাথায়। প্লট এল না। এল আমার চাকর অর্জুন। বলল—পুরোনো ট্রাংকটা কি এখুনি পরিষ্কার করব ?

বললাম—কর।

পুরোনো ট্রাংকে পুরোনো বাক্সে চিঠি আছে অনেক। অর্জুনকে বলেছিলাম ওগুলো ফেলে দিয়ে ট্রাংকটা খালি কর।

অর্জুন ট্রাংকটা আমার সামনে এনে খুলে বার করতে লাগল গোছা গোছা চিঠি। তার মধ্যে হঠাৎ নজরে পড়ল তোমার একটা পুরোনো চিঠি রয়েছে। সেই বেগুনী রঙের কালী আর ফিকে নীল রঙের খাম—ভুল হবার নয়। খুলে পড়লাম। দেখলাম এ চিঠিও বেশ উত্তপ্ত।

"তোমার জন্যে নিজের হাতে মোগলাই পরোটা করেছিলাম। তোমার অপেক্ষায় বসেছিলাম রাত দশটা পর্যন্ত। কিন্তু তুমি এলে না। প্রতিজ্ঞা করলাম—আর কখনও তোমাকে নিমন্ত্রণ করব না, চিঠিও লিখব না।"

চিঠিটা বছর তিনেক আগে লেখা।

তারপর তুমি বহুবার নিমন্ত্রণ করেছো আমাকে। বহুবার চিঠিও লিখেছ। অর্থাৎ তুমিও প্রতিজ্ঞা রাখতে পার নি। প্রতিজ্ঞা সব সময় রাখা যায় না। সমস্ত ব্যাপারটা টুকে তোমাকে পাঠাচ্ছি। জানি না এটা ছোট গল্প হল কি না। এবং তোমার রাগ কমল কি না।

তিস্তা

তিস্তা কিছুতে খাবে না। দুধ খাবে না, ভাত খাবে না, লুচি, রুটি, সন্দেশ কিছু খাবে না। তার লোভ কেবল আচারে। চাকর অর্জুন তাকে ভয় দেখায়—ওই কোলা ব্যাঙ আসছে শিগ্গির খেয়ে নাও। তিস্তার বয়স দু'ছর।

সে আধো-আধো কথায় জিজ্ঞেস করে—কই কোলা ব্যাঙ ?

ওই জানলা দিয়ে আসবে।

তিস্তা ছুটে পালিয়ে যায়। দুধ খায় না। ভাত খাওয়াতে বসে অনিমা দি। তিস্তা কিছুতেই মুখে তোলে না ভাত। অনিমাদি বলে—ওই জুজুবুড়ী আসছে। শিগ্গির খেয়ে নাও—

তিস্তা জিজ্ঞেস করে—কই জুজু বুড়ী ?

ওই জানলা দিয়ে আসবে।

তিস্তা উঠে পালিয়ে যায়। ভাত খায় না। তিস্তার মা মোহনভোগ নিয়ে সাধাসাধি করছে।

খা না একটু—

তিস্তা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

খাবে না—

হালুম বুড়ো আসবে এখুনি—

কই হালুম বুড়ো ?

ওই জানলা দিয়ে আসবে।

ভাঙা জানলাটা দেখায় তার মা।

পালিয়ে যায় তিস্তা। খায় না।

কোলা ব্যাঙ, জুজু বুড়ী আর হালুম বুড়ো এই তিনটে জীব কি রকম? ওই ভাঙা জানলাটার ওপারে তারা থাকে? কেমন দেখতে? কৌতূহল হয় তিস্তার। ভয়ও করে। একদিন ছবি টাঙাবার জন্যে অর্জুন একটা ছোট টেবিল নিয়ে এল জানলাটার ধারে। ওই ভাঙা জানলাটার ওপরই ছবি টাঙানো হল একটা। টেবিলটা কিন্ত অর্জুন তখনই সরিয়ে নিয়ে গেল না। দুপুর বেলা। সবাই ঘুমোচ্ছে। তিস্তার ঘুম ভেঙে গেল। তার পিসি সেইদিনই তাকে একটা খেলার বন্দুক কিনে দিয়েছে। সেইটে নিয়েই ঘুমেয়েছিল সে। পিসি তাকে বলেছিল—এই বন্দুক দিয়ে তুমি কোল ব্যাঙ, হালুম বুড়ো, জুজু বুড়ী সবাইকে তাড়িয়ে দিতে পারবে।

বন্দুকটি হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠল তিস্তা। ভাঙা জানলার কাছে গিয়ে টেবিলটার পাশে দাঁড়াল। ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল একটু। তবু সাহস সঞ্চয় করে সে উঠে পড়ল টেবিলের উপর বন্দুকটা নিয়ে। ভাঙা জানলাটার ফাঁক দিয়ে দেখল দেওয়ালের উপর গুটিসুটি হয়ে একটা বেড়াল বসে আছে।

তুমি কি কোলা ব্যাঙ?
তুমি কি জুজু বুড়ী?
তুমি কি হালুম বুড়ো?
বিড়াল বলল—মিউ।

হরু নিরক্ষর

স্থান একটি পল্লীগ্রাম। গ্রামের মুকুটমণি বিলাসবাবুর বাড়ি। রাজনীতি ক্ষেত্রে, বাণিজ্যের জগতে তাঁহার বিরাট নাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. উপাধিও আছে তাঁহার। দোর্দণ্ড প্রতাপ ব্যক্তি। সেদিন তাঁহার বাড়িতে অনেক বন্ধু-বান্ধব আসিয়াছেন। একটি ঘরে খিল দিয়া আড্ডা জমাইয়াছেন তাঁহারা। একটি সুকণ্ঠী যুবতী রবীন্দ্র সংগীত গাহিতেছেন। মদ চলিতেছে।

বাহিরের ঘরে ইলেকট্রিক বেল বাজিয়া উঠিল। দারোয়ান কপাট খুলিয়া দেখিল—হরু গোয়ালা আসিয়াছে।

"আজ বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।"

"বাবু কিন্তু আজ আমাকে আসতে বলেছিলেন।"

"আজ দেখা হবে না।"

হরু চলিয়া গেল।

হরুর বউ উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"টাকা পেলে?"

"না আজ দেখা হ'ল না।"

"তিন মাসের দুধের দাম বাকি। আমাদের চলবে কি করে ?"

হর চুপ করিয়া রহিল।

হরর বউ বলিল—"কাল থেকে দুধ বন্ধ করে দেব।"

হর মৃদু হাসিয়া বলিল—"পাগল। তা কি হয়। বাড়িতে তিনটে শিশু। তারা খাবে কি। কারো মায়ের বুকে দুধ নেই—"

"আমাদের টাকা না দিলে চলবে কি করে—"

"দেবে, দেবে, টাকা দেবে। ব্যস্ত হও কেন—" হর হাসি মুখে স্ত্রীর দিকে চাহিল।

হর নিরক্ষর।

বীরেনবাবুর গঙ্গাস্নান

বীরেনের সঙ্গে বাল্যকালে এক স্কুলে পড়েছিলাম। তারপর আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। ত্রিশ বছর পর শিলং শহরে হঠাৎ শুনলাম বীরেন এখানকার স্কুলে মাস্টার হয়ে এসেছে। আমি শিলং শহরে ওকালতি করছি তখন। খোঁজ নিয়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা তার বাড়ি গেলাম। শুনলাম সে বাড়িতে নেই। পরদিন স্কুলে ফোন করলাম। ফোনে পেলাম তাকে। পরিচয় দিতে সে আমাকে চিনতে পারল, দেখলাম আমাকে ভোলেনি সে। বললাম—"আজ সন্ধ্যায় তোমার বাড়িতে যাব। বাড়িতে থেকো।"

"সন্ধ্যার সময় এসো না। সে সময় আমি গঙ্গাস্নান করতে যাই। রবিবার সকালে এসো—"

"গঙ্গা-স্নান ? শিলং-এ গঙ্গা কোথায় ?"

"আমি যে গঙ্গায় স্নান করি সে গঙ্গা সব দেশে আছে—"

"তার মানে ?"

"আমি রোজ সন্ধ্যায় লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনা করি। গঙ্গাস্নানের পুণ্য এবং আনন্দ লাভ হয়—"

এর উত্তরে কি যে বলব ভেবে পেলাম না।

স্রষ্টা

গোল করে পাকানো সাদা কাগজটি আলমারির ভিতর অনেকদিন ছিল। বেশ নিশ্চিন্ত আরামে ছিল সে। একদিন হঠাৎ চিত্রকর বার করল তাকে। রবার ব্যাণ্ডটা খুলে ফেলে গোল করে পাকানো কাগজটা চওড়া করে রাখল টেবিলে।

এ কি—এ কি করছেন আপনি ? চীৎকার করে উঠল কাগজটা। কিন্তু সে চিৎকার চিত্রকরের কানে গেল না। কাগজের ভাষা মানুষে শুনতে পায় না। চিত্রকর কাগজটা তুলে নিয়ে একটা কালো বোর্ডের উপর সেটাকে রেখে চার কোণে কাঁটা মেরে টান করে আটকে দিল সেটাকে। তারপর !

চীৎকার করতে লাগল কাগজটা।

চিত্রকরের ভ্রুক্ষেপ নেই।

তারপর একটা তুলিতে খানিকটা কালো রং নিয়ে মাখিয়ে দিল কাগজের উপর।

কাগজ প্রতিবাদ জানাল—আমার সাদা রংকে তুমি কালো করছ কেন?

প্রতিবাদ শুনতে পেল না চিত্রকর।

সে আর একটা তুলিতে বাদামী রং নিয়ে ছপ্ ছপ্ করে লাগাতে লাগল আবার।

এ কি—এ কি কাণ্ড!—আর্তনাদ করে উঠল কাগজ।

চিত্রকর নির্বিকার।

তারপর সে নীল, সবুজ, হলুদ, গোলাপী নানা রকম রং পরপর লাগিয়ে যেতে লাগল।

কাগজের আর্ত হাহাকার তার কানেই এল না। ঘণ্টা দুই ধরে ছবি আঁকা চলল। কাগজের হাহাকার, অনুনয়, আবেদন—কোন কিছুই বিচলিত করল না স্রষ্টাকে। আঁকা যখন শেষ হোল তখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সে ছবিটাকে। পছন্দ হল না। ছবিটা বোর্ড থেকে নামিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিল সে।

তারপর আর একটা কাগজ নিয়ে এল।

সিঁড়ি

সৌরভ সেন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁর অদ্ভুত প্রকৃতির খেয়ালে চলবারও সুযোগ পেয়েছিলেন জীবনে। কারণ তাঁর টাকার অভাব ছিল না। তাঁর বাবা মা দুজনেই যখন মারা গেলেন এক বছরের মধ্যে তখন সৌরভের বয়স দশ বছর। অভিভাবক হবার মতো নিকট আত্মীয় স্বজন কেউ ছিল না। সৌরভকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিল তাদের চাকর জগনু। জগন্নাথের এ সংক্ষিপ্ত নামকরণ সৌরভই করেছিল। সেই নামটিই টিঁকে গেছে। সৌরভের বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর জগনুই গিয়ে পিতৃবন্ধু জজ যোগেনবাবুকে খবর দেয়। তিনিই এসে সৌরভের বিশাল সম্পত্তির ব্যবস্থা করে দেন। একজন প্রবীণা গৃহ-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন সন্তানহীনা বিধবা, সেকালের এম. এ. পাস। একটি কলেজে প্রফেসারি করতেন। প্রফেসারি থেকে রিটায়ার করে বসেছিলেন, যোগেনবাবু তাঁকে মাসিক পাঁচশো টাকা বেতনে নিযুক্ত করলেন এবং বললেন, আপনি ওই বাড়িতে গিয়ে থাকুন। সৌরভকে মানুষ করুন। ওকে এখন স্কুলে দিতে চাই না। ও প্রাইভেটে আপনার কাছে পড়েই ম্যাট্রিক পাস করুক। তারপর একেবারে কলেজে পড়বে।

ভদ্রমহিলার নাম ছিল স্নেহপূর্ণা দেবী। তিনি যোগেনবাবুকে শুধু একটি প্রশ্ন করেছিলেন, আইনত আপনি কি ওর অভিভাবক?

যোগেনবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ। ওর বাবা গৌরব আমার সহপাঠী ছিল। ওর স্ত্রী যখন মারা গেল এবং তারপর যখন ওর নিজের ক্যানসার ধরা পড়ল তখন ও একটি উইল করে আমাকে ওর অভিভাবক করে গেছে। সৌরভের বয়স যখন চব্বিশ বছর হবে তখনই ও বাবার সম্পত্তি পাবে। তার আগে পর্যন্ত আমি অভিভাবক

থাকব। আপনি ওর ভালর জন্য যা উচিত মনে করেন করবেন। টাকার অভাব নেই ওর। ওর বাবা যথেষ্ট রেখে গেছেন, মাসে প্রায় একলাখ টাকা সুদই পায়। তাছাড়া কলকাতায় বাড়িও আছে চার-পাঁচটা। বর্ধমানে ধানের জমিও অনেক। ওর টাকার অভাব নেই। আপনার ওপর ভার দিচ্ছি আপনি ওকে মানুষ করে তুলুন। আপনি ওর মা-বাবার স্থান অধিকার করুন। জগনু তো আছেই।

স্নেহপূর্ণা দেবী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যথাসাধ্য চেষ্টা তিনি করবেন। এবং যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছিলেন তিনি। সৌরভ আঠারো বছর বয়সে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করল তিনটে লেটার এবং স্কলারশিপ নিয়ে। ও লেখাপড়ায় বরাবর ভাল ছেলে ছিল। বরাবর প্রথম বিভাগেই পাস করেছে। ইংরেজীতে এম. এ দিয়েছিল। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। কিন্তু প্রথম বা দ্বিতীয় হতে পারেনি। স্নেহপূর্ণা আশা করেছিলেন ও প্রথম হবে। স্নেহপূর্ণা রোজ ডাইরি লিখতেন। সেই ডাইরিতে একটি আশ্চর্য কথা লিখেছিলেন তিনি—

আমি আজ সৌরভের একটা কথা শুনে বড় বিস্মিত হলাম। ওকে যখন বললাম, আমি আশা করেছিলাম তুই আরও উঁচুতে উঠবি। কিন্তু এ কি হল! সৌরভ উত্তর দিয়েছিল, আমি অনেক উঁচুতে উঠব কিন্তু ঠিক সিঁড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না। আমি শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, সিঁড়ি? কিসের সিঁড়ি? সৌরভ বলল, তা আমিও জানি না ঠিক—

এর পরই স্নেহপূর্ণা দেবী মারা যান। যোগেনবাবু তখনও বেঁচে ছিলেন। তিনি সৌরভকে তার পিতার বিশাল সম্পত্তির মালিক করে দিলেন তারপর। তারপর তিনিও মারা গেলেন।

সৌরভ যখন তার সম্পত্তির পুরোপুরি মালিক হল তখন নানা খেয়ালে মেতে উঠল সে। দিনকতক মাতল ফুল নিয়ে। নানারকম ফুল নিয়ে চমৎকার বাগান করল একটি। তাই নিয়ে মেতে রইল দিনকতক। কিছুদিন পরে কিন্তু তা আর ভাল লাগল না। বেরিয়ে পড়ল দেশ ভ্রমণে। প্রায় বছর দুই ঘুরে বেড়ালো নানা জায়গায়। ইয়োরোপ আমেরিকা চীন জাপান মিশর পারস্য তুর্কিস্থান আরো অনেক জায়গায়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাও ভাল লাগল না। বাড়ি ফিরে এসে সংস্কৃত পণ্ডিত রেখে শাস্ত্র অধ্যয়নে মন দিল। তাও ভাল লাগল না কিছুদিন পরে। সে সিঁড়ি খুঁজছিল। পাচ্ছিল না। তারপর পুরাতন শিলালিপি আর পুরাতন ছবি সংগ্রহ করতে যখন সে ব্যস্ত তখন তার দেখা হল ছবিওয়ালা রতনলাল মুস্তাফির সঙ্গে। রতনলাল একজন গুণী লোক। অশ্লীল ছবি চড়া দামে বিক্রি করাই তার প্রধান ব্যবসা। কিন্তু পৃথিবীর অনেক ভাল ছবির, আশ্চর্য ছবির, অদ্ভুত ছবির খবরও সে রাখে। ভাল ছবির সমঝদার সে একজন। সৌরভ প্রায়ই তার দোকানে যেত। একদিন গিয়ে দেখে তার ঘরে প্রকাণ্ড একটা ছবি রয়েছে। ছবিটা ঘরের মেঝে থেকে ঘরের ছাদ পর্যন্ত লম্বা। চওড়াও প্রায় হাত দুয়েক হবে। আর সেটা আপাদমস্তক কাগজ দিয়ে কাপড় দিয়ে ঢাকা।

নতুন ছবি এসেছে দেখছি একটা—

রতন সসম্ভ্রমে উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল বিকেলে এসেছে—

খোল, দেখি কি রকম ছবি?

খোলা যাবে না স্যার। যিনি চিত্রকর তিনি একজন তিব্বতী লামা বলে মনে হল। এ-ও মনে হল তিনি শুধু চিত্রকর নন, হয় বড় গণৎকার নয় যাদুকর। মোট কথা সাধারণ লোক নন তিনি। তিনি বললেন এ ছবিটা আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। এ ছবির ক্রেতা নিজেই আপনার কাছে আসবেন। দাম বললেন—পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু ছবিটি মোড়ক সুদ্ধ কিনতে হবে। কেনার আগে ছবি দেখতে পাবেন না। বাড়ি গিয়েই দেখবেন। ছবি না দেখেই ছবিটি কিনতে হবে তাঁকে। এ ছবি বিক্রি করে পাঁচ হাজার টাকা যদি পান তাহলে সেটা গরীব দুঃখীদের দান করে দেবেন, তাহলেই আমি পাব—এই বলে সেই অদ্ভুত লোকটা আমাকে নগদ একশো টাকা দিয়ে গেলেন। বললেন, এটা হচ্ছে আপনার কমিশন। আমি আর আসব না। এর ক্রেতা কিন্তু আসবেন এবং এই শর্তেই, অর্থাৎ ছবি না দেখেই ছবিটা কিনে নিয়ে যাবেন। এই বলে সেই গেরুয়া জোব্বা পরা লোকটি চলে গেল।

আশ্চর্য তো! কি ভাষায় কথা বললেন তোমার সঙ্গে?

ইংরেজি—

দেখতে কেমন?

মঙ্গোলিয়ান চেহারা। অনেকটা চীনাম্যানের মতো। চোখ মুখের ভাব কিন্তু গম্ভীর, আর পবিত্র। দেখলে ভক্তি হয়।

সৌরভ দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে। তারপর বলল, ওটা আমিই কিনব। আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। আমি তোমাকে চেক লিখে দিচ্ছি। সৌরভ চেক লিখে দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

রতনলালের কাছে সৌরভ অনেক মূর্তি অনেক ছবি কিনেছে। সৌরভের বাড়ির ঠিকানা তার জানা ছিল।

সৌরভের পাঁচতলা প্রকাণ্ড বাড়ি। লিফ্‌ট আছে। একটু পরে স্বয়ং রতনলাল হাজির হল ছবিটা নিয়ে।

কোথায় রাখবেন? আমি ঠিক করে টাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

পাঁচতলায় আমি শুই। আমার খাটের পায়ের দিকের দেওয়ালটা সম্পূর্ণ ফাঁকা আছে। সেইখানেই টাঙাব ভাবছি।

বেশ তো—

ছবির মোড়ক খুলে দুজনেই মুগ্ধ হয়ে গেল। ছবিটি একটি সিঁড়ির ছবি। পৃথিবী থেকে একসারি সিঁড়ি উঠে গেছে আকাশের দিকে এঁকে বেঁকে, তারপর মিলে গেছে মহাশূন্যে। ওপরে উঠবার জন্য এই রকম সিঁড়িই কি খুঁজছিল সৌরভ? খুঁজছিল। কিন্তু জানত না যে খুঁজছিল। তার অবচেতন মনের ছবিটি অদ্ভুত নিপুণতা সহকারে এঁকেছেন শিল্পী। তার মনে হল এমন অপূর্ব ছবি সে আগে দেখেনি। বাড়ির ঝি চাকর সবাই এসে দেখল ছবিটি। সবাই মুগ্ধ হল। সবাই যখন চলে গেল সৌরভ গেল না।

রাঁধুনি এসে বললে, খাবার দেওয়া হয়েছে বাবু—

খাবার এইখানেই নিয়ে আয়—ছবির সামনে বসেই সে খাবার খেল। তারপর ছবির দিকে চেয়েই বসে রইল সে। সমস্ত দিন বসে রইল। ছবির ভিতর আরও কি যেন প্রত্যাশা করছিল সে। সন্ধ্যার একটু আগে উত্তেজিত হয়ে সে দাঁড়িয়ে উঠল চেয়ার

থেকে। সি'ড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, সীমা যেখানে অসীমে হারিয়ে গেছে, ঠিক সেইখানেই একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনে হল। ধরা-অধরার মাঝখানে অপরূপ মেয়ে একটি। তার দিকে চেয়ে হাসছে। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসতে লাগল ক্রমশ। সৌরভ উঠে আলমারি থেকে পাঁচশো ওয়াটের বড় বাল্ব বার করে লাগিয়ে দিলে একটা টেবিল ল্যাম্পে, তারপর সেটাকে বে'কিয়ে দিলে যাতে সমস্ত আলোটা ছবির ওপর পড়ে।

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ছবিটা। সৌরভ লক্ষ্য করল মেয়ের মূর্তি'টি আর একটু বড় হয়েছে। তার মনে হল মেয়েটি যেন সি'ড়ি বেয়ে নেমে আসছে।

রোমাঞ্চিত হয়ে বসে রইল সে। মেয়েটি সত্যিই নেমে আসছিল, সি'ড়ির বাঁকে যখন আসছিল তখন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল খানিকক্ষণের জন্য। বাঁক ঘুরলেই দেখা যাচ্ছিল। আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল মূর্তি'টা।

চাকরটা এসে প্রশ্ন করল, খাবার আনব ?

না। আমি রাতে কিছু খাব না। তোমরা কেউ ওপরে এসো না এখন। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সে আলোকিত ছবিটির দিকে চেয়ে নেমে গেল। কপাটটা ভেজিয়ে দিলে সৌরভ, তারপর চেয়ারে এসে বসে চেয়ে রইল ছবিটার দিকে। হ্যাঁ, নামছে। আরও অনেকখানি নেমেছে। কি চমৎকার রূপ। মনে হয় নারী নয়, যেন দেবী। একটু পরে সে আরও নেমে এলো। তারপর দেখতে দেখতে নেমে এলো তার ঘরের মেঝেতে।

এসেই বলল, চল—

কোথায়—

ওই সি'ড়ি বেয়ে ওপরে যাবে না ? তোমাকে যে অনেক ওপরে উঠতে হবে। তুমি তো মনে মনে এই সি'ড়িই খুঁজছিলে। চল—

চলুন—

মেয়েটি ঘুরে আবার সি'ড়ির ওপর উঠতে শুরু করল। তার অনুসরণ করল সৌরভ। সে আর ফেরেনি।

পরদিন সকালে খবরটা জানা গেল। চাকর খাবার দিতে এসে দেখে সৌরভ নেই। বাল্বটা জ্বলছে। ছবিতে সি'ড়ির ছবিটাও নেই। একটা সাদা ক্যানভাস রয়েছে খালি।

গল্প লেখার গল্প

গল্প কি কৌশলে লিখি তা আমি নিজেই জানি না। আকাশে যেমন মেঘ ভেসে আসে, গাছে যেমন ফুল ফোটে, তেমনি গল্পও মনে আপনি জাগে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এ হচ্ছে ঊনপঞ্চাশ বায়ুর লীলা। একটা বিশেষ মুহূর্তে কেন একটা গল্পের প্লট হঠাৎ মাথায় আসে তা বলা খুবই শক্ত। আমার মনে হয় যিনি আসল গল্পলেখক তিনি নেপথ্যে বাস করেন। তাঁর যখন গল্প লেখার ইচ্ছা হয়, তিনি আমাকে দিয়ে গল্পটা লিখিয়ে নেন। এইটুকু শুধু বলতে পারি, গল্পের প্লটটা হঠাৎ মাথায় আসে এবং কে যেন ঘাড় ধরে সেটা লিখিয়ে নেন। কে সেই নেপথ্যবাসী জানি না। সমাজে যখন ঘোরাফেরা করি তখন নানারকম নর-নারী দেখতে পাই, তাঁদের ছাপ আমার

মনের উপর পড়ে। শুধু পড়ে না, কল্পনা-রসে জারিত হয়ে সেগুলি চিত্ররূপে রাখা থাকে আমার মনের অবচেতনলোকে। এই নেপথ্যবাসী কবি যখন গল্প সৃষ্টি করতে চান তখন সেই চিত্রশালা থেকেই তিনি চিত্র সংগ্রহ করেন। তিনি খেয়ালী কবি। সব সময়ে যে বাস্তব চিত্র ব্যবহার করেন তা নয়। কাল্পনিক অবাস্তব চিত্রও ব্যবহার করেন অনেক সময়। এর প্রমাণ আমরা কালজয়ী গল্পে দশমুণ্ড রাবণের, রক্তপায়ী ভীমের, সিন্দবাদ নাবিকের, পারসিউসের, মেডুসার এবং আরও অনেক অদ্ভুত অবাস্তব চরিত্রের দেখা পাই। শুধু দেখা পাই না, দেখা পেয়ে অবাক হই, আনন্দিত হই। মনের নেপথ্যবাসী সেই কবি-সত্তার মর্জির উপরই নির্ভর করতে হয় আমাকে। তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় কি তা জানি না। তাঁকে প্রতিভা বলতে পারেন, ভগবানও বলতে পারেন। তাঁর যখন ইচ্ছা হয় তখন ভালো গল্প লিখতে পারি। তাঁকে উপেক্ষা করে পরের ফরমাসে জোর করে যখন লিখতে যাই, গল্প ওতরায় না। কি যেন একটা অভাব থেকে যায়। কৌশল করে প্লট ভেবে ছক্ এঁকে অঙ্ক কষে প্রথম শ্রেণীর গল্প লেখা যায় না। প্রথম শ্রেণীর গল্প বিদ্যুৎ-চমকের মতো, স্বতঃস্ফূর্ত শতদলের মতো। যখন হয় আপনিই হয়। সেই বিদ্যুৎ-চমকের বা শতদলের রূপটিকে ভাষায় রূপান্তরিত করার নিপুণতাই লেখকের কৃতিত্ব। মনে রাখা উচিত অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরে শিল্পের সুষমা নষ্ট হয়।

> কপালেতে ছোট্ট টিপ—মানানসই দুল
>   খোঁপায় গোঁজা টাটকা চাঁপা ফুল
> হাত দুটিতে হালকা চুড়ি,
>   চোখে ভরা লাজ
> সত্যিকার সুন্দরীর
>   আর কি চাই সাজ !

সেকালের এক খোকনের গল্প

সেকালের যে খোকনের গল্পটি আজ লিখছি সে যদি বেঁচে থাকত তাহলে তার বয়স আজ বিরাশী বা তিরাশী হত। লর্ড কার্জন তখন বাংলা দেশকে দু'ভাগ করেছেন। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে সমস্ত দেশ আলোড়িত। 'বিদেশী জিনিস বয়কট্' আন্দোলনে স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত যোগ দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গান তখন জাগিয়ে তুলেছে দেশকে। বঙ্কিমচন্দ্র দেশের লোককে বুঝিয়েছেন আমাদের দেশই আমাদের মা, তিনিই দুর্গা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মেতে উঠেছে দেশ। বিশেষ করে মেতে উঠেছে স্কুল কলেজের ছেলেরা। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও ক্ষেপে উঠেছেন খুব। তাঁরা স্কুলে কলেজে নোটিশ পাঠিয়েছেন, যে সব ছেলেরা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবে—তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। অনেক ছেলের জরিমানা হল। অনেক ছেলের স্কুল থেকে নাম কেটে দেওয়া হল, অনেক ছেলেকে বেত মারা হল, কিন্তু ফল কিছুই হল না। সমানে চলতে লাগল আন্দোলন।

খোকনের বয়স তখন দশ বছর। তাদের মেলায় অনেক রকম মাটির পুতুল বিক্রি

হত। সেই মেলা থেকে খোকন একটি মাটির দুর্গা-প্রতিমা কিনেছিল। ছোট্ট মাটির প্রতিমাটি চমৎকার দেখতে। খোকন তার মাকে এসে বলল—"মা, আমাদের পণ্ডিত মশাই বলেছেন—দুর্গাই দেশমাতা। তাকে রোজ পুজো করতে হয়। আমি কাল দেশমাতাকে পুজো করব মা, তোমার ঠাকুর ঘরে—"

মা বললেন, "ঠাকুর ঘরে অত জায়গা কোথা? বাড়ির সামনে যে উঠোনটি রয়েছে—ওই খানেই কর না। আমি সাজিয়ে দেব এখন।"

সামনে রাস্তা, তার পরই খানিকটা উঠোনের মতো জায়গা, তার পরই খোকনদের বাড়ি। সেই উঠোনেই খোকন চারখানা ইট দিয়ে ছোট্ট বেদী করে ফেলল একটা। সেই বেদীর উপর বিছাল একটা আসন। সেই আসনের উপর বসানো হ'ল দেশমাতাকে তার বন্ধুরা চারটে কঞ্চি কেটে এনে বেদীর চার পাশে পুঁতে দিয়ে তার উপর টাঙিয়ে দিল একটা রঙীন কাপড়। মা গেঁথে দিলেন ফুলের মালা। খোকনের আবদারে ছোট্ট একটি থালায় ভোগও রেঁধে দিলেন। পাড়ার ছেলে মেয়েরা সবাই জুটে 'বন্দেমাতরম্' গান গাইতে লাগল। খোকনের মা তাদের মিষ্টান্ন বিতরণ করলেন—ঘরে অনেক নারকেল—নাড়ু আর মোয়া তৈরি করেছিলেন তিনি। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে পাড়া মুখরিত হয়ে উঠল। মা বললেন—"আমি এক হাঁড়ি ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি, তোরা এখানে খেয়ে যা—"

ছেলেরা চীৎকার করে উঠল—'বন্দেমাতরম্'—একজন ছেলে তাদের পুকুর থেকে পদ্মফুল তুলে এনে দেশমাতার প্রতিমাকে আরও সাজিয়ে দিলে।

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটল। সেই রাস্তা দিয়ে হাফ্ প্যাণ্ট পরা একটা লম্বা-চওড়া সাহেব মশ্ মশ্ করে কোথা যাচ্ছিল।

'বন্দেমাতরম্' শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

"হোয়াট্‌স্ দিস্ ? কেয়া হ্যায়—"

"দেশমাতার পুজো করছি আমরা। বন্দেমাতরম্—"

সাহেবরা তখন 'বন্দেমাতরম্' শুনলে ক্ষেপে যেত। সাহেব হঠাৎ রেগে গিয়ে 'ডাম্ ইওর দেশমাতা—" বলে বুটসুদ্ধ এক লাথি মারল দুর্গাপ্রতিমার পুতুলের উপর। পুতুল ছিটকে পড়ে ভেঙে গেল।

হাফ্-প্যাণ্ট-পরা সাহেব পিছন ফিরতে না ফিরতেই খোকন তার হাঁটুর পিছন দিকটা কামড়ে ধরল। সাহেব পা ছুঁড়তে লাগল, খোকনকে হাতের বেতটা দিয়ে মারতে লাগল, খোকনকে কিন্তু ছাড়াতে পারল না সে কিছুতে। খোকনের দাঁত সাহেবের মাংসের মধ্যে ঢুকে গিয়ে টাইট হয়ে বসে গেছে। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল খোকনের দু'কস্ বেয়ে রক্ত পড়ছে। সাহেব আর্তনাদ করতে লাগল, খোকন কিন্তু কামড়েই রইল। সাহেব শেষে তাকে টানতে টানতে নিয়ে থানায় গিয়ে হাজির হলেন। তিনি পুলিশেরই বড় সাহেব একজন। থানায় গিয়ে অনেক লোকে মিলে টানাটানি করে খোকনকে ছাড়িয়ে নিল। দেখা গেল খোকনের মুখে খানিকটা মাংস উঠে এসেছে। হাঁটু থেকে হুহু করে রক্ত পড়ছে। কনেষ্টবলরা খোকনকে বেত মেরে মেরে অজ্ঞান করে ফেলল। সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল তার। থানায় গারদে আটকে রেখে দিলে তাকে। গ্রামে হাসপাতাল ছিল না। সাহেবকে ভাল করতে পাঠানো হল দূরের স্টেশনে। ট্রেনে চড়ে তিনি শহরের বড় হাসপাতালে গেলেন।

খোকন তার পর দিনই মারা গেল প্রবল জ্বরে।

সাহেবও নিস্তার পায় নি। যে পা দিয়ে সে খোকনের 'দেশমাতা'-র মুখে লাথি মেরেছিল সে পা কেটে ফেলতে হয়েছিল। সেপ্‌টিক হয়ে গিয়েছিল সমস্ত হাঁটু। এখনও তো অনেকে 'দেশমাতার' মুখে লাথি মারছে। তেমন খোকন আর জন্মাচ্ছে কি ?

অতীতের রাণী

কলকাতার একটা বড় রাস্তার চৌমাথায় একটা রাস্তার একধারে বসে ছিল বৃদ্ধা ভিখারিণীটা। সামনে একটা টোল-খাওয়া অ্যালুমিনিয়মের বাটি। মাঝে মাঝে করুণ নাকি সুরে বলছে, দু'দিন খাইনি বাবা। দয়া করে কিছু দিন। আশেপাশে সামনে জনস্রোত বয়ে চলেছে। কেউ তার কথায় কর্ণপাতও করছে না। সামনে সিনেমার প্রকাণ্ড একটা বিজ্ঞাপন। সুন্দরী একটি মেয়ের ছবি। ছবিটি নাকি দশম সপ্তাহ চলছে। সিনেমার সামনে তবু এখনও প্রচুর ভীড়।

এই মাগী, সরে বস না। ফুটপাথের মাঝখানে বসে আছে—

দু'দিন খাইনি বাবা। দয়া করে দিন কিছু—

ভদ্রলোকের দয়া হল না। গজগজ করতে করতে চলে গেলেন তিনি।

তারপরই সাইরেন বেজে উঠল। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল পুলিশরা। মুখ্যমন্ত্রীর মোটর সোঁ করে পার হয়ে গেল। পুলিশতাড়িত একদল লোক উঠে পড়ল ফুটপাথে। বুড়ীর পা মাড়িয়ে দিল। বাটিটা উলটে গেল তার। বুড়ী ফোঁস করে উঠল, আ মর মুখ পোড়া। চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি—

রাস্তার মাঝখানে বসেছিস কেন হারামজাদী—

কোথা বসব। বসবার জায়গা দিবি তুই। ফুটপাথ কি তোর বাপের—

লোকটা কোন উত্তর দিল না। সিনেমার টিকিট কিনেছিল সে, তাড়াতাড়ি সিনেমা হাউসের দিকে চলে গেল।

রাস্তার গোলমাল থিতিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য।

দু'দিন খাইনি বাবা। দয়া করে দিন কিছু—

আবার শুরু করল বুড়ী। কিন্তু পরক্ষণেই এলো একটা বিয়ের প্রসেশন। বাজনা বাজিয়ে বর যাচ্ছে বিয়ে করতে ফুল-দিয়ে-সাজানো মোটরে চড়ে। বুড়ীর ক্ষীণ কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল সে গোলমালে। বুড়ী তবু বলতে লাগল, দয়া করে কিছু দিন বাবা।

কেউ তার কথায় কর্ণপাত করল না। প্রসেশন চলে গেল। বুড়ীর নাকি সুর শোনা যেতে লাগল আবার।

এই বুড়ীর যে এককালে রূপ-যৌবন ছিল, সে যে এককালে অনেকের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা এখন অনুমান করা শক্ত। তখন তার একজন প্রণয়ী তাকে রাণী বলে ডাকত।

দু'দিন কিছু খাইনি বাবা। দয়া করে কিছু দিয়ে যান বাবা—

সত্যিই সে দু'দিন খায়নি। গলার স্বরটা আর একটু চড়িয়ে চেঁচাতে লাগল সে। হঠাৎ খট করে তার বাটিতে একটা পাঁচ পয়সা পড়ল। বুড়ী ভাবলে পাঁচ পয়সায় কি কিনে খাবে সে? আজকাল পাঁচ পয়সায় পেট ভরে না—

আবার সে নাকি সুরে শুরু করল, দু'দিন কিছু খাইনি বাবু—

আবার রাস্তায় পুলিশরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মিছিল আসছে একটা। নেতাদের জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল চারদিক। মাঠে সর্বহারাদের একটা বিরাট মিটিং হচ্ছে না কি। বুড়ী ফুটপাথ থেকে মিছিলের দিকে এগিয়ে গেল একটু। ওদের মধ্যে যদি দয়া করে কেউ। কেউ করল না। জিন্দাবাদের গর্জনে ডুবে গেল তার ক্ষীণ আর্তকণ্ঠ। সে পাঁচ পয়সাটা কোমরে গুঁজে তবু চেঁচাতে লাগল বাটিটা উঁচু করে ধরে। কেউ কর্ণপাতও করল না। মিছিল পেরিয়ে গেল।

তখন পুলিশের নজর পড়ল তার ওপর।

তুমি কি করছ এখানে, সর, সরে যাও—

বুড়ীর ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করেছিল। সে বাটিটা ছুড়ে দিল পুলিশের মুখের দিকে। পুলিশের মাথার টুপিতে লেগে পড়ে গেল বাটিটা ছিটকে। পুলিশের ব্যাটনের এক ঘায়ে বুড়ীও লুটিয়ে পড়ল পুলিশের পায়ের কাছে। পুলিশের পা দুটো জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে, আমায় জেলে পুরে দাও সার্জেণ্ট সাহেব। আমাকে জেলে পুরে দাও—

জেলে যাবার শখ কেন?

সেখানে রোজ দুটি খেতে পাব। ক্ষিধেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে—।

দাবানল

চার বছরের নাতনী তিস্তার ফরমাসে প্রায় রোজই গল্প বলতে হয় আমাকে।

সেদিন সে এসে বলল— দাদা আজ রাজার গল্প বল একটা। তাকে সেদিন যে গল্পটা বলেছিলাম সেইটেই বলছি তোমাদের।

এক ছিল রাজা—তাঁর নাম ছিল ভূনাথ। অত্যন্ত ভালোমানুষ ছিলেন। কাউকে বকতে বা ধমকাতে পারতেন না। তাঁর রাজ্য শাসন করতেন তাঁর মন্ত্রী। রাজার একটি শিবমন্দির ছিল। সেই মন্দিরের ভিতর ছিল ধবধবে শাদা পাথরের তৈরি চমৎকার একটি শিবমূর্তি, রাজা সেই শিবমূর্তির পুজো করতেন।

রাজার দুই রাণী। বড় রাণী আর ছোট রাণী। এদের নিয়ে রাজার মনে বড় অশান্তি। রাজরাণী হলে কি হবে ছোটলোকের মতো ঝগড়াটে আর হিংসুকে। ছোটলোকের মতো গালাগালি, মারামারি, খামচাখামচি, চুল-টানাটানি পর্যন্ত করত তারা। অন্দরমহলে সর্বদা চীৎকার চেঁচামেচি। বাড়িতে কাক চিল পর্যন্ত বসত না। চাকর-বাকররা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত সর্বদা।

বড় রাণী যদি দুল পরলেন কানে ছোট রাণী ছুটে গিয়ে দুল ধরে টান দিলেন—

"এ তো আমার দুল, তুই পরেছিস কেন—" লেগে গেল দুজনে ঝাটাপাটি

মারামারি। ছোট রাণী যদি হার পরলেন গলায় বড় রাণী তক্ষুণি ছুটে এসে ছিনিয়ে নিলেন সেটা তার গলা থেকে।

"আমার হার তুই পরছিস কেন—"

শুরু হয়ে গেল চীৎকার চেঁচামেচি, কান্না।

এই রকম প্রত্যহ।

তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে রোজ রোজ এই রকম তুলকালাম কাণ্ড। রাজা ভুনাথ ভালোমানুষ। রাণীদের কিছু বলতে পারতেন না। মন্ত্রীদের পরামর্শ নিতেও লজ্জা হয় তাঁর। ঘরের কেলেঙ্কারির কথা কি বাইরের লোককে বলা যায়? তিনি তাঁর মনের দুঃখ নিবেদন করেন মহাদেবকে।

"হে মহেশ্বর তুমি এর উপায় কর একটা। দয়া কর আমার উপর—"

মহাদেবের মূর্তি নীরব থাকেন। কোন উত্তর দেন না। একদিন রাজা মহাদেবের পায়ের উপর মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন। অনেকক্ষণ কাঁদবার পর হঠাৎ কথা কয়ে উঠলেন মহাদেব।

"ভুনাথ, দুটি বিয়ে করে তুমি নিজের অশান্তি নিজেই ডেকে এনেছ। যাই হোক, আমি ভেবে চিন্তে এর একটা উপায় বের করেছি। দাবানল বলে আমার এক ভক্ত আছে। খুব ক্ষমতাবান লোক সে। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। তাকে আমি পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে। সে এককালে জাদুবিদ্যায় খুব নাম করেছিল। এখন সে সব ছেড়ে দিয়ে তপস্যা করছে। তপস্যাতেও সিদ্ধিলাভ করেছে সে। আমার মনে হয় সে গিয়ে তোমার সমস্যার সমাধান করতে পারবে। সে একটু উগ্র প্রকৃতির লোক, কিন্তু খুব ক্ষমতাবান। সে যা করবে তাতে বাধা দিও না।"

কিছুক্ষণ পরেই মহারাজ শুনতে পেলেন তাঁর প্রাসাদের সিংহদরজার সামনে দাঁড়িয়ে মোটা বাজখাই গলায় কে যেন খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠল—"বোম মহাদেও।"

মহারাজ জানলা দিয়ে দেখলেন জটাজুটধারী প্রায় উলঙ্গ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ এক সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে প্রকাণ্ড এক ত্রিশূল। মুখ-ভরতি দাঁড়ি গোঁফ। প্রকাণ্ড লাল লাল চোখ। মনে হয় মানুষ নয়, প্রকাণ্ড একটা জ্বলন্ত শিখা।

ভুনাথ নিজেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন এবং ছুটে গিয়ে নিজেই সিংহদরজা খুলে প্রণাম করলেন দাবানলকে।

"তুমিই কি মহারাজ ভুনাথ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বাবা মহাদেবকে রোজ দিক করছ কেন? কি পিণ্ডি চটকেছ?"

"সব বলছি। ভিতরে আসুন—"

"আগে আমার খাবার যোগাড় কর। আমি সাতদিন অন্তর খাই। আজ আমার খাবার দিন ছিল, কিন্তু বাবার হুকুম—তুমি এখনই যাও। তাই চলে এসেছি। আগে খাই তারপর তোমার কেচ্ছা শুনব—"

"তাই হবে। আপনি ভিতরে চলুন—"

ভিতরে নিয়ে গিয়ে রাজা তাঁকে সোনার সিংহাসন এগিয়ে দিলেন।

"আমি ওসবে বসি না, মাটিতে বসব।" বলেই তিনি ধপ করে মেঝের উপর বসে পড়লেন।

"আগে খাবার আনাও কিছু—"

"কি খাবার আনব বলুন—"

"এক কাঁদি ভালো মর্তমান কলা আনাও, আর ভালো ক্ষীর এক গামলা।"

রাজার আদেশে এক কাঁদি কলা আর ক্ষীর এসে পড়ল।

রাজভৃত্য একটি ভালো মখমলের আসনও এনে বিছিয়ে দিচ্ছিল—

দাবানল বললেন—"মখমলের উপর বসা আমার অভ্যেস নেই। তুমি একঘড়া জল এনে রাখ। আর একটা গামছা—"

দাবানল নিজেই কলার কাঁদি থেকে কলাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে ছাড়িয়ে খেতে লাগলেন ক্ষীরে ডুবিয়ে ডুবিয়ে। অনেকক্ষণ সময় লাগল। তাঁর দাড়ি গোঁফ ক্ষীরে মাখামাখি হয়ে গেল।

বললেন— আমি জঙ্গলে একা থাকি। বিশ্বকর্মা আমার আশ্রমের চারদিকে প্রচুর মর্তমান কলার গাছ লাগিয়েছেন। আর কামধেনু আমাকে সাতদিন অন্তর এক গামলা ক্ষীর পাঠিয়ে দেন। তোমার কলা ও ক্ষীর চমৎকার। খুব ভালো লাগল।"

খাওয়া শেষ করে দাবানল ঘড়া থেকে জল নিয়ে নিজের দাড়ি গোঁফ ধুয়ে গামছা দিয়ে হাত মুখ মুছে ফেললেন।

"এইবার বল কি হয়েছে তোমার? বাবাকে অত দিক করছ কেন—"

ভুনাথ সব বললেন তাঁকে। শুনে খেঁকিয়ে উঠলেন দাবানল।

"তুমি দুটো বিয়ে করেছিলে কেন? একটা বিয়ে করেই লোক হিমসিম খায়, তুমি দুটো বিয়ে করতে গেলে! আচ্ছা আহাম্মক লোক তো তুমি। সতীনে সতীনে ঝগড়া তো করবেই। ওই তো নিয়ম—"

ভুনাথ হাত জোড় করে বললেন—"আপনি আমায় উদ্ধার করুন।"

"কোথায় তারা—"

"অন্দরমহলে।"

"চল দেখি—"

দাবানলকে নিয়ে অন্দরমহলে প্রবেশ করা মাত্র নিদারুণ চীৎকার শোনা গেল একটা। ছোট রাণী বড় রাণীর হাত কামড়ে ধরেছে, আর বড় রাণী তার চুল ধরে টানছেন। দাবানল গিয়ে তাদের ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর জোর গলায় আদেশ করলেন—"চুপ কর তোমরা।"

দুই রাণী কেউ গ্রাহ্য করল না তাঁর কথা।

"এখুনি চুপ কর বলছি।"

চুপ করল না রাণীরা। সমানে চেঁচিয়ে যেতে লাগল।

তখন দাবানল তাঁর ত্রিশূল উঁচিয়ে—"চুপ কর বলছি, তা না হলে অভিশাপ দেব।"

জ্বলজ্বল করে উঠল দাবানলের চোখ দুটো।

রাণীরা কিন্তু মোটেই গ্রাহ্য করল না তাঁর কথা। সমানে চেঁচাতে লাগল। তখন দাবানল চিৎকার করে অভিশাপ দিলেন—"তোরা এখুনি পুতুল হয়ে যা।" সঙ্গে সঙ্গে দুই রাণী দুটি পুতুল হয়ে গেল। সব চিৎকার থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

দাবানল তখন রাজা ভুনাথের দিকে চেয়ে বললেন—"আর ওরা ঝগড়াও করবে না, চিৎকারও করবে না। পুতুলরা ঝগড়া করে না। চল, বাইরে যাই এবার।"

বাইরে গিয়ে ভুনাথ প্রশ্ন করলেন—"ওরা কি বরাবরই পুতুল হয়ে থাকবে ?"

"বরাবর। ওদের তাকের উপর তুলে রেখে দাও।"

ভুনাথ তখন বললেন—"আমার গতি কি হবে তাহলে ? আমি কি দুটো পুতুল নিয়ে সারাজীবন থাকব ?"

"তাই থাকো। থাকলে শান্তি পাবে। দুটো খাণ্ডারণী বউ নিয়ে এতদিন তো জ্বলে পুড়ে মরছিলে, আর বাবার পায়ে ধরে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলে তাঁকে।"

ভুনাথ হঠাৎ দাবানলের পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন—"আপনি ওদের আবার মানুষ করে দিন। আমার অদৃষ্টে যা হবার তাই হবে। দয়া করুন—"

হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন ভুনাথ।

দাবানল জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন—"ওফ্ জ্বালালে !"

"আপনি ইচ্ছে করলেই এর একটা সমাধান করে দিতে পারেন। দয়া করুন—"

"চল ভিতরে চল। আর আমাকে একটা চাদর দাও—"

আবার অন্দরমহলে গেলেন তাঁরা।

"বড় চাদর আনো একটা—"

প্রকাণ্ড একটা শাল বার করে দিলেন ভুনাথ।

মহারাণীরা যে ঘরে পুতুল হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল সেই ঘরে ঢুকলেন আবার দাবানল। তাঁর ত্রিশূল উঁচিয়ে বললেন—"আবার তোমরা মানুষ হও, মানুষ হও, মানুষ হও—"

সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হয়ে গেল পুতুল দুটি।

দাবানল প্রশ্ন করলেন—"আর তোমরা ঝগড়া করবে ?"

দুই রাণী সমস্বরে বলে উঠল—"না, আর আমরা ঝগড়া করব না। ককখনো না—"

"বেশ তাহলে ওই খাটের উপর দু'জনে পাশাপাশি শোও, দুজন দু'জনকে জড়িয়ে ধরো, গালে গাল ঠেকিয়ে—"

তাই করল রাণীরা।

দাবানল তখন শালটা দিয়ে ঢেকে দিলেন তাঁদের। তারপর ত্রিশূল উঁচিয়ে বললেন—"তোমরা এক হও, এক হও, এক হও—"

তারপর তুলে ফেললেন শালটা। দেখা গেল—দু'জন রাণী নেই। একজন রয়েছেন। তার মুখের আধখানা বড়রাণীর মতো আর আধখানা ছোট রাণীর মতো। দেহ দুটো মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

"একি হল !"

বলে উঠলেন ভুনাথ।

"তোমার দুই রাণীই রইল। কিন্তু এক দেহে। ওরা আর ঝগড়া করবে না।"

এই বলেই দাবানল হন হন করে বেরিয়ে গেলেন এবং অদৃশ্য হয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

আধো-ঘুমে

রিক্শায় চড়ে যাচ্ছি। পথ দুর্গম। জল কাদা। মাঝে মাঝে গর্ত। রিক্শাওলাটা রোগা। আমার বিশাল বপু। তার উপর আমার কোলের উপর রয়েছে আমার নাতি। রিক্শাওলার জামাটা ছেঁড়া। কিন্তু সে দেখলাম একটা শৌখীন প্ল্যাস্টিকের মালা পরে রয়েছে। চমৎকার দেখতে মালাটি। আমার নাতি প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মালাটির দিকে।

একবার আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে—"আমাকে ওই রকম একটা মালা কিনে দাও না।"

রিক্শাওলাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"এ মালা কোথায় কিনেছ?"

"এক বছর আগে কিনেছিলাম চাঁদনিচক থেকে। আমার নাতির জন্যে। এখন ঠিক এই রকম মালা আর পাওয়া যাবে না বোধহয়।"

"তোমার নাতির জন্যে কিনেছিলে, তুমি পরে আছ কেন—"

রিক্শাওলা চুপ করে রইল একটু। তারপর বলল—"আমার নাতি মারা গেছে—।"

আমার নাতি আবার আবদার ধরল—"আমাকে একটা ওই রকম মালা কিনে দাও না দাদু।"

"আজ নয়। আর একদিন কিনে দেব। আজ চল বাড়ি যাই আগে। বৃষ্টি পড়ছে।"

বাড়ি পেঁাছে রিক্শাওলাকে ভাড়া দিলাম। সে হঠাৎ গলা থেকে মালা খুলে বলল—"খোকা নাও তুমি এটা—"

আমি বললাম—"না, না—সে কি। ও মালা নিতে হবে না।"

"কেন?"

আমি চুপ করে রইলাম।

সে বলল—"আমি গরীব মানুষ, কিন্তু আমি কি উদার হতে পারি না—"

চট্ করে ঘুমটা ভেঙে গেল।

স্বপ্ন দেখছিলাম।

সভাপতি

উদীয়মান সাহিত্যিক নীলগোপাল বসাক নকুলগঞ্জ সুশীল গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করতে আসছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য স্থানীয় যুবকেরা স্টেশনে সমবেত হয়েছেন। ট্রেন থেকে নামবামাত্র তাঁর গলায় যে মালাটা পরানো হবে সে মালাটাতে মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে সেটাকে টাটকা-ফুলে-গাঁথা মালার গৌরব দান করবার চেষ্টা করছেন অনিল বসু। অনিল বসু আগের দিন মালাটি কোলকাতা থেকে এনেছেন। এ রকম মালা এখানে পাওয়া যায় না। ট্রেন লেট আসছে। উৎসুক চিত্তে প্রতীক্ষা করছেন সবাই।

অনিলবাবু নরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নীলগোপালবাবুকে আপনি চেনেন তো? তাঁর লেখা অবশ্য পড়েছি কিন্তু তাঁকে দেখিনি।"

যাঁর নামে সুশীল গ্রন্থাগার তাঁরই পুত্র নরেশ। তিনি বললেন—"আমিও দেখিনি তাঁকে। চিঠিপত্রেই আলাপ হয়েছিল।"

অনিলবাবু চৌকস কারিৎকর্মা লোক। ওভারশিয়ারি করেন। তিনি প্রশ্ন করলেন,—"আমাদের মধ্যে কে চেনে তাঁকে? ট্রেন এলে কি করে বোঝা যাবে তিনি এসেছেন—"

বাবরিচুলওলা ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবী গায়ে অমিয় মৃদু হেসে বললে—"যদি আসেন বুঝতে বাকি থাকবে না। এত অচেনাকে যিনি চিনিয়েছেন তাঁকে চিনতে কি দেরি হবে—"

বিষ্ণু বললে—"আমাদের বাঁটলো ভালো করে চেনে তাঁকে। পাশাপাশি বাড়িতে বহুদিন ছিল—"

হাওয়াই শার্ট পরা ঘাড় একদম চাঁছা কাবুলী চপ্পল পায়ে বাঁটুল কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। অনিল বসু তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই সে মৃদু হেসে বললে—"খুব চিনি। উনি রাবড়ি খেতে ভালবাসেন বলে পিসিমাকে দিয়ে ভালো রাবড়িও করিয়েছি আজ—"

ট্রেন এসে পড়ল একটু পরে। প্রথম শ্রেণীর কামরায় একটি মাত্র যাত্রীই ছিলেন। সকলে সেই দিকে গেলেন।

বাঁটুল নমস্কার করে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলে, "চিনতে পারছেন? আপনার পাশের বাড়িতেই ছিলাম অনেকদিন—"

"পারছি বই কি, তবে চেহারাটা আপনার বদলেছে—"

"আপনার জিনিসপত্র কই—"

"জিনিসপত্র বেশী নেই। ওই সুটকেশটা আর বিছানাটা—"

সুটকেশের উপর ইংরেজীতে নাম লেখা—এন. জি. বসাক। মালা পরিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। তারপর সমারোহ করে নিয়ে গিয়ে বসানো হল নরেশবাবুর মোটরে।

সেদিন সভাপতির পদ সত্যই অলঙ্কৃত হয়েছিল। চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন বসাক মশাই। তাঁর সব বক্তৃতাটা উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি সেদিন যা বলেছিলেন তার সারমর্ম হচ্ছে "যাঁরা মনে করেন আজকাল বাংলা সাহিত্যের অধঃপতন হয়েছে তাঁদের সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, যাঁরা পরশ্রীকাতর। তাঁরা কারও ভালো কখনও দেখতে পারেন না। আয়নায় নিজের মুখ দেখেও তাঁরা বিমর্ষ হয়ে যান। সাহিত্যের ভালো তারা সহ্য করবেন কি করে? দ্বিতীয় দল হচ্ছে মুখ-মেরে যাওয়ার দল। ক্রমাগত ভালো খাদ্য খেতে খেতে মুখ মেরে যায়, ভালো খাদ্যকেও তখন আর ভালো বলে মনে হয় না। এঁদের অনেকটা সেই দশা হয়েছে। এ অবস্থায় অনেক সময় অখাদ্যে কুখাদ্যেও রুচি হয়। এঁরা অনেক সময় বাজে ইংরেজি বই পড়ে বাহবা বাহবা করেন। আর যাঁদের তৃতীয় শ্রেণীতে ফেলেছি—তাঁরা প্রায়ই বৃদ্ধ এবং অসুস্থ। চোখে দেখতে পান না, বাত, বহুমূত্র, ব্লাড প্রেসার প্রভৃতি নানা রোগে সর্বদা পীড়িত হয়ে থাকেন। এঁদের একমাত্র সম্বল অতীতের স্বপ্ন। বর্তমান এঁদের কাছে তুচ্ছ।

বাংলা ভাষায় যা লেখা হচ্ছে তাই যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এইটেই শুধু বলতে চাইছি বাংলা ভাষাতেও এখনও অনেক ভালো বই লেখা হচ্ছে, হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

প্রতিভা-পোষাক প্রকাশনী নামে নূতন একটি প্রতিষ্ঠান হয়েছে। আসবার ঠিক আগেই তাঁরা আমাকে একখানি ক্যাটালগ দিলেন। সেটি আমার সঙ্গেই আছে। আপনাদের গ্রন্থাগারে সেটি দিয়ে যাচ্ছি। এটি ভালো করে পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন বাংলা ভাষায় কত ধরনের কত রকমের বই লেখা হচ্ছে।…"

বক্তৃতাটি সত্যিই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। সভা শেষ করে সেইদিন রাত্রেই ফিরে গেলেন সভাপতি মশাই, গলায় আর এক প্রস্থ মালা পরে। বহুলোক অনুরোধ করেছিল অন্তত আর একবেলা থেকে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি থাকলেন না, জরুরী কাজ ছিল।

দিন কয়েক পরে নীলগোপালবাবু নিজের বৈঠকখানায় ভ্রূকুঞ্চিত করে বসেছিলেন খবরের কাগজের দিকে চেয়ে। এ কি খবর বেরিয়েছে! দ্বারপ্রান্তে খুট করে শব্দ হ'ল। নীলগোপাল ঘাড় ফিরিয়া দেখলেন।

"আরে আসুন আসুন। আপনার কাছেই যাব ভাবছিলাম। আপনি নকুলগঞ্জে যান নি?"

"গিয়েছিলাম। দুদিন পরে—"

"আমার চিঠিটা তাদের দিয়েছিলেন?"

"না। আমিই আপনার হয়ে সভাপতিত্বটা করে এসেছি। আপনিও এন. জি. বসাক, আমিও এন. জি. বসাক। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধিটা খেলে গেল। প্রতিভা-পোষাক প্রকাশনীর ক্যানভাসিংটাও সেরে এলাম। যাতায়াত ফার্স্টক্লাস ফেয়ার, তাছাড়া জামাই আদর—এ কখনও ছাড়তে আছে!"

নীলগোপালবাবু রসিক লোক। তাঁর চোখ দুটিতে হাসি উপচে পড়ল।

"বলেন কি! যদি ধরা পড়ে যেতেন—"

"সেখানে বাঁটুল ছিল, ভালো নাম প্রমথ।"

"সে আবার কে?"

"সে নাকি আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু?"

নীলগোপালবাবুর ভ্রূ আবার কুঞ্চিত হ'ল।

"কই মনে পড়ছে না তো—"

"না পড়ুক। আমি কিন্তু ছোকরার কাছে কৃতজ্ঞ। এ বছরের এই ক্যালেন্ডারখানা রাখুন। সব লেখকদের ছবি দিয়েছি। বঙ্কিম চাটুজ্যে থেকে আরম্ভ করে বঙ্কু বরাট পর্যন্ত—"

নীলগোপাল হাসিমুখে চেয়ে রইলেন।

রিক্‌শাওয়ালার আত্মকাহিনী

আমি সামান্য রিক্‌শাওয়ালা। আমার নাম ঝক্‌সু। জন্মের আগেই আমি পিতৃহীন হই। বিহার দেশে আমার বাড়ি। আমার বয়স কত তাহা ঠিক জানি না। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের জন্ম সময়ে কেহ আমাদের জন্মতারিখ টুকিয়া রাখে না। শুনিয়াছি যে বৎসর বিহারে ভূমিকম্প হয় সেই বৎসর আমি মাঠে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার মা একজন মজুরণী ছিলেন, তখন তিনি মাঠেই কাজ করিতেছিলেন। সেই সময় তাহার মৃত্যু হয়। ছেলেবেলাটা আমার বড় কষ্টে কাটিয়াছে। আমার মামী আমাকে মানুষ করিয়াছিলেন। তাঁহাকেই আমি মা বলিয়া জানি। আমার এক কাকা ছিলেন, কিন্তু তিনি সঙ্গদোষে তাড়িখোর হইয়া উঠিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত একটা মারামারিতে জড়াইয়া পড়িয়া তাঁহার জেল পর্যন্ত হইয়া যায়। কাকা আমার জীবনে কোন কাজে লাগেন নাই, তবু কিন্তু আমি তাঁহাকে ভালোবাসিতাম। তিনি যেদিন জেল হইতে ছাড়া পাইয়া বাড়ি ফিরিলেন সেদিন সত্যই আমার বড় আনন্দ হইয়াছিল, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন মামীর সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতাম। মামী 'বাবুভাইয়াদের' বাড়িতে চাকরাণীর কাজ করিতেন। আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। প্রথম প্রথম আমি তাঁর কাজে সাহায্য না করিয়া বাধাই সৃষ্টি করিতাম বেশী। কিন্তু যখন আমার বয়স একটু বাড়িল, যখন আমি আট দশ বছরের হইলাম, তখন আমিও কাজে লাগিয়া গেলাম একটা বাড়িতে। বেতন হইল মাসে দুই টাকা। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বেতনও বাড়িতে লাগিল। অনেক ভদ্রলোকের বাড়িতে আমি চাকরের কাজ করিয়াছি। আমার বয়স যখন আঠারো-উনিশ তখন আমার বেতন পনেরো টাকা হইল—তাহা ছাড়া খাওয়া-পরা। জিনিস পত্রের দাম যেরূপ বাড়িতেছিল তাহাতে পনেরো টাকাতেও কুলানো সম্ভব হইতেছিল না। মামী খুব বুড়া হইয়া গিয়াছিলেন, মামাও একটা মোটর দুর্ঘটনায় চাপা পড়িয়া মারা গেলেন, আমার দুইটি মামাতো বোনের বিবাহে অনেক ধার হইয়া গিয়াছিল, মহাজন প্রতিমাসে আসিয়া তাগাদা দিতে লাগিল, আমার একটি ছোট মামাতো ভাই ছিল চুনুয়া। একরূপ বিনা চিকিৎসায় সে মারা গেল টাইফয়েড রোগে। সমস্ত সংসারের ভার আমার উপর পড়িল। পনেরো টাকায় আর কুলানো সম্ভবপর হইতেছিল না। আমার কাকা মজুর খাটিয়া কিছু উপার্জন করিতেন, কিন্তু সবটাই খরচ করিয়া ফেলিতেন মদে আর তাড়িতে। সেই সময় আমার একজন ফুফা (পিশামশায়) আমাকে বলিলেন—রিক্‌শা টানিলে বেশী রোজগার করিতে পারিবে। তিনি ভাগলপুর শহরে রিক্‌শা টানিতেন। তিনি বলিলেন—রিক্‌শা টানিতে যদি চাও আমার কাছে আসিয়া দিনকতক কাজ শেখ। ওখানে একটা খাটাল আছে। সেই খাটালে গিয়া আমি প্রথম কাজ শিখি। দৈনিক দু-টাকা রোজগার করিতাম। দিনে খাইতাম এক পোয়া ছাতু, রাত্রে কয়েকখানা রুটি। মাঝে মাঝে ভাতও খাইতাম। আমার ফুফা সেখানে একটা বস্তিতে মাসিক চার টাকা ভাড়ায় একটি খোলার ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন। সেইখানেই আমরা কোনক্রমে থাকিতাম। মামীও সেখানে আসিয়া হাজির হইলেন একদিন। তাঁহার চোখে ছানি পড়িয়াছিল, ভালো দেখিতে পাইতেন না।

তবু তিনি বসিয়া থাকিতেন না, এক জনের বাড়িতে দাইগিরিতে বাহাল হইয়াছিলেন। সেখানে বাসন মাজিতে হইত। এবং একটি শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত। মাইনা পাইতেন মাত্র দশ টাকা। কিছু খাবারও পাইতেন। এই ভাবেই তখন সুখে দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল।

ইহার পর একটি বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। আমাদের বস্তিতে কলেরার মড়ক লাগিল। আমাদের সকলেরই কলেরা হইয়াছিল, কেবল আমিই বাঁচিয়া গেলাম। পাড়ার লোকেরা আমাদের সকলকেই হাসপাতালে দিয়া আসিয়াছিল। ডাক্তারবাবুরা হয়তো ভালো চিকিৎসাই করিয়াছিলেন কিন্তু আমি ছাড়া আর কেহ বাঁচিল না।

তাহার পর আমি কলিকাতায় চলিয়া আসি। আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় কলিকাতায় রিক্‌শা টানিত, সেই আমাকে ডাকিয়া লইল।

তাহার পর হইতেই এই শহরে বরাবর রিক্‌শা টানিতেছি। নিদারুণ গ্রীষ্মের রৌদ্রে, প্রবল বর্ষায়, মিছিলের হট্টগোলের মধ্যে 'বাস' 'ট্রাম' 'মোটর' হইতে আত্মরক্ষা করিয়া প্রত্যহ রিক্‌শাই টানিয়া চলিয়াছি। কত রকম লোকই যে আমার রিক্‌শায় রোজ চড়ে। তাহারা বাঙালী, না বিহারী, না পাঞ্জাবী, না মাড়োয়ারি এ কথাটা আমার নিকট বড় নয়, তাহারা আমার আরোহী, তাহারা আমায় পয়সা দেয় এইটেই আমার নিকট বড় কথা। আমার আরোহীদের মধ্যে ভদ্রলোক, অভদ্রলোক, কৃপণলোক, দুই চারিটি পয়সার জন্য ছোটলোকের মতো দরদস্তুর করে এমন লোক, দিলদরিয়া লোক—সব রকম লোকই দেখিয়াছি। মানুষ নানা রকম হয়। একটি আরোহিনীর কথা কিন্তু আমার বরাবর মনে আছে, কখনও বোধহয় ভুলিব না। একদিন একজন বৃদ্ধা হাওড়া স্টেশনে আমার রিক্‌শায় চড়িয়া বলিলেন, আমাকে লেকটাউন পেঁছাইয়া দিতে হইবে। কত ভাড়া চাও? বৃদ্ধার মুখটি দেখিয়া আমি চমকাইয়া উঠিলাম। অবিকল আমার মামীর মতো দেখিতে। বলিলাম আগে আপনাকে পেঁছাইয়া দিই, তাহার পর ভাড়ার কথা হইবে। বৃদ্ধা উঠিয়া বসিলেন। হাওড়া হইতে লেকটাউন অনেক দূর। সেদিন আবার কি একটা হাঙ্গামা ছিল শহরে, পুলিশের গুলিগোলা চলিতেছিল চৌরঙ্গী অঞ্চলে। চারিদিকে ভীড় আর হৈ-হল্লা। অনেক জায়গায় ট্রাফিক জাম। অনেক কষ্টে বৃদ্ধাকে আমি তাঁহার ঠিকানায় পেঁছাইয়া দিলাম। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন—কত দেব তোমাকে? তুমি বাবা এত কষ্ট করে ভীড় বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছ আমাকে, যা চাইবে তাই দেব। আমি মনে মনে ঠিক করিয়া ছিলাম কি বলিব।—বলিলাম আপনার কাছে কোন ভাড়া নেব না।

কেন?

আমার যে মামীমা আমাকে মানুষ করেছিলেন যিনি এখন আর বেঁচে নেই, আপনি ঠিক তাঁর মতো দেখতে। আপনি আমার সেই মামী। আপনার কাছে ভাড়া নেব কি করে?

বৃদ্ধা সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—না, সে হয় না। তিনি জোর করিয়া আমার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিলেন। আমি তখন লোভ সামলাইতে পারিলাম না, টাকাটা লইলাম। আমার টাকার তখন বড় প্রয়োজন ছিল।

এখন মনে হয় টাকাটা না লইলেই পারিতাম। কিন্তু হায়, গরীব মানুষরা অভাবের তাড়নায় উদারতা প্রকাশ করিতেও অক্ষম। তাঁহার নামটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম—জগত্তারিণী দেবী। এবার ভোটের সময় যখন সকলে ভোট সংগ্রহ করিবার জন্য আমার কাছে আসিল তখন আমি বলিলাম—আমি জগত্তারিণী দেবীকে ভোট দিব। তাঁহারা বলিল—ও নামের কোন প্রার্থী নাই। আমি কাহাকেও ভোট দিলাম না, কারণ প্রার্থী হিসাবে যাহাদের নাম ছিল তাহাদের কাহাকেও আমি চিনিতাম না। আমি রাজনীতি বুঝি না, কে মন্ত্রী হইলেন তাহা লইয়া আমার মোটেই মাথা ব্যথা নাই। নির্বিঘ্নে আমাদের কাজকর্ম চলিলেই আমি খুশী। দুইবেলা যদি পেট ভরিয়া খাইতে পাই তাহা হইলে আরও খুশী হই। কিন্তু এত মেহনত করিয়াও দুইবেলা ভালো খাবার খাইতে পাই না। জিনিসপত্র দুর্মূল্য। আমার মামীর একটি নাতী আমার কাছে আসিয়াছে। তাহাকে স্কুলে পড়িতে দিয়াছি। যদি সে লেখা পড়া শিখিয়া ভালো চাকরি পায়, হয়তো আমাদের দুঃখ ঘুচিবে। সবই ভগবানের হাত।

মেয়েটি

সেদিন আমি যখন ট্রাম থেকে নামলাম তখন মেয়েটি রাস্তার একটি থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখে একটু হেসে নমস্কার করল। আমিও নমস্কার করলাম। কিন্তু চিনতে পারলাম না। মনে হল হয়তো আমার কোনও ছাত্রী। মেয়েটি বেশ রূপসী। ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে চলে গেল কিছুদূর। সামনের ডান হাতি গলিতে আমার বাসা। কিছুদূর গিয়ে পিছু ফিরে চাইলাম আবার। দেখলাম মেয়েটি আমার পিছু পিছু আসছে। মনে হল সে আমাকে কিছু বলবে হয়তো। গলিতে ঢোকবার মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম একটু। মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে আর একটু হাসল। তারপর দাঁড়াল এসে আমার পাশে। সত্যিই রূপসী।

"এই গলির ভিতর আপনার বাড়ি নাকি ?"

"হ্যাঁ—"

"আপনার সঙ্গে যদি আপনার বাড়ি যাই আপত্তি করবেন কি ?"

প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য হলাম, একটু বিব্রতও হলাম। তবু বলতে হল,"—না, আপত্তি আর কি—কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।"

"আমি কিন্তু চিনি আপনাকে। আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমি সব বিষয়েই আপনার চেয়ে ছোট। আপনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়তেন, আমি তখন আই. এ. পড়ি। আপনি নামকরা ছেলে ছিলেন, সবাই আপনাকে চিনত, আমিও চিনতাম।"

"আমার বাড়িতে এসে কি করবে।"

"এমনি কৌতূহল, আর কিছু নয়।"

"বেশ, এস।"

আমি অবিবাহিত লোক। এক তলায় ছোট একটা ফ্লাট নিয়ে থাকি। ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। মেয়েটিও এল আমার পিছু পিছু।

"তুমি ওই চেয়ারটায় বস। আমি জামা কাপড় ছেড়ে আসি। চা খাবে?"

"না।"

আমি পাশের ঘরে চলে গেলাম। পোষাক বদলে ফিরে এসে দেখি মেয়েটি আমার ঘরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমাকে দেখেই বলল—"আপনার রুচির প্রশংসা করি। প্রত্যেকটি জিনিস সুন্দর।"

তারপর হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বলল—"একটা কথা বললে বিশ্বাস করবেন?"

"বিশ্বাসযোগ্য হলে করব না কেন!"

"আপনার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল।"

এ খবরের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বললাম—"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ। আমার বাবা আপনাকে আমার একটা 'ফোটো' পাঠিয়েছিলেন। সেটা কিন্তু আপনি ফেরত দেন নি। সেটা এখনও আছে কি?"

"আমি হঠাৎ বিলেতে চলে যাই। তখন আমার কিছু চিঠিপত্র গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। হয়তো তার মধ্যে আছে সেটাও। আমি দেখিনি।"

"ও। আচ্ছা, যাই তবে। আপনার একটু সময় নষ্ট করলাম।"

"তুমি এখন কোথায় আছো?"

মেয়েটি চুপ করে রইল। তারপর হাসল একটু। সহসা প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল সে।

"আপনাকে একটা অনুরোধ করছি। সেই ফোটোটা যদি পান, পুড়িয়ে ফেলবেন।"

"পুড়িয়ে ফেলব? কেন?"

আবার চুপ করে গেল মেয়েটি।

বললাম—"সে যা হয় করা যাবে। তুমি এখন কিছু খেয়ে যাও। ভালো বিস্কুট আছে,—দাঁড়াও নিয়ে আসি—"

ভিতরে গিয়ে আলমারি খুলে বিস্কুট বার করে নিয়ে এলাম। এসে দেখি সে নেই। বিস্মিত হলাম। এ ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি। কপাট খোলাই ছিল। উঁকি দিয়ে দেখলাম গলিতে কেউ নেই।

মেয়েটির এই অদ্ভুত আচরণ সত্ত্বেও, কিম্বা হয়তো এই অদ্ভুত আচরণের জন্যেই, মেয়েটিকে খুব ভালো লেগে গেল। রোজই তার কথা মনে করতাম। মেয়েটি শুধু রূপসী নয়, রহস্যময়ীও।

একদিন পুরনো চিঠিপত্র খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম তার ফোটো আর তার বাবার চিঠিখানা। দেখলাম খামটা খোলাই হয়নি। ফোটোটির দিকে চেয়ে কিন্তু মেয়েটিকে রূপসী মনে হল না। হঠাৎ আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে কে যেন বলল—"পুড়িয়ে ফেলুন ও ফোটো। ফোটোগ্রাফার ভালো তুলতে পারেনি। পুড়িয়ে ফেলুন"—ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, কেউ নেই। মনে হল—তাহলে আমার কল্পনা ওটা।

মেয়েটি কিন্তু ক্রমশ আমার মন অধিকার করে বসল। ফোটোটা এনলার্জ করিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রাখলাম। ভাবলাম ফোটোর জন্য সে নিশ্চয় আবার আসবে। কিন্তু সে এল না।

তার বাবাকেও একটা চিঠি লিখলাম। লিখলাম—"আমি হঠাৎ বিলেতে চলে

গিয়েছিলাম। তাই আপনার পত্র পেতে বিলম্ব হয়েছে। আপনার মেয়েকে পছন্দ হয়েছে আমার। আপনি একদিন আসুন।"

রোজই প্রত্যাশা করতাম সাড়া পাব। কিন্তু পেলাম না।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি এনলার্জ ফোটোটা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। চারদিকে কাঁচের টুকরো। একটা ফ্রেম খোলা। ছবিটা নেই।

কয়েকদিন পর তার বাবার চিঠি পেলাম। "আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। দুঃখের সহিত জানাচ্ছি আমার মেয়ে বাস একসিডেন্টে মারা গেছে। সে আপনাকে খুব ভক্তি করত। আপনাকে স্বামী রূপে পেলে তার জীবন ধন্য হয়ে যেত। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা তা ছিল না। সবই নিয়তি। নমস্কার ইতি—"

সেদিন ভোরে

খোকনের সেদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল।

এতে ভোরে যে তখনও কেউ জাগেনি—ঠাকুমা পর্যন্ত না।

জানলা দিয়ে খোকনের প্রথমেই চোখে পড়ল বকুল গাছের আড়ালে চাঁদ অস্ত যাচ্ছে, আর চাঁদের ঠিক পাশেই দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড একখানা কালো মেঘ বিশাল হাঁ করে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে চাঁদের দিকে।

চাঁদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। তার মুখের হাসি এতটুকু কমেনি। কাছে শুকতারাটিও জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। তারও এতটুকু ভয় নেই।

খোকন বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে বেড়িয়ে এল। আস্তে আস্তে দরজাটি খুলে বাগানে এসে দাঁড়ালো। কি সুন্দর ভোরের আধফোটা আলো। চতুর্দিক যেন স্বপ্ন দেখছে।

"নমস্কার"

খোকন ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে। কেউ তো নেই। তবে নমস্কার করলে কে?

"নমস্কার—"

এ তো অদ্ভূত ব্যাপার কোথাও কেউ নেই অথচ—"নমস্কার—"

হঠাৎ খোকন দেখতে পেলে বাগানের বেড়ার গায়ে একটি অপরাজিতা ফুল ফুটেছে—আর তার ভেতর থেকে সুন্দর ছোট, একখানি মুখ তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

"নমস্কার—"

প্রতি নমস্কার করে খোকনও এগিয়ে গেল। এ রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার যে ঘটতে পারে, তা সে কখন ভাবেও নি।

ফুলের ভেতর মানুষ থাকে নাকি।

ছোট্ট সুন্দর মুখখানি তো।

একটু ঝুঁকে খোকন অবাক হয়ে দেখতে লাগলো।

ফুলের ভেতর থেকে হাসি শোনা যাচ্ছে—কি মিষ্টি হাসি।

ছোট্ট, মুখখানি হাসিতে ভরে গেছে।

খোকন একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে—"আমাকে ডাকছিলেন ?"

"হ্যাঁ—"

বলেই আবার হাসি।

খোকন জিজ্ঞেস করলে—"আপনি অত হাসছেন কেন ?"

"আমি ?"

আবার মুখখানি তার হাসিতে ভরে গেল।

খোকনের এবার একটু রাগ হ'ল। কথাবার্তা নেই খালি হাসি।

"অত হাসছেন কেন শুধু শুধু ?"

"তোমাকে দেখে ! কি প্রকাণ্ড বড় তুমি। মাথার চুলগুলোও তোমার কি অদ্ভুত। সামনের দিকটা লম্বা—পেছনে মোটে নেই ! ওটা পরেছো কি তুমি ?"

"এটা জাঙ্গিয়া—"

"জাঙ্গিয়া ?"

হেসে লুটিয়ে পড়ল সে।

তার হাসির ধমকে অপরাজিতা ফুলটা পর্যন্ত দুলতে লাগল।

খোকন তো অবাক !

অমন সুন্দর করে তার চুল ছেঁটে দিয়েছে হীরু নাপিত—অমন চমৎকার জাঙ্গিয়া করে দিয়েছেন মাসীমা নিজে হাতে—আর তাই দেখে হাসছে এ ! পাগল না কি ? খোকন প্রথমটা ভদ্রতা করে 'আপনি' বলে কথা শুরু করেছিল—কিন্তু এখন বুঝতে পারলে, খাতির করবার মতো লোক নয় এ !

খোকন জিজ্ঞেস করলে—"তোমার নাম কি ?"

"নাম ? নাম মানে কি ?"

"নাম নেই তোমার ? তুমি ছেলে না মেয়ে ?"

"জানি না তো।"

"কোথা থাক তুমি ?"

"এই ফুলের ভেতর।"

এই অদ্ভুত লোককে আর কি প্রশ্ন করা চলতে পারে—খোকন ভাবতে লাগলো। এরকম সে দেখেও নি ভাবেও নি।

একটু ভেবে খোকন জিজ্ঞেস্ করলে—

"জাঙ্গিয়া পর না বুঝি তোমরা ? কি পর তাহলে ?"

এই শুনে তার মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল।

উত্তর না দিয়ে সে শুধু হাসতে লাগলো !

খোকন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল !

কিছুক্ষণ চুপ্চাপ্।

খোকন ভাবতে লাগলো একে আর কি বলা চলে। কিছু বল্লেই তো খালি হাসতে থাকবে।

এমন সময় ঘটল এক কাণ্ড !

শূন্য থেকে সুতো বেয়ে একটা মাকড়শা তর তর করে নেমে এসে পড়ল অপরাজিতা ফুলটার ওপর।

"ওগো-মা গো—"

ছোট মুখখানি ফুলের ভেতর পুট্ করে ঢুকে গেল।

খোকন ভাবতে লাগলো—"ওর মা আছে নাকি ?"

"টিট্ হড়মড়, টিট্টু খড়মড়—"

মাকড়শা কথা বলছে !

"চিং চিং খট্ খট্ হুড়মুড় টিট্টু—"

কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো।

খোকন্ বল্লে—"তুমি কি বলছ, কিছু বুঝতে পারছিনা। এ কোন্ দেশী ভাষা ?"

বড় বড় চোখ বার করে মাকড়শা বললে—

"ও তুমি বাঙ্লা ছাড়া আর কিছু বোঝনা বুঝি। আমি যা বলছি এ তালগাছি ভাষা! আমি ট্রেনিং নেবার জন্যে আকাশমুখী তালগাছের ডগায় ছমাস ছিলাম কিনা!

"সে আবার কোথায় ?"

ও তা জানোনা বুঝি! অপ্সরী নদীর ধারে প্রকাণ্ড এক মাঠ আছে। সেই মাঠের ঠিক মাধ্যখানে আকাশমুখী তালগাছ একা দাঁড়িয়ে আছে। শিকারী চিলের সেখানে বাসা। সেইখানে আমরা ট্রেনিং নিতে যাই। সেই তালগাছি ভাষা বলছি। কি সুন্দর ভাষা সেখানকার—

"টিট্টু খট্ মট্ মড় মড় টিট্টু, খন খট্ ঝন্ ঝন্ হড়মড় টিট্টু—"

খোকন তাড়াতাড়ি বললে—"চুপ কর তুমি—আর শুনতে চাইনা। ওর মানে কি ?"

"মানে ?"

মাকড়শার ড্যাবডেবে চোখ দুটো মিট্মিট্ করতে লাগল ! তারপর হেসে বললে—"ওর মানে—

মাছি কই মাছি কই পোকা কই পোকা কই
দিন রাত জাল পেতে পথ পানে চেয়ে রই—

আমি কবিতা লিখতে পারি, জালও বুনতে পারি। কেমন সুন্দর জাল বুনেছি দেখেছো ? ওই দেখো।"

এই বলে সে ওপর দিকে চাইলে।

খোকন দেখলে জবাফুলের গাছটার দুটো ডালের ফাঁকে সুন্দর একখানি মাকড়শার জাল। তাতে বিন্দু বিন্দু শিশির পড়েছে। মনে হচ্ছে সূক্ষ্ম রেশমের জালে কে যেন মুক্তো আর জড়ির কাজ করে দিয়েছে। এমন চমৎকার।

"কিন্তু কিছু হয়না—"

খোকন জিজ্ঞেস করলে, "কি হয় না ?"

"একটা মাছি বা পোকা আজ পর্যন্ত ধরতে পারিনি। জায়গা বদলাব ভাবছি !"

"ফ্যাঁস্—ফোঁস্—খবরদার—"

খোকন চমকে উঠল।

মাকড়শা তো সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান !

খোকন দেখলে, একটা কালো বেরাল লোম ফুলিয়ে পিঠটাকে বাঁকিয়ে ধনুকের মতো করে হাস্নাহানার ঝোপটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

হাস্নাহানা ঝোপের তল থেকে একটা প্রকাণ্ড বহুরূপী গিরগিটি গলা ফুলিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বলছে—

"চোপ্ রও—"

"বেরাল বললে, "জানিস্ আমি বাঘের মাসী—"

গিরগিটি সগর্বে ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে—

"তোর বাঘের আমি থোড়াই কেয়ার করি—কুমীর আমার মামা—"

"খবরদার"

"চোপ রও।"

খোকন দেখলে নির্ঘাৎ এইবার ভীষণ দাঙ্গা হবে একটা।

সে একটা ছোট ইঁট তুলে নিলে।

ইঁট তুলতেই বেরালটা ল্যাজ তুলে পালালো।

গিরগিটিও হাস্নাহানার ঝোপে সুট্ করে ঢুকে পড়ল।

টুম্ টুমা টুম্ টুম্
এ কি রাগের ধুম।
ইঁট ফেলে দাও খোকনমণি
ইঁট ফেলে দাও চাঁদ সোনা—
ও ইঁট গায়ে লাগলে পরে
বাঁচবো না রে বাঁচবো না।
ছোট্ট, আমি টুনটুনি।

খোকন দেখলে ছোট্ট একটা টুনটুনি পাখী হাস্নাহানার ডালে নাচছে আর গাইছে।

আজ এসব হচ্ছে কি!

হঠাৎ টুনটুনি ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল।

টুনটুনির কথামত খোকন ইঁটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

খোকনের গায়ে জোর তো কম নয়।

ইঁটটা কদমগাছটা ভেদ করে বোঁ করে পাঁচিল টপকে চলে গেল।

"কুহু, কুহু—কুহু—কুহু"

কোকিল ডাকছে।

খোকনের মনে হতে লাগলো যেন বলছে—

"উহু—উহু—উহু, উহু"

ইঁটটা লাগল না কি কোকিলটার?

ক্বড়-ক্বড়-ক্বড়-ক্বড়াৎ—

মেঘ ডেকে উঠল।

খোকন চেয়ে দেখলে সেই দৈত্যের মতন মেঘটা সমস্ত আকাশ দখল করে হুঙ্কার ছাড়ছে।

চতুর্দিক কালোয় কালো।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

চাঁদ নেই—শুকতারাও নেই।

"আচ্ছা খোকন, এই ভোরে খালি পায়ে শিশিরে শিশিরে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন? অসুখ করবে যে! বিষ্টি আসছে। ভেতরে যা। বিড়বিড় করে আপন মনে কি বকছিস্ তুই এত?"

ঠাকুমা বাগানে পুজোর ফুল তুলে বেড়াচ্ছেন।

খোকন চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

সত্যি, কোথায় এতক্ষণ ছিল সে?

যেন অন্য রাজ্যে!

ঠাকুমা ডাকতেই সব যেন মিলিয়ে গেল।

সে তাড়াতাড়ি বেড়ার কাছে গিয়ে দেখলে অপরাজিতা ফুলটি নেই।

"ঠাকুমা এইখানে যে ফুলটা ছিল—কি হল?"

"এই যে পুজোর জন্যে তুলেছি।"

খোকন একদৃষ্টে ছিন্ন অপরাজিতাটার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে। তার কেমন যেন কান্না পেতে লাগলো।

অবাক কাণ্ড

॥ এক ॥

মনি ছেলে খুব ভাল, যেমন পড়াশোনাতে, তেমনি খেলাধুলোয়। গ্রামের এক হাই স্কুলে পড়ে সে, বোর্ডিংএ থাকে। স্কুলে পড়াশোনা ভাল হয়, কিন্তু খেলাধুলোর তেমন ব্যবস্থা নেই। গরীব স্কুল। এক ফুটবল ছাড়া অন্য কোনও খেলার সরঞ্জাম রাখতে পারেন নি স্কুলের কর্তৃপক্ষ। মনি যখন গ্রামের পাঠশালাতে পড়ত, তখন থেকেই তার স্বপ্ন, হাইস্কুলে যখন পড়তে যাবে তখন টেনিস খেলা শেখবার সুযোগ পাবে। স্কুলে সে ফার্স্ট হয়ে স্কলারশিপ পেয়েছে। টেনিস চ্যাম্পিয়ন হবারও শখ তার। কিন্তু বাবা তাকে এমন স্কুলে পাঠালেন যেখানে টেনিস দূরে থাক ব্যাডমিন্টন খেলারও ব্যবস্থা নেই। একটা ছেঁড়া ফুটবলের পেছনেই দৌড়চ্ছে স্কুলসুদ্ধ ছেলে।

মনি কিন্তু দমবার ছেলে নয়। তাদের বোর্ডিংএর সামনে খানিকটা মাঠ পড়ে ছিল, মনি বই দেখে মেপেজুপে দেখলে, চমৎকার টেনিস বোর্ড হয় ওখানে। মনি তার বন্ধু বীরেনের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে ফেলল, চাঁদা তুলবে। স্কুলের প্রত্যেক ছেলে যদি কিছু কিছু করে দেয়,—বল, র‍্যাকেট আর নেট হয়ে যাবে। স্কুলের থার্ড মাস্টার মশায়ও উৎসাহ দিলেন। তিনি নিজে নগদ দু-টাকা চাঁদা দিলেন এবং বললেন, মাস্টারদের কাছ থেকে আরও কিছু তুলে দেবেন। খুব উৎসাহিত হল মনি আর বীরেন। কিন্তু চাঁদার খাতা হাতেকরে ছেলেদের কাছে দিনকয়েক ঘুরে বেড়াবার পর তারা নিঃসংশয়ে হৃদয়ঙ্গম করলে যে, ছেলেদের কাছে চাঁদা তুলে টেনিস খেলার ব্যবস্থা

করা যাবে না। নিচের ক্লাসের ছেলেরা চাঁদা দিলে না, কারণ টেনিস খেলার বয়সই হয় নি তাদের। টেনিস খেলার বয়স হয়েছে যাদের, সেরকম ছেলে স্কুলে চল্লিশটির বেশি নেই। তাদের মধ্যে জন পাঁচেক মাত্র চার আনা করে চাঁদা দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাকি সব দু আনা করে, তাও কেবল প্রতিশ্রুতি, নগদ কেউ দিলে না। আরও দিনদশেক ঘোরাঘুরির পর মাত্র আড়াইটি টাকা উঠল। থার্ড মাস্টার মশাই আরও পাঁচ টাকা তুলে দিলেন। কিন্তু মাত্র সাড়ে সাত টাকায় টেনিস খেলার ব্যবস্থা হয় না। খুবই নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ল মনি। বীরেন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, কিছু ভাবিস নি, হয়ে যাবে আস্তে আস্তে ঠিক। ভগবান আছেন। আমরাতো কোন খারাপ কাজ করছি না ভাই।

মনির মন খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে বলে উঠল, আরে দুত্তোর ভগবান-টগবান! ভগবান বলে কিছু নেই : থাকলে, একজন বড়লোক আর একজন গরীব হয় কি করে? আর বড়লোকগুলো দেখবি প্রায় পাজি হয়; ভগবান থাকলে কি পাজি লোকদের অত বাড়-বাড়ন্ত হয়?

বীরেন অবাক হয়ে গিয়েছিল। মনি বলে কী! ভগবান নেই? তবে এত মন্দির, মসজিদ, পুজো, মানত সব বাজে! বীরেন একটু ভীরু-গোছের, সে ফ্যালফ্যাল করে মনির মুখের দিকে চেয়ে রইল। এমন সময় থার্ড মাস্টার মশাই এলেন। বীরেন বললে, মনি বলছে কী জানেন স্যার? বলছে, ভগবান নেই—

থার্ড মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে পড়লেন।

বলেছ তুমি?

মনির কানের কাছটা লাল হয়ে উঠল।

ভগবান আছেন তা জানব কী করে? এখনও তো দেখি নি।

থার্ড মাস্টার হাসলেন একটু। জ্যামিতি পড়াতেন তিনি। বললেন, বিন্দু বলে একটা কিছু আছে, তা বিশ্বাস কর তো?

করি।

কী করে কর? বিন্দু তো দেখা যায় না! বিন্দুর সংজ্ঞাটা হচ্ছে, যার অবস্থান আছে কিন্তু পরিমাপ নেই। ও জিনিস আঁকা যায় না, কল্পনা করে নিতে হয়। রেখাও তাই। যার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ নেই, এও কল্পনা করে নিতে হয়, আঁকা যায় না বা দেখানো যায় না। ভগবানও সেই রকম। আছেন, কিন্তু দেখা যায় না, কল্পনা করে নিতে হয়।

থার্ড মাস্টারমশাই তারপর মনির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো ঠিকই, কিন্তু সেটা ঠিক জান না। তোমার চাঁদা কতদূর হল?

কিছু হয় নি স্যার। মোটে সাড়ে সাত টাকা হয়েছে।

হবে আরও। হেড মাস্টারমশাই কিছু দেবেন বলেছেন।

থার্ড মাস্টারমশাই চলে গেলেন।

॥ দুই ॥

সেইদিন রাত্রে মনি নিজের বিছানায় মশারির ভিতর শুয়ে যখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিল সেই সময় পাশের ঘরের হরি এসে তাকে টেনে তুলল। মনি, ওঠ্ ওঠ্ একজন ভদ্রলোক খুঁজছেন তোকে।

মনি তাড়াতাড়ি উঠে দেখলে, একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ তার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

ও, তুমিই বুঝি মনি? আমি তোমার বাবার বন্ধু। এখানে একটু কাজে এসেছিলাম, আর রাত্রে তোমার কাছেই থাকব। ভোরে উঠে চলে যাব আবার। শোবার জায়গা হবে একটু?

হ্যাঁ হবে, আসুন।

মনি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানাটি দেখিয়ে দিলে। এখানেই শোন আপনি। আপনার খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ। এটা তো তোমার বিছানা, তুমি শোবে কোথায়?

আমি কারও কাছে গিয়ে শোব এখন। আপনি শুয়ে পড়ুন।

তাঁকে শুইয়ে, মশারিটি ভাল করে মুড়ে দিয়ে মনি বেরিয়ে গেল। খুব আনন্দ হল তার। কিন্তু কারও ঘরেই সে শোবার জায়গা পেল না। অবশেষে কমনরুমের টেবিলে গিয়ে শুয়ে পড়ল সে। কিন্তু ঘুম এল না। ভয়ানক মশা। মশার কামড়ে ছটফট করতে লাগল বেচারা। সমস্ত রাত এ-পাশ ও-পাশ করে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল অবশেষে।

বোর্ডিংের চাকরটা এসে ঘুম ভাঙাল তার। আর বললে, একটি বুড়ো বাবু আপনাকে এই চিঠিটি দিয়ে গেছেন, আর এই বাক্সটা রেখে গেছেন।

মনি দেখল, কমন-রুমের এক কোণে প্রকাণ্ড একটা প্যাকিং কেস রয়েছে। চিঠিতে লেখা ছিল, কাল আড়াল থেকে তোমাদের কথাবার্তা আমি শুনেছিলাম। থার্ড মাস্টারমশাই ঠিক কথাই বলেছিলেন। ভগবানে তোমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু তুমি সেটা জান না। কাল পরীক্ষা করে দেখলাম। তোমার ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়েছি। যার ভগবানে বিশ্বাস নেই, সে ভদ্র হতে পারে না। কারণ, একটু ত্যাগ না করলে, একটু পরার্থপর না হলে ভদ্র হওয়া যায় না। আর, যে পরের জন্য ত্যাগ করতে শিখেছে সে তো পশুত্বের স্তর ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে। সে সেই রাস্তায় চলতে শুরু করেছে, যে-রাস্তায় চললে ভগবানের দেখা পাওয়া যায়। পরার্থপরতার মূলে আছে ভগবানের আকর্ষণ, সব সময় সেটা আমরা বুঝতে পারি না। কারও জন্য নিঃস্বার্থ-ভাবে কিছু ত্যাগ করলে সঙ্গে-সঙ্গে আনন্দলাভ হয়, মানে, সঙ্গে-সঙ্গে ভগবানের দেখা পাওয়া যায়, কারণ ভগবানই তো আনন্দস্বরূপ। তোমার ব্যবহারে খুব খুশি হয়েছি। এ বাক্সে কিছু উপহার রেখে গেলাম তোমার জন্য।

চিঠিতে কারও নাম নেই। হাতের লেখা মুক্তোর মতো। মনি তাড়াতাড়ি গিয়ে বাক্সটা খুলে ফেলল। অবাক হয়ে গেল। বাক্সের ভিতরে রয়েছে ছটা টেনিস বল, চারটে কালো র‍্যাকেট, আর চমৎকার একটি নেট।

আলোক পরী

॥ এক ॥

সুধাংশু আর অনিল দুই বন্ধু। গতবার ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে দুজনেই কলেজে ঢুকেছে। দুজনেই ভাল ছেলে। পড়শোনায় ভাল, খেলাধুলোয় ভাল, সব বিষয়ে ভাল। দুজনের মনের মিলও খুব। একটি বিষয়ে কেবল অমিল ছিল। সুধাংশুর ধারণা, পরার্থপরতাটা একটা সদ্‌গুণ বটে, কিন্তু স্বার্থপরতাটা আরও বড় গুণ, নিজের উন্নতিটা আগে দরকার। আত্মরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ নিয়ে প্রায়ই তাদের তর্ক হত। দুজনেই নানারকম নজির দেখিয়ে নিজের নিজের মত প্রমাণ করবার চেষ্টা করত। কিন্তু তর্কের কোন মীমাংসা হত না।

একদিন কিন্তু অদ্ভুত উপায়ে মীমাংসা হয়ে গেল। এক পরী মীমাংসা করে দিলে। সেই গল্পই আজ তোমাদের বলব। তোমরা হয়তো মুচকি মুচকি হাসছ, ভাবছ, পরী বলে কিছু আছে নাকি! আছে বৈকি। পিঠে ডানা লাগানো যেরকম পরীর ছবি আমরা রূপকথার বইয়ে সাধারণত দেখি সেরকম পরী আছে কি না জানি না—আমি অন্তত দেখি নি কখনও—কিন্তু পরী আছে। তারা আমাদের আশেপাশে অনেক সময় নানা বেশ ধরে ঘুরে বেড়ায়, আমরা চিনতে পারি না। এই যে প্রজাপতির দল নানারঙের পাখা দুলিয়ে উড়ে বেড়ায়, ওর সবাই প্রজাপতি নাও হতে পারে। কেউ কেউ হয়ত পরী। নির্জন অরণ্যে বা গভীর রাত্রে যেসব সূক্ষ্ম সুর বা শব্দ আমরা শুনতে পাই, তা হয়তো পরীদের আলাপ। এই যে গাছে গাছে প্রত্যহ অসংখ্য ফুল ফুটছে, কত রঙের কত ধরনের ফুল, ওরা সবাই যে ফুল, তার অকাট্য প্রমাণ আছে কোন? কোন কোন ফুল হয়তো পরী, ফুলের ছদ্মবেশে আছে; কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবীর আলো বাতাস উপভোগ করে, তারপর টুপ্‌ করে ঝরে পড়ে। স্বপ্নের দেশে চলে যায়। আবার আসে!

সুধাংশু আর অনিল যে পরীটিকে দেখে ছিল তার চেহারা প্রথমে মানুষের মতো ছিল না, আলোর সূক্ষ্ম রেখা একটি। গঙ্গার ধারে যে গুহাটি আছে, তার ভিতর ঢুকেছিল তারা একদিন। গুহাটির সম্বন্ধে নানা রকম প্রবাদ প্রচলিত ছিল। কেউ বলত ওটা নবাবী আমলের সুড়ঙ্গ। বিপদের সময় নবাবরা ঐ গুপ্তপথ দিয়ে পালিয়ে নাকি আত্মরক্ষা করতেন। কেউ বলত ওখানে পুরাকালে এক মুনির আশ্রম ছিল। তাঁর তপস্যায় বিচলিত হয়ে নাগরাজ বাসুকি নাকি পাতাল থেকে উঠে এসেছিলেন। মাটি ফুঁড়ে এসেছিলেন, এসে তপস্বীবরকে সসম্মানে নিজের রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারও কারও মতে, ওটা কতগুলো ফিরিঙ্গির কীর্তি। বহুকাল আগে আমাদের দেশে পর্তুগীজ বণিকরা এসেছিল। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যেন তেন প্রকারেণ টাকা রোজগার করা। তারা ডাকাতি, রাহাজানি, মানুষ চুরি, সব রকম করত। অনেকে বলেন, কয়েকটা ফিরিঙ্গি বণিক ঐখানে কিছু গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধান পেয়েছিল, ঐ জায়গাটায় মোগল আমলের এক বড়লোকের বাড়ি ছিল নাকি এককালে। ফিরিঙ্গিরা নাকি ঐ জায়গাটা খুঁড়ে অনেক টাকা, অনেক হীরাজহরৎ পেয়েছিল। তারাও তাদের লুটপাট করা টাকা নাকি ঐ গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখত।

এই ধরনের নানা গল্প প্রচলিত ছিল গুহাটা সম্বন্ধে। কিছুদিন আগে শোনা যায় দুজন ডানপিটে সাহেব নাকি গুহার মধ্যে ঢুকেছিল, আর ফেরে নি। গুহার ভিতর থেকে একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ মাটির নিচে কোথায় যে চলে গেছে তা কেউ জানে না। শোনা যায় সুড়ঙ্গটা ভিতরের দিকে গিয়ে দু-ভাগ হয়ে গেছে, কেউ কেউ বলে, তিন ভাগ। মোট কথা, গুহাটা সম্বন্ধে নানারকম গল্পগুজব প্রচলিত ছিল।

অনিল আর সুধাংশুর অনেকদিন থেকে ইচ্ছা ছিল গুহাটার ভিতর ঢুকে দেখে ব্যাপারটা কী। সুযোগও হয়ে গেল একদিন। সামনে কিসের যেন ছুটিও পড়ে গেল একটা। শহর থেকে গঙ্গার তীর, যেখানে সেই গুহা আছে, প্রায় দু-ক্রোশের উপর। খুব ভোরে উঠে হেঁটেই রওনা হল দুজনে। চলে যেতে যেতে সেই পুরাতন তর্কটা উঠে পড়ল আবার। হেতুও জুটে গেল একটা। দুজনেই একটা করে পাঁউরুটি নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে। গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে যদি দেরি হয়ে যায়, কিংবা তার ভিতরে ঢুকে যদি পথ হারিয়ে ফেলে, তাহলে ও দুটো কাজে লাগবে। কিন্তু রাস্তায় কিছুদূর এগিয়েই দেখা হয়ে গেল এক ভিখারীর সঙ্গে। জীর্ণ শীর্ণ চেহারা, কোটরগত চক্ষু, গায়ে শতছিন্ন একটা আলখাল্লা। পোড়া কাঠের মতো হাতদুটো বার করে সে বলতে লাগল, বড্ড খিদে পেয়েছে বাবু, আট-দশ দিন কিছু খেতে পাই নি, দয়া করে কিছু ভিক্ষা দিন আমাকে হুজুর, ভগবান আপনাদের মঙ্গল করবেন—

সুধাংশু দাঁড়িয়ে পড়ল।

অনিল বলল, থামলি কেন, চল—

ভাবছি আমাদের তো দুটো পাঁউরুটি আছে, একটা ওকে দিয়ে দিলে কেমন হয়—

পাগল নাকি! ওকে দিলে আমরা খাব কী?

একটাতেই আমাদের দুজনের চলে যাবে না? কতই বা খাব আমরা—

খিদের মুখে একটা পাঁউরুটি তো নস্যি? জোর খিদে পেলে দুটোতেই কুলুবে কি না সন্দেহ।

ভিখারীটা নাকি সুরে আবার শুরু করল, বড্ড খিদে পেয়েছে বাবু, দোহাই আপনাদের একটা রুটি দিন আমাকে!

যাও যাও, খেটে খাও গিয়ে। ভিক্ষে করে পেট ভরে কখনও?

ধমকে উঠল অনিল।

সুধাংশুর কিন্তু সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল খুব। অনিলের দিকে কাচু-মাচু ভাবে চেয়ে সে বললে, দিয়েই দি আমার রুটিখানা, কী বল। সত্যিই বেচারার—

দিতে হয় দাও, কিন্তু খিদে পেলে আমারটা নিয়ে যেন টানাটানি কোরো না। আমি একটি টুকরো দেব না, তা বলে দিচ্ছি।

সুধাংশু হাসল একটু। তারপর দিয়ে দিল পাঁউরুটিটা ভিখারীকে।

এই সূত্র ধরে আবার শুরু হল সেই পুরাতন তর্কটা। তর্ক করতে করতেই তারা পেঁছিল গিয়ে গুহার মুখে।

॥ দুই ॥

গুহার ভিতর কিছুদূর গিয়েই তারা বুঝতে পারল, টর্চ না এনে তারা ভুল করেছে। গুহার ভিতর ভীষণ অন্ধকার। মাথাটাও ঘুরতে লাগল তাদের। আস্তে আস্তে হাতড়ে হাতড়ে তবু তারা এগুতে লাগল। মনে হতে লাগল ক্রমশই যেন তারা নিচের দিকে নামছে। কিছু সিঁড়িও পাওয়া গেল কিছুদূরে গিয়ে। সিঁড়ি পেয়ে নামবার কিছু সুবিধে হল যদিও, কিন্তু অন্ধকারের জন্য অসুবিধেও হতে লাগল খুব। সামনে কিছু আছে কিনা দেখা যায় না। হোঁচট খেলে কয়েকবার, তবু তারা আরও কিছুদূরে গেল। যতদূর সিঁড়ি পাওয়া গেল ততদূরে কোনক্রমে নেবে গেল তারা। কিন্তু কিছুদূরে গিয়েই দেখা গেল সিঁড়ি আর নেই, একটা ঘরের মতো জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তারা। কিছুক্ষণ হাতড়ে হাতড়েও কিন্তু ঘর থেকে বেরোবার রাস্তা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যেদিকেই যায় সামনে দেয়াল।

অনিল বললে, আজ ফিরে যাই চল। টর্চ নিয়ে আর একদিন আসা যাবে। আমার কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দুজনেই বসে পড়ল। সুধাংশুরও ফিরে যাবার ইচ্ছে করছিল, তারও মাথা ঘুরছিল, কিন্তু এমন সময় এক কাণ্ড ঘটল। ছাদের ওপর থেকে একটা সরু আলোর রেখা প্রবেশ করল ঘরের মধ্যে। মনে হল টর্চের অভাবটা কেমন পূর্ণ করে দিলে।

সুধাংশু বললে, কোনও ফাটল দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকল বোধ হয়।

অনিল উত্তর দিলে, তাছাড়া আর কী, ভালই হল। ঐ যে ওদিকে আর একটা সুড়ঙ্গের মতো দেখা যাচ্ছে। আর একটু এগিয়ে চল, দেখাই যাক—

দেখা গেল, ঘরের মেঝেতে এক কোণে সুড়ঙ্গ আছে আর একটা। সেটা কিন্তু এত ছোট যে তাতে দুজনে একসঙ্গে ঢোকা যাবে না। একে-একে ঢুকতে হবে।

অনিল জিগ্যেস করল, ঢুকবি ওর ভিতর?

ঢুকব বলেই তো এসেছি।

তুই তাহলে আগে ঢোক।

সুধাংশু ঢুকে পড়ল তার ভিতর। একটু পরে অনিলও ঢুকল।

॥ তিন ॥

দুজনে কিন্তু হাজির হল দু-জায়গায় গিয়ে।

অনিল একটি ঘরের ভিতর গিয়ে পড়ল। ঘরটি একটি মৃদু আলোয় ঈষৎ আলোকিত, কার যেন মৃদু হাসি সমস্ত ঘরখানিতে ছড়িয়ে রয়েছে। অনিলের অবশ্য এ কথা মনে হল না। কারণ আলোকে সে পরী বলে চিনতে পারে নি। তার এবং সুধাংশুর দুজনেরই মনে হয়েছিল যে, কোনও ফাটল দিয়ে রোদ ঢুকেছে। সুধাংশুকে না দেখতে পেয়ে কিন্তু ভয় হল তার। ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখলে, কেউ কোথাও নেই, অন্য কোথাও যাবার রাস্তাও নেই। ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অনিল যদি আলোর ভাষা বুঝতে পারত, তাহলে অনুভব করত নীরব ভাষায়

আলো মৃদু হেসে তাকে যেন বলছে—সুধাংশু না থাকাতে ভালই তো হয়েছে। সমস্ত রুটিটা একাই তো খেতে পারবে, ওকে আর ভাগ দিতে হবে না—

অনিলের কিন্তু এসব কথা মনে হল না। আলোর ভাষা বোঝাবার মতো বুদ্ধি তার ছিল না। সে সুধাংশুর নাম করে আরও কয়েকবার ডেকে বসে পড়ল ঘরের মেঝেতে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, খিদেও পেয়েছিল বেশ। পাঁউরুটিটা খেতে গিয়ে কিন্তু অবাক হয়ে গেল সে। একী কাণ্ড! পাঁউরুটি পাথর হয়ে গেছে, ছেঁড়া যাচ্ছে না, ভারীও বেশ। একী! দাঁত বসাবার চেষ্টা করতেই পাঁউরুটি কথা কয়ে উঠল—

অনিল, তোমার নীতি অনুসরণ করে আমি স্বার্থপর হয়েছি, আত্মরক্ষার জন্য বর্ম পরেছি। আমাকে সহজে ঘায়েল করতে পারবে না।

অনিলের সমস্ত শরীর ভয়ে কেঁপে উঠল। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

॥ চার ॥

সুধাংশু গিয়ে হাজির হয়েছিল আর একটা ঘরে। খুব ছোট্ট ঘর, আর তার সমস্ত মেঝেটা জুড়ে চিত্র-বিচিত্র করা প্রকাণ্ড পাথরের মতো কি যেন একটা। সুধাংশুও কম ক্লান্ত হয় নি, তারও খুব খিদে পেয়েছিল। কিন্তু সে তো তার নিজের পাঁউরুটি দান করে ফেলেছে। অনিল তাকে পাঁউরুটির ভাগ দেবে না জেনেও করেছে। সুতরাং ক্ষুধা সহ্য করা ছাড়া উপায় কী। অনিলের ঘরের মতো এ ঘরটি মৃদু আলোয় ভরা। আলো নয়, যেন হাসি! সুধাংশুর পাদুটো ব্যথা করছিল খুব। সেই চিত্র-বিচিত্র পাথরটার ওপর সে বসে পড়ল। বসেই কিন্তু লাফিয়ে উঠতে হল তাকে। পাথরটা জীবন্ত, নড়ছে! তারপর ভাল করে চেয়ে দেখলে—ওটা পাথর নয়, বিরাট একটা সাপ, কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে বিরাট অজগর। শেষে মানুষের ভাষায় কথাও কইল। সুধাংশু অবাক হয়ে গেল যখন অজগর তাকে সম্বোধন করল।

অজগর বললে, সুধাংশু তোমারই জন্যে বহুকাল থেকে অপেক্ষা করছি।

আমার জন্যে? কেন?

তোমাকে খাব বলে।

আমাকে খাবে! সেকি!

তুমি পরার্থপর ত্যাগী লোক, একটু আগেই নিজের খাবার একজন ক্ষুধার্ত ভিখারীকে দান করেছ। দাতাকর্ণ, দধীচি, শিবি প্রভৃতির উদাহরণ দেখিয়ে অনিলকে তর্কে হারিয়ে দিয়েছ বারবার। সেজন্য আশা করে আছি আমার ক্ষুধা তুমিই নিবারণ করবে। আমি হাঁ করছি, এস আমার মুখের মধ্যে ঢুকে পড়। বহুদিন অনাহারে আছে। চলে এস, আর দেরি কোরো না।

এই বলে অজগর প্রকাণ্ড হাঁ করে এগিয়ে আসতে লাগল সুধাংশুর দিকে। সুধাংশু ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল। তারপর সেও অজ্ঞান হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

দুজনের যখন জ্ঞান হল তখন দুজনেই দেখলে তারা পাশাপাশি শুয়ে আছে, আর একটি ফুটফুটে মেয়ে তাদের দিকে চেয়ে মুচকি-মুচকি হাসছে। রঙ যেন ফেটে পড়ছে! একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল, কালো চোখের তারাদুটি নাচছে আর তা থেকে উপছে পড়ছে আলো।

কী কাণ্ড! এখানে ঢুকেছিলে কেন তোমরা! এই গুহায় ঢুকে কত লোক মারা গেছে জান? ভাগ্যে আমি কাছাকাছি ছিলাম! গোঁ গোঁ শব্দ শুনে দৌড়ে এলাম। এসে দেখি, তোমরা দুজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছ। গঙ্গা থেকে আঁচল ভিজিয়ে এনে তোমাদের চোখেমুখে জল দিলাম, তবে তোমাদের জ্ঞান হল। আর কখনও এস না এখানে, এই গুহার ভিতর থেকে মাঝে মাঝে বিষাক্ত হাওয়া বের হয়। চল বাইরে চল—

মেয়েটির সঙ্গে আস্তে আস্তে তারা গুহা থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে দেখে, গুহায় ঢোকবার দ্বারের কাছে তিনটি বড়-বড় পাকা আম রয়েছে। দুজনেরই খুব খিদে পেয়েছিল, দুজনেই আমগুলির দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। মেয়েটি মুচকি-মুচকি হাসছে।

অনিল জিগ্যেস করলে, এখানে আম এল কী করে?

মেয়েটি বললে, আমার আম। আমি রেখে গেছি এখানে। খেতে ইচ্ছে করছে নাকি?

খুব।

সুধাংশু বললে, আমারও খুব খিদে পেয়েছে।

মেয়েটি হেসে বললে, তা বলে সবগুলো দিচ্ছি না। ভাগাভাগি করে নি। তোমরা দুজনে একটা একটা করে নাও, আমার জন্যে একটা থাক। বেশি স্বার্থপরতাও ভাল নয়, পরার্থপরতাও ভাল নয়। কী বল? এই নাও।

মেয়েটি দুজনকে দুটি আম দিলে, তারপর নিজের আমটি নিয়ে ছুটে চলে গেল। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আলোক-পরীকে ওরা চিনতে পারলে না। ওদের তর্কের কিন্তু মীমাংসা হয়ে গেল। ঐ ছোট মেয়েটি ওদের বুঝিয়ে দিয়ে গেল, কোনও কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়, সামঞ্জস্য করে না চলতে পারলেই দুঃখ পেতে হয়।

নাটক

বাঁশি

[পথ। নানারকম শব্দ শোনা যাচ্ছে। রিক্‌শার টুন্‌ টুন্‌ শব্দ, মোটরের হর্ন, ছেলেদের চীৎকার, দূরে একটা হাতুড়ি পেটার শব্দ,—নানারকম শব্দে চতুর্দিক মুখরিত।]

মাধব। রামবাবু যে, নমস্কার, অনেক দিন পরে দেখা হল। খবর সব ভাল তো।

রাম। আজ্ঞে না। বাড়িসুদ্ধ সব অসুখ। গিন্নীর হাঁপানি বেড়েছে। আপনার খবর ভালো আশা করি।

মাধব। আমার ব্লাড প্রেসার জ্বালাচ্ছে। ওষুধ খেয়ে খেয়ে জেরবার হয়ে গেলাম। দ্বিজেন ডাক্তার বলে বিশ্রাম নাও। আমাদের বিশ্রাম নাও বললেই কি নেওয়া যায়। আচ্ছা চলি। তেল কিনেছেন দেখছি। আজ কত কিলো।

রাম। ন'টাকা কেজি। শুনছি আরও বাড়বে।

[রাম আর মাধব চলে গেল। জগৎ চীৎকার করে উঠল হঠাৎ।]

জগৎ। ও পিওন, ও পিওন। আমার নামে কোনও মণি অর্ডার এসেছে কি ?

পিওন। আজ্ঞে না।

জগৎ। রেজেস্ট্রি চিঠি বা ইনসিওর চিঠি।

পিওন। আজ্ঞে না, কিছু আসেনি।

[পিওন চলে গেল। জগতের পাশেই হেমন্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন।]

জগৎ। আরে হেমন্ত যে—

হেমন্ত। তোমার ছেলে তো তার বউকে নিয়ে দার্জিলিঙে গেছে।

জগৎ। তাই নাকি। তুমি কি করে জানলে—

হেমন্ত। আমিও যে দার্জিলিং গিয়েছিলাম কাল এসেছি। আচ্ছা এখন চলি ভাই। দেরী হলে মাছ পাব না। পনেরো টাকা কেজি মাছও পড়তে পায় না। আজ জামাই এসেছে, কিনতেই হবে কিছু পাকা মাছ। চলি ভাই—

[হেমন্ত চলে গেলেন।]

জগৎ। অমল দার্জিলিং চলে গেছে ? আমাকে কিছু জানায় নি তো। আশ্চর্য ! হাতে একটি পয়সা নেই, কি করি এখন। সাত দিন আগেই অমল টাকা পাঠাবে লিখেছিল। দার্জিলিং চলে গেছে। আশ্চর্য !

[হঠাৎ যেন অকূলে কূল পেলেন।]

এই যে বিনয়। তোমার দেখা পেয়ে বাঁচলুম। আমাকে গোটা কয়েক টাকা ধার দিতে পার ভাই।

বিনয়। এখন সঙ্গে তো টাকা নেই। আমি তাগাদা করতে বেরিয়েছি। দোকান থেকে ক্রমাগত ধার নিয়ে গেছে, একটি পয়সা শোধ করেনি কেউ।

জগৎ। দু'চার টাকাও হবে না ?

বিনয়। একটি পয়সা নেই দাদা।

জগৎ। তাহলে বিলাসের কাছে যাই। এখন গেলেই তাকে ধরতে পারব।

[জগৎ চলে গেলেন]

বিনয়। এর আগে তিনবার আমার কাছে টাকা নিয়েছেন। এখনও শোধ করেন নি। আবার টাকা চাইতে লজ্জাও করে না। ওহে রাজেন, দোকান খুলেছ দেখছি—ভালো ব্রাণ্ডি আছে ?

রাজেন। আছে।

বিনয়। দাও এক বোতল। বিলিতি মাল তো ?

রাজেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। খাঁটি বিলিতি।

বিনয়। দাও।

[এক বোতল ব্র্যাণ্ডি নিয়ে চলে গেলেন। তর্ক করতে করতে হাবুল ও কানুর প্রবেশ]

হাবুল। তুমি তাহলে বলছ দোষী আমাদের গভর্নমেণ্ট নন, আমরাই।

কানু। আমরাই তো গভর্নমেণ্ট। আমরা যদি ভালো হই গভর্নমেণ্টও ভালো হবে। তুমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পার যে তুমি সৎপথে বরাবর চলছ ? কখনও মিথ্যে কথা বল না, কখনও ঘুষ নাও না।

হাবুল। ঘুষ না নিলে সংসার চলে না ভাই এ বাজারে।

[খুব জোরে হর্ণ দিয়ে একটা মোটর চলে গেল। ওদের কথা শোনা গেল না আর। মোটর চলে যাওয়ার পর দেখা গেল তারা অন্য প্রসঙ্গে এসে পড়েছে]

হাবুল। তুমি আমার মেয়েকে যে গান শেখাচ্ছ তার কথাগুলো তো অদ্ভুত।

নীলকণ্ঠের গানের সুরে
পাগল হল লাল মুনিয়া
পেছনে গেল হলদে পাখি
তালাক দিল টুনটুনিয়া।

এর মানে কি ?
নীলকণ্ঠের ডাক শুনেছ কখনও ?
ও রকম কর্কশ কণ্ঠ পাখী খুব কম আছে—

কানু। গানে সুরই প্রধান। কথাটা সুরের বাহন। নী—ই—ই—ইল বলে যে টানটা দেওয়া হয়—

[আবার বাধা পড়ল। জগুবাবুর বাড়ির বুড়ো ঝি নিস্তারিণী প্রবেশ করল]

নিস্তারিণী। হ্যাঁ গা বাবুরা আমার বাবুকে তোমরা দেখেছ কেউ ? সকাল থেকে বেরিয়েছেন এখনও ফেরেন নি। মা হা-পিত্যেশ করে বসে আছে।

হাবুল। কে তোমার বাবু ?

নিস্তারিণী। জগুবাবু।

কানু। না আমরা চিনি না।

নিস্তারিণী। বুড়ো মানুষ ঝোলা গোঁফ, চোখে ভালো দেখতে পায় না একটু কুঁজো—

হাবুল। না, না আমরা চিনি না। কি আপদ। চল, মাঠের দিকে যাই—আজ মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল সেমিফাইনাল।

কানু। হ্যাঁ চল।

[দুজনে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় পেছন থেকে যামিনীবাবু ডাক দিলেন—]

যামিনী। ও মশায়রা বলতে পারেন আজ কি পূর্ণিমা।

কানু। ঠিক জানি না।

হাবুল। পূর্ণিমার খবর নিচ্ছেন কেন?

যামিনী। দিন কুড়ি আগে এক সাধু মাঠে বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে, আগামী পূর্ণিমায় বাঁশি শোনা যাবে। যারা সচ্চরিত্র যারা নিষ্পাপ তারা যদি বাঁশির স্বর শুনে বাঁশিওলার দিকে যায় তার দেখা পাবে। আর তার দেখা পেলে তিনি নাকি তার সব দুঃখ মোচন করে দেবেন।

হাবুল। আমিও কথাটা শুনেছি বটে। সাধুর বক্তৃতা আমি শুনিনি। কার্তিক শুনেছিল। তারই কাছে শুনেছি। না মশাই, আজ পূর্ণিমা কিনা জানি না।

কানু। চল আর দেরি করলে টিকিট পাবে না।

হাবুল। ব্ল্যাকে পাব ঠিক। চল।

[দুজনে চলে গেল, নিস্তারিণী এদের কথা শুনছিল। সে এইবার কথা কইল]

নিস্তারিণী। হ্যাঁ বাবু, আজই পূর্ণিমা।

যামিনী। ঠিক জান, পাঁজি দেখেছ?

নিস্তারিণী। কোথা আছেন তা কি জানি। দেখার দরকার হয় না। প্রতি পূর্ণিমায় আমার বাঁ হাঁটুতে ব্যথা হয়। আজ হয়েছে। আজ পূর্ণিমা।

[যামিনীবাবু চলে গেলেন। নিস্তারিণী দাঁড়িয়ে রইল]

নিস্তারিণী। বাবু যে কোন দিকে গেলেন।

[একটা রিকশাওলা এল এবং নিস্তারিণীর পায়ের উপর চাকা চালিয়ে দিল।]

নিস্তারিণী। উহু উহু উহু। আমার পা-টা থেঁতলে দিয়ে গেল।

[রিকশাওলা রিকশা থামালো]

রিকশাওলা। আমি দেখতে পাইনি মা। উঠুন আপনি আমার রিকশার উপর। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

নিস্তারিণী। আমি আমার বাবুকে খুঁজতে বেরিয়েছি। তুমি যাও। রিকশায় চড়বার পয়সা আমার নেই।

রিকশাওলা। পয়সা নেব না। কোথায় যাবেন চলুন—

নিস্তারিণী। আমি আমার বাবুকে না নিয়ে যাব না।

রিকশাওলা। কোথা আছেন তিনি—

নিস্তারিণী। কোথা আছেন তা কি জানি। সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। এখনও ফেরেন নি।

রিকশাওলা। বুড়ো মানুষ?

নিস্তারিণী। হ্যাঁ বুড়ো মানুষ। ঝোলা গোঁফ একটু কুঁজো। দেখেছ তুমি এ রকম কাউকে?

রিকশাওলা। ওদিকের মোড়ে একজন বুড়ো অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। তাকে ঘিরে ভিড় জমেছে দেখলাম।

নিস্তারিণী। আমাকে সেইখানে নিয়ে চল বাবা।

[রিকশায় চড়ে নিস্তারিণী চলে গেল। গোপাল, ভূধর এবং আরও কয়েকজনের প্রবেশ]

গোপাল। আজই পূর্ণিমা। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে। গুপ্তপ্রেস মতে কাল।
ভুধর। আপনি নিজে শুনেছেন সেই সাধুর বক্তৃতা?
গোপাল। স্বকর্ণে শুনেছি।
আর একজন। আমিও শুনেছি।
আর একজন। আমিও শুনেছি।
আরও কয়েকজন। আমরাও শুনেছি।
ভুধর। সন্ন্যাসী বললেন যে, পূর্ণিমায় বাঁশি বাজবে। আর সেই বাঁশিওলার কাছে পৌঁছতে পারলে আমাদের সব দুঃখ মোচন করবেন তিনি।
গোপাল। কিন্তু সচ্চরিত্র না হলে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না।
ভুধর। আমি ত্রিসন্ধ্যা করি মশাই, বৃন্দাবন বাবার কাছে দীক্ষা নিয়েছি। বাঁশি যদি বাজে আমি তার দেখা পাবই।
গোপাল। আমি নেশা ভাং করি, খুব যে একটা সচ্চরিত্র তা-ও নই।
তবে বাঁশি যদি বাজে বাঁশিওলাকে খুঁজে বার করবই।
অন্যান্য সকলে। আমরা সবাই যাব।

[হল্লা করতে করতে চলে গেল। খুব জোরে হুইস্‌ল্‌ বেজে উঠল। ছুটে এল একদল লোক একটা ছোঁড়ার পিছু পিছু। পুলিশও সঙ্গে আছে। একজন সেই হুইস্‌ল্‌ বাজাচ্ছে]

একজন। পকেটমার পকেটমার ধরুন, ধরুন ব্যাটাকে।

[পকেটমার ধরা পড়ে গেল। সবাই মারতে লাগল তাকে। আর্তনাদ করতে লাগল ছোঁড়াটা। সেই রিক্‌শাটির পুনঃপ্রবেশ। রিক্‌শার উপর জগুবাবু এবং নিস্তারিণী। জগুবাবুর মুখ ভাবলেশহীন। নিস্তারিণী রিক্‌শা থেকে নেমে পড়ল]

নিস্তারিণী। ওগো কাকে ধরে মারছ গো। ও-যে আমার ন্যাশলা—কি করেছে ও?
একজন। আমার পকেট থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়েছিল গো।
নিস্তারিণী। ব্যাগ পেয়েছো?
লোকটি। হ্যাঁ, এই যে। ওর প্যান্টের পকেটে ছিল।

[নিস্তারিণী এগিয়ে গিয়ে ছোঁড়াটার গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারল]

নিস্তারিণী। আমার নাতি।
পুলিশ। আমি থানায় নিয়ে যাব।
নিস্তারিণী। মড়ার উপর আর কত খাঁড়ার ঘা দেবে বাবা। বাবু তাঁর ব্যাগ ফিরে পেয়েছেন, তোমরা হাতের সুখ করে নিয়েছ, এবার ও মড়াটাকে ছেড়ে দাও। যে ঘাটে ঠেকবার ঠেকুক গিয়ে।
পুলিশ। চুরি করলে থানায় যেতে হয়।
নিস্তারিণী। চুরি করবে না, চারিদিকে এত লোভের জিনিস ছড়ানো রয়েছে, লেখাপড়া শেখাতে পারিনি, সামর্থ্যে কুলোয় নি, রোজগার করতে পারে না, তাই চুরি করে। ওকে ছেড়ে দাও।
পুলিশ। না—ওকে থানায় যেতে হবে—চল—আরে—

[ছোঁড়াটা হঠাৎ ছুটে একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়ল। সবাই হই হই করে ছুটল তার পেছনে। পুলিশ আর একবার হুইস্‌ল্‌ দিল]

রিক্‌শাওলা। আপনাদের বাড়ি কত দূরে মা—

নিস্তারিণী। এই যে বাবা এসে পড়েছি—ওই থামটার কাছে দাঁড়াও। আমরা নেমে যাচ্ছি।

জগ্‌বাবু। বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ কেন আমাকে। আমি বাজার করতে পারি নি। কোথাও ধার পাই নি।

নিস্তারিণী। আমি আমার নিজের পয়সা দিয়ে বাজার করে এনেছি। তুমি ভাবছো কেন। নামো—

[একটি ভিখারিণীর প্রবেশ]

ভিখারিণী। দু'দিন কিছু খাই নি বাবা। দয়া করে কিছু দিন বাবা। আমার ছেলেটিও দু'দিন থেকে অনাহারে আছে—দয়া করুন বাবা।

নিস্তারিণী। ও কাত্যায়নী, ও কাতু, একটু শোন—

[কাত্যায়নীর প্রবেশ]

কাত্যায়নী। কি বলছিস ?

নিস্তারিণী। তোর কাছে টাকা আছে দুটো ?

কাত্যায়নী। আছে, কেন ?

নিস্তারিণী। আমাকে দে এখন—কাল ফেরত দেব—

কাত্যায়নী। এক টাকা গোটা আছে। আর এক টাকা খুচরো—

নিস্তারিণী। খুচরোই দরকার। যা আছে দে—

কাত্যায়নী। আজ পূর্ণিমা। শুনছি আজ নাকি বাঁশি বাজবে। আমি যাব। তুই যাবি ?

নিস্তারিণী। আমার আজ অবসর নেই।

কাত্যায়নী। চললুম—

[কাত্যায়নী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মোটরবাইক চতুর্দিক কাঁপিয়ে চলে গেল। তার পিছু পিছু আর একটা। তার পিছু একটা ভ্যানের উপর মাইক]

মাইক। আজ বাঁশি বাজবে। বাঁশি বাজবার পর যাতে বাঁশিওলার কাছে ট্যাক্সি করে যেতে পারেন তার বিরাট ব্যবস্থা আমরা করেছি। এখন থেকেই অগ্রিম বুকিং হচ্ছে। হ্যাণ্ডবিলে সব খবর পাবেন।

[ভ্যান চলে গেল]

নিস্তারিণী। [রিক্‌শাওলাকে] রিক্‌শা ভাড়া কত দিতে হবে ?

রিক্‌শাওলা। আমি তো বলেছি আপনার পায়ের উপর দিয়ে রিক্‌শা চালিয়ে আপনার কাছে অপরাধী হয়ে আছি, আপনার কাছে ভাড়া নেব না।

নিস্তারিণী। খুব হয়েছে। তুমি ইচ্ছে করে আমার পায়ের উপর চাকা চালিয়েছ ? দুঃখটা আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল, তোমার দোষ কি। বল, কত দেব—

রিক্‌শাওলা। যা খুশী দিন। না দিলেও কিছু মনে করব না।

নিস্তারিণী। তুমি গতর খাটিয়ে খাও। তুমি সোনা ছেলে—তুমি ভদ্দর হবেই। কিন্তু আমিও গতর খাটিয়ে খাই, আমিই বা অভদ্দর হতে যাব কেন। নাও একটি টাকা নাও। দীর্ঘজীবী হও বাবা।

রিক্‌শাওলা। মা আপনার মতো যদি সবাই হতো। আপনাকে একটা প্রণাম করি।

নিস্তারিণী। দেখ, দেখ কাণ্ড দেখ—

[রিক্‌শাওলা প্রণাম করে চলে গেল]

ভিখারিণী। মা দু' দিন খেতে পাইনি—

নিস্তারিণী। এই নাও—

[ভিখারিণী ভিক্ষা নিয়ে চলে গেল]

নিস্তারিণী। (জগুকে) এখানে দাঁড়িয়ে পড়লে যে। ঘরে চল জগু। ঘরে যাবে না? রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে?

জগু। রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে থাকব। ভগবানের ইচ্ছে আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকি। তাই তিনি আমায় নিঃস্ব করেছেন। আমার একমাত্র ছেলে অমলের উপর নির্ভর করেছিলাম। কিন্তু সে নির্ভরও নড়বড় করছে। ভগবানের উপরই নির্ভর করলাম। রাস্তা থেকে আর ঘরে যাব না।

[পথে বসে পড়লেন]

নিস্তারিণী। কি কাণ্ড? যাই মাকে ডেকে আনি।

[নিস্তারিণী ঘরের ভিতর চলে গেল। কথা কইতে কইতে গঙ্গারাম ও সনাতনের প্রবেশ]

গঙ্গারাম। হঠাৎ এ রকম গুজব রটল কি করে। শহর শুদ্ধ সবাই বাঁশি শুনবে বলে উৎকর্ণ হয়ে আছে।

সনাতন। শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র হতে পারে। বাঁশি বাজিয়ে শহর সুদ্ধ লোককে বাইরে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করবে।

গঙ্গারাম। আমাদের আবার শত্রু কে! আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মশাই। উদ্ভট সব কল্পনা করছেন—

সনাতন। যা রটছে সেটাও তো উদ্ভট। কোন সন্ন্যাসী কোথায় বক্তৃতা দিয়েছেন যে আজ বাঁশি বাজবে আর যে কোন সচ্চরিত্র লোক তাঁর কাছে গেলেই তার সব দুঃখ ঘুচে যাবে—যত সব বোগাস—

গঙ্গারাম। তাহলে আপনার মতে রামায়ণ, মহাভারত, বৃন্দাবনলীলা সব বোগাস।

[কথা কইতে কইতে চলে গেলেন। 'বল হরি, হরি বোল' 'বল হরি, হরি বোল'—ধ্বনি দিতে দিতে একদল শবযাত্রী বেরিয়ে গেল]

জগু। কবে আমার ওই সুদিন আসবে।

[জগুর স্ত্রী চিন্ময়ীকে নিয়ে নিস্তারিণীর প্রবেশ]

চিন্ময়ী। তুমি রাস্তায় বসে পড়লে কেন।

জগু। ভগবান বসিয়েছেন তাই বসেছি। রাস্তাই ভালো। ঘরে আর সুখ নেই। সাত দিন আধপেটা খেয়ে আছি। রাত্রে ঘুম হয় না, বিছানায় এ-পাশ-ও-পাশ করি।—রাস্তাই ভালো। এখানেই শোব।

চিন্ময়ী। রাস্তার এই ধুলো বালির উপর শুয়ে থাকবে—

জগু। সর্বত্র ধুলো বালি। সর্বত্র। তাছাড়া সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়—তোমরা ঘরে যাও।

চিন্ময়ী। রান্না করে রেখেছি। খাবে চল লক্ষ্মীটি।
জগৎ। লক্ষ্মীটি তোমার ছেলে। আমি মূর্তিমান অলক্ষ্মী। আমি রাস্তাতেই থাকব।
চিন্ময়ী। খাবে না ?
জগৎ। না—
নিস্তারিণী। (নিম্নকণ্ঠে) আমি ডাক্তারবাবুকে খবর দি—
আমি তাহলে যাই মা। ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়ে আমি আমার ভাইপোকে দেখতে যাব। তারও নাকি বড্ড অসুখ। আমার ফিরতে একটু দেরি হবে। আমি সব ঠিক করে রেখেছি। বাবুকে নিয়ে তুমি বিছানায় শুইয়ে দাও। আমি ডাক্তারবাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।
জগৎ। ডাক্তারকে খবর দিও না। আমার ফি দেবার পয়সা নেই। ওষুধ কেনবার পয়সা নেই।
[নিস্তারিণী কোনও উত্তর না দিয়ে চলে গেল]
চিন্ময়ী। ঘরে চল।
জগৎ। না, ওই ঘুপচি ঘরে ঢুকে ময়লা বিছানায় শুয়ে ছারপোকার কামড় খেয়ে ছটফট করার চেয়ে রাস্তায় বসে থাকা ঢের ভালো। আমি ঘরে যাব না।
চিন্ময়ী। কিছু খাবে না ?
জগৎ। না।
চিন্ময়ী। কিন্তু আমার তো ক্ষিধে পেয়েছে। তুমি না খেলে আমি খাব কি করে।
জগৎ। তবে এইখানেই নিয়ে এস কিছু—
[চিন্ময়ী ভেতরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল বাঁশি। অপরূপ সুর সে বাঁশির। মনে হল কোন সুদূর থেকে এক মহা সান্ত্বনা যেন ভেসে আসছে সুরের রূপে। হঠাৎ রাস্তার গোলমালটা বেড়ে উঠল। সবাই ছুটতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে। রিক্‌শা, বাস, ট্যাক্‌সি মোটরের নানাবিধ হর্ণ বেজে উঠল। হুইস্‌ল দিতে লাগল ট্রাফিক পুলিশরা। জগৎ ফুটপাথের উপর বসেছিল। তার ঘাড়ের উপর দিয়েই লোক ছুটতে লাগল]
জগৎ। এই এই মশাই কি করছেন—উহু হাতটা মাড়িয়ে দিলেন—আরে আরে—করছেন কি আপনারা ?
[কেউ সে প্রতিবাদ গ্রাহ্য করল না। চিন্ময়ী খাবার নিয়ে প্রবেশ করলেন। হাতে থালা ও গেলাস। একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন। ঝন্‌ ঝন্‌ করে উঠল থালা আর বাটি]
চিন্ময়ী। ওগো মা গো—একি একি আমাকে উঠতে দিন—
[কেউ তার কথায় কর্ণপাত করল না।। তার উপর দিয়েই ছুটতে লাগল। বাঁশি বেজে চলেছে]
জগৎ। ও মশাই, কি করছেন আপনারা। ওকে উঠতে দিন—চিনু তুমি উঠে পড় না—
চিন্ময়ী। (কাতর কণ্ঠে) কোমরে বড্ড লেগেছে—উঠতে পারছি না। ও হো হো, ওহো হো—মাগো—উহু হু—হু—
[জনতা তাকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ছুটতে লাগল। কেউ থামল না। বাঁশি বেজে চলেছে—]

জগনু। আমার গায়েও তো শক্তি নেই। আমিও উঠতে পারছি না। ভগবান, ভগবান রক্ষা করো, রক্ষা করো। চিনু তুমি গড়িয়ে একটু সরে যাও।

[চিন্ময়ীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। জগনু আস্তে আস্তে উঠে তার কাছে গেল]

জগনু। চিনু— [চিন্ময়ীর কোন সাড়া নেই]

জগনু। চিনু—চিনু—চিনু—

[কোন সাড়া নেই। জনতা জগনুকেও কয়েকবার ধাক্কা দিলে—]

জগনু। করছে কি, সবাই ক্ষেপে গেল না কি!

[নিস্তারিণীর প্রবেশ]

নিস্তারিণী। ডাক্তারবাবুও বাঁশি শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। আমার ভাইপোরাও। আমি তাই ফিরে এলুম। মায়ের কি হল?

জগনু। ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে একজন। মূর্ছা গেছে বোধহয়। বার বার বলছি তবু শুনছে না কেউ। ওর ওপর দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ছুটছে।

নিস্তারিণী। এমনি শুনবে না। থামো খ্যাংরাটা নিয়ে আসি।

[নিস্তারিণী ঘরের ভিতর ঢুকে একটা ঝাড়ু নিয়ে এল]

নিস্তারিণী। (একজন পথিককে) ওকে মাড়িয়ে যাচ্ছ কেন, পাশ দিয়ে যাও না, চোখের কি মাথা খেয়েছ মুখপোড়া—

[সপাসপ্ ঝাড়ু চালাতে লাগল]

জনতার ভিতর একজন। বাঁশি শুনে মাগী ক্ষেপে গেছে। ওদিকে যাবেন না, এদিক দিয়ে আসুন—

[হঠাৎ সাইরেণ বেজে উঠল। তারপর মাইক থেকে ঘোষণা করলেন]

ঘোষণা। আমি একজন পুলিশ অফিসার এই ঘোষণা করছি। আর এক পাও এগোবেন না। প্রত্যেকে ঘরের ভিতর চলে যান। বাঁশি বাজবার পর থেকে গঙ্গার জল ফুলতে আরম্ভ করেছে। হাওড়া ব্রিজ ডুবে গেছে। স্ট্রাণ্ড রোড জলমগ্ন। ভয়ংকর ঢেউ উঠছে গঙ্গায়। অনেক লোক সাঁতরে পার হবার চেষ্টা করেছিল, সবাই মারা গেছে। সেজন্য গঙ্গার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না, বাড়ি ফিরে যান। পুলিশ চিৎপুরে সবাইকে আটকেছে। বাড়ি ফিরে যান আপনারা। গঙ্গার ঘাটে পেঁছানো যাবে না। বাঁশি গঙ্গার ওপারে বাজছে। গঙ্গার এরকম অস্বাভাবিক স্ফীতির কারণ বিশেষজ্ঞরা নির্ণয় করছেন। অনেক নৌকো ভেসে গেছে। অনেক বাড়ি ডুবেছে। আপনারা অবিলম্বে ঘরে ঢুকে পড়ুন।

জনতার মধ্যে একজন। পালান, পালান সবাই ওরা কাঁদুনে গ্যাস ছেড়েছে, গুলিও চালিয়েছে কয়েক জায়গায়।

আর একজন। তাই নাকি?

আর একজন। পালাই, চল তাহলে। এই গলিটায় ঢুকে পড়ি।

নিস্তারিণী। সব পালাচ্ছে। রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল। এবার ঘরে চল। মা—ওমা—এই যে পিট পিট করে তাকাচ্ছে—

চিন্ময়ী। (ক্ষীণকণ্ঠে) উঠতে পাচ্ছি না কোমরে বড্ড ব্যথা—

জগনু। আমি ঘরে যাব না।

নিস্তারিণী। শুনলে তো পুলিশ গুলি চালাচ্ছে।

জগু। ভগবান যদি আমাকে গুলি দিয়েই মারতে চান তাই মরব। তাঁর উপরই নির্ভর করেছি এখন—

[বাঁশি বরাবর বাজছিল হঠাৎ সেটা স্পষ্টতর হয়ে উঠল। তার পরই বাঁশি বাজাতে বাজাতে একটি শ্যামবর্ণ কিশোর বালক এগিয়ে এল।]

নিস্তারিণী। ও কালো ছোঁড়া আবার বাঁশি বাজাতে বাজাতে কোথা থেকে এল?

জগু। কে তুমি বাবা?

বাঁশিওলা। আমার নাই কানাই।

জগু। কানাই! কানাই!

কানাই। আপনি কি আমাকে ডাকছিলেন?

জগু। আমি ভগবানকে ডাকছিলুম।

কানাই। ও ভগবানকে? তাহলে আমার ভুল হয়েছিল। চললুম—

[বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলে গেল]

[কৈলাসবাবু প্রবেশ করলেন]

কৈলাস। জগু রাস্তায় বসে কেন?

জগু। বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি ভাই।

কৈলাস। এবার বল পাবে, সুখবর এনেছি। দার্জিলিং গিয়েছিলাম, তোমার ছেলে অমলের সঙ্গে দেখা হল। অমল তো কোন মফঃস্বলের কলেজের কেমিস্ট্রির প্রফেসর ছিল?

জগু। হ্যাঁ—

কৈলাস। সে রিসার্চ করে পোকা মারবার কি একটা ভাল ওষুধ বার করেছে। একটা জর্মান কোম্পানীর সঙ্গে এই নিয়ে তার চিঠিপত্র চলছিল। কয়েকদিন আগে সে একটা চিঠি পায় যে সেই জর্মান কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার কি একটা গাছের শিকড়ের সন্ধানে নাকি দার্জিলিং-এ এসেছে। অমলের সঙ্গে দেখা করতে চায়। অমল গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছে, সে অমলের ফরমুলাটা দু লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছে। অমলের সঙ্গে আমার দেখা হতেই আমাকে বলল—আপনি বাবাকে গিয়ে বলবেন সব কথা। হঠাৎ দার্জিলিং চলে আসতে হল বলে তাঁকে টাকাটা পাঠাতে পারিনি।

জগু। স্বয়ং কানাই এসেছিল, আমি চিনতে পারিনি।

কৈলাস। কানাই? সে কে—

জগু। কানাই—শ্রীকৃষ্ণ—এখুনি এসেছিল। কেউ চিনতে পারিনি, প্রণাম করিনি। (হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে) কানাই, কানাই, কানাই, কানাই—কানাই। মনে মনে আমি তোমার কাছে গিয়েছিলাম—পায়ে হেঁটে যেতে পারিনি। তবু তুমি এসেছিলে—আমার দুঃখ মোচন করে দিয়ে গেলে। আর একবার এসো, দয়া কর, আর একবার এস, আমি টাকাকড়ি কিছু চাই না—তোমাকে চাই—খালি তোমাকে চাই—খালি তোমাকে—

[মূর্ছা গেলেন। কানাই ফিরল না। দূরে কিন্তু তার বাঁশিটা আর একবার বেজে উঠল]

আসন্ন

উৎসর্গ

আধুনিক বাংলা নাটকের শীর্ষশোভা
নাট্যকার শ্রী মন্মথ রায়—
বন্ধুবরেষু

ভূমিকা

এই নাটকটি ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে 'নব কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর নানা কারণে এটি পুস্তক-আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। স্বাধীনতা পাওয়ার পর যে সব দুর্নীতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে বিষাক্ত করেছে, উত্তেজিত করেছে, বিপথে চালিত করেছে, যে সব দুর্নীতি উন্মূলিত না হলে আমাদের স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ বিপন্ন—তারই একটা সাহিত্যিক রূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছি এই নাটকে। নাটকটি 'নব কল্লোল' 'রাগ ভৈরব' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। নানা কারণে বই আকারে প্রকাশ করবার সময় এটির নূতন নামকরণ করলাম—'আসন্ন'।

এই বই যদি কোন নাট্যসম্প্রদায় কখনও অভিনয় করেন তাঁরা যেন আমার অনুমতি নেন। অভিনয় করবার সময় নাটকের যদি কিছু অদল-বদল করা প্রয়োজন হয়, সেটাও আমার সম্মতি নিয়ে করতে হবে।

পরিশেষে বক্তব্য, এই নাটকের সব চরিত্রগুলি কাল্পনিক। কিন্তু যে সব দুর্নীতির কথা এতে বলেছি তা অবশ্য কাল্পনিক নয়। সেগুলি সুবিদিত। কাগজে পড়েছি, লোকমুখে শুনেছি, নিজেও দেখেছি কিছু কিছু।

বনফুল

নাটকের পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষ চরিত্র

জগদীশ —রিটায়ার্ড এনজিনিয়ার

ভূষণ —তাঁর মেজ ভাই

কনিষ্ঠ —তাঁর ছোট ভাই

রতন —জগদীশের পুরাতন ভৃত্য

মোহন, ফাগু —ভুষণের ভৃত্য

সুরেন —জনৈক দালাল

তীর —ভুষণের বিপক্ষ দলের লোক, কনিষ্ঠের বন্ধু

ডাঃ গুপ্ত —রিটায়ার্ড ডাক্তার

ডাঃ ঘোষ —জনৈক ডাক্তার, মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ

নীলকান্ত —'পথ' পত্রিকার সম্পাদক

বিনয় মিত্র, জগন্নাথ বিশ্বাস, দুলাল চৌবে, সৌরেন গাঙ্গুলী — ভুষণের দলের লোক

নিবারণ বাবু, যতীন বাবু, যোগেন বাবু, ডাক্তার বোস, ভূধর বাবু — তীরের দলের লোক

অবনীশ —জনৈক বিদ্বান বিদ্রোহী ব্যক্তি। সন্ত্রাসবাদী

ঘোষ সাহেব —একজন ধনী ব্যবসাদার

ভৈরব বাবা —একজন সন্ন্যাসী

ব্রজেনবাবুর লোক, দীনু ময়রার লোক

কয়েকজন ক্যানভাসার

দুজন পিওন

দুজন দারোগা

দুজন কনস্টেবল

একটি ছেলে···(জগদীশের ভক্ত)

কয়েকজন প্রতিবেশী

স্ত্রী-চরিত্র

মালতী—জগদীশের স্ত্রী

ধারা—জগদীশের কন্যা (পালিতা)

কুন্তী—অবনীশের স্ত্রী

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ধারা চরিত্রটি বরাবরই নেপথ্যে থাকবে

[জগদীশের বাড়ির সম্মুখভাগ। সামনে বড় পাকা উঠান। উঠানের পিছনে বামে ও দক্ষিণে উঁচু উঁচু ঘর। প্রত্যেক ঘরেই আলাদা প্রবেশ-দ্বার। প্রত্যেক ঘরে জানলাও আছে। জানলাগুলি উঠানের দিকেই খোলা। প্রত্যেক ঘরের সামনে চওড়া বারান্দা। মাঝখানের বারান্দায় একটি টেবিল রয়েছে। দক্ষিণ ও পিছন দিকের বারান্দায় দ্বারের উপর কয়েক সার বিজলী বাতি সাজানো। একটি তক্তায় ছোট ছোট বালব দিয়ে 'বন্দেমাতরম' লিখে সেটিও মাঝখানের দরজার উপর টাঙানো হয়েছে। জগদীশ সেগুলি দেখছেন। তাঁর ভৃত্য রতনও পাশে দাঁড়িয়ে আছে।]

জগদীশ ॥ বাঃ বেশ চমৎকার হয়েছে। এইবার কানেক্শনটা করতে হবে।

রতন ॥ একজন মিস্ত্রিকে খবর দিয়েছি।

জগদীশ ॥ মিস্ত্রির দরকার কি, আমিই করে দেব। মিস্ত্রিকে তুই মানা ক'রে দিয়ে আয়।

[রতনের প্রস্থান]

দীপক রাগ আলাপ করবার আমার ক্ষমতা নেই। বিদ্যুতের আলো দিয়েই অভ্যর্থনা করব। পুজোর লগ্ন আসন্ন হয়ে আসছে।

[কপাট খুলে জগদীশের স্ত্রী মালতী প্রবেশ করলেন। প্রৌঢ়া। দেখলেই মনে হয় এককালে রূপসী ছিলেন। পরণে টকটকে লালপাড় শাড়ি। সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর। হাতে শাঁখা। গলায় একটি সরু হার। আভরণের স্বল্পতা কিন্তু তাঁর মহিমময়ী মূর্তিকে খাটো করতে পারে নি।]

মালতী ॥ চল, খাবে চল। লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

জগদীশ ॥ বলেছি তো লুচি আমি আর খাব না।

মালতী ॥ কি যে ছেলেমানুষি কর।

জগদীশ ॥ বলেছি তো লুচি যদি সকলের জন্য কর তাহলে আমি খাব। সকলের জন্য করেছ কি ?

মালতী ॥ আমার তো আজ উপোষ। তাছাড়া আমার লুচি ভালোও লাগে না। ধারা, কনিষ্ঠ হাতে-গড়া রুটি ভালবাসে। রতন মুড়ি খেতে চায়।

জগদীশ ॥ আমি তাহলে রুটি কিংবা মুড়ি খাব। লুচি খাব না।

মালতী ॥ কিন্তু চিরকালই তো তুমি চায়ের সঙ্গে ফুলকো লুচি খেয়েছ। কি যে বলছ অবুঝের মতো।

জগদীশ ॥ [ঈষৎ উচ্চস্বরে] চিরকাল যা করেছি এখন তা করতে পারছি না। চিরকাল সকলের সঙ্গে লুচি খেয়েছি। এখন তোমরা কেউ রুটি খাবে, কেউ মুড়ি খাবে, আর আমি একা লুচি খাব তা পারব না। আমার সংসারে সবাই একরকম খাবে। এখন পয়সা নেই, সবাই মুড়ি খাব তাতে লজ্জার কিছু নেই। একা একা লুচি খেলেই লজ্জার কারণ ঘটবে।

মালতী ॥ পয়সা নেই তো এতগুলো বিজলী বাতি কিনে পয়সার অপব্যয় করছ কেন ?

জগদীশ ॥ অপব্যয় নয়। পুজোর আয়োজন। চিন্ময়ী মহাকালী আসছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করতে হবে। দীপক রাগ আলাপ করে তাঁকে অভ্যর্থনা করা উচিত। কিন্তু আমি গান গাইতে পারি না, তাই বিদ্যুতের আলো জেবলে তাঁকে অভ্যর্থনা করব। পয়সা থাকলে আমি বিদ্যুতের মশাল জ্বালাতাম। কিন্তু অত পয়সা নেই আমার। খোকনের কোনও খবর পাচ্ছি না। সে যদি থাকত--

মালতী ॥ খোকন কাল পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছে।

জগদীশ ॥ [সবিস্ময়ে] খোকন? অমি? টাকা পাঠিয়েছে? পিওন তো আসে নি কাল থেকে।

মালতী ॥ মনি অর্ডারে পাঠায় নি। লোকের হাতে পাঠিয়েছে।

জগদীশ ॥ কোন্ লোক, কোথায় সে?

মালতী। সে নিজের পরিচয় দিতে চায় না। দিয়েই চলে গেছে।

জগদীশ ॥ আমাকে তুমি ডাকলে না?

মালতী ॥ আমিও তো তাকে দেখি নি। হঠাৎ কাল দুপুরে দেখলাম বাইরের ঘরে জানলার নীচে আমার ঠিকানা-লেখা একটা চিঠি পড়ে আছে। খুলে দেখি তাতে পাঁচটা একশ' টাকার নোট রয়েছে আর ছোট্ট একখানা চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে আপনার ছেলে অমিতাভ এই টাকা পাঠিয়েছে। খবরটা গোপন রাখবেন। অমিতাভর বাবাও যেন না জানতে পারেন। অমিতাভ বলেছে তাঁকে অকারণে উত্তেজিত করে লাভ নেই। চিঠির নীচে কোনও নাম ছিল না। কাল তোমাকে বলি নি কিন্তু আজ আর চেপে রাখতে পারলাম না। তুমি কিছু ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। সে ঠিক ফিরে আসবে আবার। আমি মায়ের কাছে মানত করেছি সে যদি ফিরে আসে আমি বুক চিরে রক্ত দেব। চল, খাবে না—

[জগদীশ হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর উল্লসিত হয়ে উঠলেন।]

জগদীশ ॥ তবে শুধু আমার জন্যে কেন, সকলের জন্যে লুচি কর। সকলের জন্য—

[হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে গেলেন আবার।]

সব ঠিক হয়ে যাবে না বড় বউ, সে আর ফিরবে না। পুলিশ যার পিছনে লেগেছে তার আর ভদ্রস্থ নেই।

মালতী ॥ অমির পিছনে পুলিশ লেগেছে? কে বললে তোমাকে?

জগদীশ ॥ নীলকান্ত। সে শুনেছে মিস্টার গুপ্তর কাছে। তিনি বাজে কথা কইবার লোক নন।

মালতী ॥ অমির মতো ভালো ছেলের পিছনে পুলিশ লাগবে কেন?

জগদীশ ॥ সে সত্যিকার ভালো ছেলে, এইটেই তার মস্ত অপরাধ। এদেশে সত্যিকারের ভালো আদর্শবাদী ছেলের সমাজে স্থান নেই। স্থান আছে ভণ্ডদের।

মালতী ॥ কিন্তু সে তো কোন দোষ করে নি।

জগদীশ ॥ দোষ আছে বইকি। সে কারো খোসামোদ করতে পারে না এইটেই তো মহাদোষ। ওই যে প্রিন্সিপ্যালটা ছেলেদের খাওয়ার টাকা থেকে চুরি করছিল অমিই তার প্রথম প্রতিবাদ করে। দাতব্য হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা যে টাকা না পেলে গরীবদের চিকিৎসা করে না এ কথা অমিই লিখেছিল কাগজে। মন্ত্রীদের

বন্ধ, ওই জুয়াচোর ব্যবসাদার যে ময়দায় তেঁতুল বিচির গুঁড়ো মেশাচ্ছিল তারও প্রতিবাদ করেছিল ওই অমি। এখানে পরীক্ষকের বাড়ি ঘুরে ঘুরে ঘুষ দিয়ে ছেলেরা কোশ্চেন আগে থাকতে জেনে নেয়, খাতা বদলে দিয়ে বেশী নম্বর পায়, অনেক সময় ফার্স্টও হয়—এর প্রতিবাদও করেছিল ওই অমি। একটা বি. ডি. ও.-র চুরি সে হাতে-নাতে ধরেছিল, স্টেশনের মালবাবুরা দুহাতে চুরি করে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল। তার অপরাধ অনেক, তার স্পর্ধা আকাশচুম্বী। তাকে এরা জেলে পুরবেই। চোরের দেশে ভদ্রলোক টিকতে পারে না। হয় তাকে মেরে ফেলবে, না হয় জেলে পুরবে।

মালতী ॥ বল কি! নির্দোষ লোককে জেলে পুরবে? আইন বলে কিছু নেই?

জগদীশ ॥ আইন আছে বইকি। যে আইনের বলে ইংরেজরা এককালে দেশের হীরের টুকরো ছেলেদের বিনা বিচারে জেলে পুরে রাখত সে আইন এখনও আছে। তার নামটা বদলেছে শুধু।

[ভুষণের দুজন চাকর—মোহন ও ফাগু বড় বড় দুটি ঝুড়ি নিয়ে প্রবেশ করল।]

মালতী ॥ এসব কি মোহন?

মোহন ॥ খাবার আছে। সিঙাড়া, কচুরি, আলুর দম, সন্দেশ।

ফাগু ॥ একটু পরেই যে এখানে মীটিং বসবে।

মালতী ॥ ও!

[মোহন ও ফাগু বাঁ দিকের দরজা দিয়ে ভিতরে চলে গেল।]

জগদীশ ॥ ভুষণ শুনছি আবার ইলেক্‌শনে দাঁড়াচ্ছে। তারই মীটিং বোধহয়। ভালই করছে। বাঁচবার ওই এখন রাস্তা। আগে লোকে ইংরেজদের খোসামোদ করত এখন ভোটারদের করে।

মালতী ॥ বাড়িতে এত খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছে কিন্তু আমাদের তো জানায় নি।

জগদীশ ॥ আমরা তো ওর ক্যানভাসার নই।

[জগদীশের বৈমাত্রেয় ছোট ভাই কনিষ্ঠের প্রবেশ। কনিষ্ঠ বাড়ির দক্ষিণ দিকের মালিক।]

মালতী ॥ এই যে ইনিও এতক্ষণে বেড়িয়ে ফিরলেন। না খেয়ে কোথায় বেরিয়েছিলি?

কনিষ্ঠ ॥ [হেসে] আজ আপিসের ছুটি যে বৌদি। তাই নীলুদার বাড়ি গিয়েছিলাম।

মালতী ॥ তীর ফিরে এসেছে?

কনিষ্ঠ ॥ এসেছে। তার খোঁজেই গিয়েছিলাম। তার কাছে আমার একটা বই ছিল [দেয়ালে টাঙানো বালবের সারি দেখে] বাঃ, চমৎকার হয়েছে। মাঝখানে ওটা কি দাদা?

জগদীশ ॥ বন্দেমাতরম্।

কনিষ্ঠ ॥ এসব কেন করছ দাদা? কালীপুজো তো হয়ে গেছে—

জগদীশ ॥ অন্ধকাররূপিণী আর এক কালী শীঘ্রই আসবেন। তাঁকে আলো জেলে অভ্যর্থনা করব আমি।

কনিষ্ঠ ॥ কবে হবে সেটা?

জগদীশ ॥ আর বেশী দেরি নেই।

মালতী ॥ চল, চল খাবে চল। সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

[জগদীশ, মালতী ও কনিষ্ঠ ভিতরের দিকে চলে গেলেন। রতন বাইরে থেকে এল।]

রতন ॥ আলো টাঙানো তো হয়ে গেল, এইবার টেবিলটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিই।

[টেবিল ঢোকাতে যাচ্ছিল এমন সময় সুরেনের প্রবেশ। ভদ্রলোকের আঁটসাঁট গড়ন। পরণের কোট-প্যাণ্টও আঁটসাঁট। দেখলেই মনে হয় চতুর লোক। তিনি রতনের দিকে চকিতে একবার চাইলেন, তারপর বাঁ দিকের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। রতন তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। সুরেন বাঁ দিকের কপাটে একটি আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে তিনবার টোকা দিলেন। কপাট খুলল না।]

রতন ॥ কাকে খুঁজছেন আপনি ?

সুরেন ॥ ভূষণবাবু কি বাড়িতে আছেন ?

রতন ॥ ঠিক জানি না। ছোটবাবুকে সকাল থেকে দেখি নি।

সুরেন ॥ তুমি কি এখন এইখানেই থাকবে, না ভিতরে যাবে ?

রতন ॥ এই টেবিলটা নিয়ে ভিতরে রেখে আসব। কেন বলুন তো ?

সুরেন ॥ না, কিছু না, এমনিই জিগ্যেস করলুম। যাও টেবিলটা ভিতরে নিয়ে যাও। জগদীশ বাবু ক্রমাগত বিজলী বাতি লাগিয়ে যাচ্ছেন কেন বলতো। হরিশের দোকানের সব বাল্‌বগুলো কিনেচেন শুনলাম, বাড়িতে বিয়ে-টিয়ে না কি ?

রতন ॥ তা তো শুনি নি।

সুরেন ॥ শুনলুম জগদীশ বাবু নিজেই সব আলো লাগিয়েছেন নিজে হাতে।

রতন ॥ হ্যাঁ, এই টেবিলের উপর চড়ে নিজেই সব করেছেন। বড় ইনজিনিয়ার তো।

[ভিতর থেকে ধারার ডাক শোনা গেল—রতন—রতন।]

রতন ॥ এই যে যাই। [সুরেনকে] বড় বাবুকে খবর দেব ?

সুরেন ॥ না। ভূষণবাবুর সঙ্গেই দরকার আছে একটু।

[রতন চলে গেল। সুরেন দ্বারে আবার তিনবার টোকা দিলেন। তারপর নিজের হাতঘড়িটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন। এবার কপাট খুলল। ভূষণবাবু বেরিয়ে এলেন। গায়ে খদ্দরের ফতুয়া, পায়ে চপ্‌পল। মাথায় বাবরি চুল। গোঁফ-দাড়ি কামানো। কপালের মাঝখানে একটি টিপ। পরণের কাপড়ও খদ্দর।]

ভূষণ ॥ ও সুরেন, এসেছ। কি খবর ?

সুরেন ॥ [এদিক-ওদিক চেয়ে, নিম্নকণ্ঠে] খবর ভালো, লাখখানেক খালি ক্যাপসুল পেয়েছি। অনেক দাম চাইছে কিন্তু। ত্রিশটাকা শ'য়ের কম দেবে না। বলছে আমেরিকা থেকে smuggle করে আনতে অনেক খরচ পড়ে গেছে।

ভূষণ ॥ তার মানে, ত্রিশ হাজার টাকা এখনই চাই ?

সুরেন ॥ সাতদিনের মধ্যে দিলেই চলবে। আপনি যদি কথা দেন মালটা আটকে রাখি।

ভূষণ ॥ ডাক্তার বাবুরা আর কেমিষ্টরা ঠিক আছে তো ?

সুরেন ॥ সব ঠিক আছে। টাকা খাইয়ে বন্ধ করে রেখেছি সবাইকে।

ভূষণ ॥ এতে আমাদের কত 'নিট্' লাভ হবে তা খতিয়ে দেখেছ তো ?

সুরেন ॥ দেখেছি বই কি। আপনি যদি ওই তিরিশ হাজার টাকা দিতে পারেন তাহলে আপনার নিট্ পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকবে।

ভূষণ ॥ তুমি কত নেবে ?

সুরেন ॥ [হাত কচলে] আমাকে হাতে তুলে যা দেবেন।

ভূষণ ॥ সামনে ইলেক্শন, তাতেও বেশ খরচ আছে।

সুরেন ॥ আপনার টাকার অভাব কি সার ! ব্যাংকে তো আপনার টাকা পচছে। গম থেকেই তো মোটা টাকা পেয়েছেন সেদিন। ও হ্যাঁ আর একটা কথা মনে পড়ল—আপনাদের এই বাড়িটা বিক্রি করবেন ? ভালো দাম পাওয়া যাবে। দু'লাখ টাকা দিতে চাইছে একজন।

ভূষণ ॥ বাড়িতো আমার একার নয়। দাদা আছেন, এক ভাই আছে। সবাই আমরা সমান অংশীদার। বাবা এক অদ্ভুত উইলও করে গেছেন। বিষয় ভাগ হবে না ; যে বিষয় ভাগ করতে চাইবে সে বিষয় থেকে বঞ্চিত হবে।

সুরেন ॥ [সবিস্ময়ে] আপনারা কি এক অন্নে আছেন ? আমার ধারণা ছিল—

ভূষণ ॥ এক অন্নেই ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি থাকতে পারলাম না। পাগলের সঙ্গে বাস করা যায় না। দেখ না হঠাৎ বাড়িতে বাল্ব বসাতে আরম্ভ করেছে দাদা। দু'লাখ টাকা দাম দেবে এই পুরানো বাড়ির ?

সুরেন ॥ দেবে বই কি, চার পাশে জমি যে অনেক।

ভূষণ ॥ আমি আমার অংশটা বিক্রি করে দিয়ে অনায়াসে আমার বালীগঞ্জের বাড়িতে থাকতে পারতাম। কিন্তু তাতো হবার উপায় নেই।

[ভিতর থেকে আবার ডাক এল—রতন—রতন। বন্ধদ্বারের ঠিক পেছন থেকে রতন সাড়া দিল 'যাই'। সুরেন একটু চমকে দ্বারের দিকে চাইলেন। তাঁর সন্দেহ হল রতন আড়ি পেতে তাঁদের কথা শুনছিল নাকি ! পরমুহূর্তেই কপাটে খিল বন্ধ করার শব্দ পাওয়া গেল।]

সুরেন ॥ রতন আড়ি পেতে শুনছিল না কি আমাদের কথা ? একটু আগে সে ছিল এখানে।

ভূষণ ॥ শুনতে পারে। মিটমিটে শয়তান ওটা। চাকর কিন্তু খুব ভালো। দাদার পাগলামির ছোঁয়াচও ওর লেগেছে। দাদার পাগলামিকে ও পুজো করে। ওর ভালো একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলাম, দাদাকে ছেড়ে গেল না।

[ভিতর থেকে ছোট্ট একটি পিয়ানোর গৎ বেজে উঠল।]

ওই শোন !

সুরেন ॥ কি ওটা ?

ভূষণ ॥ ইলেক্ট্রিক খেলনা। দাদা তৈরী করে দিয়েছে ধারাকে। প্লাগ লাগিয়ে দিলেই পিয়ানোর গৎ বাজে। ইলেকট্রিসিটির ভূত এখন ওঁর ঘাড়ে চেপেছে। বাড়ির মধ্যে ছোটোখাটো একটা ল্যাবরেটারি করেছেন ; নিজের হাতে বাড়িময় বাল্ব বসাচ্ছেন।

সুরেন ॥ তাই তো দেখছি। কেন কচ্ছেন এসব ?

ভূষণ ॥ ভগবান জানেন।

সুরেন ॥ আমি ভেবেছিলাম ধারার বিয়ে-টিয়ে লাগল বুঝি।

ভূষণ ॥ [ঠোঁট উলটে, অবজ্ঞাভরে] ধারাকে আবার বিয়ে করবে কে? কোন্ জাত তার ঠিক নেই।

সুরেন ॥ [বিস্মিত] জাত ঠিক নেই? তার মানে?

ভূষণ ॥ ও তো রাস্তায় পড়েছিল। দাদা কুড়িয়ে এনে ওকে মানুষ করেছেন। ব্যাস্টার্ড।

সুরেন ॥ বলেন কি?

ভূষণ ॥ তুমি যেন একথা আর কাউকে বোলো না। ধারার কানে গেলে তুলকালাম্ কাণ্ড করবে সে। মেয়েটা গুণ্ডা গোছের। সেদিন গোপীকান্ত ওকে রাস্তায় কি একটু ঠাট্টা করেছিল, তাকে এসা এক চড় মেরেছে যে তার দাঁত ভেঙে গেছে।

সুরেন ॥ কে, ওই বুড়ো গোপীকান্ত? হ্যাঁ, মেয়েমানুষ দেখলেই ও কেমন যেন বেসামাল হয়ে পড়ে। আমার বোনকেও রাস্তায় কি যেন বলেছিল একদিন [উদ্ভাসিত মুখে] তাকে চড়িয়েছে ধারা। বাঃ বাঃ বাঃ। কিন্তু ওর এ হিস্ট্রি তো জানতাম না।

ভূষণ ॥ ওই হিস্ট্রি। দাদা ওকে কুড়িয়ে নিয়ে কেষ্টনগরে যান। কেষ্টনগরে তখন বৌদি ছিলেন।

সুরেন ॥ কেষ্টনগরে কেন?

ভূষণ ॥ সেখানেই ওঁর বাপের বাড়ি। অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন তখন; ছেলে হবার জন্যেই বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। কিন্তু সে ছেলেটি আঁতুড়েই মারা যায়। কিছুদিন পরে বৌদি যখন ধারাকে নিয়ে ফিরলেন সবাই ভাবল ধারা দাদারই মেয়ে বুঝি। বৌদিও সকলের কাছে বলেছিলেন ধারা আমার মেয়ে।

সুরেন ॥ ও বাবা, এত ব্যাপার! আমি তখন এখানে আসি নি বোধ হয়।

ভূষণ ॥ না, তুমি আস নি।

সুরেন ॥ [আবার হাতঘড়ি দেখলেন] আপনি তাহলে খালি ক্যাপসুলগুলো নিচ্ছেন?

ভূষণ ॥ সেটা আপিসে না গিয়ে বলতে পারছি না। তুমি আপিসে ফোন্ কোরো চারটে নাগাদ।

সুরেন ॥ এসব ব্যাপারে ফোন করা নিরাপদ নয়। আচ্ছা আমিই আসব একবার চারটে নাগাদ। আচ্ছা, এখন চলি তবে, নমস্কার।

[সুরেন চলে গেলেন। ভিতর থেকে মোহন এসে প্রবেশ করল।]

মোহন ॥ মীটিংয়ের ব্যবস্থা কোথায় করব?

ভূষণ ॥ এই উঠোনে আর বারান্দায় সতরঞ্চির কম্বল পেতে দে। এখানেই মীটিং হবে।

মোহন ॥ খাওয়া-দাওয়া?

ভূষণ ॥ সেটা ভিতরে হবে। লম্বা টেবিলের চার দিকে চেয়ারগুলো পেতে দে। ব্রজেনবাবু এখনি চেয়ার পাঠাবেন।

[প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেনবাবুর লোক এসে হাজির হলেন।]

লোকটি ॥ ব্রজেনবাবুর দোকান থেকে চেয়ার এনেছি।

ভূষণ ॥ খিড়কির দিকে নিয়ে চল। এসো, আমি খুলে দিচ্ছি কপাটটা। মোহন তুই সতরঞ্চি পাত।

[ভূষণ ভিতরের দিকে এবং লোকটি বাইরের দিকে গেলেন। মোহন ভিতরে গিয়ে একটি সতরঞ্চি এনে বারান্দায় বিছাতে লাগল। তীর এলেন। তীর বিদ্রোহী স্বদেশপ্রেমিক।]

তীর ॥ এসব কি হচ্ছে, মোহন ?

মোহন ॥ মীটিং হবে তাই সতরঞ্চি পাতছি।

তীর ॥ ইলেক্‌শনের মীটিং নাকি ?

মোহন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

[কথাটা শুনেই তীরের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটিয়ে ফেললে সে। তারপর কনিষ্ঠের ঘরের দরজার দিকে চেয়ে ডাকল।]

তীর ॥ কনিষ্ঠ—কনিষ্ঠ—

[রতন বেরিয়ে এল]

রতন ॥ উনি খেতে বসেছেন। আপনি ভিতরে চলুন।

[তীর ও রতন ভিতরে চলে গেল। মোহন সতরঞ্চি পাতছিল। ফাগুও এসে তাকে সাহায্য করতে লাগল।

ডাক্তার গুপ্ত এসে প্রবেশ করলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক। প্রসন্ন মুখভাব।]

ডাক্তার গুপ্ত ॥ মোহন, ভুষণবাবু বাড়িতে আছেন ?

মোহন ॥ আছেন।

ডাক্তার গুপ্ত ॥ একবার খবর দাও দেখি।

[মোহন ভিতরে গিয়ে ভুষণকে ডেকে নিয়ে এল।]

ভুষণ ॥ নমস্কার, ডাক্তারবাবু। কি খবর ?

ডাক্তার গুপ্ত ॥ আজই আমি কানপুর যাচ্ছি।

ভুষণ ॥ কবে ফিরবেন ?

ডাক্তার গুপ্ত ॥ আর ফিরব না। রিটায়ার করেছি তো, এখন ছেলের কাছেই থাকব। তার ডিসপেনসারিরই দেখা-শোনা করব। যাওয়ার আগে সবারই কাছে বিদায় নিচ্ছি।

ভুষণ ॥ আপনার মতো লোককে হারিয়ে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। আপনার ছেলের তো ভালো প্র্যাক্‌টিস হয়েছে শুনেছি সেখানে।

গুপ্ত ॥ আপনাদের আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে একরকম।

ভুষণ ॥ আমার ওষুধগুলোকে ব্যাক করবেন।

গুপ্ত ॥ নিশ্চয়ই করব। আপনার কোম্পানির নাম কি ?

ভুষণ ॥ সুজাতা কেমিক্যালস্‌।

গুপ্ত ॥ আপনার নিজের ব্যবসা ?

ভুষণ ॥ ব্যবসাটা আমারই, তবে এক বন্ধুর বেনামীতে করেছি। সুজাতা আমার স্ত্রীর নাম। টাকা-কড়ি সব আমারই। আপনি কানপুরে যাচ্ছেন শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। আমার ছেলে প্রসূন ওখানে চামড়ার কাজ শিখছে। তারও একটু খবর-টবর নেবেন।

গুপ্ত ॥ নিশ্চয় নিশ্চয়।

ভুষণ ॥ তার ঠিকানাটা আপনাকে দিয়ে দিই।

[পকেট-বুক থেকে কাগজ ছিঁড়ে ঠিকানা লিখে দিলেন।]

গুপ্ত ॥ প্রসূন কি আপনার বড়ছেলে ?

ভুষণ ॥ ওই একমাত্র ছেলে। বাল্যকালে মাতৃহীন হয়। বৌদি—মানে আমিই—ওকে মানুষ করেছি।

গুপ্ত ॥ বেশ বেশ। আমি তার খবর নেব।

[সতরঞ্জিগুলি দেখিয়ে]—এসব কি ?

ভূষণ ॥ মীটিং হবে একটা। আবার ইলেক্‌শনে নামছি। এবারও টিকিট পেয়েছি। আমার ক্যানভাসারদের আজ ডেকেছি এখানে। আপনি চলে যাচ্ছেন—আমার একটা ভোট নষ্ট হল।

গুপ্ত ॥ [মৃদু হেসে] থাকলে এবার আপনাদের ভোট দিতাম না। আপনাদের দলের উপর আর আস্থা নেই।

ভূষণ ॥ কেন, কেন আমরা তো যথাসাধ্য করছি।

গুপ্ত ॥ না, করছেন না। অধিবেশন, বৈঠক, ঘোষণা আর বাণী-বিতরণ—এ ছাড়া আর কি করেছেন বলুন ? চোর আর কালোবাজারীরা পঙ্গপালের মতো সব মুড়িয়ে খাচ্ছে, আপনাদের আপিসে চিঠি লিখে কোনও জবাব পাওয়া যায় না, প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনারা প্রতিশ্রুতি রাখেন না, মধ্যবিত্ত সমাজ তো মরে গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা হয় না, ভালো ছেলেরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, ঘরে ঘরে বেকার ছেলেমেয়ে, প্রত্যেকটি জিনিস অগ্নিমূল্য। না, আপনাদের দলের উপর আর বিশ্বাস নেই।

ভূষণ ॥ আপনি যা বললেন তা সত্যি। আমরা দোষ স্বীকার করছি। আমাদের দোষ সংশোধন করতেই হবে, আমাদের পণ আদর্শ গণতন্ত্র গড়ব। দুর্নীতি দূর করবই আমরা।

গুপ্ত ॥ বেশ, পারেন তো করুন। আমি এখন চলি। আমাকে আরও কয়েক জায়গায় যেতে হবে। নমস্কার।

[ডাক্তার গুপ্ত বাইরের দিকে ও ভূষণ ভিতরের দিকে প্রস্থান করল। কনিষ্ঠ ও তীরের প্রবেশ।]

তীর ॥ তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমাদের দলের কয়েকজন লোককেও ডেকে আনি এখানে।

কনিষ্ঠ ॥ তাতে লাভ হবে কি ?

তীর ॥ লাভ হয়তো কিছু হবে না ! কিন্তু আমরা ভূষণবাবুকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই কেন আমরা ওঁকে ত্যাগ করেছি। কেন আমরা ওঁর বিরোধিতা করছি। আমাদের মধ্যে অনেক ভুক্তভোগী আছে তারা স্পষ্টভাষায় সে কথা বলতে পারবে ; উনি শুনুন সে সব কথা।

কনিষ্ঠ ॥ কিন্তু আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। অমিতাভকে তোমরা ক্যাণ্ডিডেট দাঁড় করিয়েছ, সে কি আইনত নির্বাচনপ্রার্থী হতে পারে ? সে তো এখানে নেই। শুনেছি পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে আছে।

তীর ॥ কারো ভয়ে লুকিয়ে থাকবার মতো ছেলে সে নয়। সে আসামে মুগার ব্যবসা করছে—আর

[হঠাৎ থেমে গেল]

কনিষ্ঠ ॥ আর কি—

তীর ॥ না কিছু নয়। না, আইনত কোন বাধা নেই। স্ক্রুটিনাইজিং অফিসার ওর আবেদন মঞ্জুর করেছেন।

কনিষ্ঠ ॥ কিন্তু যা শুনছি পুলিশ না কি—

তীর ॥ হ্যাঁ এখানকার পুলিশ ওর উপর সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু আসামে ও নিরাপদে আছে। সেখানকার পুলিশের যিনি বড়কর্তা তিনি ওর সহপাঠী ছিলেন। অমিতাভ যে কত ভালো ছেলে তা তিনি জানেন। এখানে হয়তো সে হঠাৎ আসতে পারে। কিন্তু কথাটা গোপন রেখো। দাদা বৌদির কানে যেন না যায়, ও'রা হয়তো উত্তেজিত হয়ে উঠবেন—

কনিষ্ঠ ॥ অমি কাল টাকা পাঠিয়েছে—

তীর ॥ আমি জানি তো। ভৈরব বাবা কাল আসাম থেকে এসেছেন। তিনিই এনেছেন টাকাটা। তিনি আমাকে বললেন অমির বাবা মাকে তো আমি চিনি না। তুমিই দিয়ে এস টাকাটা। আমার নাম প্রকাশ কোরো না। আমি টাকাটা খামে পুরে সেটা জানালার নীচে রেখে এসেছিলাম।

কনিষ্ঠ ॥ ভৈরব বাবা কি এখানেও বক্তৃতা দেবেন ?

তীর ॥ দেবেন আশা করি। তোমাদের বাড়ির পাশের মাঠে যে বটগাছটা আছে, তারই তলায় আছেন দেখলাম।

কনিষ্ঠ ॥ স্বপাক খান শুনেছি।

তীর ॥ হ্যাঁ। উনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। অমিকে খুব ভালবাসেন। তাকে আমরা দাঁড় করিয়েছি শুনে খুব খুশি হয়েছেন। তোমার সঙ্গে আলাপ নেই ?

কনিষ্ঠ ॥ না, দূর থেকে দেখেছি। আর অমির কাছে শুনেছি ও'র কথা।

তীর ॥ আমি চলি তাহলে এখন। আমাদের দলবল নিয়ে তাহলে আসবো তো ?

কনিষ্ঠ ॥ এসো।

[তীর চলে গেল। কনিষ্ঠও ভিতরের দিকে যাচ্ছিল এমন সময় ভূষণ এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে একগোছা ছাপা কাগজ।]

ভূষণ ॥ কনিষ্ঠ, এইগুলো নাও।

কনিষ্ঠ ॥ কি ওগুলো ?

ভূষণ ॥ ভোটারদের কাছে আমার নিবেদন। তোমার বন্ধুবান্ধবদের দিও।

কনিষ্ঠ ॥ তোমার ইলেক্‌শনের সঙ্গে আমি নিজেকে জড়িত করতে চাই না।

ভূষণ ॥ কি হল ! গতবার তুমি আমার জন্য ক্যানভাস করেছিলে। নিমতা গ্রামে—

কনিষ্ঠ ॥ গতবার তোমার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল এখন আর তা নেই।

ভূষণ ॥ হঠাৎ এ মত-পরিবর্তনের মানে—!

কনিষ্ঠ ॥ মানে তুমি জান।

ভূষণ ॥ জানি। কিন্তু এ-ও তোমাকে বলে দিচ্ছি ওই তীরের সঙ্গে তুমি যদি বেশী ঘনিষ্ঠতা কর তাহলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। হি ইজ্ এ লোফার। ওর উদ্দেশ্য ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা।

কনিষ্ঠ। তোমার বান্ধবী কুন্তীরও কি সেই উদ্দেশ্য না কি! শুনছি সে তার স্বামীকে ত্যাগ করবে।

ভূষণ ॥ [সক্রোধে] তোমার স্পর্ধার একটা সীমা থাকা উচিত। কুন্তী ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের স্ত্রী, তার সম্বন্ধে তুমি এরকম কুৎসিৎ ইঙ্গিত করবার সাহস কর !

কনিষ্ঠ ॥ তীরের মতো সচ্চরিত্র আদর্শবাদী ছেলের নামে কলঙ্ক দিতে তুমি যদি ইতস্ততঃ না কর—

ভূষণ ॥ [হঠাৎ চীৎকার করে] দূরে হয়ে যাও তুমি আমার সামনে থেকে—

[সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে দুম দুম করে কয়েকটা আওয়াজ হল। ধারার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ শোনা গেল—ছোট কাকা তুমি কোথা গেলে। রতনের প্রবেশ।]

রতন ॥ [কনিষ্ঠকে] ধারা-মা আপনাকে ডাকছেন।

ভূষণ। আওয়াজ কিসের হল ?

রতন ॥ বাবু ছোট একটা ইলেকট্রিক কামান বানিয়েছেন সেইটে দাগলেন এখন।

ভূষণ ॥ কামান ? বারুদ দিয়ে কামান দাগল ?

রতন ॥ না, ওতে বারুদ লাগে না। কি দুটো গ্যাস মিশিয়ে তার ভিতর ইলেকট্রিক স্পার্ক দেন।

[রতন ও কনিষ্ঠ ভিতরে চলে গেল। উদ্ভাসিত মুখে জগদীশ প্রবেশ করলেন।]

জগদীশ ॥ বুঝলে ভূষণ, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিকশ্চার ছোট ছোট কয়েকটা স্টীল সিলিণ্ডারে পুরে ধারাকে ইলেকট্রিক কামান বানিয়ে দিয়েছি [সতরঞ্জিগুলি দেখে] এ সব কি ?

ভূষণ ॥ এখানে মীটিং হবে।

জগদীশ ॥ ও তোমার ইলেকশন মীটিং বুঝি ?

ভূষণ ॥ আমার জন্যে যাঁরা ক্যানভাস করবেন তাঁদের কয়েকজনকে ডেকেছি আজ। আচ্ছা দাদা, এত বাল্‌ব লাগাচ্ছ কেন ?

জগদীশ ॥ মনে হচ্ছে মহাকালীর আবির্ভাব আসন্ন। তাঁকে অভ্যর্থনা করব।

ভূষণ ॥ কালীপুজো তো হয়ে গেছে।

জগদীশ ॥ এ কালী মৃন্ময়ী নন, চিন্ময়ী। ইনি প্রতিবছর রুটিন-মাফিক আসেন না, যুগযুগান্তরে একবার আসেন। মনে হচ্ছে এইবার আসবেন। খোকন এই মহাকালীর উদ্দেশ্যে একটা কবিতা লিখেছিল। তার প্রথমটা হচ্ছে—

ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত খড়্গ যাঁর দানবের শোণিতে চর্চিত
যাঁর কণ্ঠে মুণ্ডমালা ভণ্ড মানবের
শোনা যায় ফের
তাঁহারই চরণ-ধ্বনি মনুষ্যত্ব শ্মশান-শিয়রে
বিদ্যুৎ-বিক্ষত নভ আনন্দে ও শঙ্কায় শিহরে।

ভূষণ ॥ খোকন ইলেকশনে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এ খবর জান তুমি ?

জগদীশ ॥ অমির কোন খবরই আমি রাখি না। কেবল জানি কু-শাসনের কুয়াশা তাকে গ্রাস করেছে। কনটেস্ট করছে সে তোমার সঙ্গে ? [সাগ্রহে] সত্যি ? তাহলে হয়তো সে আসবে একবার।

ভূষণ ॥ এলেই কিন্তু তাকে পুলিশে ধরবে। পুলিশ বলছে সে এক ডাকাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

জগদীশ ॥ ছিল না কি ? ভালো। [সহসা] এটা কিন্তু জেনে রেখো হি ইজ্ এ প্যাট্রিয়ট। পলিটিশিয়ান নয়। গদি চায় না, দেশের উন্নতি চায়। ডাকাতি যদি করেই থাকে দেশের ভালোর জন্যেই করেছে।

[ভিতর থেকে আবার পিয়ানোর গৎ বেজে উঠল]

ধারা আবার ওই পিয়ানোটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে। ওতে একটা বেয়ার wire আছে -- টেপ করতে হবে সেটা—দেখি।

[তাড়াতাড়ি ভিতরের দিকে চলে গেলেন। একটু পরে বাজনা থেমে গেল]

ভূষণ ॥ [বাইরের দিকে চেয়ে] আরে আরে—কুন্তী যে। এস এস।

[কুন্তী দেবী প্রবেশ করলেন। ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। বয়স কত বোঝবার উপায় নেই। বিবাহিতা কিন্তু মাথায় সিঁদুর নেই। পিঠে বেণী দুলছে। হাতে সুদৃশ্য একটি ভ্যানিটি ব্যাগ। পায়ে টুকটুকে লাল স্যাণ্ডাল। রং যদিও শ্যামবর্ণ কিন্তু চোখেমুখে মনোহারিণী কমনীয়তা আছে।]

কুন্তী ॥ গৃহস্থালীর খাঁচা ভেঙে চলে এলাম।

ভূষণ ॥ সে কি ! অবনীবাবু তাড়িয়ে দিলেন তোমাকে ?

কুন্তী ॥ না, তাড়িয়ে দেন নি। এ বাজারে পেট-ভাতার রাঁধুনী-চাকরাণীকে চট্ করে তাড়িয়ে দেয় না কেউ। যদিও রোজই শাসাচ্ছেন তাড়িয়ে দেব, কিন্তু তাড়ান নি। আমি নিজেই চলে এলাম।

ভূষণ ॥ কি করবে এখন ?

কুন্তী ॥ তোমার কাছেই এলুম। তোমার বালীগঞ্জের বাড়িটা খালি আছে ? যিনি ভাড়াটে ছিলেন তিনি দিল্লী যাবেন বলেছিলেন।

ভূষণ ॥ তিনি চলে গেছেন। বাড়ি এখন খালি আছে।

কুন্তী ॥ তাহলে তার চাবিটা আমাকে দাও। কিছু টাকাও দাও (ভ্যানিটি ব্যাগটি নেড়ে) আমি এখন ফতুর। যা সামান্য আছে তা ট্যাক্সি ভাড়াতেই যাবে ; তখন সত্যিই আমি কপর্দকহীন হয়ে পড়ব। একবস্ত্রে চলে এসেছি।

ভূষণ ॥ ভালো কর নি। কি করবে এরপর।

কুন্তী ॥ মুচকি হেসে] তুমি যদি মন্ত্রী হও তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারি হব। স্টেনো হতেও আপত্তি নেই। আপাতত পুঁটিকে নাচগান শেখাব। সে মাসে একশ টাকা দেবে বলেছে।

ভূষণ ॥ পুঁটি কে ?

কুন্তী ॥ খেতু বক্‌শির ছোট মেয়ে। পাত্র জুটছে না, তাই ঠিক করেছে সিনেমায় নামবে। একজন ডিরেকটার আশ্বাস দিয়েছেন যে টুইস্ট নাচ আর হুলা-হুলা নাচে যদি দক্ষতা দেখাতে পারে তাকে নেবে। আধুনিক গানও গাইতে পারা চাই। তিনটিই আমি ওকে শিখিয়ে দেব বলেছি।

ভূষণ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ পুঁটিকে তো দেখছি। আমাদের এক সভায় ওপনিং সং গেয়েছিল। সিনেমায় নামবার যোগ্যতা আছে না কি তার ?

কুন্তী ॥ একটা যোগ্যতা আছে আপাতত।

ভূষণ ॥ কি ?

কুন্তী ॥ উদগ্র যৌবন। ওই মেয়ে যদি আধুনিক গান গেয়ে হুলা-হুলা আর টুইস্ট নাচ নাচে হই-হই পড়ে যাবে কলকাতায়! [শতরঞ্জিগুলি দেখিয়ে] এ সব কি?

ভূষণ ॥ আমার ক্যানভাসারদের মীটিং হবে এখানে। তুমি আমার হ'য়ে ক্যানভাস করবে?

কুন্তী ॥ নিশ্চয় করব। তুমি মন্ত্রী হলে আমার একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

[বাইরে ট্যাক্সির হর্ণ শোনা গেল]

ট্যাক্সিটা ওয়েট্ করছে। আমাকে ছেড়ে দাও আমি যাই। তোমার মীটিং কটার সময়?

ভূষণ ॥ একটু পরেই।

কুন্তী ॥ পারি তো আসব। এখন আমাকে ছেড়ে দাও।

ভূষণ ॥ কত টাকা চাই তোমার আপাতত। ভেবেছি প্রতি ক্যানভাসারকে হাত খরচ বাবদ ৩০০ টাকা করে দেব। তুমি যখন আমার ক্যানভাসার হচ্ছ তাই দি তোমাকে।

কুন্তী ॥ বেশ তাই দাও। বাড়ির চাবিটাও দিও।

[হঠাৎ বাহিরে শোনা গেল—জয় ভৈরব বাবা কি জয়—জয় ভৈরব বাবা কি জয়। শাঁখও বাজল দু'একটা]

কুন্তী ॥ ও কি?

ভূষণ ॥ আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে, এক ত্রিশূলধারী ভৈরব এসে হাজির হয়েছেন। তাঁকে ঘিরে অনেক লোক জুটেছে। লাউড স্পীকার ফিট করেছে। বক্তৃতা দেবেন বোধহয়। বোগাস যত ব্যাপার।

কুন্তী ॥ বোগাস নয়। আমি ওকে চিনি। খুব ভাল বক্তা। পারো তো তোমার দলে ওঁকে টান।

ভূষণ ॥ চেষ্টা করেছিলাম। বললেন উনি কারো দলে থাকেন না—একাই দুনিয়া মাৎ করেন। পিকিউলিয়ার ম্যান।

[ট্যাক্সি আবার হর্ণ দিল]

কুন্তী ॥ আমাকে দিয়ে দাও তাহলে।

ভূষণ ॥ দাঁড়াও নিয়ে আসি। একটু দেরি হবে। কারণ আমার স্ট্রং রুম আণ্ডার গ্রাউণ্ডে। অনেকগুলো তালা খুলতে হয়। আমি তোমাকে একটা চেয়ার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[ভূষণ চলে গেল। একটু পরেই ফাগু ভিতর থেকে একটি চেয়ার এনে কুন্তীকে বলল 'বসুন'। কুন্তী চেয়ারে বসল গিয়ে, কিন্তু পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ দাঁড়িয়ে উঠল সে। অপ্রত্যাশিতভাবে প্রবেশ করল অমিতাভ। গায়ে আড়ময়লা কাপড় চাদর, চুল অবিন্যস্ত। প্রতিভাদীপ্ত সৌম্য চেহারা]

কুন্তী ॥ অমিতাভ তুমি এখানে!

অমিতাভ ॥ কে, কুন্তীদি নাকি? আমি আজ সকালে এসেছি।

কুন্তী ॥ [নিম্নকণ্ঠে] পালাও, পালাও, পুলিশ তোমাকে ধরবার জন্যে ওত্ পেতে আছে।

অমিতাভ ॥ আমি তো থানা থেকেই আসছি।
কুন্তী ॥ থানা থেকে! সে কি ওরা তোমায় ছেড়ে দিল?
অমিতাভ ॥ সঙ্গে দুজন পুলিশ এসেছে। বাইরে আছে তারা। আমি এখন এখানেই থাকব।
কুন্তী ॥ আমি বুঝতে পারছি না ঠিক।
অমিতাভ ॥ কোথায় যেন ডাকাতি হয়েছে—বেঙ্গল পুলিশের সন্দেহ আমি তার সঙ্গে জড়িত আছি। আসাম পুলিশকে খবর দিয়েছিল ওরা। আসাম পুলিশই নিয়ে এসেছে আমাকে এখানে। আমি বাবা মার কাছে থাকতে চাইলাম, দারোগা বললে বেশ আপত্তি নেই, তবে সঙ্গে পাহারা থাকবে। আমার সঙ্গে পুলিশ এসেছে দুজন। তারা পাহারা দিচ্ছে—
কুন্তী ॥ [নিম্নস্বরে] বাড়ির ভিতর ঢুকে খিড়কি দিয়ে পালাও তুমি। । যেমন করে হোক পালাও, ওরা তোমায় কোন না কোন ছুতোয় জেলে পুরবেই। ওরা নানারকম জাল পেতেছে আমি জানি—তোমাকে জেলে পুরবেই।
অমিতাভ ॥ [হেসে] পুরুক না। জেলও তো মন্দ জায়গা নয়। তুমি এত ভীতু কেন? তুমি তো টেররিস্ট ছিলে এককালে। এখনও আছ না কি?
কুন্তী ॥ দেখ অমি, আত্মরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তার জন্যে যখন যা হওয়া দরকার তাই হতে হবে। [একটু থেমে] রিভলভারটা আছে এখনও। বম্ও আছে একটা।
অমিতাভ ॥ অবনীবাবু কোথা?
কুন্তী ॥ আমার সঙ্গেই আছে। কিন্তু সুস্থির নেই। টগবগ করে ফুটছে যেন সর্বদা।
অমিতাভ ॥ শুনেছিলাম তিনি একটা থীসিস্ লিখছেন। অতবড় একজন স্কলার—
কুন্তী ॥ স্কলারকে কিন্তু আমল দেয় নি আমাদের স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট। হ্যাঁ, থীসিস লিখছে। কিন্তু আমি স্কলারকে টিকটিকির মুখোশ পরিয়ে রেখেছি। বাইরের লোকে জানে সে স্পাই, আর সেইজন্যেই আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছি—। অবনী কিন্তু ছটফট করছে।
অমিতাভ ॥ এ মিথ্যাচার কেন?
কুন্তী ॥ পেটের জন্যে। বাঁচবার জন্যে। আমি তোমার কাকার বালীগঞ্জের বাড়িতে থাকব। সেইখানেই এস। সব বলব। আর আমার পরামর্শ যদি শোন, পালাও।

[অমিতাভ একটু মুচকি হেসে ভিতরে চলে গেল। ভুষণের প্রবেশ]

ভুষণ। এই নাও চাবি আর টাকা। এবার আমার ক্যানভাসার হয়ে তুমি নিমতা সেণ্টারে যাও। গতবার কনিষ্ঠ গিয়েছিল, এবাব সে অমির জন্যে ক্যানভাস করছে, এবারও হয়তো যাবে সেখানে। I went you to be an antidote to him.
কুন্তী ॥ চেষ্টা করব।

[তার চোখ দুটো চিকমিক করে উঠল। ভ্যানিটি ব্যাগে টাকা ও চাবি রেখে সে কায়দা করে স্যালুট করল একটা। ট্যাক্সির হর্ণ আবার শোনা গেল। কয়েকবার উপর্যুপরি হর্ণ দিল]

আমি যাই এবার।
ভুষণ ॥ আমার একটা কথা শুনবে?

কুন্তী ॥ কি বল ?

ভূষণ ॥ অবনীর সঙ্গে ঝগড়া কোরো না। সত্যিই সে যদি পুলিশের স্পাই হয়ে থাকে, তার সঙ্গে ভাব রাখলেই বরং লাভ হবে আমাদের। আর নিতান্তই যদি ওর সঙ্গে থাকতে না চাও, ভদ্রভাবে পরে না হয় ডিভোর্স কোরো।

[আবার ট্যাক্সি জোরে জোরে হর্ণ দিল]

কুন্তী ॥ অবনীর সঙ্গে ভদ্রভাবে থাকা যায় না। বেশ, তুমি যখন বলছ তখন সহ্য করব তাকে।

[কুন্তী চলে গেল। ভূষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইল। ভিতরে চলে যাচ্ছিল কিন্তু বাধা পড়ল, নীলকান্ত প্রবেশ করলেন। জীর্ণ বেশ। কিন্তু চোখে মুখে নিভীক দৃষ্টি। বয়সে প্রৌঢ়]

ভূষণ ॥ নমস্কার নীলকান্ত বাবু। আজ আমার ইলেকশনের মীটিং, তারই খবর সংগ্রহ করতে এসেছেন বুঝি আপনার কাগজের জন্য।

নীলকান্ত ॥ না, সেজন্য আসি নি। এসেছি ধারার কাছে। এখনই খোঁচ লেগে কাপড়টা ছিঁড়ে গেল [কোঁচা তুলে দেখালেন] দেখি ধারা যদি সেলাই করে দিতে পারে। ওই আমার সব করে। আমার পাঞ্জাবীতে তালি ওই দিয়েছে। চমৎকার শেলাই করে।

ভূষণ। আপনার মতো লোক ছেঁড়া কাপড় পরে তালি-দেওয়া জামা গায়ে দিয়ে বেড়ান—এটা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা। আপনাকে অনেকবার বলেছি আপনি আমাদের দলে যোগ দিন, আপনার কাগজকে আমাদের মুখপত্র করে তুলুন তাহলে আপনার কোন অভাব আমরা রাখব না।

নীলকান্ত ॥ এখনও তো আমার কোন অভাব নেই ভাই। আদর্শকে আঁকড়ে ধরে আছি, ধরে থাকতে পেরেছি, এর চেয়ে বেশী আর কি চাই --

[ক্যানভাসার বিনয় মিত্র সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে প্রবেশ করলেন। পরিধানে চক্‌রা-বকরা ছিটের হাওয়াই শার্ট আর কালো চোং প্যান্ট। পায়ে চপ্‌পল। চোখে রঙীন চশমা। নাকের নীচে বাটারফ্লাই গোঁফ। ইনি আসতেই নীলকান্ত জগদীশের বাড়ির ভিতর চলে গেলেন]

বিনয় ॥ ভূষণ দা, মীটিংয়ের দেরি আছে, না ?

ভূষণ ॥ খুব বেশী দেরি নেই (ঘড়ি দেখলেন) একটায় আরম্ভ হওয়ার কথা।

বিনয় ॥ তাহলে আমি বরেনের বাসা থেকে চট্‌ করে ঘুরে আসি। আজকের কাগজটা পড়া হয় নি। নীলকান্তবাবু এসেছেন দেখছি। আমাদের দলে টানুন না ওকে। বেশ কলমের জোর আছে ভদ্রলোকের।

ভূষণ ॥ বলেছিলাম। রাজি নন। সহজে রাজি হবেন না।

বিনয় ॥ না হবারই কথা। মাথা-ফোলা লোক।

ভূষণ ॥ মাথা-ফোলা মানে ?

বিনয় ॥ Swollen-headed. মিলওলা জয়রাম দাসের ছেলেকে চুরি করার জন্যে উনি রাসটিকেট করেছিলেন। কিন্তু মিনিস্টারের সুপারিশের জোরে সে আবার ভরতি হল। উনি তৎক্ষণাৎ রিজাইন করে চলে এলেন। 'পতাকা' কাগজের মালিকেরা ওঁকে মোটা মাইনে দিয়ে 'এডিটার' করেছিল, কিন্তু উনি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে

এসা এক কড়া এডিটোরিয়েল লিখলেন যে রাজধানী থেকে ওয়ার্নিং এল। 'পতাকা'র মালিকরা বললেন ওপর-ওলাদের মন রেখে এডিটোরিয়েল লিখতে হবে। উনি তৎক্ষণাৎ কাজ ছেড়ে দিলেন। এখন নিজেই 'পথ' কাগজ বের করছেন, কিন্তু বিক্রি নেই। বিক্রি হবে কি করে? Entertainment value nil—সিনেমার খবর ছাপবেন না, আধুনিক কবিতা ছাপবেন না, মজাদার গল্প ছাপবেন না। কেচ্ছা নেই, খিস্তি নেই, আছে কেবল ভালো ভালো প্রবন্ধ। ক'টা লোকে প্রবন্ধ পড়ে বলুন। ভদ্রলোকের কলমের জোর আছে কিন্তু। আমাদের দলে যদি আসতেন—

ভূষণ ॥ আসবেন না। সিধে আঙুলে ঘি বেরুবে না। আঙুল বেঁকাতে হবে [নিম্নকণ্ঠে] ওঁর কাগজের জামানত শিগগিরই বাজেয়াপ্ত হবে—

বিনয় ॥ তাই না কি?

ভূষণ ॥ হ্যাঁ।

[দীনু ময়রার লোক প্রবেশ করিল]

লোকটি ॥ দই এনেছি। এইখানেই নিয়ে আসব?

ভূষণ ॥ না, ভিতরের দিকে রাখতে হবে। খিড়কি দুয়ার দিয়ে এস।

বিনয় ॥ দই কেন?

ভূষণ ॥ তোমরা খাবে।

বিনয় ॥ তাই না কি? বাঃ গ্র্যান্ড। আমি কাগজটা পড়েই আসছি।

ভূষণ ॥ আমিও জিনিসগুলো রাখাই গিয়ে ঠিক করে।

[বিনয় বাহিরের দিকে ও ভূষণ ভিতরে চলিয়া গেলেন। কথা কহিতে কহিতে জগদীশ ও অমিতাভের প্রবেশ]

জগদীশ ॥ তোর মুখে যা শুনছি তাতে মনে হচ্ছে মহাকালীর আগমনের আর দেরি নেই। আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করব বলে 'বালব' সাজিয়ে রেখেছি। এই দেখ।

[হাত দিয়ে অমিতাভকে বালবের সারি দেখালেন]

অমিতাভ ॥ মাঝখানে ওটা কি?

জগদীশ ॥ বন্দেমাতরম্। প্রথমে ভেবেছিলাম 'জয় হিন্দ' লিখব, কিন্তু পরে মনে হল —না 'বন্দেমাতরম্'ই লিখতে হবে। ওই আমাদের আদি মন্ত্র।

অমিতাভ ॥ চমৎকার হয়েছে।

জগদীশ ॥ আর তো কিছু করবার নেই বাবা। তোর সেই কবিতাটা আমি মুখস্থ করে রেখেছি [সহসা] তোকে ডাকাতির চার্জে ফেলেছে?

অমিতাভ ॥ তাইতো শুনছি। শুধু আমাকে নয়, আমায় ব্যবসার পার্টনার সমর ঘোষালকেও। সে ফেরার হয়েছে।

জগদীশ ॥ তোমাদের অপরাধ?

অমিতাভ ॥ অপরাধ আমরা ঘুষ দিই না, খোসামোদ করি না। অপরাধ আমরা একটা নাইটস্কুল করে সেখানে দেশের মহাপুরুষদের জীবনী পড়ে শোনাই। সিংঘাটিতে একটা ডাকাতি হয়েছে পুলিশ রিপোর্ট দিয়েছে ওদের সন্দেহ আমরা ওর মধ্যে আছি। সমর গা-ঢাকা দিয়েছে।

জগদীশ ॥ তোদের মুগার ব্যবসা কেমন চলছে? এতো টাকা পেলি কোথা?

অমিতাভ ॥ সমর টাকা দিয়েছে। ব্যবসা ভালই চলত, কিন্তু বাধা দিচ্ছে গভর্ণমেণ্টের লোকরা। পদে পদে ঘুষ চায়—। তাছাড়া ওখানে লোকাভাব। আমি ভেবেছি ধারাকে নিয়ে যাব। ওকে হাতে কলমে কাজকর্ম শেখাব।

[ভিতর থেকে আবার পিয়ানোর বাজনা শোনা গেল]

জগদীশ ॥ [বিস্মিত]! ধারার ভরণ-পোষণ রক্ষণাবেক্ষণের ভার তুমি নেবে ?

অমিতাভ ॥ নেব।

জগদীশ ॥ [সোল্লাসে] নেবে ? ধারার মত নিয়েছ ?

অমিতাভ ॥ সেটা অনেক আগেই নিয়েছি। ও আমার কাছেই থাকতে চায়। কিন্তু—

জগদীশ ॥ আবার 'কিন্তু' কি—

অমিতাভ ॥ মাকে এখনও বলি নি। তিনি মত দেবেন কি না ভাবছি—

জগদীশ ॥ ওসব কথা ভাবার আগে তুমি তোমার নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর রাস্তা-থেকে-কুড়োনো অজ্ঞাতকুলশীল ওই মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে প্রস্তুত কি না।

অমিতাভ ॥ জাত আমি মানি না। কিন্তু বিয়ের কথা তুলছেন কেন ? আমি তো ওকে বিয়ে করব বলি নি। ও আমার সঙ্গে থাকবে, আমাদের ব্যবসা শিখবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে শেষে।

জগদীশ ॥ ও তোমার সঙ্গেই থাকবে তো ?

অমিতাভ ॥ তা তো থাকবেই।

জগদীশ ॥ তাহলে ওকে বিয়ে করতে হবে। বিয়েতে আমার আপত্তি নেই, আমি খুব খুশী হব।

অমিতাভ ॥ ধারা তার জন্মের ইতিহাস জানে না। সে জানে সে আমার সহোদরা বোন। বোনের মতোই সে থাকবে আমার কাছে। হঠাৎ ওকে ওর জন্মের ইতিহাস বললে ওর মনের কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছেন না ?

জগদীশ ॥ সে কথা কিন্তু ওকে বলতেই হবে একদিন।

অমিতাভ ॥ না বললেই বা ক্ষতি কি ? জগদীশ মল্লিকের কন্যারূপেই ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক। ওর নিজের দীপ্তিই উজ্জ্বল করুক ওকে—

জগদীশ ॥ তুমি যা বলছ তা হয়তো ঠিক, কিন্তু তোমার মা বোধহয় মত দেবেন না। তোমার বিয়েতে হয়তো মত দিতে পারতেন, কিন্তু অবিবাহিত ধারাকে তোমার সঙ্গে যেতে দেবেন কি না সন্দেহ। ওঁর সেকেলে মন। ঘি আর আগুনের উপমাটা ওঁর মনে গাঁথা আছে and perhaps it is true also.

অমিতাভ ॥ মায়ের এ ভুল ভাঙতে হবে বাবা।

[ভিতর থেকে দুম দুম করে আবার ইলেকট্রিক কামানের আওয়াজ শোনা গেল। মালতী প্রবেশ করলেন

মালতী ॥ খোকন খাবি আয়। লুচি ভাজছি। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন সব—

[মালতী, জগদীশ ও অমিতাভ ভিতরে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভুষণের প্রবেশ]

ভুষণ ॥ আপনি ভালো করে দেখেছেন ?

ডাঃ ঘোষ ॥ হ্যাঁ, যা দেখবার আমি দেখে নিয়েছি। আপনার দাদাকে পাগল প্রতিপন্ন করা যাবে না। উনি পাগল নন, খেয়ালী। জিনিয়াস মাত্রেই একটু খেয়ালী হয়।

ভূষণ ॥ কিন্তু আমাদের তো মনে হয় উনি পাগল।

ডাঃ ঘোষ ॥ না। কাল সমস্ত দিন রাত আপনার দোতলার ঘর থেকে ওঁকে আমি ভালো করে লক্ষ্য করেছি। মুগ্ধ হয়ে গেছি ওঁর কামান আর পিয়ানো দেখে। উনি জিনিয়াস, পাগল নন।

ভূষণ ॥ আপনাকে কত দিতে হবে ?

ডাঃ ঘোষ ॥ দু'শো টাকা।

ভূষণ ॥ তা দেব। কিন্তু (গলাখাঁকারি দিয়ে) মানে যদি আপনি—

ডাঃ ঘোষ ॥ (হেসে) বুঝতে পেরেছি। আমি যদি মিথ্যে সার্টিফিকেট দিয়ে জগদীশবাবুকে পাগল প্রতিপন্ন করে দিই, আপনার বৈষয়িক সুবিধা হয়। আর তার জন্যে আপনি আমাকে আরও বেশী টাকা দেবেন—এই তো ?

ভূষণ ॥ দু'হাজার টাকা দেব।

ডাঃ ঘোষ ॥ ধন্যবাদ। আমাদের দেশে বিবেকহীন ডাক্তার আছে বলেই আপনার এই সাহস। কিন্তু আপনি ভুল করেছেন। আমি আলাদা জাতের লোক। আমার ফি-টা কি এখনই দেবেন ?

ভূষণ ॥ এই যে—

[পকেট থেকে টাকা বার করে দিলেন। তিনখানা একশ টাকার নোট]

ডাঃ ঘোষ ॥ বললাম তো আমার ফি দুশো টাকা। বেশী দিচ্ছেন কেন ?

ভূষণ ॥ কথাটা যেন প্রকাশ না পায়।

ডাঃ ঘোষ ॥ পাবে না। কিন্তু আপনি যদি অন্য ডাক্তার ডেকে ওঁকে পাগল বানাবার চেষ্টা করেন আমি প্রতিবাদ করব।

[একখানা নোট ফেরত দিয়ে চলে গেলেন। সহসা ভৈরব বাবার কণ্ঠস্বর লাউড স্পীকারে শোনা গেল। ভূষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে শুনতে লাগলেন]

কণ্ঠস্বর ॥ ইংরেজ ভারত ভাগ করে শাসনভার আমাদের দিয়ে চলে গেছে। এ ভার বড় গুরুভার। এ ভার বহন করবার যোগ্যতা না থাকলে আবার ছারখার হয়ে যাবে সব। আমরা সচ্চরিত্র—বলে যদি বলীয়ান না হতে পারি তাহলে হুড়-মুড়িয়ে সব ভেঙে পড়বে আবার। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। স্বাধীনতাকে যদি রক্ষা করতে চাও বীর হও, মানুষ হও, সাধক হও, সেবক হও, একাগ্র হও, সমর্থ হও। স্বাধীনতা অমূল্য ধন, সে ধন যখন পেয়েছ তখন তা রক্ষা করবার শক্তি অর্জন কর। স্বাধীনতার হর্ম্য দাঁড়িয়ে থাকে দেশের সম্মিলিত শক্তির উপর। সে শক্তি কি আছে আমাদের ? নিজেকে বার বার এই প্রশ্ন কর—সে শক্তি কি আছে ?···

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

একই দৃশ্য। ভূষণবাবুর ইলেকশন সভা আরম্ভ হয়েছে। তাঁর ক্যানভাসাররা প্রত্যেকে গেঁদা ফুলের মালা পরে বসে আছেন। প্রত্যেকের কপালে চন্দনের টিপও রয়েছে। ভূষণ করজোড়ে বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। জগন্নাথ বিশ্বাস, বিনয় মিত্র, সৌরেন গাঙ্গুলী, দুলাল চৌবে এবং আরও কয়েকজন শতরঞ্চির উপর

বসে আছেন ; কুন্তী দেবীও এসেছেন, কিন্তু তিনি শতরঞ্চির উপর বসেন নি। তিনি আলাদা একটি চেয়ারে বারান্দার উপর বসে আছেন। তাঁর গলায় ফুলের মালা বা কপালে চন্দনের টিপ নেই। তিনি একটি সুদৃশ্য নাইলনের শাড়ি পরে আছেন। মাথায় একটি লাল গোলাপ ফুল গোঁজা। জগদীশবাবুর ঘরের জানালাগুলি সব খোলা। কনিষ্ঠের ঘরেরও। দেখে মনে হচ্ছে ওঁরাও এ সভার সম্বন্ধে উদাসীন নন, যদিও এখনও ওঁদের কাউকে সভায় দেখা যাচ্ছে না। ভূষণ প্রাথমিক বক্তৃতা আরম্ভ করল।

ভূষণ ॥ নমস্কার। আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা সবাই আমার আত্মীয়, আমার ঘর আপনাদেরই ঘর। তবু আনুষ্ঠানিকভাবে আজ আপনাদের পুষ্প-চন্দন-চর্চিত করে অভ্যর্থনা করছি কারণ আমরা যা করতে যাচ্ছি তা শুধু ইলেকশন ক্যাম্পেন নয়, তা পুজো। দেশমাতৃকার পুজো ! আপনারা তাঁর প্রতিভূ। আমাদের দেশে পুজোকে কেন্দ্র করে ছোট বড় উৎসব হয়। তাই এই শুষ্ক ইলেক্শন ক্যাম্পেনকে কেন্দ্র করে আমি সামান্য উৎসবের আয়োজন করেছি। আমি জানি সাধারণ ইলেক্শন্ ক্যাম্পেনে এ ধরনের সভা হয় না, আপনারা হয়তো আমার এই উৎসব-প্রবণতাকে উপহাস করবেন, তবু আমি আমার এই প্রবণতাকে দমন করতে পারি নি, দমন করতে চাই নি। কারণ আমরা দেশবাসীকে জানাতে চাই আমাদের এই ক্যাম্পেন দেশকে পুজো করবার অধিকার প্রার্থনার ক্যাম্পেন। পুজো কথাটারই উপর আমি জোর দিতে চাই—

[সহসা ভূষণ থেমে গেল। সদলবলে তীর এসে প্রবেশ করল। জগদীশবাবুর ঘরের বারান্দার উপর উঠে দাঁড়াল তারা। ভূষণ সবিস্ময়ে চেয়ে রইল তাদের দিকে]

তীর ॥ ভূষণবাবু, ক্ষমা করবেন, আপনার এই সভায় আমরাও এসে পড়লুম। আমরাও সবাই ভোটার। আমরাও একদিন আপনার দলে ছিলাম, কেন আপনাকে ছেড়েছি তা বলতে চাই এ সভায়।

ভূষণ ॥ এটা প্রাইভেট সভা। এখানে বিনা নিমন্ত্রণে তোমরা এলে কেন ?

[কনিষ্ঠ ভিতর থেকে বেরিয়ে এল]

কনিষ্ঠ ॥ ওরা বিনা নিমন্ত্রণে আসে নি। আমি ওদের নিমন্ত্রণ করেছি। এ বাড়িতে তুমি ছাড়াও আর একজন প্রার্থী আছে। তারও সমান অধিকার আছে এ রকম সভা ডাকবার।

ভূষণ ॥ নিশ্চয় আছে। অমিতাভ কোথায় ?

কনিষ্ঠ ॥ সে ভৈরব বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। নিজের জন্যে কোনও প্রোপ্যাগাণ্ডা করতে চায় না সে। তার মতে নিজের ঢাক নিজে বাজিয়ে আত্মপ্রচার করা অনুচিত। সে বলেছে সে যে একজন প্রার্থী এইটি শুধু সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হোক। লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে যদি নির্বাচন করে ভালই, যদি না করে তাতেও তার দুঃখ নেই। কিন্তু আমরা জানি অতটা নির্বিকার থাকলে ইলেক্শনে জেতা যায় না। তাই আমরা ঠিক করেছি তার জন্যে চেষ্টা করব।

ভূষণ ॥ কিন্তু এখানে প্রাইভেট সভায় এসে হাল্লা না করে অন্যত্র সে চেষ্টা করলে কি ভালো হতো না ?

তীর ॥ পাবলিক ব্যাপারে প্রাইভেট কোন কিছু থাকবে কেন। Everything should be above board—তাছাড়া আমরা হাল্লা করব তাই বা আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন ? আমরা আপনার বক্তব্য শুনব। প্রয়োজন হলে দু'একটা প্রশ্ন করব।

দুলাল চৌবে ॥ বেশ তো, বেশ তো ওঁরা থাকুন না, এতে আপত্তি কি আছে ?

বিনয় মিত্র ॥ প্রশ্ন করলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে। উত্তর দিয়ে ওঁদেরও আমরা convince করতে পারব।

জগন্নাথ বিশ্বাস ॥ আমাদের বক্তব্য শুনে ওঁরাও আমাদের দলে আসতে পারেন।

সোরেন গাঙ্গুলী ॥ ভালই হয়েছে আপনারা এসেছেন। কোথায় বসবেন ?

তীর ॥ আমরা এই বারান্দাতেই বসছি।

[সকলে বসে পড়লেন। জগদীশ ও নীলকান্তর প্রবেশ। তাদের পিছু পিছু রতন ঢুকল দুটো চেয়ার নিয়ে। জগদীশ ও নীলকান্ত চেয়ারে বসলেন। রতন ভিতরে চলে গেল]

জগদীশ ॥ আমি ভেবেছিলাম আজ আরও এক সার আলো টাঙাব। কিন্তু সভার গোলমালে তা আর হল না। তাই ঠিক করলুম তোমাদের বক্তৃতাই শুনব আজ। অবশ্য এসব বক্তৃতায় আমার আস্থা নেই। আমি জানি empty vessel sounds much—ভূষণকে অনেকদিন আগেই বলেছিলাম যদি সত্যি সত্যি দেশের কাজ করতে চাও গ্রামে গিয়ে গরীবদের সঙ্গে বাস কর, তাদের দুঃখ নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব কর। কাউন্সিলে গিয়ে আর কি হবে ? সেখানে তো হাততোলা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। সেখানে নিজের বিবেককে বলিদান দেবার জন্যে পার্টির খুঁটিতে বাঁধা থাকতে হবে।

বিনয় মিত্র ॥ [হেসে] বক্তৃতায় যদি বিশ্বাস নেই তাহলে বক্তৃতা শুনতে এলেন কেন দাদা ?

জগদীশ ॥ ছেলেবেলায় যাত্রা শুনতে খুব ভালবাসতুম। এখনও বাসি। সেকালে রাধু কেরাণী রাবণের পার্ট খুব চমৎকার করত। পলিটিক্যাল রাম-রাবণের যুদ্ধ, পাণ্ডব-কৌরবের তর্জনগর্জনও মন্দ লাগে না, যদি তারা ভালো অভিনয় করতে পারে।

কুন্তী ॥ [দাঁড়িয়ে উঠে, তীরের দিকে চেয়ে] আমাদের বক্তব্য শোনার আগে আপনাদের বক্তব্য শুনতে চাই। আমাদের বক্তব্য ছাপা হয়েছে, সেগুলি এখনই আমরা বিতরণ করব।

ভূষণ ॥ [ভিতরের দিকে চেয়ে] মোহন, ছাপা বইগুলো এনে সবাইকে দাও।

[মোহন ছাপা প্যামফ্লেট বিলি করে গেল]

তীর ॥ এটা আমি পড়েছি।

কুন্তী ॥ তাহলে বলুন কি প্রশ্ন করতে চান আপনি।

তীর ॥ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারিতে যে শপথ আমরা গ্রহণ করেছিলাম, যে শপথে আমরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলাম কেন আমরা ইংরেজের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করতে চাই, যে শপথ প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে গিয়ে দেশের অনেক নেতা এবং ছাত্র পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন, মারাও গিয়েছিলেন কয়েকজন, সে শপথের কথা কি আপনাদের মনে আছে ? সে শপথে ছিল, আমরা স্বাধীনতা

চাই কারণ জীবনধারণের জন্য যা অপরিহার্য তা আমরা পাই না। এখন কি পাই ? এখন আমরা খেতে পর্যন্ত পাই না। আপনারা কি তার ব্যবস্থা করবেন ? মৌখিক প্রতিশ্রুতি ভূষণবাবুর দল আগেও দিয়েছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন কি ? সে শপথে ছিল আমরা ইংরেজের শাসন থেকে মুক্তি দাবী করি কারণ সে শাসনে আমাদের পূর্ণাঙ্গ উন্নতির সুযোগ নেই। এখন কি আছে ? এখন আমাদের ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা পাচ্ছে তা কি শিক্ষা ? কোট-প্যান্ট-পরা মূর্খ বেকারে তো দেশ ভরে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় আর স্কুল-কলেজেও জঘন্যতম অসাধুতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। তার কোন প্রতিকার নেই কেন ? গভর্ণমেণ্ট ছাত্রদের শাসন করতে ভয় পান, কারণ ছাত্রদের হাতেই ভোট। সে শপথে আর একটা কথাও ছিল যে আমাদের আয়ের অনুপাতে ইংরেজরা অনেক বেশী কর আদায় করেন। আমাদের স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট কি অনুপাতে কর আদায় করছেন এখন ? করের চাপে আমাদের জিব বেরিয়ে গেছে, আমাদের নাভিশ্বাস উঠেছে—গভর্ণমেণ্ট তা দেখেছেন কি ? সে শপথে ছিল ইংরেজরা আমাদের কুটিরশিল্প এবং চাষীদের উন্নতির কোন চেষ্টাই করেন নি। আমাদের গভর্ণমেণ্ট নানারকম পরিকল্পনা বানিয়ে সে চেষ্টা করেছেন অবশ্য, কিন্তু ফল কি হয়েছে ? আমাদের দেশের প্রতিভাবান শিল্পীরা আজও অজ্ঞাত, অখ্যাত দারিদ্র্যের পেষণে নিষ্পিষ্ট। পুরস্কৃত হচ্ছেন খোশামুদেরা। উদাহরণ আমাদের এই সভাতেই রয়েছেন। শ্রদ্ধেয় জগদীশদা।

[জগদীশ উঠে দাঁড়ালেন]

জগদীশ ॥ আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন আবার। আমি চললুম।

[চলে গেলেন। নীলকান্ত বসে রইলেন]

তীর ॥ শ্রদ্ধেয় জগদীশদা প্রতিভাবান বিজ্ঞানী এবং শিল্পী। তিনি ঘরে বসে সস্তায় ট্রানজিস্টার করেছিলেন। টাকা পেলে ঘরে বসেই তিনি সস্তা ট্রানজিসটার তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু বার বার আবেদন করেও তিনি গভর্ণমেণ্টের দপ্তর থেকে কোন সাড়া পান নি। চাষের উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট বড় বড় বাঁধ বেঁধেছেন কোটি কোটি টাকা ধার করে, কিন্তু গরীব চাষীরা উপকৃত হয় নি। উপকৃত হয়েছে কতকগুলো চোর। আমাদের দলের নিবারণবাবু চাষী, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা নিজেই বলবেন। গভর্ণমেণ্ট যেসব কুটিরশিল্পের দোকান করেছেন সেখানে যাঁরা কর্মচারী তাঁরা তাঁদের পেটোয়া লোক। যে শিল্পের নিদর্শন সেখানে থাকে তা প্রায়ই মহৎ শিল্প নয়, বেতনভোগী মজুরদের ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। সে সব দোকানের প্রত্যেকটি জিনিস অগ্নিমূল্য। সে সব দোকানের বিক্রেতারা উদ্ধত, কারণ তারা গভর্ণমেণ্টের চাকুরে, দোকানের উন্নতি-অবনতির তোয়াক্কা রাখে না। ২৬শে জানুয়ারির শপথে আর একটা কথাও ছিল, আমাদের নেতারা বলেছিলেন আমরা ইংরেজদের অধীনে থাকতে চাই না, কারণ আমাদের দেশের মানী লোকদের মান তাঁরা রাখেন না—the tallest of us have to bend before foreign authority ; আমাদের স্বাধীন গভর্ণমেণ্টেও কি তা হচ্ছে না। আমাদের দেশের যাঁরা tallest তাঁদের মধ্যে দু'চার জন গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদ পেয়েছেন স্বীকার করি, কিন্তু অধিকাংশই তো অবজ্ঞাত, অপমানিত অনেকে।

ভূষণ ॥ তুমি যা বলেছ তা অতিরঞ্জিত। মানছি গভর্ণমেণ্ট অনেক জায়গায় ভুল করেছেন। কিন্তু ভুল সংশোধন করবারও চেষ্টা করছেন তাঁরা।

তীর ॥ তার কোনও প্রত্যক্ষ ফল তো দেখা যাচ্ছে না। নিবারণবাবু আপনি আপনার কথা বলুন। নিবারণবাবু চাষ করেন, গ্রামে থাকেন। চাষের উন্নতিকামী গভর্ণমেণ্টের কাছে উনি কি ব্যবহার পেয়েছেন শুনুন।

[নিবারণবাবু উঠে দাঁড়ালেন। খদ্দরের জামা-কাপড়-পরা বলিষ্ঠ লোক। পুষ্ট একজোড়া গোঁফ আছে।]

নিবারণ বাবু ॥ গভর্ণমেণ্টে চাষের উন্নতির জন্য নানারকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমরা গ্রামের চাষীরা তা শুনেছি। নানা রঙের নানা ঢঙের অফিসাররা এসে তা আমাদের শুনিয়ে গেছেন। রেডিওতেও শুনি। কিন্তু কার্যত আমরা কিছু পাই নি। গভর্ণমেণ্ট ভালো বীজ দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু চিঠি লিখে লিখে হয়রান হয়ে গেছি, বীজ পাই নি। ঘুস চায়। গভর্ণমেণ্ট বলেছিলেন সার দেবেন। গ্রামের যেখানে যত সার ছিল তা তাঁরা নিয়ে গিয়ে জমা করেছেন শহরে। নানারকম কেমিক্যাল সার আর প্রতিষেধক ওষুধও নাকি সেখানে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সার দেন যে অফিসাররা তাঁদের মর্জি না হলে সার পাওয়া শক্ত। তিনবার গাড়ি-ভাড়া খরচ করে গেলাম, কিন্তু পেলাম না। খরচ করে পাম্প বসিয়েছি, কিন্তু পাম্প চলে না, সর্বদাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কাছে-পিঠে সারাবার ব্যবস্থা নেই। টিউবওয়েলেরও সেই অবস্থা। গভর্ণমেণ্টের অফিসাররা চাষের জমির কাছে থাকেন না। থাকেন শহরে, অসুবিধা হলে তাঁদের পরামর্শ পাওয়া যায় না। নদীতে বাঁধ বেঁধে চাষের জন্য যে জল সরবরাহ করা হবে শুনেছিলাম সে জলের এত দাম যে গরীবরা তা কিনতে পারে না। এই সব কারণে চাষের অবস্থা আগেও যা ছিল এখনও তাই আছে। দিন দিন খারাপই হচ্ছে বরং—

ভূষণ ॥ এই সবের প্রতিকার করব বলেই তো বিধানসভায় ঢুকতে চাইছি আমি।

তীর ॥ গতবারও আপনি ঢুকেছিলেন। কি প্রতিকার করেছেন ?

[কুন্তী উঠে দাঁড়াল]

কুন্তী ॥ এটা ভুলে যাবেন না বিধানসভার সদস্যরা চেষ্টাই করতে পারেন, আর কিছু করতে পারেন না। মেজরিটি ভোটে যা গৃহীত হবে তা তাঁকে মানতে হবে।

তীর ॥ তা আমি জানি। কিন্তু মেজরিটি ভোটে যদি কোনও অন্যায় প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহলে সে বিধানসভা ত্যাগ করে চলে আসা উচিত ; তাছাড়া ভূষণবাবু তাঁর পার্টির বিরুদ্ধে কোন কিছু করেছেন বলে আমার জানা নেই।

জগন্নাথ বিশ্বাস ॥ দেখুন, এসব বিতর্ক করে কোন লাভ নেই। আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে আমরা চলব। ফলাফল যা-ই হোক। ভূষণবাবুকে আমরা যোগ্য লোক মনে করি। তিনি যাতে নির্বাচিত হন সেজন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তবে আপনাদের সমালোচনা শুনতে আমাদের আপত্তি নেই। আর কেউ কিছু বলবেন ?

তীর ॥ যতীনবাবু, আপনার যা বলবার আছে বলুন।

[যতীনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। চোখে হাই-পাওয়ার চশমা। প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করেছেন। তীক্ষ্ণ নাক। গোঁফ-দাড়ি কামানো। মাথার সামনের দিকে ঈষৎ টাক]

যতীনবাবু ॥ আমি মশাই পুলিশে কাজ করতাম। মানে, দারোগা ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি রাখতে পারি নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পরে আমার উপর-ওলা একজন অফিসার বললেন, যদি চাকরির উন্নতি চাও আমাকে মাসে দু'শ টাকা করে দিতে হবে। বললাম, দু'শো টাকা আমি কোথা থেকে পাব সার। তিনি বললেন যেমন করে হোক পেতে হবে। রাইট অ্যান্ড লেফট্ ঘুষ নাও আর তার ভাগ আমাকে দাও। আমি যদি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হতাম আমার চাকরির উন্নতি হত। কিন্তু আমার দুর্বুদ্ধি হল আমি তাঁর নামে উপরে কমপ্লেন করলাম। তাঁর কিছু হল না, আমার চাকরিটা গেল। একজন হোমরা-চোমরা মিনিস্টার তাঁর আত্মীয় ছিলেন। আপনাদের কাছ থেকে আমি কোন সুবিচার পাই নি।

[বসে পড়লেন। আর একজন উঠলেন। লোকটি রোগা, ঝোলা গোঁফ, গায়ে একটি লম্বা গলাবন্ধ কোট। জগদীশও আবার নিঃশব্দে এসে চেয়ারে বসলেন]

তীর ॥ যোগেনবাবু, আর একটু এগিয়ে আসুন।

[যোগেনবাবু এগিয়ে এলেন। বাঁ হাত দিয়ে গোঁফ মুছলেন]

তীর ॥ [হেসে] জগদীশদা আবার ফিরে এলেন যে ?

জগদীশ ॥ ভিতরে একা ভালো লাগল না। এখানেই বসি।

তীর ॥ যোগেনবাবু বলুন।

যোগেন ॥ আমি একজন শিক্ষক। একটা স্কুলে মাস্টারি করতাম। খুব কম বেতন ছিল। তাও নিয়মিত পেতাম না। তবু একটা আদর্শের জন্য দারিদ্র্য সহ্য করেও ছিলাম সেখানে। কিন্তু আমার আদর্শও শেষ পর্যন্ত টিকল না। সে স্কুলে বাঙালী ছেলে শতকরা আশি জন। বাংলার মাধ্যমে সেখানে পড়ানো হতো। উপর থেকে হঠাৎ হুকুম এল হিন্দীর মাধ্যমে না পড়ালে সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে না। একমাত্র আমিই তার প্রতিবাদ করলাম। কেউ গ্রাহ্য করলে না সে প্রতিবাদ। ফলে আমাকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হল। সে স্কুলে এখন জোর করে বাঙালী ছেলেদের হিন্দী পড়ানো হয়। আমি টাকা নিয়ে কখনও টিউশনি করি নি। যারা আমার বাড়িতে আসত বিনা বেতনে তাদের পড়িয়ে দিতাম। আমার জায়গায় যিনি এসেছেন তিনি চুটিয়ে প্রাইভেট টিউশনি করছেন। তাঁর বাড়িতে সকাল-সন্ধে পাঠশালার মতো বসে। প্রত্যেকের কাছ থেকে মাইনে নেন তিনি। যে ছেলে বেশী টাকা দেয় তাকে কোশ্চেন পর্যন্ত বলে দেন। তিনি খোশামোদ-পটু ওস্তাদ লোক। তাঁর মাইনেও বেড়েছে শুনছি। আমি আদর্শ শিক্ষক হতে চেয়েছিলাম স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট সে সুযোগ আমাকে দিলেন না। আমাকে এখন ক্যানভাসার হতে হয়েছে। মুদীর দোকানও করেছি একটা।

[বসে পড়লেন। উঠলেন ডাক্তার বোস। বুক-খোলা কোট গায়ে। পকেটে স্টেথোস্কোপ। হৃষ্ট-পুষ্ট গোল মুখে বুদ্ধিদীপ্ত হাসি]

ডাক্তার বোস ॥ আমার কথাটাও শুনুন তাহলে। আমি এক হাসপাতালে চাকরি করতুম মশাই। টিকতে পারলাম না। ওষুধপত্র কিছু নেই, চিঠি লিখে লিখে হয়রান। কোন উত্তরও নেই। রোজ একপাল রোগী, কি দিয়ে তাদের চিকিৎসা করি বলুন। এর উপর আছে গভর্ণমেণ্ট অফিসারদের হুমকি। পালিয়ে এলুম। আমার

জায়গায় যিনি এসেছেন তিনি গভর্ণমেণ্টের পেয়ারের লোক, তিনি কিছু ওষুধপত্র পেয়েছেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের চেয়ারে বসে তিনি প্রতি রোগীর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে চিকিৎসা করেন। খুব টাকা পিটছেন শুনেছি, যে যা দেয় তাই নেন। এ গভর্ণমেণ্টে আদর্শবাদী লোকের স্থান নেই। এঁরা গ্রাম-পঞ্চায়েত করছেন আজকাল। কিন্তু তা হয়েছে আমাদের সনাতন চণ্ডীমণ্ডপের নতুন রূপ। ওদের মধ্যে ভাল লোক বেশী নেই। সবই প্রায় ঘুঘু।

[জগদীশ আবার উঠে পড়লেন]

জগদীশ ॥ নাঃ! ওরে ভিতরে গিয়ে লুডো খেলি চল। যাত্রা ঠিক জমছে না। আয়।

[একটি ছেলেকে ইশারা করলেন]

ছেলেটি ॥ যাবার আগে তাহলে আমিও একটা কথা বলে যাই! কলেজে মিউজিক আমার একটা বিষয় ছিল। সবাই বলত আমি সেতার খুব ভাল বাজাই। ফাইনাল পরীক্ষার সময় যিনি পরীক্ষক হয়ে এলেন তিনিও আমার সেতার শুনে বললেন আমার বাজনা খুব ভাল লেগেছে তাঁর। কিন্তু তিনি আমাকে পাঞ্জাবী ভেবেছিলেন। আমাদের প্রিন্সিপালের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে তিনি বললেন ওই পাঞ্জাবী ছেলেটি চমৎকার বাজিয়েছে। কিন্তু প্রিন্সিপাল বললেন—উহু তো বাঙালী হ্যায়। পরীক্ষার ফল যখন বেরুল তখন দেখলাম প্রিন্সিপালের মেয়ে বাজনায় ফার্স্ট হয়েছে, আর আমি লাস্ট।

জগদীশ ॥ এসব নিয়ে কেন দুঃখ করছিস তুই। তোদের তো কতবার বলেছি ওরা গদি দখল করেছে ওরা এখন হাতে মাথা কাটবে। ভারতবর্ষের ইতিহাস খুলে দেখ, যে যখন সিংহাসন দখল করেছে সে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে কিসে তার প্রভুত্ব বজায় থাকে। এ চিরকাল হয়েছে, এখনও হচ্ছে। ভবিষ্যতেও হবে। মাইট ইজ রাইট—এ কথাটা মিথ্যে নয়। চল এ ঘ্যানোর ঘ্যানোর আর ভাল লাগছে না।

[কনিষ্ঠ উঠে দাঁড়াল]

কনিষ্ঠ ॥ কিন্তু দাদা আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করব না তা বলে?

জগদীশ ॥ কর। হাতী যখন বাজার দিয়ে যায় হাজার হাজার কুকুর তার প্রতিবাদ করে। কিন্তু হাতী কখনও সে প্রতিবাদ গ্রাহ্য করেছে বলে শুনি নি। এর সত্যিই যিনি প্রতিকার করেন, তিনি হঠাৎ যুগে যুগে আসেন, এবারও আসবেন, তাঁর আগমন আসন্ন। তাঁকে অভ্যর্থনা করব বলেই আমি দীপালী সাজিয়ে রেখেছি! চল—

[ছেলেটি ও জগদীশের প্রস্থান]

তীর ॥ তবু আমরা প্রতিবাদ করব। একবার নয়, বারবার করব। প্রতিবাদই গণতন্ত্রের বিবেককে জাগিয়ে রাখে! কনিষ্ঠ আমি যাচ্ছি। একটু পরেই বেরুব আমরা। গাড়ি নিয়ে আসছি আমি।

নিবারণ বাবু ॥ আমরাও তাহলে চললাম।

[তীরের সঙ্গে নিবারণবাবু, যতীনবাবু, যোগেনবাবু ও ডাক্তার বোস চ'লে গেলেন। নীলকান্ত একধারে বসে নীরবে লিখছিলেন। তাঁর 'পথ' কাগজের জন্যে 'নোট' নিচ্ছিলেন সম্ভবত। তীরের কথায় তিনি মুখ তুলে চাইলেন]

নীলকান্ত ॥ আমাদের এখন freedom of speech আছে ! যত খুশী মৌখিক প্রতিবাদ আমরা করতে পারি। কিন্তু ইতিহাসের নজীর হচ্ছে তাতে কোন ফল হয় না। সক্রিয় প্রতিবাদ করতে হয়, তার জন্যে দুঃখ ভোগ করতে হয়। আজ যাঁরা আমাদের নেতা তাঁরাও এককালে জেল খেটে অনেক দুঃখ ভোগ করেছিলেন।

কনিষ্ঠ ॥ জেল খেটে দুঃখ ভোগ আমিও করেছিলাম, আপনি করেছিলেন, তাঁরাও করেছিল। কিন্তু আমরা কেউ নেতা হ'তে পারি নি। আদর্শকে বিসর্জন দিতে না পারলে গদি পাওয়া যায় না। খাঁটি সোনার গয়না হয় না। তাতে খাদ মেশাতে হয়।

[কুন্তী উঠে দাঁড়ালেন। মুখে মৃদু হাসি]

কুন্তী ॥ সোনা হয়ে লাভ কি কনিষ্ঠ যদি তা অলংকারে রূপান্তরিত না হ'তে পারে। সত্যি সত্যি তা যদি অলংকার হ'য়ে উঠতে পারে তাহলে একটু আধটু খাদে আপত্তি করা উচিত নয়।

কনিষ্ঠ ॥ উচিত কিনা সে তর্কে আপনার কাছে আমি হেরে যাব ! কারণ আপনি খাদ-বিশারদ। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি আমরা আদর্শকে খাটো করতে পারি নি বলেই সংখ্যা-লঘুদের দলে পড়ে আছি।

কুন্তী ॥ আপনাদের দলে ক্রীশ্চিয়ার গান্ধী, বাদশা খাঁনও আছেন। তাঁর সারা জীবনই তো জেলে কাটল। আপনার কথা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে যে সংখ্যা-লঘুদের দলে পড়ে গেছেন ব'লে আপনার মনে একটু দুঃখ আছে। সংখ্যা-গরিষ্ঠদের দলে ঢুকতে পারলে যেন খুশী হতেন।

কনিষ্ঠ ॥ নিশ্চয়ই হতাম ! সংখ্যা-গরিষ্ঠের দলেই তো ঢুকতে চাই, কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নয়, আমাদের উজ্জ্বল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে।

[সৌরেন গাঙ্গুলি উঠে দাঁড়ালেন]

সৌরেন ॥ আমরাও তাই চাই। আমরা যে সব প্রার্থীকে দাঁড় করাই তাঁরা সবাই আদর্শবাদী সৎ লোক।

কনিষ্ঠ ॥ না, তা নয়। আমি নাম করতে চাই না কিন্তু আমি জানি সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের পৃষ্ঠপোষকতায় এমন অনেক লোক বিধানসভায় ঢুকেছেন যাঁরা কালো-বাজারী, গুণ্ডা, লম্পট, মাতাল, চোর, মতলববাজ।

সৌরেন ॥ আপনার দাদা ভুষণবাবুকেও কি আপনি উপযুক্ত লোক মনে করেন না ?

কনিষ্ঠ ॥ না, করি না।

সৌরেন ॥ কেন, করেন না ? তিনি চিরকাল সমাজসেবা করে এসেছেন, দেশের লোক সস্তায় ওষুধ পাবে বলে অনেক লোকসান সহ্য করেও তিনি একটা ওষুধের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন, উনি এখানে খদ্দরের দোকান করেছেন। দেশের ছেলে-মেয়েরা যাতে খাঁটি দুধ-ঘি পায় তার জন্যে উনি গোপালন সমিতি করেছেন—

কনিষ্ঠ ॥ উনি আমার দাদা, প্রকাশ্য সভায় আমি ওঁর কার্যকলাপের সমালোচনা করতে চাই না। তবে আমার মতে উনি বিধানসভায় যাওয়ার উপযুক্ত লোক নন।

সৌরেন ॥ আপনার এ অভিমত অন্যত্র প্রচার করুন গিয়ে। এখানে সুবিধে হবে না।

ভূষণ ॥ না, না, সৌরেন। সকলের অভিমত আমরা শুনব। সকলের অভাব-অভিযোগ আমাদের জানতে হবে, তবেই আমরা ওদের সেবা করতে পারব। দুঃখ-কষ্ট মোচন করতে হলে সেগুলো কি তা জানা দরকার। আপনি কিছু বলবেন কি? আপনার কি দুঃখ-কষ্ট বলুন।

[ভুধরবাবু নামক একজন গ্যাট্টাগোট্টা ভদ্রলোক এতক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসেছিলেন। তাঁকে তীর ডেকে এনেছিল। তিনি কিছু বলেন নি, সবার কথা শুনছিলেন। তাঁর বড় বড় চোখ দুটি যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছিল; তিনি হয়তো কিছু বলতেন না, কিন্তু ভূষণবাবুর কথায় উঠে দাঁড়ালেন]

ভুধরবাবু ॥ আপনি মশাই ন্যাকা না কি, আমাদের দুঃখ-কষ্ট কি তা জানেন না? আমরা খেতে পাচ্ছি না, মাথা গোঁজবার জায়গা পাচ্ছি না, আমাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে ভরতি হতে পাচ্ছে না, ভরতি হলেও শিক্ষা পাচ্ছে না। ভালোভাবে পাশ করলেও রোজগার করবার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। অমিতাভর মতো হীরেরটুকরো ছেলেও খোশামোদ করতে পারে নি বলে চাকরি পায় নি। ধরাধরি আর ঘুষ, কালোবাজার আর যথেচ্ছাচার এইতো চলছে খালি। এসব কি আপনি জানেন না? ন্যাকামি করছেন কেন? আপনাদের বৈঠক আর অধিবেশন, টুর আর শুভ উদ্‌ঘাটন এইতো হচ্ছে খালি, আর হচ্ছে কি? মধ্যবিত্ত সমাজ তো মরে গেল, অনেকের বাড়িতে দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে না। বাজারে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। প্রতিটি জিনিস অগ্নিমূল্য। এসব কি আপনার অজানা? ন্যাকামি করছেন কেন মশাই? আপনার খদ্দরের দোকান থেকে কাপড় কিনে দেখলাম অর্ধেক সুতো মিলের। আপনার গোপালন সমিতির দুধ জল মেশানো, ঘি ভেজিটেবল তেলে ভরতি—

[দুলাল চৌবে উঠে দাঁড়ালেন]

দুলাল ॥ ভূষণবাবু, এঁরা ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করছেন। আশা করেছিলাম এঁরা এঁদের বক্তব্য ভদ্রভাবে বলবেন, তাই এঁদের আহ্বান করেছিলাম কিন্তু আপনার মতো লোককে ওঁরা যে ভাবে অপমান করছেন তাতে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছে—

ভুধরবাবু ॥ তা তো উঠবেই! উনি যে আপনার ছেলের চাকরি করে দিয়েছেন। চললুম—

[গটগট করে চলে গেলেন। বিনয় মিত্র এতক্ষণ বসে সিগারেটে রিং করছিলেন। তিনি এইবার উঠে দাঁড়ালেন।]

বিনয় ॥ এসব কি বাজে গজল্লা হচ্ছে! এখানে মীটিং না ক'রে ভিতরে করা উচিত ছিল। বাজে লোকের ভীড় জমে গেছে। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। ভিতরে চলুন।

ভূষণ ॥ তাই চল।

কুন্তী ॥ [নীলকান্তবাবুকে] আপনার কাছ থেকে একটা তেজস্বিনী বক্তৃতা শুনব আশা করেছিলাম। আপনি আমাকে হতাশ করলেন।

নীলকান্ত ॥ [হেসে] আমি সম্পাদক, যা বলি লিখে বলি, মুখে বলি না।

কুন্তী ॥ আপনার লেখা আমি নিয়মিত পড়ি। গতমাসের 'পথ'-এ যে সম্পাদকীয় বেরিয়েছিল—'হবে না হবে না খোল তরবার এসব দৈত্য নহে তেমন'—তাতে আপনার নির্ভীকতা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

নীলকান্ত ॥ শুধু অবাক হলে চলবে না, সবাক সক্রিয় হতে হবে। জড়তাই আমাদের দুর্দশার কারণ। তোমরা জাগো, সত্যি জাগো—না জাগলে মৃত্যু—

[ডাক পিওনের প্রবেশ]

পিওন ॥ [নীলকান্তকে] ও আপনি এখানে আছেন! আপনার নামে একটা রেজেণ্ট্রি চিঠি আছে।

[সই করে নীলরতন রেজেণ্ট্রি চিঠি নিলেন]

পিওন ॥ [ভূষণকে] এই আপনার ডাক।

[ভুষণকে এক গোছা চিঠি দিয়ে চলে গেল। ভুষণ সেগুলি একটু উলটে পালটে দেখে না পড়েই পকেটে পুরে ফেললেন। নীলকান্ত নিজের চিঠিটি খুলে পড়লেন। তাঁর চোখে মুখে হাসি ফুটে উঠল]

নীলকান্ত ॥ [কুন্তীর দিকে চেয়ে] তরবারি কোষবন্ধ করতে হল।

কুন্তী ॥ তার মানে ?

নীলকান্ত ॥ গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে চিঠি এসেছে তারা 'পথ' কাগজের সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করেছেন আর আমাকে জানিয়েছেন 'হবে না হবে না খোল তরবার' প্রবন্ধটির জন্য তাঁরা আমার নামে কেস করবেন।

কুন্তী ॥ কি করবেন তাহলে এখন ?

নীলকান্ত ॥ 'পথ' বন্ধ হল, 'রথ' বেরুবে।

[ভিতরে শাঁখ বেজে উঠল]

সৌরেন ॥ হঠাৎ শাঁখ বাজল যে।

ভূষণ ॥ বৌদির পুজো বোধহয় শেষ হল।

কনিষ্ঠ ॥ আমি যাই তাহলে—

[ভিতরে চলে গেল]

বিনয় ॥ ভূষণদা, আর দেরি করছেন কেন ? ভিতরে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে ফেলা যাক।

দুলাল ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চলুন।

ভুষণ সদলবলে ভিতরে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাধা পড়ল। অমিতাভর সঙ্গে ভৈরব বাবা প্রবেশ করলেন! পরণে গেরুয়া, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা ; কপালের মাঝখানে বড় সিঁদুরের টিপ! হাতে ত্রিশূল]

ভৈরব বাবা ॥ এই তোমাদের বাড়ি ?

অমিতাভ ॥ [সসম্ভ্রমে] আজ্ঞে হ্যাঁ! আমি বাবাকে খবর দিই।

[ভিতরে চলে গেল]

ভৈরব বাবা ॥ [চারদিকে তাকিয়ে] এখানে কি হচ্ছিল ? সভা ?

ভূষণ ॥ হ্যাঁ।

ভৈরব বাবা ॥ কিসের সভা ?

জগন্নাথ ॥ আমাদের ইলেকশন মীটিং। ভুষণবাবু এবার দাঁড়াচ্ছেন কি না। তাই—

ভৈরব বাবা ॥ ও বুঝেছি ; কিন্তু অমির বাড়িতে এরকম সভা দেখব তা প্রত্যাশা করি নি।

ভূষণ ॥ এটা শুধু অমির বাড়ি নয়, আমারও বাড়ি। অমি আমার ভাইপো। আমি তো আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম আমার দলে আসুন, কিন্তু আপনি রাজি হন নি।

ভৈরব বাবা ॥ আমি চারণ। আমি কারও দলে থাকি না।

দুলাল ॥ চারণ ? চারণ কি আবার ?

ভৈরব বাবা ॥ ইতিহাস পড়ুন, বুঝতে পারবেন। আমাদের কাজ দেশকে জাগানো।

ভূষণ ॥ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, দেশ তো জেগেই আছে।

ভৈরব বাবা ॥ না ঘুমুচ্ছে, অঘোরে ঘুমুচ্ছে, মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে। তাকে জাগাতে হবে।

ভূষণ ॥ কি করে জাগাবেন আপনি ?

ভৈরব বাবা ॥ আমাদের পূর্বসুরীরা যে সঞ্জীবনী মন্ত্রে সবাইকে জাগাতেন সেই মন্ত্রই বার বার বলব। মাঠে বাটে পথে প্রান্তরে গ্রামে নগরে সর্বত্র বলব—তোমরা জাগো। জাগো জাগো জাগো। তোমরা পশু হয়ে আছো, মানুষ হও, দুর্বল হয়ে গেছ সবল হও।

জগন্নাথ ॥ [অধীর ভাবে] বোগাস। চলুন আমরা ভিতরে যাই। হাটের ভিতর কি মীটিং হয় মশাই ?

ভূষণ ॥ বেশ চল।

কুন্তী ॥ তোমরা যাও। আমি পরে আসছি।

[কুন্তী ছাড়া সকলে ভিতরে চলে গেল। কুন্তী এগিয়ে এসে ভৈরব বাবাকে প্রণাম করল]

ভৈরব বাবা। কে মা তুমি ?

কুন্তী ॥ আমি আপনার মেয়ে যমুনার সঙ্গে পড়তাম। রায়টের সময় আপনার যে সর্বনাশ হয়ে গেছে তা আমি জানি। কেবলমাত্র আপনিই যে রক্ষা পেয়েছিলেন এ খবরও আমি পেয়েছিলাম। আপনিই যে কৃষ্ণপদবাবু এ-ও আমি জানি। আমার বাবা বন্ধু ছিলেন আপনার।

ভৈরব বাবা ॥ তোমার বাবার নাম কি ?

কুন্তী ॥ কল্যাণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভৈরব বাবা ॥ ও, কল্যাণবাবুর মেয়ে তুমি ? কিন্তু তাঁরাও তো—

কুন্তী। হ্যাঁ, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমিও যেতুম। কিন্তু আমি তখন কলকাতায় বোর্ডিংয়ে ছিলুম।

ভৈরব বাবা ॥ ও !

কুন্তী ॥ একটা কথা শুনলে হয়তো আপনার তৃপ্তি হবে। যে গুন্ডার সর্দারটার প্ররোচনায় আমাদের সর্বনাশ হয়েছিল সে বেঁচে নেই। রিভলভারের গুলিতে তার খুলিটা উড়ে গেছে।

ভৈরব বাবা ॥ কে করলে এ কাজ ?

[কুন্তীর চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে। তারপর কথা বলল]

কুন্তী ॥ সেটা আর না-ই জানলেন।

ভৈরব বাবা ॥ দু একটা গুণ্ডা মেরে তো লাভ নেই। ওদের নীচ প্রবৃত্তির সুযোগ নিয়ে যারা ওদের নাচাচ্ছে তারাই আমাদের শত্রু। তারাই বিদ্বেষের বিষ ছড়াচ্ছে। আমাদের এখন প্রধান কাজ মানুষ তৈরী করা। বিলাস ত্যাগ করে তপস্যা করতে হবে সেজন্য। একটা কথা বলছি, কিছু মনে কোরো না। তোমার এই নাইলনের শৌখীন শাড়ি দেখে হতাশ হয়েছি একটু। তুমি কল্যাণকিশোর বাবুর মেয়ে।

কুন্তী ॥ আপনাকে সব কথা খুলে বলতে পারব না, কিন্তু একটা কথা বিশ্বাস করুন। আপনি গৈরিক পরে যা করছেন আমি নাইলনের শাড়ি পরেও তাই করছি। আমাদের লক্ষ্য এক, পথ যদিও আলাদা।

[অমিতাভ ভিতর থেকে বেরিয়ে এল]

অমিতাভ ॥ দেরি হয়ে গেল, মাপ করবেন। গিয়ে দেখি মা পুজোর ঘরে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। কাল থেকে উপোস করে ছিলেন। তার উপর আমি ফিরে এসেছি বলে বুক চিরে মা কালীকে রক্ত দিয়েছেন। মানত ছিল নাকি। মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে হাওয়া করাতে এখন জ্ঞান হয়েছে। দুধও খাইয়ে দিয়েছি একটু। আপনি আসুন [কুন্তীর দিকে চেয়ে] তোমাদের মীটিং হয়ে গেল না কি ?

কুন্তী ॥ ঘরের ভিতরে হচ্ছে। চল, আমিও মাকে দেখে আসি।

[ভৈরব বাবা, কুন্তী আর অমিতাভ ভিতরে চলে গেল। ভূষণের ঘরের ভিতর থেকে একটা বাদ-প্রতিবাদ শোনা গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে কে যেন বললেন—

না মশাই, দুশো টাকায় অত ঝঞ্চাট পোয়াতে পারব না। পাঁচশ টাকা চাই আমার সাফ কথা। একটু পরেই ভূষণ বাইরে এলেন পিছনে তার দলবল। দেখা গেল দুলাল চোবে এক তাড়া নোট তাঁর কোটের ইনার পকেটে ঢোকাচ্ছেন। বাকী সকলের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত]

ভূষণ ॥ তোমরা খাবার তাহলে সন্ধের পর খাবে ?

সৌরেন ॥ সেই ভালো।

দুলাল ॥ আমরা চলি তবে এখন।

ভূষণ ॥ এসো।

[সকলে চলে গেল। ভূষণ একা দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনিও ভেতরে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে কুন্তী ফিরে এল]

কুন্তী ॥ ওঁরা চলে গেলেন ?

ভূষণ ॥ হ্যাঁ।

কুন্তী ॥ কত টাকায় রফা হল ?

ভূষণ ॥ পাঁচশ টাকার কম কেউ রাজি নয়।
তাই দিলুম।

কুন্তী ॥ আমাকেও তাহলে বাকী দু'শ দিয়ে যাও। আমিও তো তোমার একজন ক্যানভাসার।

ভূষণ ॥ তুমি তার চেয়েও বেশী। তুমিও শাইলকের মতো টাকা আদায় করবে? তোমার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক—

কুন্তী ॥ তা অত্যন্ত গভীর। সেই গভীরতার মাপে যদি টাকা চাইতাম তাহলে অনেক বেশী দিতে হ'ত তোমাকে। বেশী টাকা চাই না। দুশো টাকার বদলে দুটো অনুরোধ করছি।

ভূষণ ॥ কি অনুরোধ ?

কুন্তী ॥ তোমাকে চেষ্টা করতে হবে যাতে নীলকান্ত বাবুর 'পথ' কাগজটা উঠে না যায়, অমিতাভকে যেন পুলিশ ছেড়ে দেয়।

ভূষণ ॥ পুলিশ আমার অনুরোধ শুনবে কেন ?

কুন্তী ॥ শুনবে। কারণ তুমি ভি. আই. পি., ইলেকশানে জিতলে মিনিস্টার হবে।

ভূষণ ॥ কিন্তু ওরা আমার শত্রুপক্ষ। ওদের বাঁচাতে বলছ কেন, তোমার যুক্তি কি ?

কুন্তী ॥ (হেসে) প্রণয়িনীর আবদারে কি সব সময় যুক্তি থাকে ? অনুরোধ দুটো মনে রেখো কিন্তু ঃ I am serious about it. বল রাখবে ?

ভূষণ ॥ রাখব।

কুন্তী ॥ এই তো লক্ষ্মীসোনা।

[থুতনি নেড়ে আদর করল]

আচ্ছা, চলি তাহলে এখন।

[কুন্তী চলে গেল। ভূষণ ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। ভিতর থেকে অমিতাভর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—, 'মা তুমি যেও না, দাও আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

পরমুহূর্তে মালতী বেরিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ। মালতীর হাতে একটি থালায় পুজোর প্রসাদ, ফুল প্রভৃতি রয়েছে।]

মালতী ॥ [অমিতাভকে] আমাকে ছেড়ে দে, আমি যেতে পারব। এই যে ঠাকুরপো বাইরেই আছ। তোমাকে পুজোর ফুল আর প্রসাদ দিতেই যাচ্ছিলুম। এস—

[ভূষণ এগিয়ে এল। মালতী তার মাথায় পুজোর ফুল দিলেন]

একটু প্রসাদ মুখে দাও। তোমার মীটিং হ'য়ে গেল ?

ভূষণ ॥ আশীর্বাদ করুন যেন জয়ী হই।

মালতী ॥ তোমাকে নিয়তই আশীর্বাদ কচ্ছি ঠাকুরপো। যখন বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে প্রথম এসেছিলাম তখন তুমিই তো একা ছিলে বাড়িতে। তুমিই আমার বড় ছেলে। সৎপথে থেকো, নিশ্চয়ই জয়ী হবে। একটু আগে যখন দেখলুম মোহন আর ফাগু বাজার থেকে খাবার আনছে, তাদের মুখ থেকে যখন শুনলাম এখানে মীটিং হবে অথচ সে কথা তুমি আমাদের জানাও নি, তখন একটু কষ্ট হয়েছিল, মনে হয়েছিল তুমি সত্যিই আমাদের পর ক'রে দিয়েছ। মনে সত্যিই কষ্ট হয়েছিল। পুজো করবার পর দেখছি মনটা হালকা হয়েছে, মনে হয়েছে তুমি যাই কর আমি তোমার বৌদি।

ভূষণ ॥ আপনাকে বলি নি, কারণ আপনার শরীর খারাপ, এতগুলো লোকের হাঙ্গামা, আপনি—

মালতী ॥ তুমি যদি বলতে আমি সব ক'রে দিতাম। তোমাকে বাজার থেকে খাবার আনাতে হ'ত না। ১০৪ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে তোমার জন্য কলেজের ভাত রেঁধে দিয়েছি, মনে নেই ?

অমিতাভ ॥ মা, তুমি বেশী কথা বোলো না। চল ভিতরে চল।
মালতী ॥ [ভূষণকে] প্রসূনের খবর পেয়েছ ? কেমন আছে সে ?
ভূষণ ॥ হ্যাঁ, আজ তার চিঠি এসেছে মনে হচ্ছে। গোলমালে আর পড়া হয় নি।
[পকেট থেকে চিঠিগুলি বার করলেন]
এই যে প্রসূনের চিঠি
[চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন]
লিখেছে একটু জ্বর হয়েছে।
মালতী ॥ তাই না কি ! আমাদের ডাক্তার গুপ্ত তো কানপুরে গেছেন। তাঁকে একটা চিঠি লিখে দাও।
ভূষণ ॥ তাই দেব।
অমিতাভ ॥ মা, তুমি ভিতরে চল।
[ভিতর থেকে ধারার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "মা তোমার খাবার দিয়েছি—খাবে এস"]
অমিতাভ ॥ চল চল।
[অমিতাভ ও মালতী ভিতরে চ'লে গেলেন। কনিষ্ঠ বেরিয়ে এল। তার হাতে একগোছা ছাপা কাগজ]
কনিষ্ঠ ॥ [ভূষণের হাতে কাগজ দিয়ে] তুমিও একখানা নাও।
ভূষণ ॥ কি এটা ?
কনিষ্ঠ ॥ অমিতাভর প্রচারপত্র।
ভূষণ ॥ এই শুনলাম সে কোনও প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা করবে না।
কনিষ্ঠ ॥ এটা প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা নয়, খবর (পড়তে লাগল) সকলের অবগতির জন্য জানাইতেছি শ্রীঅমিতাভ মল্লিক এম. এ., পি. এইচ-ডি. এবারকার নির্বাচনে একজন নির্দলীয় প্রার্থীরূপে দাঁড়াইতেছেন। শ্রীতীরতীক্ষ্ণ বসু।
ভূষণ ॥ ওর নাম তো কমল বলেই জানতুম। এ রকম অদ্ভুত নাম কি ও নিজে নিয়েছে ?
কনিষ্ঠ ॥ মেয়েলি নাম ওর পছন্দ নয়।
[বাইরে একটা মোটরের হর্ণ শোনা গেল]
ভূষণ ॥ কে এল আবার !
কনিষ্ঠ। তীর আমার জন্যে গাড়ি এনেছে বোধহয়।
[কনিষ্ঠ বেরিয়ে গেল। ভূষণও চলে গেল নিজের বাড়ির ভিতর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ ও জগদীশের সঙ্গে ভৈরব বাবা বাইরে এলেন]
ভৈরব বাবা ॥ অমিতাভকে আগেই চিনতাম। আজ আপনাদের সঙ্গেও আলাপ হয়ে ভারি খুশি হলাম। আপনার মতো বাবা মালতী দেবীর মতো মা, তাই ছেলে অমন হীরের টুকরো হয়েছে। ওরাই দেশের আশা। অমিতাভ তোমার কবিতাটা টুকে নিয়েছি তোমার বাবার কাছ থেকে। বড় ভাল লাগল কবিতাটি।
জগদীশ ॥ হীরের টুকরো বলেই ভয় বেশী। এদেশে হীরের টুকরোর কদর নেই। তাদের সবাই পায়ে মাড়িয়ে ভেঙে চুরমার ক'রে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয় !

ভৈরব বাবা ॥ তা দিক। গ‍ুঁড়ো হয়ে গেলেও হীরে হীরেই থাকবে। ক্রমশ দেশের প্রতি ধ‍ূলিকণা হীরের কণা হয়ে যাবে। ভয় পাবেন না, অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াবেন না। কোনও কারণে বিবেককে বলি দেবেন না।

জগদীশ ॥ এখনও পর্যন্ত তো দিই নি, তাই এত দ‍ুর্দশা আমাদের।

[ভিতর থেকে মালতীর গলা শোনা গেল। 'অমি, এইটে নিয়ে যা'— অমিতাভ ভিতরে চ'লে গেল]

ভৈরব বাবা ॥ কোনও ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

[অমিতাভ আবার ফিরে এল। হাতে একটা প‍ুঁটুলি]

অমিতাভ ॥ আপনি কিছ‍ু খেলেন না। তাই মা কিছ‍ু সিধে দিয়ে দিলেন।

ভৈরব বাবা ॥ দরকার ছিল না কিছ‍ু। তবে মায়ের দান ফেরানো যাবে না। নিয়ে চল।

জগদীশ ॥ ওঁকে পে'ৗছে দিয়ে এস।

ভৈরব বাবা ॥ আচ্ছা, আসি তবে।

জগদীশ ॥ নমস্কার।

[জগদীশ ভিতরে চ'লে গেলেন। অমিতাভ ও ভৈরব বাবা চলে যাচ্ছিলেন এমন সময় বাধা পড়ল। একজন প‍ুলিশ অফিসার এলেন।]

প‍ুলিশ অফিসার ॥ অমিতাভ মল্লিককে থানায় নিয়ে যেতে এসেছি। যে দ‍ুজন প‍ুলিশ বাইরে পাহারা দিচ্ছে তারা বললে তিনি এই বাড়িতেই আছেন। আমি নতুন এসেছি এখানে, কাউকে চিনি না।

অমিতাভ ॥ আমিই অমিতাভ।

প‍ুলিশ ॥ আপনি ভুষণবাব‍ুর ভাইপো ? ভুষণবাব‍ুকে চিনি আমি। তিনি কোথা ?

অমিতাভ ॥ ভিতরেই আছেন বোধ হয়। এখ‍ুনি তো এখানে ছিলেন [উচ্চকণ্ঠে] কাকা, কাকা—

[ভুষণ ভিতর থেকে বেরিয়ে এল]

প‍ুলিশ অফিসার ॥ নমস্কার। ইনি আপনার ভাইপো ?

ভুষণ ॥ হ্যাঁ।

প‍ুলিশ অফিসার ॥ ওঁকে থানায় নিয়ে যেতে হবে একবার। সিংহাটিতে যে ডাকাতিটা হয়েছে সেখানে একটা রক্তাক্ত ছোরা পাওয়া গেছে। তাতে কয়েকটা finger print আছে। এ'র finger print নিয়ে আমরা দেখতে চাই মেলে কি না ?

অমিতাভ ॥ [সবিস্ময়ে] আমার !

ভৈরব বাবা ॥ ওর ফিংগার প্রিণ্ট মিলবে না। ও ডাকাতি যখন হয় তখন সিংহাটিতেই একটা মাঠে গাছতলায় ছিলাম আমি। দেখলাম অনেক রাত্রে কয়েকটা মোটর এসে দাঁড়াল মাঠে। মোটর থেকে লোক নেবে গেল কতকগ‍ুলো। মোটরগ‍ুলো দাঁড়িয়ে রইল ঘণ্টাখানেক। তারপর ছ‍ুটতে ছ‍ুটতে ফিরল আবার লোকগ‍ুলো, মোটরে চড়ে চলে গেল সবাই। একটা মোটর খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে চলল না। সকালে মোটর মিস্ত্রি আর প‍ুলিশ এসে মোটরটা সরিয়ে নিয়ে গেল। শ‍ুনলাম মোটরটা না কি একজন নেতার। তিনি প‍ুলিশে খবর দিয়েছিলেন যে ডাকাতরা তাঁর গ্যারাজ ভেঙে মোটর নিয়ে এসেছে। মোটরটা চলে যাওয়ার পর আমি যখন বের‍ুলাম তখন দেখলাম ঘাসের মধ্যে কি একটা চিক‍্চিক করছে। দেখলাম

সোনার একটা হাতঘড়ি। তার পিছনে নাম খোদাই করা আছে। সেই নেতার ছেলের নাম। আমি ঘড়িটা কুড়িয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দিয়ে একটা রসিদ নিয়েছি।

ভূষণ ॥ এখানে আপনার কাছে আছে রসিদটা ?

ভৈরব বাবা ॥ না, সঙ্গে নেই।

পুলিশ অফিসার ॥ তাহলে আপনিও থানায় চলুন। আপনার এজেহারটাও রেকর্ড করে নিই আমরা।

ভৈরব বাবা ॥ আমি সিংহাটি থানায় আমার এজেহার দিয়ে এসেছি।

ভূষণ ॥ আপনার সেই রসিদটি কোথায় ?

ভৈরব বাবা ॥ তা বলব না।

ভূষণ ॥ আমাকে না বলুন থানায় বলতে হবে সে কথা।

ভৈরব বাবা ॥ তা-ও বলব না। পুলিশ ভাল করেই জানে দোষী কে। কিন্তু পুলিশ তাকে ধরছে না। চেষ্টা করছে দোষটা ঢাকতে। এইসব নির্দোষ আদর্শবাদী ছেলেদের ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করছে। সিংহাটি ডাকাতিতে যে ছেলেটি খুন হয়েছে সে-ও একজন আদর্শবাদী ভালো ছেলে ছিল। যে নেতার ছেলের ঘড়ি আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম তার অনেক দুষ্কৃতির খবর সে জানত, অনেক প্রমাণ সে সংগ্রহ ক'রে রেখেছিল তাঁর বিরুদ্ধে, তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে। সমর ঘোষালের বন্ধু ছিল সে।

পুলিশ অফিসার ॥ আপনি এই সব কথাই থানায় গিয়ে বলবেন চলুন।

ভৈরব বাবা ॥ যা বলবার আদালতে বলব। পুলিশের কাছে আমি কিছুই বলব না। আমি ওই মাঠটায় গাছতলায় থাকি সেখানেই চললাম।

পুলিশ অফিসার ॥ কিন্তু আপনাকে থানায় যেতে হবে।

ভৈরব বাবা ॥ আমি যাব না।

পুলিশ অফিসার ॥ [দুহাত প্রসারিত ক'রে পথরোধ করলেন] কিন্তু আমি আপনাকে থানায় নিয়ে যাবই।

[ভৈরব বাবার চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে উঠল। তিনি ত্রিশূল উঁচু করে ধরলেন]

ভৈরব বাবা ॥ খবরদার—

ভূষণ ॥ এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। থানায় যান আপনি।

ভৈরব বাবা ॥ আমি কিছুতেই যাব না। আমার গায়ে উনি যদি হাত দেন এ অঞ্চলের সব লোক ছুটে আসবে মার মার ক'রে। প্রলয়কাণ্ড হবে একটা।

[গোলমাল শুনে জগদীশ বেরিয়ে এলেন]

জগদীশ ॥ এ সব কি, [ভৈরব বাবাকে] আপনি যান নি ? এ ভদ্রলোক কে ?

পুলিশ অফিসার ॥ আমি দারোগা। অমিতাভবাবুকে থানায় নিয়ে যাবার জন্য এসেছি। ওঁর finger print নিতে হবে।

জগদীশ ॥ ও ! খেল শুরু হয়ে গেছে তাহলে ! বা—বা—বা !

ভৈরব বাবা ॥ আমি চললাম।

পুলিশ অফিসার ॥ [অমিতাভকে] আপনি চলুন।

অমিতাভ ॥ এই পুঁটুলিটা কিন্তু ওঁর কাছে পেঁছে দিতে হবে।
পুলিশ অফিসার ॥ বেশ চলুন। আমিও ওঁর আস্তানাটা দেখে যাই।
ভূষণ ॥ তা দেখে যান। কিন্তু ও'কে ঘাটাবেন না এখন। ঘাঁটানো নিরাপদ নয়। Don't touch him now.
[অমিতাভ ও পুলিশ অফিসার চলে গেল। নেপথ্যে ধারার চীৎকার শোনা গেল]
ধারা ॥ দাদাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল আবার। আমি ওকে একলা যেতে দেব না। আমিও যাই।
জগদীশ ॥ রতন—রতন—মায়ের পুজোর লগ্ন এসে গেল, আরও কিছু 'বাল্ব' জোগাড় কর, অনেক আলো জ্বালব আমি।
[ভিতরে চলে গেলেন। ভূষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনিও ভিতরে যাচ্ছিলেন এমন সময় দালাল সুরেন বোস প্রবেশ করলেন]
ভূষণ ॥ ও তুমি এসে গেছ। ভিতরে এস।
[সুরেন বোসকে নিয়ে ভূষণের প্রস্থান। উত্তেজিত জগদীশ ও রতনের প্রবেশ]
জগদীশ ॥ আর সময় নেই। আরও বাল্ব জোগাড় কর তুই।
রতন ॥ এখানে তো আর পাওয়া যাবে না। যা ছিল সব কিনেছি আমরা।
জগদীশ ॥ আর একবার খোঁজ। চুনী মিঞার কাছে পেতে পারিস। সেখানে যা একবার। আচ্ছা, দাঁড়া। ধারা খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেছে অমির পিছু পিছু। দেখি কোথা গেল।
[বাইরের দিকে বেরিয়ে গেলেন। রতন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভূষণ ও সুরেন বোসের প্রবেশ। সুরেন বোসের হাতে একটি চেক]
ভূষণ ॥ পোষ্ট ডেটেড চেক দিলাম, কিছু অসুবিধা হবে না তো ?
সুরেন ॥ না, ঠিক আছে।
[চেকটি মুড়ে পকেটে পুরলেন]
আমি তাহলে আসি এখন।
ভূষণ ॥ এসো।
[সুরেন বাবু বাইরে গেলেন। ভূষণের প্রস্থান। মালতী এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর চেহারা উদ্‌ভ্রান্ত]
মালতী ॥ রতন, কাউকে দেখছি না তো। এরা সব কোথা গেল ?
রতন ॥ পুলিশ এসেছিল। দাদাবাবুকে আবার থানায় নিয়ে গেল। ধারাও তাদের পিছু পিছু গেছে। তা শুনে বাবুও বেরিয়ে গেলেন।
মালতী ॥ [শিউরে উঠলেন] পুলিশ ! পুলিশ এসেছিল ?
রতন ॥ হ্যাঁ।
মালতী ॥ কনিষ্ঠও তো বেরিয়ে গেছে ?
রতন ॥ হ্যাঁ।
মালতী ॥ ঠাকুর পো কোথা ?
রতন ॥ তিনি বাড়িতে আছেন।
[মালতী ভূষণের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় জগদীশ ফিরে এলেন]

মালতী। ওরা কোথা ?
জগদীশ। ওদের থানায় নিয়ে গেল।
মালতী। ধারাকেও ?
জগদীশ। ধারাকেও। ধারা দারোগাকে ঘুষি মেরেছে।
মালতী। কি হবে ?
জগদীশ। কি আর হবে (মুচকি হেসে) আরও বুকের রক্ত দিতে হবে তোমাকে।

[মালতী ছুটে গিয়ে ভুষণের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করতে লাগলেন]

মালতী। ঠাকুর পো, ঠাকুর পো, কপাট খোলো। অমিকে আর ধারাকে থানায় নিয়ে গেছে। ঠাকুর পো, ঠাকুর পো, কপাট খোলো।
জগদীশ। ও কপাট আর খুলবে না বড় বউ। শক্তির অপব্যয় কোরো না। ঘরে চল।

[তাঁকে ধরে ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। রতন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল]

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পনেরো দিন পরে। ভুষণের বালীগঞ্জের বাড়ির একটি সুসজ্জিত ঘর। রেডিওতে গান হচ্ছে—হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর। কুন্তী একটি টেবিলের সামনে বসে চিঠি লিখছে। পাশের একটি দ্বারে পর্দা ঝুলছিল। সেটা সরিয়ে অবনীশ প্রবেশ করল। অবনীশ শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ যুবক। একটি সুদৃশ্য ড্রেসিং গাউন পরে আছে। সে এসে কুন্তীর পিছনে দাঁড়াল।]

অবনীশ। কাকে চিঠি লিখছ ?
কুন্তী। [মুচকি হেসে] আমার আর এক প্রণয়ীকে। ইনি যদি কল-কাঠি নাড়েন ধারা অমিতাভ দুজনেই ছাড়া পেয়ে যাবে।
অবনীশ। সবসুদ্ধ তোমার কজন প্রণয়ী বল তো ?
কুন্তী। অনেক। এ যুগে একাধিক প্রণয়ী না থাকলে চলে ? অসতীত্বটাই এখন কারেন্স নোট। সতীত্ব অচল [মাথা নেড়ে] কিন্তু কেমন অভিনয় করছি বল তো ? এতগুলো হোমরা চোমরা লোককে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছি।
অবনীশ। তোমার বাহাদুরী আছে মানছি। কিন্তু এ রকম পাঁক ঘাঁটতে তোমার ভাল লাগছে ?
কুন্তী। লাগছে না। মোটেই লাগছে না। কিন্তু উপায় কি ? সবই তো পাঁক। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অনুসরণ করছি। পাঁকের মধ্যে থেকে পাঁকাল হয়ে আছি। আমার গায়ে যে একটুও পাঁক লাগেনি একথা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে।

অবনীশ ॥ করছি। কিন্তু তবু আমি বলব এসব আমার ভাল লাগছে না। কোনও মিথ্যাচারই ভালো নয়। আমি ভদ্রভাবে সহজ সামাজিক জীবন যাপন করতে চাই। তুমি লোকের কাছে আমাকে স্পাই বলে পরিচিত করছ! এটা আমার পক্ষে অসহ্য।

কুন্তী ॥ এ যুগে অবুঝ হলে চলবে কেন? মিথ্যাকে, অন্যায়কে, দুর্নীতিকে সহ্য করাই তো আজকাল নিয়ম। তোমার মুখে মিথ্যার মুখোশ পরিয়ে আমি স্বৈরিণীর অভিনয় করতে পারছি বলেই তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার রিসার্চের থীসিস লেখার সুযোগ পেয়েছ। কয়েকমাসের বাড়ীভাড়া বাকী পড়াতে বাড়ি-ওলা যখন আমাদের তাড়িয়ে দিলে তখন আমাদের রাস্তায় দাঁড়াতে হয়েছিল। ভুষণ মল্লিককে ভোলাতে পেরেছিলাম বলেই এমন চমৎকার বাড়িটা পেয়েছি। শুধু বাড়ি নয়। কিছু টাকাও। [হাসল]

অবনীশ ॥ কিন্তু ভুষণ মল্লিক যদি টোপ না গিলত?

কুন্তী ॥ আর একজনের কাছে যেতুম। তিনিও বিরাট ধনী, সরকারি মহলে তাঁরও প্রচুর প্রতিপত্তি, তিনিও তোমার কুন্তীর প্রেমে অনেকদিন থেকেই গদগদ হয়ে আছেন। তাঁকেই চিঠি লিখছি।

[অবনীশ ঝুঁকে চিঠিটা দেখবার চেষ্টা করল]

অবনীশ ॥ সাহেব নাকি! ইংরেজিতে চিঠি লিখছ। মাই ডিয়ার হাংগার, ও বাবা, হাংগার তার নাম না কি?

কুন্তী ॥ (হেসে) ইংরেজিতে চিঠি লিখি কারণ এখনও অনেক বাঙালী ভদ্রলোক ইংরেজিতে চিঠি লেখাই সভ্যতা বলে মনে করেন। ইনি ঘোষ সাহেব নামে পরিচিত। আমি আদর করে ওঁর নাম দিয়েছি হাঙর।

অবনীশ ॥ হাঙর!

কুন্তী ॥ হ্যাঁ। যখন যা পান একেবারে গিলে ফেলেন।

অবনীশ ॥ এ রকম হাঙরের সামনে যেতে ভয় করে না তোমার?

কুন্তী ॥ করে বই কি একটু একটু। তোমার জন্যেই যাই। তুমি যদি চাকরি পেতে তাহলে এসব আমার করতে হ'ত না। কিন্তু তুমি চাকরি পাবে না, কারণ পার্টিশনের সময় টেরারিস্ট বলে পুলিশের খাতায় তোমার নাম চড়েছিল। চাকরি পাবে না, কারণ সরকারের বিরুদ্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখেছ তুমি। চাকরি করবার ইচ্ছেও তোমার নেই। কেবল ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে ভালো ভালো বই পড়তে পেলেই তোমার আনন্দ। আমিও ওই সব কারণেই চাকরি পাব না। তাই এই ফিকির করতে হয়েছে। বাঁচতে হবে তো!

অবনীশ ॥ চল আমাদের গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাই। সেখানে আমার বিঘে দশেক জমি আছে।

কুন্তী ॥ অসবর্ণ বিয়ে করেছ বলে গ্রামে তুমি একঘরে হয়ে ছিলে। সেখানে গিয়ে এখন টিকতে পারবে?

অবনীশ ॥ খুব পারব, কিন্তু তোমাকেও আমার পাশে থাকতে হবে। তুমি পাশে থাকলে হাসিমুখে আমি সব করতে পারব। কোদাল দিয়ে মাটি কোপাব, নিজে হাতে লাঙল ধরব—

কুন্তী ॥ হয়েছে, হয়েছে [হেসে] তুমি কবি। সেইজন্যেই তোমায় এত ভালোবাসি, খেয়ালের বশে তুমি তুমুল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পার, কিন্তু প্রত্যহের কুশাঙ্কুর তুমি সইতে পার না। সকালে ঠিক সময় মাখন-মাখানো টোস্ট আর গরম চা না পেলে তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়—এইজন্যেই কিন্তু বড্ড ভালোবাসি তোমায়। তুমি মানুষ, অমিতাভর মতো দেবতা নও।

অবনীশ ॥ ওর সম্বন্ধে তোমার দুর্বলতা আছে জানি। [হাসল]

কুন্তী ॥ দুর্বলতা নয়, ভক্তি। সে সূর্য, সে পাহাড়। তুমি মানুষ [হঠাৎ উঠে, তাকে জড়িয়ে ধরে] তুমি আমার, আমার একার। তোমার গায়ে যাতে আঁচ না লাগে তার জন্যে আমি সব করতে প্রস্তুত। এমন কি অসতীর অভিনয়ও—

অবনীশ ॥ [গাঢ় কণ্ঠে] কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে ?

কুন্তী ॥ কি ভাবে ?

অবনীশ ॥ কতদিন তুমি আমাকে তোমার খেলার পুতুল করে রাখবে ?

কুন্তী ॥ যতদিন পারি—

অবনীশ ॥ আমি কিন্তু আর পারছি না। আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। আমি চললুম [চলে যেতে উদ্যত]

কুন্তী ॥ কোথায় যাবে ?

অবনীশ ॥ তোমার অমিতাভ যে পথে গেছে সেই পথে। আমিও রিভলভার চালিয়েছি একদিন, বোমাও ছুঁড়েছি। কঙ্কর কণ্টক মাড়িয়ে অনেক পথ অতিক্রম করেছি একদিন। সেই পথেই দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে। তুমিই আমাকে নানা বিলাসে অভ্যস্ত করে পশু করে তুলেছ। আমার সেই পুরোনো জীবনেই আবার ফিরে চললুম। সে পথে যদি চলতে না পারি সেই পথের উপরই আমি মুখ থুবড়ে মরব। এ জীবন অসহ্য। আমি চললুম। [যেতে উদ্যত]

কুন্তী ॥ [ব্যাকুল কণ্ঠে] যেও না, যেও না তুমি। তুমি ছাড়া যে আমার কেউ নেই, কিছু নেই। কাকে নিয়ে থাকব আমি— শোন—

[উঠে দুহাত বাড়িয়ে তার পথরোধ করে দাঁড়াল]

আমার বাবা, মা, ভাই, বোন, কেউ নেই। তুমিই আমার সব। যখন আমি সম্পূর্ণ অনাথ হয়ে কলকাতার রাস্তায় ঘুরছিলাম তখন তুমিই আমাকে আশা দিয়েছিলে, আশ্বাস দিয়েছিলে। তোমারই আশ্বাসে আমি টেরারিষ্ট দলে যোগ দিয়েছিলাম, তোমার সঙ্গে অবাধে একসঙ্গে থাকতে পারব বলে তোমার এক ডাক্তার বন্ধুকে দিয়ে আমার টিউব দুটো কাটিয়ে আমাকে বন্ধ্যা করে দিয়েছিলে তুমি, এখন তুমি আমাকে ফেলে চলে যাবে ? তোমার জন্যে আমি না করেছি কি ! নিজেকে বাঁচিয়ে সমাজের ওই হাঙর কুমীরদের সামনে টোপের মতো ঘুরে বেড়ানো কি সহজ মনে কর তুমি ? এই দুঃসাধ্য কাজ আমি করেছি কার জন্যে ? তোমার জন্যে। এখন তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাইছ ?

অবনীশ ॥ কিন্তু আমি যে আর পারছি না কুন্তী। সত্যিই আর পারছি না। তুমি আমাকে স্পাই সাজিয়ে রেখেছ—ছি—ছি—ছি—ছি—

কুন্তী ॥ এ যুগে বাঁচতে হলে ভণ্ডামি করতে হবে, ছদ্মবেশ ধরতে হবে। দেশপ্রেমিককে অভিনয় করতে হবে স্পাই-য়ের। সতীকে অভিনয় করতে হবে অসতীর। আমি সে

অভিনয় করে কৃতিত্ব অর্জন করেছি, তুমিই বা পারবে না কেন? তুমি তো এককালে ভালো অভিনেতা ছিলে।

অবনীশ ॥ আমার কিছু ভালো লাগছে না। আমার প্রেরণার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে কুন্তী। আমি আমার থীসিসও পুড়িয়ে ফেলেছি। কি হবে থীসিস লিখে? কে পড়বে, কে বুঝবে? আমি হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে, সব যেন কুয়াশায় ঢেকে গেছে, আমি আবার ছুটে বেরিয়ে পড়তে চাই রাস্তায়, আবার আবিষ্কার করতে চাই নিজেকে নূতন ক'রে। এ জঘন্য জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমাকে বাধা দিও না, আমাকে যেতে দাও তুমি। Let us part like friends.

কুন্তী ॥ দাঁড়াও তাহলে—

[ঝুঁকে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটি রিভলবার বার করল]

এই নাও। তোমার কুন্তীকে শেষ করে দিয়ে তবে যাও। তুমি না থাকলে আমার বাঁচবার আর কোন সার্থকতা নেই।

অবনীশ ॥ কেন তোমার ভূষণ আছে, হাঙর আছে, বাঘ সিংহ নেকড়ে অনেক আছে তো—

কুন্তী ॥ তোমার জন্যেই আছে। তুমি না থাকলে আর কাউকে প্রয়োজন নেই।

[বাইরে ইলেকট্রিক বেলটা বেজে উঠল। কুন্তী তাড়াতাড়ি রিভলভারটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখে দিল। অবনীশ পাশের ঘরে চলে গেল। ইলেকট্রিক বেলটা আবার বাজল। কুন্তী তাড়াতাড়ি গিয়ে কপাট খুলে দিতেই ঘোষ সাহেব প্রবেশ করলেন। লম্বা ঢিলা আজানুলম্বিত কোট পরা। কোটের নীচে শাদা প্যাণ্ট, পায়ে কালো সোয়েড্ লেদারের পামশু। হামদো প্রকাণ্ড মুখ। দুটি ঠোঁটই বেশ পুষ্ট। দুই চোখের নিম্নভাগই ছোট পটলের মতো ফোলা। হাতে একটি সিগার ধরে আছেন। হাত ঈষৎ কাঁপছে। চক্ষু দুটি ভাসা-ভাসা এবং বিস্ফারিত। কুন্তীর দিকে এমনভাবে চাইলেন যেন তাকে গ্রাস করতে চান। মুখে জরার চিহ্ন স্পষ্ট। উপরের ঠোঁটটি ঝোলা, নীচের ঠোঁটকে ঢেকে ফেলে সেজন্য সর্বদাই একটু হাঁ করে থাকেন।]

কুন্তী ॥ এ কি তুমি? কি সৌভাগ্য।

[এতবড় প্রবীণ লোককে কুন্তী 'তুমি' বলছে কারণ ঘোষ সাহেব বারবার অনুরোধ করেছেন 'আপনি' না বলতে]

ঘোষ সাহেব ॥ আমি এসেছি তোমাকে কংগ্র্যাচুলেট করতে। নিমতা সেণ্টারে তুমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলে তা আজ কাগজে বেরিয়েছে। ওয়াণ্ডারফুল স্পীচ। যেমন ভাব, তেমনি ভাষা। আমার দুটো একটা লাইন মুখস্থই হয়ে গেছে [আবৃত্তি করলেন] সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের অস্তিত্ব শুধু যে বলিষ্ঠ জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত তা নয়। প্রতিষ্ঠিত তাঁদের ঐকান্তিক স্বদেশপ্রেমের উপর। প্রতিষ্ঠিত তাঁদের নির্মল চরিত্রবলের উপর। প্রতিষ্ঠিত তাঁদের নির্ভীক আচরণের উপর। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জনতার দুঃখ তাঁরা মোচন করবার চেষ্টা করবেন, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁরা বদ্ধপরিকর। কিন্তু একটি কথা আপনাদের মনে রাখতে অনুরোধ করি—তাঁরা চেষ্টাই করতে পারেন, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধই করতে পারেন, কিন্তু

তাতে সুফল যে ফলবেই এমন অলীক প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিতে অক্ষম। সৈনিক প্রাণপণে যুদ্ধই করতে পারে, যুদ্ধে প্রাণও দিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধে জিতবই এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া কি সম্ভব ?

সুপার্ব। তুমি বাইরেই সুন্দর নও, ভিতরেও সুন্দর।

[তাঁর থুতনি ধরে নাড়লেন]

কিন্তু তুমি আমাকে ভুলে গেছ কুন্তী। সাতদিন আমার বাড়িতে যাও নি, একবার 'রিং'ও কর নি। আমাকে ভুলে গেছ তুমি।

কুন্তী ॥ [লীলা-ভরে] ভুলি নি যে তার প্রমাণ এখুনি দিতে পারি। এই দেখ, এখনই তোমাকে চিঠি লিখছিলাম আমি।

[টেবিল থেকে চিঠিখানি নিয়ে তাঁর হাতে দিল]

দাঁড়িয়ে রইলে যে—ব'স।

[ঘোষ সাহেব সোফার উপর উপবেশন করে পকেট থেকে চশমা বার করলেন। তারপর সেটি পরে' চিঠিটি পড়লেন]

ঘোষ সাহেব ॥ [হেসে] আমাকে একটা অদ্ভুত নাম দিয়েছ তুমি। হাঙরের পৌরাণিক নাম জান ? মকর। মকর গঙ্গার বাহন। মকর রাশির অধিপতি শনি মহা বলবান তপস্বী একজন। খুব ভালো লেগেছে নামটা আমার। তাছাড়া ওটা তোমার দেওয়া নাম। তোমার আমার মধ্যে একটা প্রাইভেট সেতু। চিঠি লিখছিলে কেন ? মন কেমন করছিল, না কোন দরকার আছে ?

কুন্তী ॥ দুইই। দরকারের কথাটাই বলি। অমিতাভকে আর ধারাকে পুলিশে ধরেছে। তুমি যদি একটু চেষ্টা কর ওরা ছাড়া পেয়ে যাবে।

ঘোষ সাহেব ॥ আমি চেষ্টা করব কেন ? ওই অমিতাভ ছোকরা কাগজে আমার নামে কি লিখেছিল তোমার মনে নেই ? আমি নাকি ময়দার সঙ্গে তেঁতুল বিচি গুঁড়িয়ে মেশাই ! এর ধাক্কা সামলাতে আমার প্রায় লাখ খানেক টাকা বেরিয়ে গেছে। তাছাড়া যা শুনছি তাতে ওর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে আমিও বিপদে পড়ে যাব। ও নাকি ডাকাতি করেছিল।

কুন্তী ॥ ওটা মিছে কথা। অমিতাভ ডাকাতি করতে পারে না।

ঘোষ সাহেব ॥ ওরা সব পারে। ও সব সাংঘাতিক ছেলে। তুমি ওর পক্ষে ওকালতি কচ্ছ কেন ?

কুন্তী ॥ করছি ওর মায়ের জন্যে। তাঁর চোখের জল শুকুচ্ছে না। তাঁকে আমি ভক্তি করি। আরও কচ্ছি ভুষণবাবুর জন্যে। অমিতাভ তার ভাইপো। সে যদি ডাকাতির চার্জে জেলে যায় সেটা কি তাঁর পক্ষে গৌরবের ?

ঘোষ সাহেব ॥ ভুষণ বেচারার জন্যে দুঃখ হয়। এত ভালো লোক, অথচ একপাল পাগল ওকে ঘিরে আছে। ওর দাদাটা পাগল। ওর ভাইটাও পাগল, তাকেও পুলিশে ধরেছে, সে না কি জামুড়ে সেণ্টারে একটা ভায়োলেণ্ট মব্ নিয়ে গিয়ে হামলা করছিল। ধারা মেয়েটাও পাগল, তার বিরুদ্ধেও সাংঘাতিক চার্জ—সে না কি দারোগাকে অ্যাসল্ট্ করেছিল।

কুন্তী ॥ হ্যাঁ সত্যি ও মেয়েটার মাথা খারাপ। বুড়ো গোপীনাথ বাবুকেও না কি মেরেছিল। ওর হিস্টিরিয়া আছে।

ঘোষ সাহেব ॥ সত্যি ভূষণ বেচারার জন্যে দুঃখ হয়। হ্যাঁ—যে কথা বলতে এসেছি—তুমি কি খেতু বক্‌সির ছোট মেয়েকে নাচগান শেখাচ্ছ ?

কুন্তী ॥ হ্যাঁ। পুঁটি আমার কাছে নাচ-গান শিখছে। কেন ?

ঘোষ সাহেব ॥ আমি একটা বই প্রডিউস করব ঠিক করেছি। শুনেছি মেয়েটি বেশ ইয়ে—কত টাকা নেবে ?

কুন্তী ॥ ওকে তো একজন প্রডিউসার বুক করেছেন শুনেছি দশহাজার টাকায়।

ঘোষ সাহেব ॥ কে ?

কুন্তী ॥ নামটা আমি ঠিক জানি না।

ঘোষ সাহেব ॥ খোঁজ কর। আমি বিশ হাজার টাকা দেব। তুমি যোগাযোগটা করিয়ে দাও।

কুন্তী ॥ [হেসে] আমিই আমার 'রাইভাল' যোগাড় করে দেব ?

ঘোষ সাহেব ॥ তোমার কি রাইভাল হতে পারে ? তুমি তো আনরাইভাল্‌ড। তোমার নাম কুন্তী না হয়ে হওয়া উচিত ছিল 'আলেয়া'। তুমি তো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তুমি কখনও পুরোনো হবে না। পুঁটির বাবা কি করেন ?

কুন্তী ॥ চাকরি করেন না। ব্যবসা করেন। অবস্থা ভালো।

ঘোষ সাহেব ॥ ব্যবসা করেন মানেই কালোবাজারী। কিসের ব্যবসা, জানো ?

কুন্তী ॥ আমি অত খবর রাখি নি।

ঘোষ সাহেব ॥ তোমাকে কত করে দেন ?

কুন্তী ॥ মাসে একশ করে দেন। হপ্তায় দু'বার শেখাই এক ঘণ্টা করে।

ঘোষ সাহেব ॥ খুব কম দেন। তুমি যদি আমার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পার আমি তোমাকে মাসে পাঁচশ টাকা দেব। আমার বাগান বাড়িটা বেশ বড়, সেখানে নাচ-গানের আসর অনায়াসে হ'তে পারবে। তুমি ওদের বোলো, বুঝলে।

কুন্তী ॥ বলব। কিন্তু পুঁটির বাবার আড়ষ্ট ভাবটা এখনও কাটে নি। উনি যদি আপনার প্রস্তাবে রাজিও হন, আপনার বাগান বাড়িতে যেতে রাজি হবেন না। যদি বা হন, বক্‌সি মশাইও যাবেন মেয়ের সঙ্গে। উনি মেয়েকে সিনেমায় নাবাচ্ছেন বটে কিন্তু মনের খুঁতখুঁতুনিটা এখনও কাটে নি। এখনও মেয়েকে আগলে আগলে বেড়ান।

ঘোষ সাহেব ॥ হ্যাঁ, ওরকমটা প্রথমে হয়, পরে থাকে না। টাকার তোড়ে সব ভেসে যায়। তুমি কথা বলে দেখ, যদি রাজি হয় কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে দিতে পার। দেখি কত আছে আমার সঙ্গে।

[কোটের ইনার পকেট থেকে একটা চওড়া পার্স বার করলেন। তার ভিতর থেকে বার করলেন এক তোড়া নোট। গুণে দেখলেন।]

হাজার পাঁচেক আছে। এইটে রাখ—

[টেবিলের উপর টাকাটা রাখলেন। কুন্তী স্পর্শ করল না সে টাকা। স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রইল]

কুন্তী ॥ তুমি নিজেই গিয়ে সরাসরি প্রস্তাবটা কর না।

ঘোষ সাহেব ॥ দেখ, আমি কোন বিষয়েই নিজে সরাসরি প্রস্তাব করি না। প্রস্তাবটা তোমাকেই করতে হবে।

কুন্তী ॥ করতে পারি, কিন্তু একটি শর্তে।

ঘোষ সাহেব ॥ বল, বল, কি শর্ত তোমার।

কুন্তী ॥ অমিতাভকে আর ধারাকে পুলিশের কবল থেকে উদ্ধার করে দিতে হবে।

ঘোষ সাহেব ॥ তাহলেই তো মুশকিলে ফেললে। ভূষণকে গিয়ে বল না। সে তো তোমার কথা বলতে অজ্ঞান।

কুন্তী ॥ মুখেই অজ্ঞান। তাকে বলিনি ভাবছেন? বলেছিলাম। সে বলে আমার ভাইপো-ভাইঝির জন্যে আমি কাউকে বলতে পারব না।

ঘোষ সাহেব ॥ তার মানেই ভূষণ চায় না যে ওরা ছাড়া পাক। চাইলে নিশ্চয় ছাড়া পেত। তুমিই বা ওদের ছাড়াবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? অমিতাভ ছোকরার প্রেমে পড়েছ?

কুন্তী ॥ [হেসে] ধর না হয় পড়েইছি। [সানুনয়ে] আমার এ আবদারটি রাখতেই হবে। লক্ষ্মীটি—

[ঘোষ সাহেব হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তার দিকে]

ঘোষ সাহেব ॥ তোমার এখানে ফোন আছে?

কুন্তী ॥ আছে। থানায় ফোন করবেন?

ঘোষ সাহেব ॥ না। আমি সরাসরি কিছু করি না। আমি যাকে ফোন করব সে অনুরোধ করবে আর একজনকে। তিনি যদি রাজি হন কাজ হয়ে যাবে।

কুন্তী ॥ সে ব্যক্তিটি কে?

ঘোষ সাহেব ॥ নাম না-ই শুনলে।

কুন্তী ॥ [ঠোঁট ফুলিয়ে] আমাকেও অবিশ্বাস। বেশ—

[লীলা-ভরে পিছু ফিরে দাঁড়াল]

ঘোষ সাহেব ॥ ওই দেখ। বলাটা 'সেফ্' না। শুধু এইটুকু বলতে পারি তিনিও একজন মহিলা। নামী মহিলা। অসাধ্যসাধন-পটিয়সী। ফোনটা কোথা—?

কুন্তী ॥ পাশের ঘরে। না ওঘরে নয়, এ ঘরে।

[অবনীশ যে দিক দিয়ে ভিতরে গিয়েছিল তার বিপরীত দিকে আর একটি কপাটে পরদা ঝুলছিল। কুন্তী সে পরদাটা তুলে ধরল। ঘোষ সাহেব ভিতরে গেলেন। কুন্তী পরদাটা আবার ফেলে দিল। হ্যালো, হ্যালো—শোনা যেতে লাগল। কুন্তী উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। অবনীশ বেরিয়ে এল। তার পরিধানে সাহেবী স্যুট। হাতে একটি কাঠের বাক্স]

অবনীশ ॥ [নিম্নকণ্ঠে] কুন্তী আমি চললুম।

কুন্তী ॥ [সভয়ে বাক্সটার দিকে চেয়ে] ওকি, ওটা নিয়ে কোথা যাচ্ছ? শোন—

[অবনীশ কোন কথা না শুনে বেরিয়ে গেল। কুন্তীও ছুটে তার পিছু পিছু গেল কিছুদূর। কিন্তু আবার ফিরে এল। ঘোষ সাহেব ফোন করছিলেন। দরজার সামনে কুন্তী উৎকর্ণ হয়ে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর টেবিলের ওপর রাখা নোটগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার। সেগুলি সে তুলে গুণে দেখল। তারপর আবার রেখে দিল। ঘোষ সাহেব বেরিয়ে এলেন]

কুন্তী ॥ কি হল?

ঘোষ সাহেব ॥ বললে তো চেষ্টা করব। কিন্তু ওই ডাকাতির কথা শুনে ভয় পাচ্ছে। তার সন্দেহ—এ পলিটিক্যাল ডাকাতি, তার মানে, আলকাতরার হাঁড়ি, ছুঁলেই হাতে লেগে যাবে। ওর স্বামী বড় সরকারি চাকরি করে কিনা, তাই ভয় পাচ্ছে। তবু বলেছে চেষ্টা করবে। আশা করি দেখবে, দেখা যাক—

কুন্তী ॥ তোমার কথা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে আশার চেয়ে আশঙ্কাই বেশী জাগছে তোমার মনে।

ঘোষ সাহেব ॥ তাতো জাগছেই। স্ত্রী চরিত্রের কুলকিনারা দেবতারাই পায় না, আমি তো সামান্য মানুষ। এই ধর না তোমাকে এতদিন দেখছি, তবু কিন্তু তুমি এখনও রহস্য হয়ে আছ আমার কাছে।

[কুন্তী ঘাড় হেঁট করে দুষ্টুমিভরা হাসি হাসল]

কুন্তী ॥ বস। একটু চা করে দি।

ঘোষ সাহেব ॥ না, চা খাবো না এখন। অন্য কিছু থাকলে খেতে পারি।

কুন্তী ॥ হোয়াইট হর্স আছে একটা।

ঘোষ সাহেব ॥ তাই দাও তাহলে। নীট দিও, আর এক পেগের বেশী দিও না। আচ্ছা, এখুনি কার যেন গলা শুনলাম। বাড়িতে কেউ আছে না কি?

কুন্তী ॥ চাকরটা বাজারে গেল।

ঘোষ সাহেব ॥ তোমার স্বামীপুঙ্গবের খবর কি?

কুন্তী ॥ (হাত এবং ঠোঁট উলটে) কি জানি, কি খবর। মাঝে মাঝে আসে, আবার চলে যায়। সত্যি পুঙ্গব হলে খুঁটিতে বেঁধে রাখতাম। কিন্তু তাতো নয়। শুনেছি পুলিশের স্পাই হয়েছে। ঠিক করেছি ওকে ডিভোর্স করব।

ঘোষ সাহেব ॥ না, না, অমন কাজটি কোরো না। একটা স্বামী থাকা ভাল।

কুন্তী ॥ তুমি বস, আমি নিয়ে আসছি।

[ঘোষ সাহেব সোফায় বসে সিগারেট ধরালেন। একটু পরেই কুন্তী এক পেগ হুইস্কি এনে দিল তাঁকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেটি গলাধঃকরণ করে ঈষৎ মুখবিকৃতি করলেন। তারপর রুমাল বার করে মুখ মুছলেন।

ঘোষ সাহেব ॥ একটা কথা জান? আমি এককালে এক 'মাদক নিবারিণী সভা'র সভ্য ছিলাম। হা—হা—হা—। আচ্ছা, উঠি এখন তবে। তুমি বক্‌শি মশায়ের কাছে কথাটা পেড়ো, বুঝলে—

কুন্তী। সুযোগ পেলে বলব।

ঘোষ সাহেব ॥ ওই দেখ। তুমিও গা বাঁচিয়ে কথা বলছ। যাক্—আমি এখন চলি। যা হয় কোরো। তোমার ধর্ম তোমার কাছে। টাকাগুলো তোল নি দেখছি। তুলে রাখ।

কুন্তী ॥ টাকার কি দরকার, আপনি নিয়ে যান না।

ঘোষ সাহেব ॥ না। ওটা থাক। ওটা তোমাকেই দিলাম। তুমি তো কখনও কিছু নাও নি আমার কাছে। তোমাকে নেওয়াতে পারি নি। আমার একটা বাড়িও খালি নেই এখন, থাকলে তোমাকে ভুষণের বাড়িতে থাকতে দিতাম না। এসেছ, থাকো, বাড়িটা ভালই। আচ্ছা, চলি।

[ঘোষ সাহেব চলে গেলেন]

কুন্তী ॥ অবনীশ বমটা নিয়ে কোথা গেল ! কি যে করবে কিছুই বুঝতে পারছি না। কি করি এখন। বেরিয়ে দেখব ?

[আবার ইলেকট্রিক বেল বেজে উঠল। কুন্তী তাড়াতাড়ি গিয়ে কপাট খুলে দিতেই নীলকান্তবাবু প্রবেশ করলেন]

কুন্তী ॥ ও, নীলকান্তবাবু, আসুন, কি খবর ?

নীলকান্ত ॥ খবর তো জানই। অমিতাভ, ধারা, কনিষ্ঠ, তীর সবাই এখন পুলিশের গারদে। আমার 'পথ' বন্ধ হয়ে গেল। 'হবে না হবে না খোল তরবার' প্রবন্ধটার জন্যে ওরা শুনছি আমাকে 'হেভি' জরিমানা করবে। জরিমানা আমি দেব না। সুতরাং আমারও জেল অনিবার্য। সেদিন তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল তুমি আমাদের মত সমর্থন কর। তাই তোমার কাছে এসেছি। জেলে যাবার আগে তোমার হাতে পতাকাটা দিয়ে যেতে চাই। ওরা 'পথ' বন্ধ করেছে, তুমি 'রথ' বার কর। আমি ওতে প্রবন্ধ লিখব, কিন্তু কাগজটার ভার তুমি নাও।

কুন্তী ॥ আমি ? আমার কি সে যোগ্যতা আছে ?

নীলকান্ত ॥ আছে। তোমার চোখে মুখে তোমার মনের দীপ্তি ঝলমল করছে। আমি মানুষ চিনি। তোমার সম্বন্ধে আমার ভুল হয় নি।

কুন্তী ॥ কিন্তু আমি যে ভূষণবাবুর দলে।

নীলকান্ত ॥ হ'লেই বা। ভূষণ তো আমাদের শত্রু নয়। আমাদের লক্ষ্য দেশে আদর্শ গণতন্ত্র হোক। সে পথে যারা বাধা দেবে তাদের সঙ্গেই আমাদের বিরোধ। কোনও অসাধু লোককে আমরা প্রশ্রয় দেব না। দুর্নীতির সঙ্গে সুনীতির লড়াই চিরকাল চলছে, চলবেও। আমরা সুনীতির দলে। আমরা ঘটনাচক্রে আজ হেরে গেছি বলে আমাদের পতাকা উঁচু করে ধরবার লোক থাকবে না কেউ ? তুমি সেটা উঁচু করে ধর কুন্তী। তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে।

কুন্তী ॥ আমার নিজের উপর আমার বিশ্বাস নেই যে নীলকান্তবাবু। খোলাখুলি-ভাবে কাগজের ভার নেওয়ার অসুবিধাও আছে। বরং আমি আড়ালে থাকলে আপনাকে বেশী সাহায্য করতে পারব। 'পথ' বন্ধ হয়ে গেছে, বেশ তো নতুন সিকিউরিটি জমা দিয়ে 'রথ' বার করুন। সম্পাদক আপনিই থাকুন।

নীলকান্ত ॥ কিন্তু ওই প্রবন্ধটার জন্য ওরা আমাকে জরিমানা করবে। জরিমানা না দিলে জেলে পুরবে। আমি সম্পাদক থাকব কি ক'রে ?

কুন্তী ॥ আপনি জরিমানা দিন।

নীলকান্ত ॥ দিতাম, আমাদের দেশের নামজাদা অনেক সম্পাদক সত্য কথা বলার জন্য জরিমানা দিয়েছেন। আমিও দিতাম, কিন্তু জরিমানা দেবার টাকা আমার নেই।

কুন্তী ॥ টাকা আমি দিচ্ছি। এই নিন।

[টেবিল থেকে নোটের তাড়া তুলে তাঁর হাতে দিল]

এতে পাঁচ হাজার টাকা আছে। দরকার হলে আরও জোগাড় করে দেব।

নীলকান্ত ॥ আমি কিন্তু মা কারও কাছ থেকে দান বা ভিক্ষা নিই না। ধারও করি না।

কুন্তী ॥ আপনাকে টাকা দেওয়ার স্পর্ধা আমার নেই। আমি দেশের কাজের জন্যে দিচ্ছি এটা। এ অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।

নীলকান্ত ॥ [একটু ভেবে] বেশ তাহলে একথাটা একটা কাগজে লিখে নাম সই করে দাও।

কুন্তী ॥ তা দিচ্ছি।

[টেবিলে প্যাড ও কলম ছিলই। কুন্তী লিখে নীলকান্তকে দিল কাগজটি]

ভৈরব বাবার খবর জানেন ? তাঁকেও কি পুলিশে ধরেছে ?

নীলকান্ত ॥ পুলিশ ভয় করছে, তাঁকে ধরলে হয়তো রায়ট হয়ে যাবে। তাই তাঁকে ধরে নি। পুলিশ এখন তাঁকে 'ওয়াচ্' করছে শুধু।

কুন্তী ॥ ও!

নীলকান্ত ॥ আমি তাহলে এখন যাই। তুমি আমার এই বিপদে অনেক উপকার করলে। আশীর্বাদ করছি তুমি সুখী হও।

কুন্তী ॥ সুখী হব ?

নীলকান্ত ॥ নিশ্চয় হবে।

কুন্তী ॥ এখন কিন্তু আমি বড় অসুখী। আমার স্বামী রেগে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে।

নীলকান্ত ॥ [প্রশান্ত হাসি হেসে] আবার আসবে। আচ্ছা, আমি চলি এখন।

[নীলকান্ত চলে গেলেন। কুন্তী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল]

কুন্তী ॥ একটা ট্যাক্সি নিয়ে বরং খুঁজি কোথায় গেল সে—

[বাইরে একটা মোটরের হর্ণ শোনা গেল]

বোধহয় ট্যাক্সি যাচ্ছে একটা—

[পরদা সরিয়ে দেখল]

ভূষণ আসছে। এসো ভূষণ।

[ভূষণের প্রবেশ]

ভূষণ ॥ তারপর কুন্তী দেবী, তোমার কি খবর ? এ ক'দিন হারিকেন টুর দিয়ে বেড়িয়েছি। তোমার কাছে আসবার অবসর পাই নি। ইউ হ্যাভ ডান্ ওয়েল। তোমার নিমতার স্পীচ ম্যাগনিফিসেণ্ট হয়েছিল। ওখানে বোধহয় আমি সেণ্ট পারসেণ্ট ভোট পাব। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

কুন্তী ॥ অন্য সেণ্টারগুলোর খবর কি ?

ভূষণ ॥ ভালো খবর। জানুড়েতে দাঙ্গা হয়েছিল। কনিষ্ঠ আর তীর একটা 'মব' নিয়ে গিয়ে সেখানে ইট পাটকেল ছুঁড়েছিল। দুলালের মাথায় একটা ইঁট লেগেছে। পুলিশকে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছিল। তীর আর কনিষ্ঠ অ্যারেস্টেড। এখন তুমি কি নেবে বল—একটা জড়োয়ার হার যদি দিই—

কুন্তী ॥ [অভিমান ভরে] আমার কিছু চাই না। তোমাকে দুটো অনুরোধ করেছিলাম তার একটাও তুমি রাখ নি।

ভূষণ ॥ ওদের সঙ্গে তুমি নিজেকে জড়াচ্ছ কেন কুন্তী। ওরা আমাদের শত্রুপক্ষ। ওরা যদি জেতে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। ওদের ত্যাগ কর। এবার তুমি নমিনেশন পাবে। বাজে লোকের সঙ্গে মিশে তোমার আখের নষ্ট কোরো না।

কুন্তী ॥ ওরা বাজে লোক নয়, নমস্য লোক।

[ভূষণ চেয়ারে গিয়ে বসলেন। কুন্তী দাঁড়িয়ে রইল]

ভূষণ ॥ নমস্য লোক ! ওদের সম্বন্ধে তাহলে কিছুই জান না তুমি। অমিতাভ এখানকার পুলিশের ভয়ে আসামে গিয়ে বসে ছিল—মুগার ব্যবসার ছুতো করে। তার এক বন্ধু ওখানে বড় পুলিশ অফিসার। সেই ওকে আগলাচ্ছিল। কিন্তু ক'দিন আগলাবে ! ও ওখানে কি করত জান ?

কুন্তী ॥ জানি। ব্যবসা ছাড়া গরীবদের পড়াবার জন্যে একটা নাইটস্কুল করেছিল।

ভূষণ ॥ পড়ানোটা একটা লোক দেখানো ব্যাপার। আসলে কি করত জান ? সেখানে দেশ-বিদেশের বিদ্রোহীদের জীবনী পড়ে শোনাতো, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সবাইকে উত্তেজিত করত, গীতার যে ব্যাখ্যা সেখানে শোনানো হোতো তা শুনলে তোমার রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠবে। পুলিশের সন্দেহ ও সেখানে একটা রিভলিউশনারি গ্যাং তৈরি করছিল।

কুন্তী ॥ ওসব বাজে কথা। আমি শুনেছি ও সেখানে তাদের শুধু পড়াতো না, খেতেও দিত। ওদের মধ্যেই বাস করত—

ভূষণ ॥ সব জানি। কিন্তু অত লোককে খাওয়াতে হলে টাকার দরকার। সে টাকা ও পেতো কোথা থেকে ?

কুন্তী ॥ ওর মুগার ব্যবসা ছিল।

ভূষণ ॥ সেটাও লোক দেখানো ব্যবসা। তাতে সামান্য আয় হত। সেদিন দাদাকে পাঁচশ' টাকা পাঠিয়েছে শুনলাম। কোথা থেকে পাচ্ছে এত টাকা ? পুলিশের সন্দেহ ও আর সমর ঘোষাল ডাকাতি করে টাকা জোগাড় করে। সিংহাটিতে সাংঘাতিক ডাকাতি হয়েছে একটা। পুলিশের খবর ওরা তার মধ্যে ছিল। তোমাদের ওই ভৈরব বাবা একটা কক্ এণ্ড বুল স্টোরি বানিয়েছেন বটে কিন্তু পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত। তুমি ওদের ছায়া মাড়িও না বলে দিচ্ছি। বিপদে পড়ে যাবে। ওরা টেরারিস্ট—ওরা সাংঘাতিক।

কুন্তী ॥ তাহলে তুমি আমার সঙ্গে মিশছ কোন্ সাহসে। তুমি তো জানতে গত রায়টের সময় আমি টেরারিস্ট হয়েছিলাম। রিভলভার দিয়ে মানুষ খুন করেছি। সে হিসেবে আমিও কম সাংঘাতিক নই।

ভূষণ ॥ তোমাকে যে সে পথ থেকে সরিয়ে নিজের দলে আনতে পেরেছি ওইটেই আমার জীবনের গর্ব।

কুন্তী ॥ [স-শ্লেষে] অপরের কাছে তুমি এ গর্ব কোরো আমার কাছে নয়। তুমি কেন আমার সঙ্গে মিশেছিলে, কেন আমাকে দলে টানতে চেয়েছিলে তা আর কেউ না জানুক আমি জানি। আমার কাছে তুমি ওসব বড়াই কোরো না। অমিতাভ আর ধারা যাতে ছাড়া পায় সেই ব্যবস্থা কর। এইখান থেকেই ফোন কর থানায়।

ভূষণ ॥ ওরা আমার শত্রু, ওরা শয়তান। ওদের জন্যে আমি কিছু করতে পারব না।

কুন্তী ॥ [দৃঢ়কণ্ঠে] তোমাকে পারতেই হবে।

ভূষণ ॥ আমি পারব না কুন্তী। তাছাড়া ফোন করাও নিরাপদ নয়।

কুন্তী ॥ বেশ, তাহলে চিঠি লিখে দাও। এই নাও, কাগজ কলম।

[কাগজ কলম এগিয়ে দিল]

ভূষণ ॥ না, তা-ও পারব না।

কুন্তী ॥ তুমি কি সেই ব্যক্তি যে হাঁটু গেড়ে বসে আমাকে বলেছিল কুন্তী তুমি আমার উপর কৃপা কর—?

ভূষণ ॥ (হেসে) কিন্তু কৃপা তো কর নি।

কুন্তী ॥ করি নি ? তোমার মতো তৃতীয় শ্রেণীর লোকের জন্যে ক্যানভাস করে বেড়াই নি ? তুমি কি জানো না তুমি পাঁক ? তোমাকে চন্দন বলে জন-সমাজে পরিচিত করে তোমার জন্যে ভোট আদায় করেছে কে ? আমি !

ভূষণ ॥ আমি কিন্তু নতজানু হয়ে যা চেয়েছিলাম তা পাই নি।

কুন্তী ॥ (রহস্যময় হাসি হেসে) পেতেও পার, যদি তুমি আমার এ অনুরোধটা রাখ।

ভূষণ ॥ [সাগ্রহে] পেতে পারি ? কিন্তু এ অনুরোধ আমি যে রাখতে পারছি না কুন্তী। অমির নামে যে চার্জ আছে তা ভয়ংকর। আমি যদি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করি পুলিশ আমাকেই সন্দেহ করবে। ওটা আমি পারব না। তুমি আর যা চাও আমি দিতে রাজি আছি—যা চাও—

কুন্তী ॥ আমি আর কিছু চাই না। চিঠিটাই লিখে দাও।

ভূষণ ॥ কিন্তু ও চিঠি আমি লিখতে পারব না।

কুন্তী ॥ তোমাকে লিখতেই হবে।

ভূষণ ॥ মাপ কর, পারব না। একে বাঁচাবার জন্যে তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বুঝতে পারছি না।

কুন্তী ॥ কপালের দোষে আমাকে নীচ সংসর্গ করতে হয়েছে। কিন্তু মহৎকে প্রণাম করতে আমি ভুলি না—তাকে বাঁচাবার জন্যে প্রয়োজন হলে আমি প্রাণ দিতে পারি।

ভূষণ। কি বলছ তুমি কুন্তী !

কুন্তী ॥ ঠিকই বলছি। চিঠিটা তুমি লিখে ফেল।

ভূষণ ॥ না, ও চিঠি আমি লিখতে পারব না।

কুন্তী ॥ সত্যিই পারবে না ?

ভূষণ ॥ না।

[কুন্তী টেবিলের ড্রয়ার থেকে রিভলভারটা বের করে সেটা ভূষণের দিকে উঁচিয়ে ধরল]

কুন্তী ॥ লেখ—তা না হলে—

ভূষণ ॥ তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে না কি ?

কুন্তী ॥ [সপদ দাপে] লেখ।

ভূষণ ॥ তোমার প্রাণের ভয় নেই ?

কুন্তী ॥ আমি সারাজীবন ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। আমার কিছুমাত্র প্রাণের ভয় নেই। লেখ, তা না হলে তোমার মাথার খুলিটা এক্ষুণি উড়ে যাবে। লেখ বলছি।

ভূষণ ॥ অবনীবাবু কোথা ?

কুন্তী ॥ সে চলে গেছে। লেখ, লেখ, দেরি কোরো না। ওয়ান, টু—

ভূষণ ॥ কি মুশকিল ! আচ্ছা, দাও—

[কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখে দিল]

নাও, তোমার অনুরোধ রাখলাম। এবার আমার অনুরোধটা নিশ্চয় রাখবে।

কুন্তী ॥ (চিঠিটা ব্লাউসের ভিতর রেখে) না, রাখব না। তুমি আমার অনুরোধ রাখ নি। যা করেছ, ভয়ে করেছ, প্রাণের ভয়ে। তুমি মানুষ নও, পশু। আমি জানি এর পর তুমি থানায় যাবে। যদি যাও, আমি এ চিঠি তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করব। ছাপিয়ে বিতরণ করব চতুর্দিকে। সহজে ছাড়ব না—

ভুষণ ॥ যা খুশী বলে যাও। আমি প্রতিবাদ করব না। রাগলে তোমাকে ভারি সুন্দর দেখায়। চল ও ঘরে চল। রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি।

[দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল]

কুন্তী ॥ [একটু পিছিয়ে গিয়ে] গেট আউট।

[ভুষণ আরও এগিয়ে এল]

গেট আউট, গেট আউট। যদি এক্ষুনি বেরিয়ে না যাও আমি চেঁচিয়ে লোক জড় করব ॥ গেট আউট প্লীজ [কপাট দেখিয়ে দিল]

ভুষণ ॥ আমার বাড়ি থেকে তুমি আমাকেই তাড়িয়ে দেবে। অল রাইট। এর ফল ভোগ করতে হবে তোমাকে।

[রেগে বেরিয়ে গেল। কুন্তী রিভলভারটাও তার ব্লাউসের ভিতর রেখে দিল। একটু পরেই ভুষণের মোটর স্টার্ট করবার শব্দ হল]

কুন্তী ॥ যাক্, পাপটা বিদেয় হ'ল। এবার অবনীশকে খুঁজে বার করতে হবে—কোথা গেল সে—

[হঠাৎ অবনীশের প্রবেশ। তার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত]

অবনীশ ॥ কুন্তী, আমি থানায় বম ফেলেছি। পালাচ্ছি। যাবে তো চল আমার সঙ্গে। শিগগির চল—

কুন্তী ॥ থানায় বম ফেলেছ ! কি সর্বনাশ !

অবনীশ ॥ যা হোক্ কিছু একটা করে অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এ জীবন আর সহ্য করতে পারছি না। যাবে আমার সঙ্গে ? চল—

কুন্তী ॥ কোথা যাব ?

অবনীশ ॥ কোথা জানি না—কিচ্ছু জানি না। যে পথে তুমি বরাবর আমার সঙ্গিনী ছিলে সেই পথেই যাচ্ছি আবার। যাবে তো চল। এই ভ্যাপসা দুর্গন্ধ বদ্ধ পরিবেশে আর আমি থাকতে পাচ্ছি না। চল পালাই।

[কুন্তী তবু নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু উত্তেজনায় তার চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধ'রে গেল]

চল, চল, চল, পুলিশ এক্ষুণি এসে পড়বে। ভাবছ কি, চল চল—

[কুন্তীর হাত ধ'রে টানতে টানতে তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রথম দৃশ্যেরই অনুরূপ। জগদীশের বাড়ির সম্মুখ ভাগ। আরও কয়েক সারি বাল্‌ব শূন্যে ঝুলছে। পট উঠলে দেখা যাবে কেউ নেই। একটু পরেই দুলাল চোবে এলেন। তাঁর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

দুলাল ॥ ভূষণবাবু, ভূষণবাবু।

[ভূষণ বেরিয়ে এল]

ভূষণ ॥ দুলাল ! কি খবর ?

দুলাল ॥ [উদ্ভাসিত মুখে] এইমাত্র খবর পেলাম ভোট কাউন্টিং হয়ে গেছে। আপনি হিউজ মেজরিটিতে জিতেছেন ; অমিতাভর টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের বাড়িতে একটা সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছি। সেখানে যেতে হবে আপনাকে। আপনি একটা জামা গায়ে দিয়ে নিন।

[বাইরে শোনা গেল 'জয় ভূষণবাবুর জয়' 'ভূষণ মল্লিক জিন্দাবাদ']

ওরা সব প্রসেশন করে আমার বাড়িতে যাচ্ছে। চলুন।

ভূষণ ॥ এ সবের কি দরকার ছিল ?

দুলাল ॥ না, না, দরকার আছে বইকি। সম্বর্ধনা ছাড়া আর একটা কাজও আমাদের করতে হবে। থানায় বম পড়েছে। সেই গোলমালের মধ্যে অমিতাভ ধারা তীর্থ মাধুরী সবাই পালিয়েছে। প্রকাশ্য সভায় এই হিংসাত্মক কাজের তীব্র নিন্দা করে একটা প্রস্তাব নিতে হবে। আপনিই সেটা উত্থাপন করবেন।

ভূষণ ॥ বেশ।

দুলাল ॥ তাহলে আর দেরি করবেন না। একটা ফর্সা খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে নিন। কাপড় আর গেঞ্জি তো ফরসাই আছে।

[ভূষণ ভিতরে চলে গেল। পিওনের প্রবেশ]

পিওন ॥ ভূষণবাবুর একটা চিঠি আছে।

দুলাল ॥ আমাকেই দাও, উনি এখনি আমার সঙ্গে বেরুবেন। জামা পরতে গেছেন। আমাকেই দাও, দিয়ে দেব।

[পিওন দুলালের হাতে চিঠি দিয়ে চলে গেল। একটু পরেই ভূষণ খদ্দরের পাঞ্জাবি ও চাদর গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এল]

দুলাল ॥ পিওন এই চিঠিটা দিয়ে গেল।

ভূষণ ॥ (চিঠিটি পড়ে') এ কি !

দুলাল ॥ কোন দুঃসংবাদ না কি !

ভূষণ ॥ তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। তোমারও এটা শোনা দরকার। আইনত তুমিই সুজাতা কেমিক্যালসের মালিক। ডাক্তার গুপ্ত লিখেছেন—সুজাতা কেমিক্যালস্ কোম্পানির 'টাইফয়েড কিওর' ওষুধটায় কোন কাজ হচ্ছে না। সেখানে আমার ছেলে প্রসূনের টাইফয়েড হয়েছে, ডাক্তার গুপ্ত ওই ওষুধটাই দিচ্ছেন কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। অসুখ খুব বাড়াবাড়ির দিকে।

দুলাল ॥ তাই না কি ? আমি তো নির্দোষ। আপনি আমাকে বেনামদার করে ব্যবসাটা ফাঁদলেন। আমার ওসবে ঢোকবার ইচ্ছে ছিল না। আমি চাল গমের ব্যবসা বুঝি, ওষুধ-টসুধের কিচ্ছু বুঝি না। কিন্তু আপনার অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না।

ভূষণ ॥ এখন কি করা যায় বল তো [একটু ভেবে] ঠিক আছে। টাইফয়েডের কিছু বিলিতি ওষুধ বাজার থেকে কিনে একজন লোকের হাত দিয়ে সেটা কানপুরে ডাক্তার গুপ্তের কাছে পাঠিয়ে দিই। কি বল ? চিঠিটা কবে লিখেছেন দেখি

[চিঠিটা দেখলেন] গড্ ! দশদিন আগের তারিখ ! পোস্টাল ডিপার্টমেণ্ট হোপলেস। কানপুর থেকে দু'দিনে চিঠি আসে [সহসা] আমি মীটিংয়ে যাব না। কানপুরে যাব। আজই প্লেনে যেতে চাই। ওষুধগুলো নিয়ে যাব—বাজারে ওষুধটা খুঁজতে হবে। বিলিতি ওষুধ—যত টাকা লাগে—খাঁটি ওষুধ আমার চাই-ই।

[টেলিগ্রাফ পিওনের প্রবেশ]

পিওন ॥ আপনার নামে একটা টেলিগ্রাম আছে।

ভূষণ ॥ টেলিগ্রাম !

[সই করে টেলিগ্রামটি নিল। পিওন চলে গেল। টেলিগ্রামটি ত্বরিত হস্তে ছিঁড়ে সেটি পড়ে আর্তনাদ করে উঠল ভূষণ]

ভূষণ ॥ একি হ'ল দুলাল ? আ—আমি তো—

[বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল]

দুলাল ॥ [উদ্বিগ্ন] কি হ'ল, কি হ'ল—

ভূষণ ॥ [সম্মুখের দিকে উদাস নেত্রে চেয়ে রইল, তার পর বলল] প্রসূন মারা গেছে।

দুলাল ॥ [স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ক্ষণকাল পরে মারা গেছে ?

ভূষণ ॥ আমারই ওষুধ খেয়ে মারা গেছে। আমারই ওষুধ খেয়ে !

দুলাল ॥ [কিছু পরে] ভূষণবাবু, চলুন, ঘরে চলুন।

ভূষণ ॥ [বিহ্বল ভাবে] কি বললে ? ঘরে যাব ?

[ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল]

না—না ঘরে যাব না। ভাল খাঁটি ওষুধ নিয়ে আমায় কানপুরে যেতে হবে। কানপুরে—

দুলাল ॥ কানপুরের ট্রেণ তো রাত্রিরে।

ভূষণ ॥ না—না ট্রেণে যাব না। প্লেনে—প্লেনে যেতে হবে আমায়—নইলে তার সঙ্গে দেখা হবে না—দেখা হবে না।

[দ্রুত প্রস্থান]

দুলাল ॥ ভূষণবাবু, ভূষণবাবু।

[পিছনে পিছনে প্রস্থান। দারোগার প্রবেশ]

দারোগা ॥ [জগদীশের দ্বারে টোকা দিলেন। তার পর ডাকতে লাগলেন] জগদীশবাবু। জগদীশবাবু—

[বাইরের দিকে চেয়ে] তোমরাও ভিতরে এস।

[পাড়ার কয়েকজন লোক ও দু'জন পুলিশ কনস্টেবল প্রবেশ করল। রতনও বেরিয়ে এল বাড়ির ভেতর থেকে]

দারোগা ॥ [রতনকে] জগদীশবাবু বাড়িতে আছেন ?

রতন ॥ আছেন।

দারোগা ॥ ডেকে দাও তাঁকে।

[রতন ভিতরে গিয়ে জগদীশবাবুকে ডেকে নিয়ে এল। পিছনে পিছনে মালতীও এলেন]

জগদীশ ॥ কি চান ?

দারোগা ॥ আপনার ছেলে অমিতাভ থানা থেকে পালিয়েছে। তার খবর কিছু জানেন ?
জগদীশ ॥ জানি, কিন্তু বলব না।
দারোগা ॥ থানায় বম্ পড়েছে, শুনেছেন ?
জগদীশ ॥ শুনেছি।
দারোগা ॥ আমরা খবর পেয়েছি আপনার বাড়িতে একটা ল্যাবরেটারি আছে। আমাদের সন্দেহ সেখানে বম তৈরি হয়। পাড়ার লোক প্রায়ই দুমদাম্ আওয়াজ শুনেছে আপনার বাড়ি থেকে। আপনাদের সকলকে অ্যারেস্ট করবার ওয়ারেন্ট নিয়ে আমি এসেছি। আপনার বাড়িতে আমরা তালা লাগিয়ে সীল করে দেব। পরে বাড়ি সার্চ হবে।
জগদীশ ॥ বেশ, শুনে সুখী হলাম।
দারোগা ॥ আপনার ছেলের খবর কিছু বলবেন না ?
জগদীশ ॥ না। একটা খবর বলতে পারি—রাজা কংস যখন ভদ্রলোকদের উপর অত্যাচার করছিল তখন তার কারাগারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ! বন্দিনী দেবকী প্রসব করেছিলেন তাঁকে।
দারোগা ॥ [মালতীকে] আপনিও বলবেন না ?
মালতী ॥ আমি ? আমি আর কি বলব। এইটুকু শুধু বলতে পারি ও ভালো ছেলে, আপনারা ওকে চিনতে পারেন নি।
দারোগা ॥ আপনারা ক'জন আছেন ?
জগদীশ ॥ আমরা দু'জন, আর রতন।
দারোগা ॥ তিনজনকেই আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।
জগদীশ ॥ বেশ (মালতীকে) মায়ের আগমন আসন্ন। প্রণাম কর [উভয়ে প্রণাম করলেন]
দারোগা ॥ [কনস্টেবলদের] বাড়ির কপাট তোমরা সীল করে দাও।
জগদীশ ॥ [রতনকে] রতন, সুইচ্‌টা অন ক'রে দে এবার।

[রতন ভিতরে চলে গেল। সমস্ত বাল্‌বগুলি জ্বলে উঠতেই দারোগা হকচকিয়ে গেলেন]

দারোগা ॥ হঠাৎ এত আলো জ্বাললেন কেন ?
জগদীশ ॥ তা আপনার মাথায় ঢুকবে না। চলুন।

[তিনজনকে নিয়ে দারোগা চলে গেলেন্। কনস্টেবলরা বাইরের কপাটে একটা তালা লাগিয়ে দিল। বাইরে থেকে ভৈরব বাবার উদাত্ত কণ্ঠস্বর লাউড স্পীকারে শোনা গেল]

উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত খড়্গ যার দানবের শোণিতে চর্চ্চিত
যার কণ্ঠে মুণ্ডমালা ভণ্ড মানবের
মূর্তিমতী যে তাড়না ইতিহাসে হয়েছে অর্চিত
শোনা যায় ফের
তাহারই চরণ-ধ্বনি মনুষ্যত্ব-শ্মশান-শিয়রে
বিদ্যুৎ-বিক্ষত-নভ আনন্দে ও শঙ্কায় শিহরে।

য ব নি কা